বিচারপতি শাইখ আবদুল হাকিম হককানি

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা

ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসন-ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা

অনুবাদ || জাহিদ বিন যুবায়ের
সম্পাদনা || জোজন আরিফ

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা

ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসন-ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা

মূল

বিচারপতি শাইখ আবদুল হাকিম হককানি

অনুবাদ

জাহিদ বিন যুবায়ের

সম্পাদনা

জোজন আরিফ

জাবির মুহাম্মদ হাবীব

দারুল ইলম

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা

বিচারপতি শাইখ আবদুল হাকিম হককানি

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

প্রকাশক

দারুল ইলম

৬৫/১ কওমি মার্কেট, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০;
ফোন : ০১৯২০ ৯৯০ ৬৫০; ০১৫৫২ ৯০ ২৩ ২৫

একুশে বইমেলা পরিবেশক
রাহনুমা প্রকাশনী

Phone : 01920 990 650; 01552 90 23 25
Facebook : fb.com/darulilmpub/
Email: darulilmpub@gmail.com
ISBN : 978-984-34-7806-1
Islami Rashtrobabostha by Abdul Hakim Haqqani. Published by *Darul Ilm Pub.,* Dhaka, Bangladesh. First Edition jan.-2023.

Price: BDT 590.00

নাজরানা—

তাদেরকে, যারা খুন-পাসিনা এক করে খিলাফতে ইসলামের জন্য নিজেদের জান কুরবান করেছেন, করছেন এবং করবেন।

তাদেরকে, যারা অক্লান্ত অবিশ্রান্তভাবে ইমরাতে ইসলামের জন্য নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, দিচ্ছে এবং দেবেন।

তাদেরকে, যারা জান বাজি রেখে ইলায়ে কালিমার জন্য হাসিমুখে শাহাদাত বরণ করেছেন, করছেন এবং করবেবেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাদের কাতারে শামিল করেন, এই কামনায়...

আমিরুল মুমিনিন শাইখ হিবাতুল্লাহ আখুনদ জাদাহ হাফিজাহুল্লাহর

মূল্যবান দুআ ও ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি সত্যভাবে কিতাব ও মিজান নাজিল করেছেন। ইনসাফ ও সদাচারের আহ্বানকারী বানিয়ে তাঁর রাসুলকে পাঠিয়েছেন। দরুদ ও সালাম পূর্ববতী ও পরবর্তীদের সরদার আমাদের সেরেতাজ উম্মি নবী মুহাম্মাদ সা.-এর প্রতি; যিনি ছিলেন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত; এবং তার পরিবার ও সাহাবির প্রতি—যারা উত্তম ও পূতঃপবিত্র। শান্তি বর্ষিত হোক তার অনুগত সকল উম্মতের প্রতিও।

পরকথা, *ইমারাতে ইসলামিয়া* (ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা) নামের কিতাবের কিছু অংশ আমি মুতালাআ করেছি, মুতালাআ করে বুঝতে পারলাম—রাষ্ট্রবিজ্ঞান জানার ক্ষেত্রে কিতাবটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ; তারপর মুতাআলা করার দায়িত্বটা আমি বড়ো উলামায়ে কিরামের হাতে সোপর্দ করেছি—যারা আমাদের প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করেন। তো, পরবর্তী সময়ে তারা তাদের দায়িত্ব খুবই সূক্ষ্মভাবে আঞ্জাম দেন, সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করেন। সাথে সাথে সমর্থনও করেন।

সুতরাং বলা যায়, কিতাবটি আমার দুটো সমর্থনের মাধ্যমে সমর্থিত—

- ০১. আমার মুতালাআর মাধ্যমে;
- ০২. উলামায়ে কিরামের মুতালাআর মাধ্যমে।

আল্লাহ তাআলা আপন বান্দাদের জন্য যে দ্বীনে ইসলাম মনোনীত করেছেন, তা মানবজীবনের প্রত্যেকটা অঙ্গানের জন্য এক সর্বজনীন ব্যবস্থা—যা দুনিয়া ও আখিরাতের পূর্ণ সৌভাগ্যের পথ দেখাতে পারে। যা বিশুদ্ধ আকিদা, খাঁটি ইবাদত, উত্তম আখলাক ও সঠিক পথ প্রদর্শন করে, যা তাকাফুল-ব্যবস্থা ও সুউচ্চ নির্মল মুআমালার আহবান করে।

উম্মতে মুসলিমার ওপর আল্লাহ তাআলার বড়ো একটি অনুগ্রহ যে, তিনি যুগে যুগে উলামায়ে কিরামকে ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণা করার তাউফিক

দান করেন। শুধু তাই নয়, বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাগরে ডুব দিয়ে দুলর্ভ মণিমুক্তা আহরণের তাউফিকও দান করেন। প্রতিটা ফন ও শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন কিতাব, রচনা ও সংকলন তৈরির ক্ষমতা দান করেন। এর অমূল্য রত্নভান্ডার লাভ করার তাউফিক দেন।

আল্লাহ তাআলার শোকর, তিনি এই সিলসিলা ও ধারাবাহিকতা আজও জারি রেখেছেন। এ যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর সত্যায়ন—'আমার উম্মতের উদাহরণ হলো বৃষ্টির মতো, যার ব্যাপারে বলা যায় না যে, তার প্রথমাংশ উত্তম, না শেষাংশ।'

আমাদের সামনে উপস্থিত *ইমারতে ইসলাম* কিতাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা। যা রচনা করেছেন আলিমকুলের শিরোমনি, যুগশ্রেষ্ঠ ফকিহ, হকের মূল ভিত্তি, আল্লাহর রাস্তার নিবেদিত মুজাহিদ, শাইখ আল্লামা আবদুল হাকিম হাফিজাহুল্লাহ।

তার রচিত এ কিতাবটি সভ্যতা বিনিমার্ণের সিঁড়ি, রচনা-জগতের কেন্দ্রবিন্দু, ইসলামি রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ একটি কিতাব, আলোচনা-গবেষণার ক্ষেত্রে শক্তিশালী, অর্থ স্পষ্টতার ক্ষেত্রে চমৎকার, সুন্দর বিন্যাসে মনোরম, ইসলামি রাজনীতিবিদদের জন্য আলোর মশাল। সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ—যেন তিনি এ কিতাবের মাধ্যমে মুসলিমবিশ্বকে উপকৃত করেন, লেখককে আপন অনুগ্রহে সর্বোত্তম জাজা দান করেন, তার এ মহৎ কাজে আমাদের জন্য বরকত দান করেন, আমিন।

—হাকির হিবাতুল্লাহ উফিয়াল্লাহু আনহু
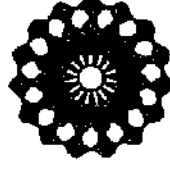
অনুবাদকের কথা

মুসলিম উম্মাহ বর্তমান যে ক্রান্তিলগ্ন পার করছে, সে সম্পর্কে সবাই অবগত। মূলত এ শোচনীয় অবস্থা এখনকার মতো এই পর্যায়ে আগে আর কখনোই ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর খুলাফায়ে রাশিদা থেকে খিলাফাত ও নিয়াবতের যে ধারা ও সিলসিলা শুরু হয়েছিল, তা যুগ যুগ ধরে বিদ্যমান ছিল, কখনো বিচ্ছিন্ন ছিল না।

খিলাফাতের এ সুদীর্ঘকালে আদল ও ইনসাফের যে নমুনা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ কায়েম করেছে, অন্য কোনো জাতি বা ধর্মের ইতিহাসে তার নজির নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পর বিপর্যস্ত মানবতা আশ্রয় পেয়েছিল ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। দিকভ্রান্ত কাফেলা পেয়েছিল পথের দিশা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আদল ও ইনসাফের মহান এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন খুলাফায়ে রাশিদা; মানবজাতির ইতিহাসে শাসক ও শাসনের এক নতুন ধারা সূচিত হয়, অবাক বিস্ময়ে পৃথিবী অবলোকন করে, উদারতা ও মহানুভতা, বিনয় ও সংযমের মতো মহৎ গুণ।

খুলাফায়ে রাশিদার পর পর্যায়ক্রমে খিলাফাতের এ মহান দায়িত্ব অর্পিত হলো, বনু উমাইয়া, বনু আব্বাস এবং বনু উসমানির হাতে। ইতিহাস সাক্ষী, পৃথিবীর বুকে যতদিন খিলাফতব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল, তা পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীর জন্য শুধু কল্যাণ ও শান্তিই বয়ে এনেছে, অন্য কোনো জাতি বা ধর্মানুসারীর জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে নি। তবে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সাথে শত্রুতা কখনোই থেমে থাকে নি, বরং এই শত্রুতা নবীযুগ থেকে তেরো শ' বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, এখনো আছে। যার সূচনা মুনাফিক আব্দুল্লাহ উবনু উবাই, সমাপ্তি কামাল পাশা। তারা অব্যাহতভাবে চেষ্টা করে গেছে—কীভাবে খিলাফাত-ব্যবস্থা নির্মূল করা যায়। যা বাস্তবায়িত হয় ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম উম্মাহর গাদ্দার কামাল পাশার হাতে।

বর্তমান আমারা ২০২২ সাল পদার্পণ করেছি, অর্থ্যাৎ, প্রায় এক শতাব্দী পার হয়ে

যাচ্ছে। অথচ মুসলিম উম্মাহর কোনো খলিফা বা খিলাফত-ব্যবস্থা নেই। পুরো বিশ্বে এমন কোনো দেশ বা অঞ্চল নেই, যেখানে পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামি শরিয়া বাস্তবায়িত হচ্ছে। অথচ সাহাবায়ে কিরামের কাছে খিলাফাত এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাফনের পূর্বেই তারা নিজেদের জন্য খলিফা নির্ধারণ করে নেন।

যাহোক, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে ইমারতে ইসলাম দান করলেন। হ্যাঁ, এই ইমারতে ইসলাম যদিও-বা শুধু আফগানে প্রতিষ্ঠিত, তবুও প্রতিটি মুসলিম-হৃদয়েও তা প্রতিষ্ঠিত। কারণ, এই ইমারতে ইসলাম মুসলিম মা-বোনদের দুআর ফল, মুমিনদের দিলের ফরিয়াদের প্রতিফলন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসা মুসলিম উম্মাহর জানবাজ সন্তানদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। আল্লাহ তাআলার লাখো কোটি শুকরিয়া, মহান রাব্বুল আলামিন আমাদের জীবদ্দশাতেই এমন একটি ইমারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে দেখার তাউফিক দান করেছেন, যেখানে প্রতিটি বিষয় শরিয়াহর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

কিতাব সম্পর্কে : যেহেতু আমাদের নিকট দূরত্বের দেশ আফগানে ইমারতে ইসলাম কায়েম হয়েছে, তাই শুধু আমাদেরই না, স্বাভাবিকভাবেই সারা বিশ্বের মুসলিমদের একটি চাওয়া ছিল, প্রয়োজন ছিল, ইসলামে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে একটি স্বতন্ত্র কিতাব তাদের পক্ষ থেকে উপহার দেওয়া। এই প্রয়োজনকে সামনে রেখেই তাদের পক্ষ থেকে বিচারপতি শাইখ আবদুল হাকিম হককানি এই কিতাবটি রচনা করেন। কিতাবটির কিছু বৈশিষ্ট্য হলো—

- ০১. এর প্রতিটি আলোচনা-ই কুরআন-সুন্নাহ ও উলামায়ে উম্মাহের মতামতের আলোকে উপস্থাপিত হয়েছে।
- ০২. এতে স্পষ্টভাবে খিলাফত ও বিচার-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।
- ০৩. ইসলাম-প্রশ্নে পশ্চিমাদের মূল আপত্তি ও সমালোচনা হলো নারী-অধিকার ও শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ে, তাই লেখকের পক্ষ থেকে তাদের মুখ বন্ধ করার মতো উপযুক্ত জবাবও কিছুটা বিশদভাবে গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত হয়েছে।

কিতাব সম্পর্কে কী আর মন্তব্য করার আছে, যেখানে স্বয়ং আমিরুল মুমিনিন মন্তব্য করেছেন। আল্লাহ তাআলা লেখককে উত্তম বিনিময় দান করেন। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত প্রায়োগিকভাবে সারগর্ভ আলোচনার তাউফিক দান করেন। আমিন।

অনুবাদ সম্পর্কে: কিতাবটি যখন হাতে নিয়ে আগাগোড়া পড়ি, তখনই আমার মনে হলো—কিতাবটির অনুবাদ হওয়া দরকার। কারণ, আরবিতে একটা প্রবাদ আছে—

শুনে বলা আর দেখে বলা কখনো এক হতে পারে না; যিনি কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, তিনি সেই বিষয়টা ভালোভাবে তুলে ধরতে পারেন। এই বই সম্পর্কেও একই কথা। লেখক হলেন ইমারতে ইসলামের প্রত্যক্ষ্যদর্শী। সেখানকার প্রধান বিচারপতি। তার লেখা অন্যদের চেয়ে অবশ্যই আলাদা কিছু হবে।

তো যাইহোক, বইটি নিয়ে একদিন শাইখুল হাদিস মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ সাহেবের কাছে গিয়ে অনুবাদ করতে চাওয়ার বিষয়টা তুলে ধরলাম। হুজুর খুশিমনেই অনুবাদের ইজাজত দিলেন। যদিওবা আমার তখন অনুবাদের ক্ষেত্রে মাদরাসাতুল মাদীনাহর কিছু তামরিন ছাড়া আর কোনো পুঁজি ছিল না। তবুও আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করে, দুই রাকাত সালাতুল হাজত পড়ে মসজিদে বসে অনুবাদ-কাজ শুরু করলাম। যথাসম্ভব মসজিদে বসে অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। তবে দারসিয়্যাতের প্রতি লক্ষ্য করেই কাজ করেছি। এভাবে কাজ করতে করতে একসময় মসজিদের বারান্দাতেই তা সমাপ্ত হয়; আলহামদু লিল্লাহ। অনুবাদের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করেছি—

- ০১. ভাষার সাবলীলতা; যার ফলে (মূল বক্তব্য ঠিক রেখে) কিছু বাক্য সংযোজন-বিয়োজন করতে হয়েছে।
- ০২. মূল বক্তব্য অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।
- ০৩. প্রয়োজনী স্থানে টীকা-টিপ্পনি যুক্ত করা হয়েছে।
- ০৪. কিছু বিষয় প্রয়োজনের কারণে বিন্যাসগতভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ০৫. কিছু পরিভাষা আরবিতেই অক্ষুণ্ণ রেখে নীচে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

হ্যাঁ, সাথে কোনো বিষয় অস্পষ্ট মনে হলে মুফতি হারুন সাহেব হুজুর এবং উস্তাদে মুহতারাম মাওলানা যায়েদ সাহেব হুজুরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। আমার উস্তাদগণ খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমি সেভাবেই বাকি কাজ সম্পাদন করেছি।

নবীন অনুবাদক হিসাবে এত কিছুর পরও ভুল হওয়াই স্বাভাবিক, তাই প্রবীণদের কাছে বিনয়ের সাথে আবেদন—যদি কোনো ভুলত্রুটি নজরে আসে, আর অবগত করা হয়, তাহলে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ থাকব।

জীবনপথ একা পাড়ি দেওয়া অনেকটা দুষ্কর। শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কারও-না কারও সাহায্য গ্রহণ করতেই হয়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়া যা কখনো শোধ করা যাবে না। তাই এ মুহূর্তে আম্মু-আব্বুকে স্মরণ করছি, জীবনটা তিলে তিলে ক্ষয় করে আমাদের চারভাইকে দ্বীনের ওপর গড়ে তুলেছেন, আল্লাহ সুস্থতার সাথে আমাদের ওপর তাদের সুশীতল ছায়াকে দীর্ঘায়িত করেন। আমিন।

আমার বড়ো দুই ভাই আমাদের জন্যে কত বড়ো নিয়ামত, তা বলে বোঝানো

অসম্ভব। শিক্ষাজীবনের সূচনা থেকে এখনো পর্যন্ত পড়ালেখা ও কর্মব্যস্ততার মাঝেও আমাদের জন্য দৌড়ঝাঁপ করেন, যখন যা প্রয়োজন হয় ব্যবস্থা করে দেন—যা এ যুগে বিরল। আল্লাহ তাআলা এ মুহাব্বত ও ভালোবাসা জীবনভর অটুট রাখেন, আমিন। জাজাহুমুল্লাহু খাইরান আহসানাল জাজা।

মাদরাতুল মাদীনাহ ও আদীব হুযুরের কথা স্মরণ না করলে না-শুকরি হবে। আমার সব সময়ের অনুভূতি, যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে মাদরাসাতুল মাদীনাহর ছায়া না দান করতেন তাহলে...!

খুব মনে পড়ছে—মাদরাসাতুল মাদীনায় থাকা আমার নেগরান উস্তাদ মাওলানা আবু উবাদা সাহেব দা. বা. হুজুরের কথা। হুজুর আমাদের দারসিয়্যাতের সাথে আদব-সাহিত্য-অনুবাদ ও অন্যান্য বিষয়ের জন্যে খুব তাকিদ দিতেন। হুজুর আমাদের গড়ে তোলার জন্য শাব্দিক অর্থেই 'দিন-রাত একাকার' করে দিতেন। আল্লাহ তাআলা আদীব হুযুরকে, আমার নেগরান উস্তাদ এবং সকল আসাতিজায়ে কিরামকে আপন শান মুতাবেক আহসানুল জাজা দান করেন। আমিন।

অবশেষে দারুল ইলমের প্রকাশক ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, তিনি অনুবাদটি প্রকাশ করার সাহস করেছেন; আল্লাহ তাআলা তাকে এবং যারাই এ-কাজের সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করেন। আমিন। আর একেবারে শেষে আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ—যে মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অনুবাদ করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা যেন সেই উদ্দেশ্য পূরণ করেন। এ অনুবাদ মাকবুল করেন, এর উপকারিতা ব্যাপক করে দেন। সাদকায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করেন। আমিন।

—দুআর মুহতাজ

জাহিদ বিন যুবায়ের

০৫. ০৪. ১৪৪৪ হিজরি
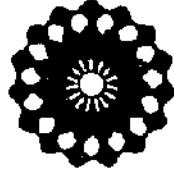
যে পৃষ্ঠায় যা আছে—

মূল্যবান দুআ ও ভূমিকা	৬
অনুবাদকের কথা	৮
ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা	২৫
শাসন-ব্যবস্থার প্রকারভেদ	২৭
শাসন-ব্যবস্থা দুই প্রকার	২৭
দাওলাতুল জিবায়ার উদ্দেশ্য	২৭
দাওলাতুল হিদায়ার উদ্দেশ্য	২৮
দাওলাতুল হিদায়ার শাসকশ্রেণি	২৯
দাওলাতুল জিবায়ার শাসকশ্রেণি	২৯
দাওলাতুল হিদায়ার জন্য যা জরুরি	৩০
মানবরচিত আইনের অসারতার প্রমাণ	৩৪
ইসলামি হুকুমাত	৪২
ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি	৪২
বনু মাখজুমের এক নারী	৪৪
উমার রা. এবং এক ঘোড়া বিক্রেতা	৪৪
ইসলামি বিধিবিধানের উৎস	৪৭
প্রথম উৎস : কুরআন কারিম	৪৭
কুরআনে বর্ণিত কার্যত বিধিবিধান দুই প্রকার:	৪৭
দ্বিতীয় উৎস: সুন্নাহ	৪৮
তৃতীয় উৎস: ইজমা বা একমত হওয়া	৪৮
চতুর্থ উৎস: কিয়াস	৪৮
পঞ্চম উৎস: ইসতিহসান	৪৯
ষষ্ঠ উৎস: মাসলাহাতে মুরসালা	৪৯
সপ্তম উৎস: প্রচলন	৪৯

অষ্টম উৎস: ইস্তিসহাব	৪৯
নবম উৎস: পূর্ববর্তী ধর্ম	৪৯
দশম উৎস: সাহাবিদের কথা ও কর্ম	৫০
মাজহাব	**৫১**
মানুষের স্বভাব ও যুগের প্রচলন	**৫৩**
স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা	**৫৫**
স্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতা	**৫৭**
ভূমির স্বাধীনতা-রক্ষা	৬১
ইসলামি সাম্রাজ্যের নামকরণ	**৬২**
শব্দ-বিশ্লেষণ	৬২
রাষ্ট্রপ্রধানের নাম	**৬৭**
নাম বিশ্লেষণ	৬৭
পতাকা ও ঝান্ডা	**৭৩**
পতাকার প্রকার	৭৩
পতাকার রং	৭৩
পতাকার ওপর কী লেখা হবে?	৭৪
আমির বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন	**৭৬**
রাষ্ট্রপ্রধান কাকে বলে?	৭৬
নির্বাচনের গুরুত্ব	৭৬
নির্বাচনের শরয়ি পদ্ধতি	৭৭
০১. ইরবাজ ইবনু সারিয়া রা.-এর হাদিস	৭৭
০২. হুজাইফা রা.-এর হাদিস	৭৮
০৩. ইজমা	৭৮
খুলাফায়ে রাশিদার নির্বাচনের পদ্ধতি	**৮০**
আবু বকর রা. এর নির্বাচন	৮০
উমার ইবনুল খাত্তাব রা. এর নির্বাচন	৮৩
অসিয়তনামা	৮৪
উসমান ইবনু আফফান রা. এর নির্বাচন	৮৬
আলি ইবনু আবি তালিব রা. এর নির্বাচন	৪৮
খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি	৮৮
বাইআতের প্রকার	৮৯
তৃতীয় পদ্ধতি—জোর-জবরদস্তি	৯৩
জোর-জবরদস্তি করে শাসনের হুকুম	৯৪

জবরদখলকারী খলিফা দুই প্রকার	৯৪
বর্তমান গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি	৯৯
খলিফা হওয়ার শর্ত ও বৈশিষ্ট্য	**১০৬**
ইমামতে কুবরার জন্য শর্তাবলি—	১০৬
নারীরা শাসক হলে যে সকল সমস্যা দেখা দেবে—	১০৭
অযোগ্য শাসককে উৎখাত করা	১১৩
খলিফার দায়-দায়িত্ব	**১১৪**
নিজেকে পরিচালনা	১১৪
নিজেকে পরিচালনা ও পরিশুদ্ধকরণের বেশ কিছু কার্যকর পদ্ধতি	১১৫
ইমামের সিয়াসাত	**১১৭**
সিয়াসাতে আদেলা বা ইনসাফপূর্ণ শাসন-ব্যবস্থার কিছু মূলনীতি	১২০
সিয়াসাতের প্রকারভেদ	১২২
আবু বকর রা.-এর উপদেশ	১২৪
আবু বকর রা.-এর রাষ্ট্রনীতি	১২৫
উমার ইবনুল খাত্তাব রা.-এর উপদেশ	১২৭
উমার রা.-এর সিয়াসাত বা রাষ্ট্রনীতি	১২৯
উমার রা.-এর রাষ্ট্রনীতি	১৩২
উসমান রা.-এর কিছু উপদেশ	১৩৮
উসমান রা.-এর রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ	১৩৯
আলি রা. এর কিছু উপদেশ	১৩৯
আলি রা. এর রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ	১৪৩
আলি রা. এর চমৎকার বিচার	১৪৭
যুদ্ধে শাসকের কর্তব্য	১৪৮
খলিফার দায়িত্ব	**১৫১**
খলিফার যে-সব দায়িত্ব	১৫১
ইনসাফ কাকে বলে?	১৫৩
খলিফা যে দশটি মূলনীতি রক্ষা করবেন:	১৬০
খলিফার শাসন-ক্ষমতার সমাপ্তি	**১৬৩**
নিজেকে বরখাস্ত করা	১৬৩
খলিফা যে কাজে নিজে নিজেই বরখাস্ত হন	১৬৪
জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মাসআলা	১৬৬
জালিম শাসক পদচ্যুত করার নিরাপদ পদ্ধতি নিরাপদ	১৭৭
নেতৃত্বে আবেদন করা	**১৮০**

জনগণের করণীয়	**১৮৩**
শাসকদের কাজের নিন্দা বা প্রত্যাখান	১৮৭
শাসকদের উপদেশ দেওয়ার চারটি শর্ত	১৮৯
আহলুল হিল্লি ওয়াল আকদ	**১৯১**
আহলুল হিল্লি ওয়াল আকদ হওয়ার শর্ত	১৯১
নারীদের বাইআতগ্রহণ	১৯৩
শাসক নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী	১৯৪
নারীদের রাজনৈতিক কাজে জড়ানো	১৯৮
'আহালুল হিল্লি ওয়ালা আকদ' এর দায়িত্ব	২০৩
'আহলুল হিল্লি ওয়াল আকদ'-এর সংখ্যা	২০৪
ইসলামে বিধান-ব্যবস্থা	**২০৮**
ভিত্তিমূলক আইন	২০৮
ইসলামে আইন-কানুনের উৎস	২১২
সালতাতুত তানফিজ (কার্যকরী মন্ত্রণালয়)	২১৩
রাষ্ট্র পরিচালনা	**২১৫**
খুলাফায়ে রাশিদার যুগে রাষ্ট্র পরিচালনা	২১৫
আবু বকর রা. এর যুগ	২১৫
উমার রা.-এর যুগ	২১৬
উসমান রা. এর যুগ	২১৬
আলি রা. এর যুগ	২১৭
শাসন ক্ষমতার প্রকার	**২১৮**
শাসক (খলিফা) এবং প্রধানমন্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক রাখার পদ্ধতি	২২০
প্রধানমন্ত্রী নিযুক্তকরণ	২২১
উজিরে তাফবিজের সংখ্যা	২২২
তানফিজ করার মন্ত্রণালয়ের শর্ত	২২৪
যাদের ক্ষমতা ব্যাপক, কিন্তু কাজের পরিধি সীমাবদ্ধ	২২৫
ইমারতের ইসতিলা (আধিপত্য বিস্তার করে নেতৃত্ব অর্জন)	২২৮
ইমারতে ইসতিলা ও ইমারতে ইসতিকফা—এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য	২৩০
ব্যাপক নেতৃত্ব	২৩০
যাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, কিন্তু কাজের পরিধি বিস্তৃত	২৩১
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	**২৩২**
সেনাবাহিনী পরিচালনা করা	২৩২
সেনাবাহিনী গঠন করার শর্তাবলি	২৩৩

শাসকের জন্য সেনাবাহিনীকে উত্তম করে গড়ে তোলার তিনটি পদ্ধতি—	২৩৪
জনগণের জন্য সেনাবাহিনীকে উত্তম করে গড়ে তোলার তিনটি পদ্ধতি—	২৩৪
ইসলামি সেনাপ্রধানের বৈশিষ্ট্য	২৩৬
মুসলিম সেনাপ্রধানের কর্তব্য	২৩৯
সেনাবাহিনীর কর্তব্যসমূহ	২৪৩
সেনাপ্রধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অধিকার ও কর্তব্য	২৪৫
এক. সেনাপ্রধানের আনুগত্য করা	২৪৫
দুই. প্রতিটি বিষয়ই তার সামনে পেশ করা এবং তার সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া	২৪৫
তিন. আদেশ-নিষেধ মান্য করা	২৪৬
অর্থ মন্ত্রণালয়	**২৪৭**
ইসলামি শরিয়তের আলোকে এর বিশ্লেষণ	২৪৭
০১. চাষাবাদ	২৪৯
প্রথম কর্তব্য: ব্যাপক পরিমাণে পানির ব্যবস্থা	২৪৯
দ্বিতীয় কর্তব্য: নিরাপত্তা-ব্যবস্থা	২৪৯
তৃতীয় কর্তব্য: ইনসাফ প্রতিষ্ঠা	২৫০
০২. ব্যবসা-বাণিজ্য:	২৫১
কুরআনে কারিম সম্পদ ব্যয়ের নির্দেশনা	২৫২
০৩. কাজ করা ও উপার্জন করা	২৫৩
ফায়দা—ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনীতি	২৫৫
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	**২৫৮**
০১. দ্বীন ও ধর্ম রক্ষা করা	২৫৮
০২. জনগণের প্রাণ রক্ষা করা	২৫৮
০৩. আকল-বুদ্ধি রক্ষা করা	২৫৯
০৪. বংশ রক্ষা করা	২৫৯
০৫. ইজ্জত-আব্রুর হিফাজত করা	২৫৯
০৬. সম্পদ রক্ষা করা	২৬০
বিচার-ব্যবস্থা	**২৬৮**
কাজা কী?	২৬৮
কাজার শরয়ি দৃষ্টিকোণ	২৬৯
নবীযুগে আদালত-ব্যবস্থা	২৬৯
নবীযুগে 'কাজা'র উৎস	২৭৪
:: মুআজ রা.-এর হাদিস	২৭৫
:: উম্মু সালামা রা.-এর বর্ণনা	২৭৬

:: আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.-এর হাদিস	২৭৬
খিলাফতে রাশিদার যুগে বিচার-ব্যবস্থা	২৭৭
আবু বকর রা.-এর যুগে বিচার-ব্যবস্থা	২৭৮
উমার রা.-এর যুগে বিচার-ব্যবস্থা	২৭৮
উসমান রা.-এর যুগে বিচার-ব্যবস্থা	২৮০
আলি রা.-এর যুগে বিচার-ব্যবস্থা	২৮০
উমাইয়া খিলাফতকালে বিচার-ব্যবস্থা	২৮৪
বিচার-ব্যবস্থায় সংযোজন	২৮৪
আব্বাসি খিলাফতকালে বিচার-ব্যবস্থা	২৮৭
আব্বাসি খিলাফতকালে বিচার-ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন	২৯০
আব্বাসি খিলাফতকালে বিচার-ব্যবস্থার উৎস	২৯১
আব্বাসি যুগে মাজালিমের বিচার-ব্যবস্থা	২৯৩
আব্বাসি খিলাফতকালে সাক্ষীদের যাচাই-বাছাই	২৯৩
আব্বাসিদের যুগে নথি ও ফাইলের ব্যবস্থা	২৯৫
আব্বাসি খিলাফতকালে বিচার-ব্যবস্থায় দিওয়ান	২৯৫
উসমানি খিলাফতকালে বিচার-ব্যবস্থা	২৯৫
দাওলাতে উসমানিয়ার বিচার-ব্যবস্থা	২৯৭
বিচারের কয়েকটি স্তর	২৯৯
উসমানি খিলাফতকালে হানাফি মাজহাবে বিচার-ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা	৩০০
শুরা-ব্যবস্থা	**৩০২**
শুরার অর্থ	৩০২
শুরার বৈধতা	৩০৩
শুরা ব্যবস্থার বৈধতার দলিল	৩০৪
শুরা-ব্যবস্থা অনুমোদনের হিকমাহ	৩০৬
(১) সঠিক পন্থা বের করার চেষ্টা করা	৩০৬
(২) কোনো বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া থেকে নিরাপদ থাকা	৩০৬
(৩) বুদ্ধি বৃদ্ধি পাবে	৩০৭
(৪) ভুলের সময় অন্যের তিরস্কার থেকে বাঁচা যাবে	৩০৭
(৫) প্রবৃত্তি থেকে মুক্তি	৩০৭
(৬) রহমত ও বরকত প্রার্থনা করা	৩০৭
(৭) মানুষের বুদ্ধির মান-নির্ণয়	৩০৮
শুরার ক্ষেত্র	৩০৮
শুরার হুকুম	৩০৮

শুরা ব্যবস্থা 'মুলজিম' না-কি 'মুলিম'	৩১১
বিশেষ দ্রষ্টব্য মজলিসে শুরার সদস্য নির্বাচন	৩১৪ ৩১৫
ইসলামি শুরা-ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক শুরা-ব্যবস্থার মাঝে পার্থক্য	৩১৬
শুরা-ব্যবস্থার সদস্যগণ	৩১৭
উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন	**৩২২**
ধর্মবিমুখ শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতি	৩২৭
নারীশিক্ষা-নীতি এবং নারীশিক্ষার পদ্ধতি	**৩৩০**
বাহিরে বের হওয়ার আদব ও শিষ্টাচার	৩৪০
'কাপড় পরিহিত উলঙ্গা' দ্বারা উদ্দেশ্য কী?	৩৪৪
সহশিক্ষা-ব্যবস্থা	**৩৫২**
সহশিক্ষা কি জায়িজ?	৩৫২
কুরআন কারিমের দলিল	৩৫২
হাদিসে নববির দলিল	৩৫৭
সহশিক্ষা হারামের ফতোয়া	৩৬২
বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অফিসে নারীদের চাকরি	**৩৭০**
নারীর সাথে মুসাফাহা বা হ্যান্ডশেক	**৩৭৭**
মাহারাম বা স্বামী ছাড়া নারীর সফর করা	৩৮৭
ইসলামে নারীদের মর্যাদা	৩৯৪
জাহিলি যুগে নারীর অবস্থা	৩৯৮
ইসলামের যুগের নারীর অবস্থা	৩৯৮
নারীদের প্রতি ইসলামের ইহসান	৪০২
লেখক-পরিচিতি	**৪০৮**
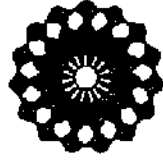
ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি তার রাসুলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনের বার্তা দিয়ে প্রেরণ করেছেন; যাতে এই দ্বীনকে সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী করেন। আল্লাহ তাআলাই এ-বিষয়ে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। আর দরুদ ও সালাম আমাদের সেরেতাজ, আমাদের মহান নবী মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ সা.-এর ওপর, যার সম্পর্কে কুরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

আর তিনি মুমিনদের প্রতি দয়াশীল।[১]

আর দরুদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক তার পরিবারবর্গ ও সাহাবিগণের প্রতি, যারা কাফিরদের প্রতি কঠোর , মুমিনদের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল; এবং (দরুদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক) তাদের প্রতিও, যারা নবীজির পদচিহ্ন অনুসরণ করে।

বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের কোনো শেষ নেই। সবচেয়ে বড়ো এবং মহান নিয়ামত হলো ইসলাম। সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের ইসলামের এই অমূল্য নিয়ামত 'হিদায়াত' দান করেছেন; আমরা হিদায়াতের যোগ্য ছিলাম না, যদি-না আল্লাহ (নিজ দয়ায়) আমাদের হিদায়াত দান করতেন।

সবাই একমুখে স্বীকার করে যে—এই দ্বীনের (ইসলামের) রয়েছে সুবিন্যস্ত জীবনব্যবস্থা; যা আখলাক, মুআমালা, ও সিয়াসাত বা রাষ্ট্র-পরিচালনা সাথে সম্পর্কযুক্ত, এ-সবই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী, কর্ম ও স্বীকারোক্তির সমষ্টি। সুতরাং এই জীবনব্যবস্থা মানতে হলে নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামের আনীত শরিয়তের পূর্ণ অনুসরণ করতেই হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

---

[১] সূরা আহজাব, আয়াত : ৪৩

আর রাসুল তোমাদের কাছে যা এনেছেন, তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বেঁচে থাকো। আর তোমরা ভয় করো আল্লাহকে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।[২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেন—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

অতি অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর রাসুলের মাঝে উত্তম আদর্শ (অর্থাৎ) তার জন্য, যারা আল্লাহ ও শেষদিবসের আশা রাখে।[৩]

আল্লাহ তাআলা নবীজির বিরোধিতা না করার ব্যাপারে হুশিয়ারি দিয়ে বলেন—

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

তো, যারা তাঁর (নবীর) আদেশের বিরোধিতা করে, তারা যেন সতর্ক থাকে যে, না-জানি তাদের কোন ফিতনা আক্রান্ত করবে, অথবা তাদের যন্ত্রণাদায়ক আজাব পাকড়াও করবে।[৪]

এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, এই মহান দ্বীনের ওপর অবিচল থাকতে হলে আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিকল্প নেই। এ-জন্যই আল্লাহ তাআলা তার শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরজ করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আবশ্যক করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও উপকারও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে আদেশ করেন, তারা যেন সমগ্র দ্বীন শুধু আল্লাহ তাআলার জন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগপর্যন্ত জিহাদ থেকে পিছপা না হন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।[৫]

وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

আর তারা যদি না মানে, তবে জেনে রাখো—আল্লাহ তোমাদের সমর্থক; এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী।[৬]

---

[২] সূরা হাশর, আয়াত : ০৭

[৩] সূরা আহজাব, আয়াত : ২১

[৪] সূরা নূর, আয়াত :৬৩

[৫] সূরা আনফাল, আয়াত : ৩৯

[৬] সূরা আনফাল, আয়াত : ৪০

সুতরাং জিহাদের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য আল্লাহর জমিনে, আল্লাহর বান্দাদের ওপর আল্লাহর বিধান কার্যকর করা। যদিও জিহাদ 'সত্ত্বাগতভাবে' ভালো নয়; কারণ, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার বান্দাদের শাস্তি দেওয়া হয়, দেশের পর দেশ, ভূমির পর ভূমি বিরান করে দেওয়া হয়; কিন্তু জিহাদ ভালো ও উত্তম বলে গণ্য হয়েছে এ-কারণে যে, এর মাধ্যমে কুফ্ফার-শক্তি ও তাদের অনিষ্ট যথোপযুক্তভাবে প্রতিরোধ করা যায়। কারণ, কাফিররা আল্লাহ তাআলার শত্রু, মুসলিমদের শত্রু। তো, জিহাদের বৈধতা দেওয়া হয়েছে কাফির-শক্তিকে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য। ইসলামকে সবার সামনে মর্যাদাবান করার জন্য, আল্লাহ তাআলার কালিমা বুলন্দ করার জন্য। এই সব বিষয়-ই উসুলের কিতাবাদিতে সবিস্তার উল্লেখ আছে। এখন যদি কুফফার-বিশ্বের শক্তি ও তাদের অনিষ্ট থাকা সত্ত্বেও জিহাদ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে মুসলিম দেশগুলো ধীরে ধীরে বিরান হতে থাকবে; মুসলিম উম্মাহ জুলুমের শিকার হতে থাকবে। আর এতে যে কোনো কল্যাণ নেই, এটাও কি সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারীর সামনে অস্পষ্ট থাকতে পারে?

সুতরাং শুধু আমেরিকার বের হয়ে যাওয়া দেখেই ইমারতে ইসলামিয়্যার মুজাহিদরা জিহাদ ছেড়ে দিতে পারে না। এটা আফগান-জিহাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল না; বরং মূল উদ্দেশ্য তো হলো—আমাদের অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শরিয়তের ঝান্ডার ছায়ায়, আল্লাহর আইন-কানুন বাস্তাবায়ন করা। আর এ মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার একমাত্র উপায় হলো আফগানে দাওলাতে ইসলামিয়্যা কায়েম করা। কারণ, এই দাওলাতে ইসলামিয়্যাই এককভাবে এবং সামষ্টিকভাবে জনগণের নিরাপত্তা দিতে পারে, তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে পারে, এর মাধ্যমেই কুফফার-বিশ্বের শক্তি ও অনিষ্ট রোধ করা সম্ভব, এর মাধ্যমেই সৃষ্টিকর্তার বিধিবিধান ও আইন-কানুন সৃষ্টিজগতের ওপর বাস্তবায়ন করা যাবে। আর ইদারাতে ইসলামিয়্যা ও মুদির ছাড়া দাওলাতে ইসলামিয়্যা প্রতিষ্ঠিত হবে না, করা সম্ভবও নয়; ইমাম বলা হয়ে থাকে সকল জনগণের উদ্দেশ্য যাকে নির্বাচন করা হয়েছে, তিনি তাদের যাবতীয় বিষয় দেখাশোনা করবেন; জালিমের হাত থেকে মজলুমকে রক্ষা করবেন; বিধিবিধান কার্যকর করবেন, ইয়াতিমদের পরস্পরের বিবাহ করাবেন, তাদের মাঝে সৃষ্ট ঝগড়া-বিবাদ নিরসন করবেন, ঈদ ও জুমআর নামাজ কায়েম করবেন; হদ-কিসাস বাস্তবায়ন করবেন, উশর-জাকাত-সাদাকাত গ্রহণ করবেন, সেগুলো শরয়ি বিধান অনুযায়ী সঠিক খাতে ব্যয় করবেন, হক ও অধিকারের বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন, জনগণের ওপর রাষ্ট্রনীতি প্রয়োগ করবেন, ইসলামকে হিফাজত করবেন, সেনাবাহিনী প্রস্তুত রাখবেন, গনিমত

বণ্টন করবেন, বাইতুল মালের সম্পদ, গনিমতপ্রাপ্তদের সম্পদ, ইয়াতিমদের সম্পদ সংরক্ষণ করবেন।

যাইহোক, আমার একটি ইচ্ছা ছিল, সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও ইদারাতে ইসলামিয়্যার কিছু মৌলিক এবং প্রয়োজনীয় বিষয় একত্রে উল্লেখ করার; অর্থাৎ খলিফার মধ্যে কী কী গুণ পাওয়া শর্ত, খলিফা ও জনগণের ওপর কী কী কর্তব্য রয়েছে তা একত্র করা, যাতে করে সেগুলো সহজেই আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন দ্বীনের এই মহান কাজ আঞ্জাম দেওয়ার তাউফিক দান করেন, আর এটা আল্লাহর কাছে মোটেও কঠিন নয়।...

***

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা

ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসন-ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা
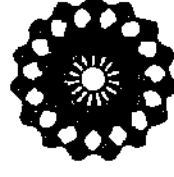
শাসন-ব্যবস্থার প্রকারভেদ

শাসন-ব্যবস্থা দুই প্রকার

সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি, শাসন-ব্যবস্থা মূলত দুই প্রকার—

- ০১। এমন শাসন-ব্যবস্থা, যার মূল লক্ষ্যই হলো প্রজাদের থেকে নেওয়া; একে বলা হয়—দাওলাতুল জিবায়া।
- ০২। অন্যদিকে যে শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তিই হলো প্রজাদের দেওয়া, তাকে বলা হয়—দাওলাতুল হিদায়া।

এই দুই শাসন-ব্যবস্থার যেমন ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও বৈশিষ্ট্য, তেমনি এর পরিণতি ও ফলাফলও ভিন্ন ভিন্ন।

দাওলাতুল জিবায়ার উদ্দেশ্য

দাওলাতুল জিবায়ার উদ্দেশ্য হলো—শাসন-ব্যবস্থার আয়তন বৃদ্ধি, ব্যাংক ব্যালেন্স পূর্ণ রাখা, শাসকগোষ্ঠীর সৌখিন হওয়া, দেশ ও সভ্যতাকে জাঁকজমকপূর্ণ করা। চাই সেটা হোক অসহায় ও নিঃস্বদের রক্ত চুষে, বা গরিবের পেটে লাথি মেরে, অথবা নিম্নশ্রেণির মানুষের সর্বস্ব লুট করে, কিংবা সেটা হোক অন্যায় কর ও চড়া ট্যাক্স দিয়ে। এ ধরনের শাসন-ব্যবস্থা শুধু তাদের সাথেই সম্পর্ক রাখে (তাদেরকেই গুরুত্ব দেয়)—যারা দেশের বাহ্যিক খ্যাতি ও মিথ্যা সুনাম এনে দিতে সক্ষম; যারা জনগণের রক্ত চুষে নিতে সাহায্য করে যাতে মন্ত্রী-সচিব এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্ম ভোগবিলাসে মত্ত থাকতে পারে, দেশের ভেতর ও বাইরে জায়গা-জমি কিনে বড়ো বড়ো ভবন তৈরি করতে পারে।

পক্ষান্তরে অসহায় জনগণের কথা যত কম বলা যায়, ততই মঙ্গল। এ-ধরনের শাসকরা দ্বীন, সচ্চরিত্র, সৎ ও উন্নত চারিত্রিক অবস্থা তো বটেই, এমনকি তারা আর্থিক ও পারিবারিক উন্নত মেজাজের ব্যাপারেও বেখবর থাকে। এর চেয়েও ভয়ংকর কথা হলো—এরা কখনো কখনো হারাম বা অন্যায় কাজকে বৈধ বলে ঘোষণা

দিতেও দ্বিধাবোধ করে না, যদি তারা সেখানে বাহ্যত নিজেদের কোনো লাভ দেখে। আবার, কখনো কখনো সুস্পষ্ট বৈধ কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেও তারা বিন্দুমাত্র চিন্তাভাবনা করে না, যদি সেখানে তাদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোনো স্বার্থ জড়িত থাকে।

দাওলাতুল হিদায়ার উদ্দেশ্য

অন্যদিকে দাওলাতুল হিদায়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে—মানুষকে আল্লাহ তাআলার দিকে আহ্বান করা, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। এর ভিত্তিই হলো—উত্তম গুণাবলি ধারণ, আখিরাতের প্রতি মনোনিবেশ, দুনিয়াবিমুখতা, সাধারণ জীবনযাপনে তুষ্টি, গুনাহ ও হারাম কাজ পরিহার, কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা; যদিও এতে দাওলাতুল হিদায়ার আর্থিক অবস্থার মান ও পরিমাণ বাহ্যত কম বা কোষাগার খালি থাকে।

উল্লিখিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য এই শাসন-ব্যবস্থা দেশের আলিমসমাজকে সাধারণ মানুষকে নামাজে ডাকার জন্য প্রেরণ করে। প্রান্তিক শ্রেণির মানুষকে অন্যায়, পাপাচার ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার কথা বলতে দ্বীনপ্রচারকদের বিভিন্ন পথেঘাটে পাঠায়। তারা নিজেদের সমাজ ও দেশ রক্ষায় নেশা জাতীয় দ্রব্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, অশ্লীল কথা ও কাজ প্রতিরোধ করে, অনর্থক খেলাধুলা দূরে সরিয়ে রাখে, নেশাগ্রস্তদের উচ্ছেদ করে। মোটকথা, দেশ ও জাতির জন্য যা কিছু অকল্যাণকর ও ক্ষতিকারক, তা থেকে সর্বদা দেশকে মুক্ত রাখে!

দাওলাতুল হিদায়ার ছায়ায় মসজিদ-মাদরাসা আবাদ হয়, দ্বীন ও তাকওয়ার প্রভাব বিস্তৃত হয়, অন্যায়-অপকর্ম ধূলিস্যাৎ হয়, দ্বীনদার ও নেককার লোকেরা মাথা উঁচিয়ে বিনম্রভাবে চলতে পারে। ফলে পাপাচারী ও খারাপ লোকেরা আড়ালে চলে যেতে বাধ্য হয়।

এই শাসন-ব্যবস্থার কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য স্বয়ং আল্লাহ তাআলার কালামে পাক থেকেই শোনা যাক—

> ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ
>
> তারা এমন লোক আমি যদি তাদেরকে পৃথিবীতে শাসন-ক্ষমতা দান করি, তাহলে তারা নামাজ কায়েম করবে, জাকাত দেবে, সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে।[৭]

[৭] সূরা হজ, আয়াত: ৪১

দুই প্রকার শাসন-ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি বা প্রাণও আলাদা। চাল-চরিত্র, মুআমালা-মুআশারা এবং আচার-ব্যবহারও ভিন্ন! তাই এর পরিণতি ও ফলাফলও ভিন্ন!

দাওলাতুল হিদায়ার শাসকশ্রেণি

দাওলাতুল হিদায়ার শাসকবর্গ সবসময় শরিয়তের উসুলের পাবন্দি করে, উম্মাহর খিদমতকে প্রাধান্য দেয়, দেশ ও জাতির জন্য নিজেকে কুরবান করে, আমানতদারিতা ও বিশ্বস্ততাকে নিজের 'নিদর্শন' বা 'পরিচয়-চিহ্ন' হিসাবে গ্রহণ করে। আর এসব কিছুর উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সন্তুষ্টি।

দাওলাতুল জিবায়ার শাসকশ্রেণি

পক্ষান্তরে দাওলাতুল জিবায়ার শাসকবর্গ নিজেরাই আইন প্রণয়ন করে, আবার নিজেরাই সেটা ভঙ্গ করে। তারা সবার আগে নিজের কথা মাথায় রাখে, দেশ ও জাতির সাথে খিয়ানত ও বিশ্বাসভঙ্গ, কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করে। সকল কাজের সকল বিন্দুতে তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয়, এমনকি সামান্য বিষয়েও ঘুষ নেয়। তারা কখনোই জনগণকে তোয়াক্কা করে না, উপরন্তু বুক ফুলিয়ে পা ফেলে! ফলে মানুষের ভাগ্যে আদল ও ইনসাফ, রাহাত ও শান্তি বলতে কিছুই জোটে না।

দাওলাতুল জিবায়াতে শাসকগোষ্ঠী নিজেকে কার্যত দেশ ও জাতির সেবক বলতে ইতস্ততবোধ করে। তারা সবসময় শুধু এই চিন্তায় থাকে যে, কীভাবে নিজের পেটের জন্য জনগণের ঘাম ঝরানো টাকা ছিনিয়ে আনা যায়। কারণ, এটাই সুযোগ। আবার কবে না কবে এই পদ ছুটে যায়, তার তো ঠিক নেই। সুতরাং, এই সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার আগেই যা করার করে নিতে হবে।

ইতিহাস এই দুই শাসন-ব্যবস্থারই সাক্ষী হয়ে আছে। দাওলাতুল জিবায়ার উদাহরণ পেশ করে তা নতুন করে তুলে ধরার প্রয়োজন নেই। কারণ, অতীতে যেমন এর প্রাধান্য ছিল, বর্তমানেও আছে। পাশ্চাত্যে যেমন এটা বিস্তৃত, প্রাচ্যেও আছে এর যথেষ্ট উদাহরণ।

পক্ষান্তরে দাওলাতুল হিদায়ার বিস্তার খুবই সামান্য থেকে সামান্যতর, বিশেষ করে বর্তমান সময়ে। কারণ, শুধু অধিকাংশ নয় বরং দুনিয়ার সকল শাসন-ব্যবস্থাই এখন বলতে গেলে দাওলাতুল জিবায়ার অন্তর্ভুক্ত।

***
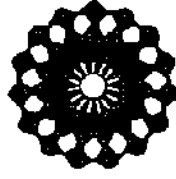
দাওলাতুল হিদায়ার জন্য যা জরুরি

দাওলাতুল হিদায়ার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, সেগুলো হলো—

- ০১। স্বয়ংসম্পূর্ণ আদালত বা বিচারব্যবস্থা;
- ০২। ইসলামি ফোর্স/সেনাবাহিনী (যার বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসবে ইন শা আল্লাহ);
- ০৩। আসমানি বিধান।

যেকোনো শাসন-ব্যবস্থার জন্যই 'আইন-কানুন' একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যাকে কেন্দ্র করে এ শাসন-ব্যবস্থা আবর্তিত হয়। এই আইন দুই প্রকার—

- ০১। আসমানি আইন—ঊর্ধ্বলোক বা আল্লাহপ্রদত্ত বিধান;
- ০২। জাগতিক আইন—নিম্নলোক বা মানবরচিত বিধান।

দু-ধরনের আইন-কানুনের মাঝে বেশ কতগুলো পার্থক্য বিদ্যমান। বিশেষ করে নিম্নোক্ত চারটি পার্থক্য—

এক. : ঊর্ধ্বজাগতিক বিধান স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাআলা রচিত হয়ে থাকে। এতে মানুষের কোনো হাত নেই। পক্ষান্তরে নিম্নজাগতিক বিধান হয়ে থাকে মানবরচিত। সুতরাং, মূলগতভাবেই এই দু-ধরনের আইনে পার্থক্য রয়েছে।

দুই. নিম্নজাগতিক আইনের চেয়ে ঊর্ধ্বজাগতিক আইনের পরিধি অধিক বিস্তৃত। কারণ, ঊর্ধ্বজাগতিক আইন রবের সাথে, নিজের সাথে এবং অন্যের সাথে মানুষের আচার-ব্যবহার নীতি নিয়ে আলোচনা করে। পক্ষান্তরে নিম্নজাগতিক আইন শুধু অন্যের সাথে মানুষের আচার-নীতির মাঝেই সীমাবদ্ধ।

তিন. : ঊর্ধ্বজাগতিক আইনের মধ্যে পার্থিব জীবন অন্তর্ভুক্ত, পক্ষান্তরে নিম্নজাগতিক আইন শুধু পার্থিব জীবনের মাঝেই সীমাবদ্ধ।

চার. : ঊধ্বজাগতিক বিধান সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রচিত। আর আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজগতের ছোটো-বড়ো, ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি বিষয়েই সম্যক

অবগত। কাজেই, এই আইন সবসময়ই ইনসাফপূর্ণ এবং মানুষের জন্য কল্যাণকর। আর নিম্নজাগতিক আইন মানবরচিত; মানুষ যেহেতু ত্রুটি-বিচ্যুতিতে ভরা, দৃশ্যমান বস্তুর ওপর নির্ভরশীল, নির্দিষ্ট সীমা-পরিসীমায় আবদ্ধ, তাই এটা খুবই সম্ভব, বরং বাস্তবেই তা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ বা অপূর্ণাঙ্গ।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, মানুষের জীবনব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গভাবে পরিচালিত হতে পারে শুধুই ইসলামি আইনের মাধ্যমে, যা অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে, সৃষ্টিজগতের আমিরের মাধ্যমে জগতের বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার সুরক্ষায় এই আইন সুরক্ষিত। আর প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাআলার নিকট এই আইনই কেবল গ্রহণযোগ্য। কারণ, এর মাধ্যমেই মানুষকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং তার অধিকার সংরক্ষণ করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

> নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার কাছে মনোনীত গ্রহণযোগ্য দ্বীন শুধুই ইসলাম।[৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

> আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করবে, তার থেকে সে ধর্ম কিছুতেই গ্রহণ করা হবে না। আর সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৯]

ইমাম রাজি রাহিমাহুল্লাহর তাফসির : প্রথম আয়াতের তাফসিরে ইমাম রাজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—'আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, যে লোক ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম পালন করবে, সে ধর্ম যেমন আল্লাহ তাআলার কাছে অগ্রহণযোগ্য, তেমনি সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত।

আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অর্থ হলো, সাওয়াব ও প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হওয়া। আর সেই সাথে শাস্তি ভোগ করা। এছাড়া দুনিয়াতে যে নেক আমলগুলো করেছে, তা হাতছাড়া করা। যে ব্যক্তি ইসলাম না মেনে, বাতিল ধর্ম গ্রহণ করে দুনিয়ায় কষ্ট ও দৌড়ঝাঁপ করেছে, তার জন্য আফসোস ও আক্ষেপ তো থাকবেই।'[১০]

---

[৮] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯

[৯] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫

[১০] তাফসিরে কাবির, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ২৮২

আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—'ধোঁকাবাজ জাহান্নামে যাবে; যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করল, যা আমাদের শরিয়ত-বহির্ভূত, তার কাজ প্রত্যাখ্যাত হবে।'[১১]

মূলত পূর্ণাঙ্গ ধর্ম ও আকিদার নামই হচ্ছে ইসলাম! মানুষের প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় বিষয়াদি ইসলাম সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ..
>
> আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। সাথে তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম।[১২]

এ আয়াতে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন। মানে কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ! এখানে, একটি পার্থক্য বোঝা দরকার—পূর্ববর্তী আসমানি ধর্মগুলোও কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ছিল, কিন্তু সেটা ছিল নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। পক্ষান্তরে দ্বীন ইসলামও পূর্ণাঙ্গ, তবে এই দ্বীনের পূর্ণাঙ্গতা কিয়ামত পর্যন্ত। সুতরাং, দ্বীন ইসলামে না কখনো পরিবর্তন হবে, আর না কখনো পরিবর্তিত হবে। তাতে যুগ যত অগ্রসর বা পরিবর্তন হোক না কেন! বরং, পৃথিবীর যেকোনো সময়ে যেকোনো স্থানে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে শুধু চৌদ্দশ বছর আগের এই দ্বীন ইসলাম!

দ্বিতীয় আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে ইমাম রাজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—'পূর্ববর্তী শরিয়ত ওই যুগে ওই সময় পর্যন্ত যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ তাআলা ওই শরিয়ত প্রেরণ করার পূর্বেই জানতেন, এই শরিয়ত যদিও বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ, কিন্তু ভবিষ্যতে তা আর পূর্ণাঙ্গ থাকবে না। এমনকি তার গ্রহণযোগ্যতাও থাকবে না। সুতরাং, ওই শরিয়ত প্রণয়ন করার পর রহিত করা হলেও এতে কোনো আপত্তি নেই। একইভাবে পরবর্তী ধর্মে যদি কোনো নতুন বিধান প্রণয়ন করা হয়, যা পূর্ববর্তী ধর্মে ছিল না, এতেও কোনো সমস্যা নেই। আর শেষ যুগে যখন আল্লাহ তাআলা এই দ্বীন ইসলাম প্রেরণ করেছেন, তখন সেটাকে পূর্ণাঙ্গ করেই পাঠিয়েছেন এবং সেই পূর্ণাঙ্গতাকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থির করে দিয়েছেন।

মোটকথা, প্রথমটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ এবং দ্বিতীয়টি কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ। আর এটি বোঝানোর জন্যই আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।'[১৩]

সুতরাং, কোনো ইসলামি রাষ্ট্র কেবল তখনই সফল হতে পারে, যখন শাসকবর্গ রাষ্ট্রে সালাফে সালিহিন ও মুজতাহিদিনে কিরামের বুঝ অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহর

---

[১১] সূত্র: সহিহ বুখারি

[১২] সূরা মায়িদা, আয়াত: ৩

[১৩] তাফসিরে কাবির, খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ২৮৭

বিধিবিধান ও আইন-কানুন কায়েম করে! মূলত এটাই আফগানের ইসলামি ইমারতের জিহাদের উদ্দেশ্য!

আফগানবাসীর রুচি-অভিরুচির চাহিদাও এটাই যে, তারা ইসলামি আইন-কানুনকে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নিজেদের জীবনব্যবস্থার মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করবে। কারণ, তারা পূর্ববর্তীদের থেকেই ইসলামকে ওয়ারিস-সূত্রে পেয়ে এসেছে। তাছাড়া ইসলামের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রসরতা থাকার ফলে ইসলামের স্বাদ ও মিষ্টতা তাদের রক্ত-মাংসে মিশে আছে।

তাই, তারা জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই ইসলামের আইন-কানুন ও বিধিবিধান ছাড়া অন্য কোনো কিছুর সামনে মাথা নত করে না। করতে পারেও না। আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত যুগ পরম্পরায় তাদের মাঝে এ বিরল গুণ অব্যাহত রাখুন। আমিন!

আল্লাহ তাআলার রহমতে ইসলামি ইমারতের বীর মুজাহিদ মুসলিম ভাইয়েরা এই দৃষ্টান্ত পেশ করতে পেরেছেন। এই আধুনিক যুগে, 'অনুর্বর' পৃথিবীতেও যে ইসলামকে শরিয়ত বা মডেল হিসাবে পেশ করা যায়, তারা এটা প্রমাণ করেছেন। তারা এটাও প্রমাণ করেছেন যে, অতীতের মতো মুসলিমদের হারানো গৌরব এখনো ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তারা অপর মুসলিম ভাইদের এই বার্তা দিতে পেরেছেন যে, বিজাতি শক্তির সামনে মাথানত করে কোনো জাতিই কখনো অগ্রসর হতে পারে না। বরং, তখন তাদের গোলামি ও তোষামোদ করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই থাকে না।

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর বাণীই সত্য—

لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها

'এ উম্মতের শেষ জামাআতের সংশোধন ওই পথেই হতে পারে, যে পথে এ উম্মতের শুরুর জামাআতের সংশোধন হয়েছিল।'

***
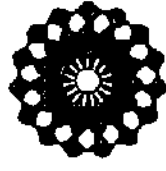
মানবরচিত আইনের অসারতার প্রমাণ

মানবরচিত আইনের অসারতা কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সুসাব্যস্ত। আর এই তিনটিই ইসলামি বিধিবিধানের প্রধান উৎস। কুরআন ও সুন্নাহর বহু জায়গায় স্পষ্টভাবে ইসলামবিরোধী আইন-কানুনের অসারতা প্রমাণিত হয়েছে। আর এভাবেই ইজমা বা উম্মাহর সর্বসম্মত রায় মানবরচিত আইনের অসারতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিচে কিছু দলিল উল্লেখ করা হলো—

এক.

আল্লাহ তাআলা ইসলামি শরিয়তের ওপর চলার আদেশ করেছেন, এছাড়া অন্য যেকোনো মতবাদ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন! কিন্তু কারও জন্য এ সুযোগ রাখেন নি যে, সে চাইলে অন্য কোনো নিয়মনীতি অনুসরণ করবে।

আর কুরআন-সুন্নাহয় যে সকল স্পষ্ট আইন-কানুন রয়েছে, তার প্রত্যেকটি তিনি মুসলিমদের ওপর অবশ্য পালনীয় অকাট্য বিধান হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন, যা স্বয়ং কুরআন কারিমের আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। কারণ, আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে শাসন-ব্যবস্থাকে দু-ভাগে বিভক্ত করেছেন। এর মাঝে তৃতীয় কোনো প্রকার নেই—হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ডাকে সাড়া দিয়ে রাসুলের অনুসরণ, অথবা প্রবৃত্তির অনুসরণ। সুতরাং, যা কিছু আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছেন, তা ছাড়া বাকি সবকিছুই প্রবৃত্তি ও খাহেশাত! যেমনটি আয়াতে রয়েছে—

> فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۚ..
>
> তারা যদি আপনার ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে জেনে রাখেন, তারা শুধু প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার হিদায়াতের

পরিবর্তে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে?[১৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (٢٦)

হে দাউদ, আমি তোমাকে জমিনে খলিফা বানিয়েছি। সুতরাং, তুমি মানুষের মাঝে হক অনুযায়ী ফায়সালা করো। প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তাহলে প্রবৃত্তি তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।[১৫]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা শাসন-ব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। তৃতীয় কোনো পথ নেই। প্রথমটি হক, তথা রাসুলগণের ওপর নাজিলকৃত ওহি। দ্বিতীয়টি প্রবৃত্তি, তথা ওহির বিপরীত। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন—

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

তারপর আমি আপনাকে দ্বীনের এক বিশেষ পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং, আপনি শরিয়তের অনুসরণ করেন। যারা জানে না, তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।[১৬]

এখানেও আল্লাহ তাআলা দুই ভাগ করেছেন। প্রথমটি শরিয়ত, আল্লাহ তাআলা যার ওপর তাঁর রাসুলকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সাথে যে অনুযায়ী আমল করার আদেশ দিয়েছেন। আর দ্বিতীয়টি, যারা জানে না তাদের প্রবৃত্তি ও খাহেশাত, যা থেকে তিনি নিষেধ করেছেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আরও বলেন—

ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

তোমরা অনুসরণ করো ওই সকল বিধান, যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। তিনি ছাড়া অন্য কোনো অভিভাবকের অনুসরণ করো না। খুব কমই তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।[১৭]

এখানে, আল্লাহ তাআলা শুধু তাঁরই পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধান অনুসরণ করতে বলেছেন। এছাড়া অন্য সব থেকে নিষেধ করেছেন। আর তিনি এটাও বলে

---

[১৪] সূরা কাসাস, আয়াত: ৫০

[১৫] সূরা সোয়াদ, আয়াত: ২৬

[১৬] সূরা জাসিয়া, আয়াত: ২৬

[১৭] সূরা আরাফ, আয়াত: ৩

দিয়েছেন, যারা কুরআন ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করবে, তারা মূলত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পূজায় লিপ্ত!

এছাড়াও কুরআন খুবই জোরালো ভাষায় ওই সকল আইন-কানুনকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে, যা শরিয়তের বিপরীত কিংবা এর মৌলিক বিধিবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক, অথবা সরাসরি মূল শরিয়তের সাথেই বিরোধপূর্ণ। তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা শরিয়ত ব্যতীত অন্য যেকোনো আইন-কানুনের ওপর আমল করতেও নিষেধ করেছেন। এরপরও যে মানবরচিত বিধিবিধানের অনুসরণ করল, সে মূলত নিজের খাহেশাতকেই অনুসরণ করল। আর তাকে কুরআন 'কাফির' ও 'জালিম' বলে আখ্যা দিয়েছে।

দুই.

আল্লাহ তাআলা কোনো মুমিনকে এই সুযোগ দেন নি যে, সে চাইলেই অন্য কোনো শাসন-ব্যবস্থার পেছনে ছুটবে। বরং, তিনি কুরআনি শাসন ছাড়া অন্য যেকোনো শাসন-ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি উপেক্ষার পরিবর্তে অন্য কোনো শাসন-ব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট থাকল, আল্লাহ তাআলা তাকে চূড়ান্তভাবে বিপথগামী শয়তানের অনুচর বলে সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (٦٠)
>
> 'তুমি কি ওই ব্যক্তিদের লক্ষ্য করোনি, যারা মনে করে—তারা ঈমান এনেছে ওই বিধানের প্রতি, যা আপনার ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, এবং যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ করা হয়েছে! আবার তারাই তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যায়! অথচ তাদের আদেশ করা হয়েছে তাগুতকে অস্বীকার করার! মূলত শয়তান তাদেরকে চূড়ান্তভাবে গোমরাহ করতে চায়।'[১৮]

এই আয়াতে কারিমা থেকে সাব্যস্ত হলো, যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহ ব্যতীত অন্য কোনো শাসন-ব্যবস্থার কাছে ধরা দিল, সে প্রকৃতপক্ষে তাগুতের কাছেই ধরা দিল! আর তাগুত বলা হয় ওই সমস্ত জিনিসকে, যার মাধ্যমে বান্দা তার নির্ধারিত পরিসীমা অতিক্রম করে—তা উপাস্য হওয়ার মাধ্যমে হোক, কিংবা অনুসৃত বা মাননীয় হওয়ার মাধ্যমে।

সুতরাং, প্রত্যেক জাতির তাগুত বলে ওই ব্যক্তিকে বোঝানো হবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ব্যতীত যার কাছে তারা মামলা-মোকাদ্দামা নিয়ে যায়; কিংবা ওই ব্যক্তিকে,

[১৮] সূরা নিসা, আয়াত: ৬০

তারা যার পূজা করে। অথবা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো প্রমাণ ছাড়াই তাকে অনুসরণ করে, কিংবা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের পরিবর্তে কোনো বিষয়ে তাকে মান্য করে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়—কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনার পর তার আর এই সুযোগ থাকে না যে, সে অন্য কারও ওপর ঈমান আনবে, অথবা অন্য কারও বিধিবিধান গ্রহণ করবে!

তিন.

আল্লাহ তাআলা কোনো মুমিন-মুমিনাকে এই অধিকার দেন নি যে, সে নিজের খেয়াল-খুশিমতো বিধান প্রণয়ন করবে; কিন্তু যদি কেউ নিজের খেয়াল-খুশিমতো বিধান প্রণয়ন করে, তাহলে সে বিপথগামী বলে গণ্য হবে। এতে প্রমাণিত হবে যে, তার অন্তরে ঈমানের কোনো চিহ্নই নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (٣٦)

আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো বিষয়ের ফায়সালা দিলে কোনো মুমিন-মুমিনার জন্য সে বিষয়ে তাদের কোনো (ভিন্ন সিদ্ধান্তের) ইখতিয়ার সংগত নয়।[১৯]

চার.

আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন, হুকুম বা শাসন যেন কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

আমি নিঃসন্দেহে আপনার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি সত্য সহকারে; যাতে আপনি মানুষের মাঝে ফায়সালা করেন ওই পদ্ধতিতে, যা আল্লাহ আপনাকে প্রদর্শন করেছেন।[২০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

আর আপনি তাদের মাঝে ফায়সালা করেন ওই বিধান অনুযায়ী, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন।[২১]

---

[১৯] সূরা আহজাব, আয়াত: ৩৬

[২০] সূরা নিসা, আয়াত: ১০৫

[২১] সূরা মায়িদা, আয়াত: ৪৯

আর যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে 'কাফির', 'জালিম', ও 'ফাসিক' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ..

আর যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই হলো 'কাফির'।[২২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ..

আর যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, তারাই হলো 'জালিম'।[২৩]

তিনি আরও বলেন—

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤٧)

আর যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসন করে না, তারাই হলো 'ফাসিক'।[২৪]

উল্লিখিত আয়াতে কারিমা থেকে সাব্যস্ত হয় যে, গোটা সৃষ্টির ওপর প্রকৃত ক্ষমতা শুধু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার। আর যেকোনো রাষ্ট্রেই মুসলিম শাসকদের কর্তব্য হলো—এই প্রকৃত ক্ষমতার সামনে নত হওয়া। কেবল তাহলেই ইসলামি নেতৃত্ব থেকে মুক্ত হবে গণতন্ত্র নামক অন্ধকার থেকে, যার মূল ভিত্তিই হলো জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস। অতএব, গণতন্ত্রের মাধ্যমে তারা তাদের নিজেদের খেয়াল খুশিমতো যেকোনো আইন প্রণয়নের সুযোগ পাবে। তাদের কোনো মৌলিক নিয়মনীতি অনুসরণও করতে হবে না, এমনকি তারা কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী বিধান প্রণয়নেরও সুযোগ পাবে।

পাঁচ.

কুরআন-সুন্নাহ যেমন শাসকদের আনুগত্যের সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে, তেমনি কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়ে তাদের আনুগত্য করতে নিষেধ করেছে! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

---

[২২] সূরা মায়িদা, আয়াত: ৪৪

[২৩] সূরা মায়িদা, আয়াত: ৪৫

[২৪] সূরা মায়িদা, আয়াত: ৪৭

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

'স্রষ্টার নাফরমানির ক্ষেত্রে সৃষ্টির আনুগত্য করার বৈধতা নেই।'[২৫]

তিনি আরও বলেন—

إنما الطاعة في المعروف

'আনুগত্য শুধু ভালো ও বৈধ ক্ষেত্রেই করা যাবে।'[২৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেতৃবর্গ সম্পর্কে বলেন—

> السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ..
>
> একজন মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে, (শাসকদের কথা) শোনা ও মান্য করা—চাই সেটা পছন্দনীয় হোক বা অপছন্দনীয়, যতক্ষণ না তাকে অবাধ্যতার আদেশ করা হয়। তাকে যখন অবাধ্যতার আদেশ করা হবে, তখন (তাদের কথা) শোনাও যাবে না, মানাও যাবে না।'[২৭]

তিনি আরও বলেন—

> إنه سيلي أمركم من بعدي رجال يطفئون السنة ويحدثون بدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها قال ابن مسعود يا رسول الله كيف بي إذا أدركتهم قال ليس يبنى ام عبد طاعة لمن عصى الله، قالها ثلاث مرات
>
> নিঃসন্দেহে আমার পর তোমাদের শাসন-ব্যবস্থা এমন কিছু লোক গ্রহণ করবে, যারা সুন্নাহকে নিভিয়ে দেবে, বিদআত চালু করবে এবং নামাজকে নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্বিত করবে!

ইবনু মাসউদ রা. বললেন—'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি যদি তাদের পাই, তাহলে কী করব?'

তিনি বললেন—'হে উম্মু আবদের সন্তান, শোনো, যে আল্লাহর অবাধ্যতা করে তার কোনোরূপ আনুগত্য করা যাবে না।' তিনি কথাটি তিনবার বললেন।[২৮]

ছয়.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আনুগত্য শুধু কুরআন-সুন্নাহর সীমানাতেই হবে, এর বাহিরে নয়। তদুপরি উম্মাহর ফুকাহায়ে কিরাম ও মুজাতাহিদানে ইজমা সবাই এ বিষয়ে একমত যে, কেবল আল্লাহ তাআলার

---

[২৫] মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা, ৩৩৭১৭

[২৬] সহিহ বুখারি, ৭১৪৫

[২৭] সহিহ বুখারি, ৭১৪৪

[২৮] মুসনাদু আহমাদ, ৩৭৯০

আদেশকৃত বিষয়েই আনুগত্য ওয়াজিব। আবার, তাদের মাঝে এ বিষয়েও কোনো মতবিরোধ নেই যে, স্রষ্টার অবাধ্যতার ক্ষেত্রে সৃষ্টির আনুগত্যের বৈধতা নেই। তাদের মাঝে এ ব্যাপারেও কোনো মতবিরোধ নেই যে, কোনো হারাম জিনিস তথা জিনা ও নেশা হালাল করা, হদ বাতিল করতে চাওয়া, ইসলামি বিধিবিধান তুলে ফেলা, আল্লাহ তাআলার আদেশ অমান্য করে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা—এসব তো কুফুর ও ধর্মদ্রোহিতারই নামান্তর!

এ বিষয়েও সবাই একমত যে, শাসক যখন কাফির বা মুরতাদ হয়ে যায়, তখন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মুসলিমদের ওপর ওয়াজিব!

বিদ্রোহ করার সবচেয়ে নিম্নস্তর হলো, তার আদেশ-নিষেধের অবাধ্যতা করা, ইসলামের সাথে বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তোষণ না করা! আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন, তিনিই হিদায়াতের পথ দেখান।

সাত.

আকল এবং বিবেক-বুদ্ধির দাবিও এটাই যে, প্রত্যেকটি জিনিসের সংশোধনের নিয়ন্ত্রণে তিনিই থাকবেন, যিনি ওই জিনিস বানিয়েছেন। কারণ, তিনিই তার স্বভাব, শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে জানেন। কীসে তার ভালো বা মন্দ, সেটাও তিনি ভালো করে জানেন! আর এটা সুবিদিত যে, গোটা বিশ্ব আল্লাহ তাআলারই সৃষ্ট! সুতরাং, সুস্থ মস্তিষ্কের দাবি এটাই যে—বিশ্বজগতের কর্মবিধায়ক এবং তার সংশোধনে সক্ষম একমাত্র আল্লাহ তাআলা, অন্য কেউ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
>
> আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করবে, তার থেকে সে ধর্ম কিছুতেই গ্রহণ করা হবে না। আর সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[২৯]

এখানে, আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী হবে, সেই ধর্ম যেমন অগ্রহণযোগ্য হবে, তেমনিভাবে সে নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে! আর ক্ষতিগ্রস্ত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া। দুনিয়ার নেক আমলগুলো হাতছাড়া করা। আর যে ব্যক্তি বাতিল ধর্মের জন্য দৌড়ঝাঁপ করবে, তার জন্য আফসোস ও আক্ষেপ তো থাকবেই!

ইসলামি আইন-কানুন তথা আল্লাহ তাআলা যে সকল বিধিবিধান প্রণয়ন করেছেন, সেগুলোর উদ্দেশ্য হলো—ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে মানুষের উপকার করা ও সংশোধন!

---

[২৯] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫

ইসলামি হুকুমাত

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি

সহজ ভাষায় হুকুমাতুল হুদা, হিদায়াতের শাসন, ইসলামি রাষ্ট্র ও বিচারব্যবস্থার ভিত্তি হলো ৬টি বিষয়—

০১। রাষ্ট্রনেতা (এর বিস্তারিত বিবরণ ও নির্বাচনের পদ্ধতি সামনেই আসছে।)

০২। শাসন-ব্যবস্থাপনা : এখানে শুধু যোগ্যদের নির্বাচিত করা হবে। যোগ্যতা ছাড়া অন্য কিছু ধর্তব্য নয়। ইয়াজিদ ইবনু আবি সুফইয়ান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আবু বকর রা. যখন আমাকে প্রেরণ করছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, 'সেখানে তো তোমার ঘনিষ্ঠজনেরা আছে। এটা খুবই সম্ভব যে, শাসন-ব্যবস্থায় তুমি তাদের অগ্রাধিকার দেবে! আমি তোমার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি এ বিষয়েই ভয় করি। কিন্তু (শোনো), রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم ..
>
> যে ব্যক্তি মুসলিমদের কোনো একটি দায়িত্ব গ্রহণ করল, অতঃপর অন্যদের প্রাধান্য দিয়ে কাউকে আমির বানালো, তাহলে তার ওপর আল্লাহর লানত! আল্লাহ তাআলা তার থেকে না কোনো বিনিময় গ্রহণ করবেন, আর না কোনো মুক্তিপণ, যতক্ষণ না তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন।[৩০]

ইবনু আব্বাস রা. থেকেও বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين ..

---

[৩০] মুসনাদু আহমাদ।

যে ব্যক্তিবর্গ কোনো লোককে কোনো দলের দায়িত্বশীল নির্ধারণ করল, অথচ সে দলে তার থেকে উত্তম কেউ ছিল, তাহলে সে আল্লাহর সাথে, রাসুলের সাথে এবং মুমিনদের সাথে খিয়ানত করল।[৩১]

০৩। **রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন :** কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক কিছু নীতিমালা এবং সাধারণভাবে প্রাথমিক কিছু বিষয় আছে, অবশিষ্ট বিস্তারিত আইন-কানুন প্রণয়নের দায়িত্ব উম্মাহর ফুকাহায়ে কিরামদের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে।

০৪। **স্বয়ংসম্পূর্ণ আদালত ব্যবস্থা :** এই আদালত দেশের যেকোনো ক্ষমতা থেকে মুক্ত থাকবে। রাজা, প্রজা ও জনগণ সবাই সমান! আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا..

হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো; আল্লাহর জন্য ন্যায়সংগত সাক্ষ্য প্রদান করো, যদিও সেটা তোমাদের নিজের বা পিতামাতার অথবা নিকটবর্তী আত্নীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। যদি সে বিত্তশালী হয় কিংবা দরিদ্র, তবে আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলো কিংবা এড়িয়ে যাও, তবে তোমরা যা করো সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।'[৩২]

ইসলামি ইতিহাসের পাতা খুললে ইনসাফের বহু আশ্চর্যজনক ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয়! আমির-ফকির, ধনী-গরিব, কোনোরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই নির্বিশেষে সবার সাথে ইনসাফ করা হতো! এর ভিত্তি ছিল কুরআনের আয়াত—

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا..

'তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার করবে, তখন ইনসাফের সাথে বিচার করবে।'[৩৩]

কেননা, এখানে 'মানুষ' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা ধনী-গরিব, আমির-ফকির সবাইকেই শামিল করে!

---

[৩১] মুসতাদরাক আল-হাকিম

[৩২] সূরা নিসা, আয়াত: ১৩৫

বনু মাখজুমের এক নারী

উসামা ইবনু জায়িদ যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বনু মাখজুমের এক নারীর চুরি ধরা পড়ার পর তার হদ (শরয়ি শাস্তি) মাফের জন্য সুপারিশ করতে যান, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন—'তুমি কি আল্লাহ তাআলার নির্দেশকৃত হুদুদের ব্যাপারে সুপারিশ করছ?' এরপর তিনি সেখান থেকে উঠে লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দেন—

> إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
>
> 'তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিরা ধ্বংস হয়েছে এ কারণে যে—তাদের মাঝে যখন কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোনো নিম্নশ্রেণির কেউ চুরি করত, তখন তার ওপর হদ কায়েম করত! আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের[৫৪] মেয়ে ফাতিমাও চুরি করত, তাহলে আমি নিজে তার হাত কেটে ফেলতাম।'

খুলাফায়ে রাশিদার যুগেও এরূপ ইনসাফ কায়েম ছিল। এর একটি চিত্র দেখি।..

উমার রা. এবং এক ঘোড়া বিক্রেতা

একবার উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এক লোকের সাথে ঘোড়া নিয়ে দরদাম করছিলেন। এরপর তিনি যাচাইয়ের জন্য ঘোড়ায় আরোহণ করলেন; কিন্তু এতে ঘোড়ার একটি হাড় ভেঙে গেল। তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকটিকে বললেন—'তুমি তোমার ঘোড়া নিয়ে যাও!'

লোকটি বলল—'না, না। তা হবে না!'

উমার রা. বললেন—'তাহলে আমাদের দুজনের মাঝে মীমাংসা করার জন্য একজন সালিশ নিযুক্ত করো।'

তখন লোকটি বলল—'শুরাইহ হবে আমাদের সালিশ!'

এরপর তারা দুজন ইমাম শুরাইহ রাহিমাহুল্লাহর কাছে বিচার নিয়ে গেলেন। সবকিছু শুনে ইমাম শুরাইহ উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'আমিরুল মুমিনিন, হয় ন্যায্যমূল্যে ঘোড়াটি কিনে নেন, অথবা ঘোড়াটি যে অবস্থায় নিয়েছেন, সে অবস্থায় ফিরিয়ে দেন!'

তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'এটাই কি তোমার বিচার?'

---

[৫৪] সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

(তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে নিজের বিরুদ্ধে আসা এই নির্দেশও মেনে নেন। এবং) পরবর্তী সময়ে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু শুরাইহকে কুফায় কাজি (বিচারক) হিসেবে নিয়োগ দেন।[৩৫]

০৫। শক্তিশালী বাহিনী : যাদের (মোট ছয়টি) বৈশিষ্ট্য হলো—

এক. তারা শত্রুকে সন্ত্রস্ত রাখবে;

দুই. তাদেরকে সীমালঙ্ঘন থেকে বাধা দেবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ
>
> 'আর তোমরা তাদের (মুকাবিলার) জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সুসজ্জিত ঘোড়া প্রস্তুত রাখো, যা দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু তথা তোমাদের শত্রুকে সন্ত্রস্ত করবে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকে যাদের তোমরা জানো না, আল্লাহ জানেন।'[৩৬]

তিন. দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করবে;

চার. সীমানা পাহারা দেবে;

পাঁচ. অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক স্বাধীনতা হিফাজত করবে, যাতে দাসত্ব ও বন্দেগি একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার জন্য হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣٩)
>
> 'আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তবে যদি তারা বিরত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের কার্যাবলির সম্যক দ্রষ্টা।'[৩৭]

ছয়. দাস ও বন্দীদের জালিম ও স্বেচ্ছাচারীদের হাত থেকে রক্ষা করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا
>
> 'আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছো না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, 'হে আমাদের রব!

---

[৩৫] সূত্র: মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা

[৩৬] সূরা আনফাল, আয়াত: ৬০

[৩৭] সূরা আনফাল, আয়াত: ৩৯

আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে, যার অধিবাসীরা জালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।''[৩৮]

০৬। একদল যুবক : যাদের বৈশিষ্ট্য হলো—

এক. তারা রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন প্রয়োগ করবে;

দুই. জনগণের জন্য কল্যাণমূলক পদক্ষেপ নেবে;

তিন. জনগণকে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ থেকে রক্ষা করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ..

'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত—যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং নিষেধ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হলো সফলকাম।'[৩৯]

এই দলকেই 'হাসবা' বলা হয়। যারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

***
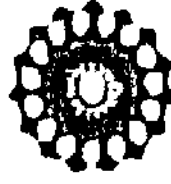
ইসলামি বিধিবিধানের উৎস

প্রথম উৎস : কুরআন কারিম

কুরআন কারিমে যে সকল বিধিবিধান এসেছে, তা তিন প্রকার—

এক. ঈমান সংক্রান্ত বিধিবিধান: যে সকল বিষয়ে ঈমান রাখা বান্দার জন্য অবশ্য কর্তব্য; তথা আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণ, আসমানি কিতাবসমূহ, নবী-রাসুলগণ, শেষ দিবস।

দুই. শিষ্টাচার সংক্রান্ত বিধিবিধান : যে সকল গুণ অর্জন করা বা যে সকল দোষ বর্জন করা বান্দার ওপর কর্তব্য (কাজের সাথে সম্পৃক্ত)।

তিন. কার্যত বিধিবিধান : বান্দার কথাবার্তা, কাজকর্ম, চুক্তি ও লেনদেন সংক্রান্ত বিধিবিধান। এ ধরনের বিধানকেই 'ফিকহুল কুরআন' বা 'কুরআনের আইন-কানুন' বলা হয়।

কুরআনে বর্ণিত কার্যত বিধিবিধান দুই প্রকার:

এক. ইবাদাত তথা নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, মান্নত, কসম সংক্রান্ত বিধান! এই বিধিবিধানের মাধ্যমে রবের সাথে মানুষের বন্ধন তৈরি হয়।

দুই. ইবাদাত ব্যতীত পারস্পরিক লেনদেন তথা চুক্তি করা, চুক্তি ভঙ্গ করা, হদ ও শাস্তি ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধিবিধান। এর মাধ্যমে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা হয়, হোক সেটা ব্যক্তিগতভাবে অথবা সামাজিকভাবে। ইবাদাত ছাড়া অন্যান্য বিধিবিধানকে শরিয়তের পরিভাষায় 'আহকামুল মুআমালাত' বলা হয়। অবশ্য বর্তমানে মুআমালাত তথা লেনদেন সংক্রান্ত বিধিবিধান উদ্দেশ্যভেদে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত হয়েছে—

০১। ব্যক্তিগত বিধান: এই প্রকার বিধিবিধানের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান। যার উদ্দেশ্য ঘর সুসংগঠিত করে রাখা।

০২। নাগরিক বিধিবিধান: এই প্রকার বিধিবিধানের মাঝে পারস্পরিক লেনদেন, আদান-প্রদান তথা বেচাকেনা, ভাড়া দেওয়া, বন্ধক রাখা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। যার উদ্দেশ্য পারস্পরিক সম্পর্ক সুসংগঠিত রাখা এবং হকদারের হক রক্ষা করা।

০৩। শাস্তি-সংক্রান্ত বিধিবিধান: বান্দা যে সকল অপরাধ করে, বা অন্যের যে সকল অপরাধের সম্মুখীন হয় সেগুলো এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। যার উদ্দেশ্য মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু ও তার সমস্ত প্রাপ্যের হিফাজত করা।

০৪। মীমাংসা-সংক্রান্ত বিধিবিধান: আদালতের ফায়সালা, সাক্ষ্য, কসম ইত্যাদি এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। যার উদ্দেশ্য প্রবর্তিত এবং প্রণয়নকৃত বিষয়গুলো চালু করা, যাতে মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা যায়।

০৫। সংবিধান-সংক্রান্ত বিধিবিধান: শাসন-ব্যবস্থার নিয়মনীতি এবং মৌলিক বিষয়সমূহ এর অন্তর্ভুক্ত! যার উদ্দেশ্য শাসক ও মাহিক ব্যক্তির মাঝে সংযোগ স্থাপন।

০৬। রাষ্ট্র-সংক্রান্ত বিধিবিধান: অন্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামি রাষ্ট্রের লেনদেন, আদান-প্রদান এবং ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক রক্ষা করা।

০৭। অর্থনৈতিক বিধিবিধান: রাষ্ট্রের আয়, রাজস্ব এবং ব্যাংকিং বিষয়াদি এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। যার উদ্দেশ্য রাষ্ট্র ও জনগণের মাঝে লেনদেনের সম্পর্ক রক্ষা করা।

দ্বিতীয় উৎস: সুন্নাহ

সুন্নাহ কী? সুন্নাহ হলো—নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ ও স্বীকারোক্তি।

তৃতীয় উৎস: ইজমা বা একমত হওয়া

ইজমার পরিচয়, হুকুম, প্রকার ইত্যাদি উসুলের কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং, সেখানে থেকে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

চতুর্থ উৎস: কিয়াস

এর বিস্তারিত বিবরণ উসুলের কিতাবে আছে।[৪০]

---

[৪০] সাধারণ কিয়াস (قياس) বলতে—ইসলামি আইনশাস্ত্রের চতুর্থ উৎসকে নির্দেশ করা হয়। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার পর এর অবস্থান। এই তিন উৎসতে সরাসরি নেই—এমন কোনো বিষয়ের মাসআলা বা বিধান উৎসভিত্তিক অনুমান করে নির্ণয় করাকে কিয়াস বলে। বিস্তারিত ও গবেষণাসহ জানতে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মৌলিক গ্রন্থ দেখতে হবে।

পঞ্চম উৎস: ইসতিহসান

উসুলবিদদের পরিভাষায় ইসতিইসান হলো—স্পষ্ট কিয়াস বাদ দিয়ে সূক্ষ্ম ক্রিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া।

ষষ্ঠ উৎস: মাসলাহাতে মুরসালা

উসুলবিদদের পরিভাষায় 'মাসলাহাতে মুরসালা' বলে ওইসব কল্যাণময় বিষয়কে—যা বাস্তবায়নের জন্য কোনো হুকুম প্রণয়ন করা হয় নি। তদ্রূপ তার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো শরয়ি দলিলও পাওয়া যায় নি।

আর এটাকে মুতলাক বা মুরসাল বলা হয় এজন্য যে, এটা দলিলমুক্ত। পক্ষের হোক বা বিপক্ষের! এর উদাহরণ হলো—কারাগার এবং রাজস্ব কর প্রভৃতি, যা সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন প্রয়োজনে বানিয়েছেন; কিন্তু তার কোনো বিধিবিধানও নেই। সেই সাথে তার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রণয়ন করার কোনো দলিলও নেই। মাসলাহাতে মুরসালা দিয়ে প্রমাণ পেশ করার জন্য শর্ত হলো—

- ০১। বাস্তবেই কল্যাণ আছে, শুধু ধারণাভিত্তিক নয়। অর্থাৎ মাসলাহাতে মুরসালা দিয়ে হুকুম প্রণয়নের পর যেন তা দিয়ে কল্যাণ লাভ করা যায়, অথবা ক্ষতি রোধ করা যায়।
- ০২। কল্যাণটি ব্যাপক হতে হবে, ব্যক্তিগতভাবে সীমাবদ্ধ থাকা যাবে না।
- ০৩। এই কল্যাণ কুরআন-হাদিস বা ইজমার বিপরীত হতে পারবে না। সুতরাং, কুরআন-হাদিস বা ইজমার মোকাবিলায় ওই কল্যাণ ধর্তব্য নয়।

সপ্তম উৎস: প্রচলন

এর পরিচয়, হুকুম, প্রকার উসুলের কিতাবে বর্ণিত আছে।

অষ্টম উৎস: ইস্তিসহাব

উসুলবিদদের পরিভাষায় ইস্তিসহাব হলো—কোনো জিনিসের ওপর পূর্বের অবস্থার বিচারে হুকুম প্রয়োগ করা, যতক্ষণ না পূর্বের অবস্থা পরিবর্তন হওয়ার ওপর দলিল পাওয়া যায়। মূলত ইস্তিসহাব আমাদের হানাফিদের নিকট কোনো প্রাণ বা উৎস নয়, বরং একটি জিনিসকে পূর্বের অবস্থায় বহাল রাখা। কারণ, পূর্বের অবস্থা পরিবর্তন হওয়ার কোনো দলিল পাওয়া যায় নি। বিস্তারিত বিবরণ উসুলের কিতাবে আছে।

নবম উৎস: পূর্ববর্তী ধর্ম

কুরআন কারিম বা সুন্নাতে সহিহাতে যদি পূর্ববর্তী ধর্মের কোনো বিধান পাওয়া যায় এবং এটাও স্পষ্ট করে উল্লেখ থাকে যে—তাদের মতো আমাদের ওপরও ফরজ, তাহলে সবার মতেই তাদের বিধান আমাদের শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি

তাদের বিধান রহিত হওয়ার ওপর কোনো শরয়ি দলিল পাওয়া যায়, তাহলে সর্বমতেই তা আমাদের শরিয়ত-বহির্ভূত বিষয় বলে গণ্য হবে।

আর যদি দুটোর কোনোটাই না পাওয়া যায়, অর্থাৎ ফরজ হওয়া বা রহিত হওয়ার ওপর কোনো দলিল না পাওয়া যায়; তাহলে অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে—আমাদের শরিয়ত বলে বিবেচিত হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করা আমাদের ওপর কর্তব্য। আর কোনো কোনো আলিম বলেন—তা আমাদের শরিয়তের মধ্যে গণ্য হবে না। অবশ্য প্রথমটাই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, যেমনটি উসুলের কিতাবে বিদ্যমান।

দশম উৎস: সাহাবিদের কথা ও কর্ম

তার বিস্তারিত বিবরণ বড়ো বড়ো কিতাবে উল্লিখিত আছে।

দ্রষ্টব্য: উসুলের প্রায় সব কিতাবে প্রসিদ্ধ আছে, মৌলিক উৎস চারটি। যথা—

- ০১। কিতাবুল্লাহ,
- ০২। সুন্নাতে রাসুল,
- ০৩। ইজমায়ে উম্মাহ,
- ০৪। কিয়াসে মুজতাহিদ!

কেননা, সূক্ষ্মভাবে দেখলে বোঝা যায়, অন্যান্য উৎসগুলোও এই চার উৎসের মাঝে চলে আসে। কারণ, পূববর্তীদের শরিয়ত কিতাব ও সুন্নাহর মাঝে অন্তর্ভুক্ত। প্রচলন ইজমার মাঝে গণ্য, সাহাবিদের বোধগম্য কথা কিয়াসের সাথে যুক্ত আর অবোধগম্য কথা সুন্নাতের সাথে যুক্ত, ইসতিহসান এবং এ জাতীয় উৎস কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত।

***

মাজহাব

ইসলামি রাষ্ট্রে কোনো একটি মাজহাব থাকতে হবে, যার ওপর রাষ্ট্রের সকল বা অধিকাংশ অধিবাসী আমল করবে। সুতরাং, আফগানের অধিবাসীদের হানাফি ফিকহ ও জীবনের অন্যান্য বিষয়ে হানাফি মাজহাবের ওপর আমল করতে হবে। কারণ, তারা আদি যুগ থেকেই হানাফি। তাছাড়া ফিকহ-ফতোয়ার কিতাব, মতন, শরাহ সবই হানাফি মাজহাবের। হানাফি ছাড়া অন্য মাজহাব আফগানিস্তানে অন্যরকম দৃষ্টিতে (দোষ) দেখা হয়, বিশেষ করে সাধারণদের মাঝে!

কাসিম ইবনু কুতলুবুগা (৮৭৯ হি.) যিনি ফকিহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি '(الكفاءة في النكاح)' নামক রিসালায় বলেন—'হানাফি মাজহাব অনুসরণকারী ব্যক্তির উচিত নয়, তার মেয়ে বিপরীত মাজহাবের ছেলের কাছে বিবাহ দেওয়া। সেটা তাদের কাছে কোনো ত্রুটির কারণে দূষণীয় নয়, বরং প্রচলনের কারণে দূষণীয়।'

'যদি কোনো মুকাল্লিদ নিজের মাজহাব ছেড়ে নতুন মাজহাব গ্রহণ করে'—ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়্যাতে[৩২] আছে, এটা নিছক দ্বীন নিয়ে তামাশা। আর এটা নাজায়িজ। ইসলামি রাষ্ট্রে বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোনো দল/ফোর্স/বাহিনীকে বিশেষ রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া যাবে না। কারণ, এতে রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে যায়। যেমন উসমানি সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে গিয়েছিল; যখন বিচারব্যবস্থায় বিভিন্ন সম্পর্ক প্রাধান্য পেয়েছিল, অপরিচিত নানা নিয়মনীতি অনুপ্রবেশ করেছিল এবং ভিন্ন রকম শাসন-ব্যবস্থা ও বিশেষ দলের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল।[৩৩]

তাছাড়া অনেক আগে থেকেই প্রসিদ্ধ ও জগৎসেরা অধিকাংশ কাজি ও মাশায়েখ হানাফি ছিলেন!

রদ্দুল মুহতারে[৩৪] আছে, অধিকাংশ ইসলামি দেশে বরং প্রায় সব জনপদে হানাফি মাজহাব ছাড়া অন্য কোনো মাজহাবের নামই জানে না। যেমন : রোম, হিন্দুস্তান, সিন্ধু, মা ওয়ারাউন নাহর ও সমরকন্দ। বর্ণিত আছে, সেখানে 'তুরবাতুল

মুহাম্মাদিন' বা মুহাম্মাদের কবরস্থান আছে। সেখানে প্রায় ৪০০জনকে দাফন করা হয়েছে। প্রত্যেকের নাম মুহাম্মাদ, প্রত্যেকেই বড়ো বড়ো মুসান্নিফ বা লেখক এবং ফতোয়াশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। প্রত্যেকেরই বিরাট সংখ্যক ছাত্র আছে! হানাফি মাজহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব *হিদায়ার* গ্রন্থকার যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন সেখানে দাফন করতে বাধা দিলে তার পাশেই দাফন করা হয়। বর্ণিত আছে, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর মাজহাব প্রায় চার হাজার বড়ো বড়ো ব্যক্তি গ্রহণ করেছেন, যাদের প্রত্যেকেরই বহু শাগরেদ আছে—ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ (যিনি শাফিয়ি মাজহাবের আলিম ছিলেন, তিনি) বলেন—'কোনো কোনো ইমাম বলেছেন, ইমাম আবু হানিফার যে পরিমাণ শাগরেদ ছিল, সে পরিমাণ আর কোনো প্রসিদ্ধ ইমামের ছিল না!'

তদুপরি, ইমাম আবু হানিফা ও তার শাগরেদদের ইলম দ্বারা উপকৃত হয়েছেন, সেটা অন্য কারও মাধ্যমে হয় নি। বিশেষ করে সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থাৎ একই রকম বিভিন্ন হাদিসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে, নতুন নতুন মাসআলা উদঘাটনের ক্ষেত্রে, বিচারব্যবস্থা ও বিধিবিধানের ক্ষেত্রে! আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ জাযা দান করুন। আমিন!

পরবর্তী সময়ে কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইমাম আবু হানিফার জীবনীতে ৮০০ শাগরিদের কথা তাদের নাম ও নসবসহ উল্লেখ করেছেন, যার আলোচনা অনেক দীর্ঘ!

আব্বাসি খলিফাদের মাজহাব যদিও তাদের পূর্বপুরুষ ইবনু আব্বাস রা.-এর মাজহাব ছিল, কিন্তু তাদের অধিকাংশ কাজি ও মাশাইখ ছিলেন হানাফি! ইতিহাসের পাতা উল্টালে এমনই দেখা যায়। আব্বাসি খিলাফত প্রায় ৫০০ বছর ছিল।

সেলজুকি শাসন এবং খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের সকল শাসক ও কাজিই হানাফি ছিলেন। আর বর্তমান (রদ্দুল মুহতারের লেখকের সময়কাল) উসমানি সাম্রাজ্যের শাসকরা তো ৯০০ হিজরি থেকে আজ পর্যন্ত (আল্লাহ তাদের সাম্রাজ্যকে কিয়ামত পর্যন্ত শক্তিশালী রাখুন) শাসন-ব্যবস্থা এবং অন্যান্য বিষয়াদির দায়িত্ব শুধু হানাফিদের হাতেই সোপর্দ করেন—এমনটাই কিছু গবেষক বলেছেন।[১২]

***

মানুষের স্বভাব ও যুগের প্রচলন

একটি সফল রাষ্ট্রে অবশ্যই জনগণের স্বভাব-প্রকৃতি যুগের প্রচলন রক্ষা করতে হবে, যদি সেগুলো শরিয়তের সাথে বিরোধপূর্ণ না হয়! সুতরাং, আফগানেও এখানকার অধিবাসীদের স্বভাব-প্রকৃতি বিবেচনা করতে হবে। যেমন: পোশাক-আশাক, বেশভূষা, ভাষা ও অন্যান্য বিষয়গুলোর যেগুলো শরিয়তের সাথে সাংঘর্ষিক না। কারণ, শরিয়তের সাথে বিরোধপূর্ণ নয়, এমন প্রচলনও শরিয়তে ধর্তব্য; এমনকি ফুকাহায়ে কিরাম এটাকে শরিয়তের দলিল বলে বিবেচনা করেছেন।

মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যা কিতাবের ৩৬৩ ধারাতে উল্লিখিত আছে—'স্বভাব-প্রকৃতিও দলিল'। অর্থাৎ, স্বভাব-প্রকৃতি ব্যাপক হোক বা ব্যক্তিগত, কোনো হুকুম সাব্যস্ত করার জন্য এটাকেও দলিল বানানো হবে। স্বভাব বলতে ওই জিনিসকে বোঝায়—যা মানুষের মস্তিষ্কে বসে যায় এবং বারবার ঘটার মাধ্যমে সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী মানুষের কাছে, তা গ্রহণযোগ্যতা পায়।

দলিল হওয়ার অর্থ হলো—মামলা-মোকদ্দমার সময় সেটাকে দলিল হিসাবে পেশ করা যাবে। এটা মূলত হাদিস শরিফ থেকেই নেওয়া হয়েছে—'মুসলিমরা যেটাকে উত্তম মনে করে, সেটা আল্লাহর কাছেও উত্তম।'[৪৬]

কিন্তু আমেরিকা আধিপত্য বিস্তার করে যে-সকল মন্দ স্বভাব-প্রকৃতি রেখে গিয়েছে এবং পাশ্চাত্য থেকে যে সকল কৃষ্টি-কালচার ও অপসংস্কৃতি এসেছে, সেটা কিন্তু কিছুতেই আফগানদের মূল স্বভাব নয়। সুতরাং, সেটা বিবেচ্যও নয়! বরং, যেকোনো মূল্যে খুব দ্রুত সেটা উপড়ে ফেলে আফগানকে পবিত্র করতে হবে। কেননা, সেটা যেমন পূতঃপবিত্র শরিয়তের ঘোর বিরোধী, তেমনি আফগানের অধিবাসীদের স্বভাবের সাথেও বৈষম্যপূর্ণ। তাদের আগের ও পরের প্রচলন থেকেও ভিন্ন। আফগানের ইতিহাসের পাতা খুললে, যেমন: জামালুদ্দিন আফগানি রচিত *তাতিম্মাতুল বায়ান ফি তারিখি আফগানিস্তান* গ্রন্থে তাদের স্বভাব-প্রকৃতি কেমন

ছিল, তা দেখা যায়। তাদের এসব স্বভাব প্রকৃতিতে গেঁথে গিয়েছে—

- ০১। সাহসিকতা;
- ০২। আগ বাড়িয়ে শত্রুর মোকাবিলা;
- ০৩। যুদ্ধ করার মানসিকতা;
- ০৪। (আল্লাহ ব্যতীত) অন্যের সামনে মাথা নত না করা;
- ০৫। তাদের পুরুষদের পোশাক-পরিচ্ছদ: পাঞ্জাবি, পায়জামা, পাগড়ি, চাদর। আর তাদের নারীদের লম্বা, পুরো শরীর ঢেকে যায় এমন কাপড় পরিধান করা।
- ৬। উলামায়ে কিরাম ও বড়োদের শ্রদ্ধা করা;
- ০৭। মেহমানকে সম্মান করা;
- ০৮। তাদের অধিকাংশই সুন্নাতের পাবন্দ, হানাফি মাজহাবের অনুসারী।
- ০৯। আফগানের গ্রাম ও শহরগুলোতে দ্বীনি ইলম শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। যেমন—সরফ, নাহু, মাআনি, বায়ান, ফিকহ, উসুল, তাফসির, হাদিস, মানতেক, দর্শন, গণিত, মিরাস। অবশ্য কোনো কোনো এলাকাতে শুধু ফিকাহই পড়ানো হয়।
- ১০। প্রত্যেক গ্রামেই আছে মসজিদ, সাথে ঘরও তৈরি করা যাতে তালিবে ইলম বা ছাত্ররা সেখানে থাকতে পারে।
- ১১। তারা মন থেকেই তালিবে ইলমদের খাবারের ব্যবস্থা করে।
- ১২। সেখানে উলামায়ে কিরামের অনেক সম্মান। দ্বীনি বিষয়ে তারা আলিমদের রাহনুমায়ি করে।
- ১৩। ইসলামের ব্যাপারে তারা অত্যন্ত কঠোর।
- ১৪। ইসলামের জন্য তারা জান দিতে প্রস্তুত।
- ১৫। তারা স্বাধীনচেতা জাতি। অন্য কোনো ক্ষমতার সামনে মাথা নত করে না।[৪৭]

স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা

ইসলামি রাষ্ট্রে আইন-কানুন, বিধিবিধান, মূলনীতি ও নীতিমালা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। বাহিরের কাউকে—যে কেউ হোক না কেন—ভেতরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ বা অনধিকার চর্চার সুযোগ দেওয়া যাবে না। কারণ, অন্যের ঘরে তো তার অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা যায় না। সেটা হবে অন্যের মালিকানায় অবৈধ হস্তক্ষেপ। তাহলে কীভাবে কোনো সাম্রাজ্যের জন্য আরেক সাম্রাজ্যে অনধিকার চর্চা করা বৈধ হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
>
> 'হে ঈমানদাগণ, তোমরা তোমাদের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে অনুমতি নেওয়া ও তার অধিবাসীদের সালাম দেওয়ার আগ পর্যন্ত প্রবেশ করো না। সেটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারো। সেখানে যদি কাউকে না পাও, তাহলে তোমাদের অনুমতি দেওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না।'[৪৮]

ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ এর কারণ বর্ণনা করে বলেন—'সেখানে তখন অন্যের মালিকানায় তার অনুমতি ছাড়া অনধিকার চর্চা করা হয়।'[৪৯]

সুতরাং, আমেরিকা যে আফগানের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল, সেটা ছিল অন্যায় হস্তক্ষেপ, অবৈধ প্রভাব বিস্তার এবং অনধিকার চর্চা। এজন্যই আফগানের উলামায়ে কিরাম তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিয়েছেন এবং আফগানের যারা তাদের সাহায্য করবে, তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করার ফতোয়া দিয়েছেন। কেননা, এর মাধ্যমে তারা নিজেদের দ্বীনকে, নারী ও শিশুকে, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করছে। আর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون اهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد...

'যে ব্যক্তি নিজের মাল রক্ষা করতে নিহত হয়, সে শহিদ। আর যে নিজের পরিবার বা নিজের জান বা নিজের দ্বীনকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সেও শহিদ।'[৫০]

***

স্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতা

ইসলামি রাষ্ট্রে বাকস্বাধীনতা অবশ্যই থাকবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক মুসলিমের এই সুযোগ থাকবে যে, সে ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি তুলে ধরতে পারবে, সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের বিধিবিধান পৌঁছে দিতে পারবে। মোটকথা, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করতে পারবে, এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানকেও। তবে সেটা শরিয়ত নির্দেশিত পন্থায় হতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
>
> 'তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান করো প্রজ্ঞা ও সুন্দর কথার মাধ্যমে এবং তাদের সাথে যুক্তিতর্ক করো সর্বোত্তম পন্থায়! নিঃসন্দেহে, তোমার রব তাদের সম্পর্কে অধিক অবগত, যারা তাঁর পথ থেকে গোমরাহ হয়েছে। আর তিনিই হিদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে অধিক অবগত।'[৫১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

> كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ..
>
> তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।[৫২]

মোটকথা, ইসলামে বাকস্বাধীনতা আছে। আর সেটা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—প্রত্যেকের সামনে থেকে জালিম শাসকের কাছে সুউচ্চ স্বরে সত্যের বাণী তুলে ধরা। যেমন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

أفضل الجهادي كلمه عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر.

---

[৫২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০

'সবচেয়ে উত্তম জিহাদ হলো জালিম শাসক বা অত্যাচারী নেতার সামনে ইনসাফের কথা বলা।'[৫৩]

মুসলিম শাসকরাও সাধারণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতেন, যাতে তাদের সামনে সত্য বাণী তুলে ধরে এবং শাসকরাও সেটা মেনে নিতেন! আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আন বলেন—'আমি তোমাদের শাসক ঠিকই, তবে তোমাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ন সুতরাং, যদি আমি সত্যের ওপর অটল থাকি, তাহলে আমাকে সাহায্য করো। আ যদি সত্য থেকে বিচ্যুত হই, তাহলে আমাকে সত্যের পথে নিয়ে আসো।'[৫৪]

বর্ণিত আছে, এক লোক উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলল—'আল্লাহকে ভ করেন।' তিনি খুশি হয়ে তাকে তখন কৃতজ্ঞতা জানালেন। বললেন—'ওই ব্যক্তিকে যেন আল্লাহ রহম করেন, যে আমাদের সামনে আমাদের দোষগুলো তুলে ধরে।

আবদুল্লাহ ইবনু মুসআব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার রা. একবার বললেন—তোমরা নারীদের চল্লিশ উকিয়ার বেশি মোহর দিয়ো না, যদিও সে নিজ গোত্রের মেয়ে হয়। অর্থাৎ, যদিও সে ইয়াজিদ ইবনু হুসাইন হারিসির মেয়ে হোক কারণ, সে ছিল ধনী ছিল। এখন কেউ যদি বেশি মোহর দেয়, তাহলে আমি সেই অতিরিক্ত অংশ বাইতুল মালে রেখে দেব।

তখন নারীদের কাতার থেকে এক নারী দাঁড়িয়ে বললেন—কীভাবে আপনি এ কথা বললেন?

উমার রা. বললেন—কেন কী হয়েছে?

নারীটি বললেন, আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন—

يْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

'আর যদি তোমরা তাদের কাউকে (স্ত্রীকে) অঢেল সম্পদও দিয়ে থাকো, তবুও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিয়ো না!'[৫৫]

তখন উমার রা. বললেন, এক নারী সঠিক বলল, কিন্তু একজন পুরুষ ভুল বলল। (অর্থা তিনি নিজের ভুল স্বীকার করে নিলেন।)

মুহাম্মাদ ইবনু কাব কুরজি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—একবার এক লোক আলি রা.-কে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল, আলি রা. তার উত্তর

[৫৩] আবু দাউদ, ৪৩৪৪। আদেশ-নিষেধ অধ্যায়।
[৫৪] সূত্র : খিলাফত : ১৪৮
[৫৫] সূরা নিসা, আয়াত: ২০

দেওয়ার পর লোকটি বলল, উত্তরটা আসলে এমন না, বরং এমন। তখন আলি রা. বললেন—তুমি ঠিক বলেছ, আমি ভুল বলেছি।'[৮৮]

কিন্তু বাক-স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, যে যার মতো নিজের খেয়ালখুশির দিকে বা বিদআতের দিকে আহ্বান করবে। কারণ, সেটা ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ। আর কেউ যদি বিদআতের দিকে মানুষকে আহ্বান করে, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।

রদ্দুল মুহতারে আছে—'কোনো বিদআতি যদি মানুষকে বিদআতের কথা বলে, আর সে বিদআত ছড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকে, তাহলে যদিও তার বিষয়ে কুফুরির ফায়সালা দেওয়া হয় নি; কিন্তু রাষ্ট্রকে গতিশীল রাখার জন্য এবং জনগণকে রোধ করার জন্য সুলতান তাকে হত্যা করতে পারবে। কারণ, এই ফিতনা অনেক গুরুতর ও মারাত্মক, দ্বীনের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টিকারী। আর যদি সেই বিদআত সরাসরি কুফুরি হয়, তাহলে বিদআতিদের সবাইকে হত্যা করা হবে; কিন্তু যদি বিদআতটি কুফুরি না হয়, তাহলে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ শুধু তাদের নেতা ও গুরুকে হত্যা করা হবে।'

আকিদাগত বা ধর্মগত স্বাধীনতা: ইসলাম জিম্মি বা চুক্তিবদ্ধ কাফিরকে ইসলামগ্রহণে বাধ্য করে না, বরং আপন ধর্মের ওপরই বহাল রাখে। উমার রা.-এর 'আশাক' নামে এক খ্রিস্টান গোলাম ছিল। সে বলে—'আমি উমার রা.-এর এক খ্রিস্টান গোলাম ছিলাম। একবার উমার রা. আমাকে বললেন—তুমি মুসলিম হয়ে যাও, যাতে মুসলিমদের কিছু কাজে সাহায্য করতে পারো। কারণ, মুসলিমদের কাজে অমুসলিমদের সাহায্য নেওয়া উচিত নয়। তখন আমি অস্বীকার করলাম!

উমার রা. বললেন—ইসলামে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই! যখন তার মৃত্যুর সময় হলো, তখন তিনি আমাকে মুক্ত করে দিয়ে বললেন—তোমার যেখানে ইচ্ছা যাও।'

ফুকাহায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, জিম্মিরা নিজেদের ধর্মের রীতিনীতি চর্চা করতে পারবে। তাদের এ-সব করতে নিষেধও করা হবে না, যতক্ষণ না তারা সেগুলো প্রকাশ্যে করে! এখন যদি তারা সেগুলো প্রকাশ্যে করতে চায়, যেমন—রাস্তায় বের হয়ে করতে চায়, তাহলে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা ও শহরে এগুলো করা ও বসবাসের ব্যাপারে তাদের নিষেধ করা হবে, তবে তাদের নিজেদের এলাকায় নিষেধ করা হবে না।

ইসলামে স্বাধীনতা দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই। এর অর্থ এই না যে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিশ্বাসে স্বাধীন—হোক সে ইহুদি বা খ্রিস্টান বা অন্যান্য ধর্মের অনুসারী। আবার, সে চাইলে এক ধর্ম বাদ দিয়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে। বরং, ইসলামে স্বাধীনতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—আল্লাহ তাআলার সত্তা, সিফাত, ইবাদাত, ইস্তিআনাতের ক্ষেত্রে

---

[৮৮] প্রাগুক্ত, ৮৬৫

একত্ববাদিতার বিশ্বাস। কারণ, ইসলামি রাষ্ট্রের বড়ো একটি উদ্দেশ্য হলো, দ্বীনকে হিফাজত করা। আর সেটা সম্ভব দ্বীনের মৌলিক বিষয়কে হিফাজত করার মাধ্যমে, মানুষকে সঠিক আকিদার ওপর রাখার মাধ্যমে, যার ওপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাহকে রেখে গিয়েছেন, যার জন্য ভ্রান্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, মুনাফিকদের বেড়াজাল মূলোৎপাটন করেছেন—যারা মানুষের মাঝে বিভ্রান্তিকর আকিদা, শয়তানের বানানো ও প্রত্যাখ্যাত অলিক ধ্যানধারণা ছড়ায়, আর ভাবে—তারা ভালো কাজই করছে। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة

'আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় দ্বীন হলো উদার একনিষ্ঠ সরলধর্ম।'[৫৭]

আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

وايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء

'আল্লাহর কসম! তোমাদের আমি শুভ্রতুল্য দ্বীনের ওপর রেখে গেলাম, যার দিন-রাত এক সমান (অর্থাৎ, উজ্জ্বল পরিষ্কার)।

আবু দারদা রা. বলেন—আল্লাহর কসম! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যই বলেছেন। তিনি আমাদের উজ্জ্বল ধর্মের ওপর রেখে গিয়েছেন, যার রাত-দিন সমান।[৫৮]

এই সহজ-সরল, উজ্জ্বল দ্বীন পরিবর্তন করার নামই হলো ইরতিদাদ ও কুফুরি। আর এটা ইসলামে মারাত্মক অপরাধ। এর শাস্তি হলো হত্যা এবং ইসলামের ফিরে আসার আগ পর্যন্ত আজীবন কারাদণ্ড।

কানজুল উম্মালে আছে—'মুরতাদের সামনে ইসলামকে পেশ করা হবে, তার সন্দেহ দূর করা হবে, তিন দিন তাকে আটকে রাখা হবে, যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তো হলোই। অন্যথায়, তাকে হত্যা করা হবে। তবে মুরতাদ নারীকে হত্যা করা হবে না। বরং, ইসলামগ্রহণের আগ পর্যন্ত আটকে রাখা হবে।'

মূলত, ইসলাম মানুষের দ্বীন-দুনিয়ার বিষয়-আশয় খুব গুরুত্ব সহকারে দেখে। এ কারণেই যে মুফতি মানুষকে বিভিন্ন হিলা বা কৌশল শেখায়, অজ্ঞতাবশত বা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য বা খেয়াল-খুশির কারণে শরিয়তের সাথে বিরোধপূর্ণ ফতোয়া দেয়, যার ফলে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমন মুফতিকে ফতোয়া দিতে শরিয়ত নিষেধ করেছে।

[৫৭] তাবারানি, আওসাত, ৭৩৫১

[৫৮] সুনানু ইবনি মাজাহ, ৫

একইভাবে ওই ডাক্তারের জন্য ডাক্তারি হারাম, যে মানুষের চিকিৎসা করে অথচ চিকিৎসা কী, সেটাও জানে না। ফলে তাদের অসুস্থতা আরও গুরুতর হয়। তদ্রূপ যে ব্যক্তি মানুষকে গাড়ি ভাড়া দেয় এবং ভাড়াও নিয়ে নেয়, পরবর্তী সময়ে যখন ভাড়াটে ব্যক্তি আসে তখন দেখে যে, তার কাছে কোনো গাড়িই নেই; ফলে ভাড়াটে ব্যক্তি সঙ্গীসাথি থেকে পিছিয়ে পড়ে, এমন নিঃস্ব ব্যক্তির জন্য মানুষের কল্যাণের জন্যই গাড়ি ভাড়া দেওয়া নিষিদ্ধ। কারণ, এদের মাধ্যমে মানুষের সম্পদ ও সময়ের ক্ষতি হয়।

ভূমির স্বাধীনতা-রক্ষা

ইসলামি রাষ্ট্রের ভূমির ক্ষয়ক্ষতি থেকে ও স্বাধীনতা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। কারণ, দেশের ভূমি সমগ্র দেশবাসীর সম্পদ। সুতরাং, অন্য কেউ এর বিন্দু পরিমাণও দখল করতে পারবে না, যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে—কারও অনুমতি ছাড়া তার সম্পদে হস্তক্ষেপ করা অবৈধ।

দেশের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে দেশের ভূমি রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা একটি প্রাকৃতিক ও বাস্তবসম্মত অধিকার। কারণ, সীমানা রক্ষা করার মাধ্যমেই দেশ নিরাপদ থাকতে পারে। এ জন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু সালামাকে নিজেদের জায়গামতো থাকতে বলেছেন, যাতে মদিনা সুরক্ষিত থাকে। আনাস রা. বলেন—একবার বনু সালামা মসজিদের কাছে চলে আসতে চাচ্ছিল, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চান নি যে, মদিনা অরক্ষিত হয়ে যাক। তাই তিনি বললেন—'বনু সালামা। তোমরা কি (মসজিদে আসার) পদচিহ্নসমূহে সাওয়াবের আশা করো না?' তখন তারা পূর্বের জায়গাতেই থেকে গেলেন।[৫১]

তাছাড়া দ্বীন হিফাজত করতে চাইলেও সীমান্ত নিরাপদ রাখা অত্যন্ত জরুরি, যাতে শত্রুরা কোনো নারীকে ইজ্জত হারা না করতে পারে, অথবা কোনো মুসলিমকে জিম্মি বা তার জানের ক্ষতি করতে না পারে।

সাম্রাজ্য যেন বিভক্ত না হয় সে ব্যাপারেও সুলতানের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা, এতে সাম্রাজ্যই দুর্বল হবে। কারণ, কোনো সাম্রাজ্য ধ্বসে যাওয়ার প্রথম লক্ষণই হচ্ছে সাম্রাজ্যভাগ হওয়া। অতীতে ইসলামি সাম্রাজ্য ততদিন স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, যতদিন পুরো সাম্রাজ্য এক সাথে এক জোট হয়ে ছিল। পরবর্তী সময়ে যখন শাসন-ব্যবস্থা বনু উমাইয়্যা থেকে আব্বাসিদের হাতে চলে এলো, তখন আন্দালুসও ভাগ হয়ে গেল। এটাই মূলত ইসলামি সাম্রাজ্যে প্রথম বিভক্তি। তারপর বিভক্তি হতে হতে মুসলিমরা পরাস্ত ও পরাজিত হয়ে গেল। শাসক না হয়ে শাসিত হলো, যেমন: বর্তমানের অবস্থা। কারণ, সাম্রাজ্য বিভক্ত না হলেই দেশ স্থিতিপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী হবে। আর দেশ রক্ষার মাধ্যমে জনগণও রক্ষা পাবে। এ জন্যই এটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

---

[৫১] সহিহ বুখারি
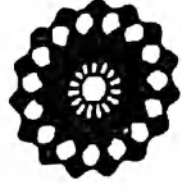
ইসলামি সাম্রাজ্যের নামকরণ

মুসলিম রাষ্ট্রের নামকরণের ক্ষেত্রে ইসলামের নাম অবশ্যই থাকতে হবে। সেটা হোক—

- (০১) ইমামতে ইসলামিয়া,
- (০২) ইমারাতে ইসলামিয়া,
- (০৩) খিলাফতে ইসলামিয়া,
- (০৪) দাওলাতে ইসলামিয়া,
- (০৫) সালতানায়ে ইসলামিয়া,
- (০৬) হুকুমাতে ইসলামিয়া,

ইতিহাসের অধিকাংশ পাতায় 'দাওলাতে ইসলামিয়া'র উল্লেখ রয়েছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

এক. ইমামত : 'ইমামতে'র মূল অর্থ 'ইচ্ছা করা'। যেমন বলা হয়, 'যদি বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা করে'। শরিয়তের পরিভাষার ইমামত দুই প্রকার:

- ০১। ইমামতে সুগরা
- ০২। ইমামতে কুবরা

এখানে, দ্বিতীয়টাই উদ্দেশ্য। হাসকাফি রাহিমাহুল্লাহ এর অর্থ এভাবে ব্যক্ত করেছেন—'ইমামতে কুবরা হলো, মানুষের ওপর ব্যাপকভাবে ক্ষমতা লাভ করা।'

ইবনু আবিদিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, *মাকাসিস* গ্রন্থে ইমামতের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে যে—'ইমামত হচ্ছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে দ্বীন-দুনিয়া; উভয় ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে নেতৃত্ব গ্রহণ করা।'

জুওয়াইনি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইমামত হলো পূর্ণাঙ্গ নেতৃত্ব ও দায়িত্ব, যা আম-খাস সবার সাথে দ্বীন-দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির সাথে সম্পৃক্ত। গুরুত্বপূর্ণ

বিষয় বলতে:

- ০১. সীমান্ত পাহারা দেওয়া,
- ০২. জনগণের দেখভাল করা,
- ০৩. দলিল-প্রমাণ বা তরবারির মাধ্যমে (ইসলামের) দাওয়াত দেওয়া,
- ০৪. অন্যায় ও ভার প্রতিহত করা,
- ০৫. মজলুমের জন্য জালিমের থেকে ইনসাফ গ্রহণ করা,
- ০৬. হক দিতে অস্বীকারকারীদের থেকে হক আদায় করা,
- ০৭. সেই হক প্রাপ্য ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

দুই. 'ইমারাত' ও 'ইমারত' : দুটোরই শাব্দিক অর্থ নেতৃত্ব। বলা হয়, 'জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করল।' 'ইমারত' ধাতুটি থেকে 'আমির' (নেতা) শব্দটি নির্গত হয়েছে।

আবার, আমিরের পদকেও 'ইমারত' বলা হয়। ফিকহের পরিভাষায় ব্যবহৃত 'ইমারাত' শব্দটিও অনেকটা এ অর্থে ব্যবহার করা হয়। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, এই 'ইমারত' ব্যাপক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর সেটা শুধু সুলতানের পক্ষ থেকেই লাভ করা যায়। পক্ষান্তরে ফিকহের 'ইমারাত' কখনো ব্যাপক ক্ষেত্রে, আবার কখনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তদ্রূপ এটা সুলতানের পক্ষ থেকেও হতে পারে, শরিয়তের পক্ষ থেকেও হতে পারে, অন্য কারও পক্ষ থেকেও হতে পারে। যেমন: অসিয়ত করা বা উকিল বানানো।

তিন. 'খিলাফত' : 'খিলাফত' এর আভিধানিক অর্থ 'কারও ওপর তার দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়া', কিংবা 'তার পরিবর্তে দায়িত্ব গ্রহণ করা'।

শরিয়তের পরিভাষায় 'খলিফার পদ'-কে 'খিলাফত' বলা হয়। তদ্রূপ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিষিক্ত (নায়েব বা সহকারী) হয়ে দ্বীন-দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে নেতৃত্বগ্রহণ। এই খিলাফতকে 'ইমামতে কুবরা'ও বলা হয়।

মুফরাদাত ফি গারিবিল কুরআন -এ (২৯৪ পৃষ্ঠায়) আছে, খিলাফত অর্থ অন্যের নায়েব (স্থলবর্তী) হওয়া—হয় তার অনুপস্থিতির কারণে, বা মৃত্যুবরণ করার কারণে, কিংবা তার অক্ষমতার কারণে। নায়েবের সম্মানার্থে এই শেষ অর্থেই আল্লাহ তাআলা মানুষকে জমিনের খলিফা বানিয়েছেন। যেমন: বর্ণিত হয়েছে—

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ

'তিনিই এ মহান সত্তা, যিনি তোমাদের জমিনে 'খলিফা' বানিয়েছেন।'[৬০]

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ

'আর তিনিই ওই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের পৃথিবীতে 'স্থলবর্তী' বানিয়েছেন।'[৬১]

আরও বর্ণিত হয়েছে—

وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ

'আর আমার প্রতিপালক তোমাদের স্থলে অন্য কোনো জাতিকে 'খলিফা' বানাবেন।'[৬২]

সুতরাং তিনিই খলিফা, যিনি মুসলিমদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। তবে কোনো কোনো আহলে ইলম বলেন, শাসক যদি শাসনক্ষমতায় থেকে ন্যায়-ইনসাফ করে জমিনে আল্লাহর আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করে, তাহলেই কেবল তাকে খলিফা বলা যাবে অন্যথায় নয়!

এ জন্যই আবু বকর, উমার, উসমান এবং আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে খলিফা বলা হয়। আর তাদের সম্পর্কেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

'তোমরা আমার সুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদার সুন্নাত আঁকড়ে ধরো।'[৬৩]

সাদ ইবনু জুমহান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাফিনা রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الخلافة في أمتي ثلاثين سنة ثم ملك بعد ذلك

'আমার উম্মাহর মাঝে খিলাফত থাকবে ত্রিশ বছর। তারপর খিলাফতের পর রাজতন্ত্র কায়েম হবে।' তারপর আমাকে সাফিনা রা. বলেন, 'তুমি আবু বকর রা. এর খিলাফত, উমার রা. এর খিলাফত এবং উসমান রা. এর খিলাফত আঁকড়ে ধরে রেখো।' তারপর আমাকে বললেন, 'তুমি আলি রা. এর খিলাফতকেও আঁকড়ে ধরে রেখো।' তিনি বলেন, 'পরবর্তী সময়ে আমরা খিলাফতকে ত্রিশ বছরের মাঝেই পেয়েছি।' সাঈদ বলেন, 'আমি সাফিনা রা.-কে বললাম, বনু

[৬০] সূরা ফাতির, আয়াত: ৩৭
[৬১] সূরা আনআম, আয়াত: ১৬৫
[৬২] সূরা হুদ, আয়াত: ৫৭
[৬৩] সূত্র: সুনানু আবি দাউদ ও আল...

উমাইয়্যা দাবি করে, তাদের মাঝেও খিলাফত আছে। তিনি বললেন, 'ওদের দাবি একেবারেই মিথ্যা। বরং, ওরা নিকৃষ্ট রাজতন্ত্র কায়েমকারী।'[৬৪]

শাসন-ব্যবস্থা যে খিলাফত থেকে রাজতন্ত্রে চলে যাবে এটা মূলত গায়েবি বিষয়, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবগত করেছেন। যেমন: নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরেক হাদিসে বলেছেন—

تكون النبوة فيكم ما شاء الله وان تكون ثم يرفعها إذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج نبوة

'তোমাদের মাঝে ততদিন নবুওয়াত থাকবে, যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করেন। তারপর তিনি যখন উঠিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর নবুওয়াতের আদর্শে খিলাফত কায়েম হবে। অতঃপর আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা করেন, ততদিন খিলাফত থাকবে। তারপর তিনি যখন খিলাফত উঠিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন উঠিয়ে নেবেন। তারপর অন্যায়ের রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা করেন, ততদিন রাজতন্ত্র থাকবে। তারপর যখন উঠিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন উঠিয়ে নেবেন। তারপর স্বেচ্ছাচারিতার রাজত্ব কায়েম হবে। অতঃপর আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা করেন, ততদিন বাকি থাকবে। তারপর যখন উঠিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন উঠিয়ে নেবেন। তারপর আবার নবুওয়াতের আদর্শে খিলাফত কায়েম হবে।'

তারপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ হয়ে গেলেন। হাবিব নামক বর্ণনাকারী বলেন—'পরবর্তী সময়ে যখন উমার ইবনু আবদিল আজিজ নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করলেন, আর ইয়াজিদ ইবনু নুমান ইবনি বাশির তার কাছে থাকতেন, তখন আমি এই হাদিস লিখে তার কাছে পাঠিয়ে বললাম—'আমি আশা করি, আমিরুল মুমিনিন উমার ইবনু আবদিল আজিজ অন্যায়ের হাদিসে বর্ণিত রাজতন্ত্র এবং স্বেচ্ছাচারিতার রাজত্বের পর খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তখন ইয়াজিদ আমার লেখাটি উমার ইবনু আব্দুল আজিজকে দিলে তিনি খুব খুশি ও মুগ্ধ হন।[৬৫]

চার. 'দাওলাত' : 'দাওলাতে'র আভিধানিক অর্থ একজনের পর আরেকজনের কাছে কোনো জিনিস অর্জিত হওয়া। অর্থসম্পদ (টাকা) বা যুদ্ধ বারবার হওয়া।

---

[৬৪] জামি তিরমিযি, ২২২৬

[৬৫] মুসনাদু আহমাদ।

দাওলাত শব্দটি সম্পদ অর্থে যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি যুদ্ধ অর্থেও ব্যবহৃত হ
অবশ্য কেউ কেউ বলেন—দুওলাত (হ্রস উ-কার দিয়ে) শব্দটি সম্পদ অর্থে। আ
দাওলাত (আ-কার দিয়ে) শব্দটি যুদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আর ইদালাত অর্থ পরাস্ত করা। বলা হয়, শত্রুদের ওপর বিজয় দান করা হয়েছে
আবু সুফইয়ানের এক হাদিসে আছে, আমরা তাদেরকে পরাস্ত করি। আবার এ
শব্দটি থেকে কুরআনে কারিমে এসেছে—

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

'আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে আবর্তিত করে থাকি।'[৬৬]

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ

'যাতে তা তোমাদের মধ্যকার সম্পদশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।'[৬৭]

অর্থাৎ, আগে শুধু ধনীদের মাঝেই সম্পদ আবর্তিত হতো, গরিবদের তারা কিছুই দিতনা।[৬৮]

পারিভাষিক অর্থে, দাওলাত বলা হয় কিছু প্রদেশের সমষ্টি। এই প্রদেশসমূহ একজনের অধীনে একত্র করা হয়, যাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে আলাদাভাবে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব হয়। যার সীমা-পরিসীমা আছে। শাসক, খলিফা, বা আমিরুল মুমিনিন এই নেতৃত্বের প্রধান থাকেন। (যেমন: দাওলাতে উসমানিয়া।)

পাঁচ. 'সালতানাত' : 'সালতানাতে'র মূল অর্থ শক্তি বা ক্ষমতা। শব্দটি সুলতান থেকেই এসেছে। যেমন: এখান থেকে এসেছে।

ছয়. 'হুকুমাত' : 'হুকুমাত' শব্দটি মূলত ('বিচার করা' অর্থের আরবি মূল 'হাকামা-ইয়াহকুমু') ধাতু থেকে এসেছে। প্রখ্যাত ভাষাবিদ আসমায়ি বলেন—হুকুমাতের শাব্দিক অর্থ : কাউকে জুলুম থেকে ফিরিয়ে রাখা। যেমন, আরবরা বলে—বিরত রাখা ও বাধা দেওয়া। শাসককে বলা হয় হাকিম। কারণ, শাসক জালিমকে জুলুম থেকে বিরত রাখে।[৬৯]

***

[৬৬] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৪০
[৬৭] সূরা হাশর, আয়াত: ৫৯
[৬৮] লিসানুল আরব, دول ধাতু।
[৬৯] লিসানুল আরব, ১৩/১৪১, মীম, হা ধাতু।

রাষ্ট্রপ্রধানের নাম

একটি ইসলামি রাষ্ট্রের যিনি দায়িত্বশীল হবেন, তার জন্য নির্দিষ্ট বেশ কিছু নাম আছে, যা দেশভেদে পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন—

- ০১. খলিফা;
- ০২. ইমাম;
- ০৩. আমিরুল মুমিনিন;
- ০৪. মালিক;
- ০৫. রাইস;
- ০৬. সুলতান;
- ০৭. হাকিম;
- ০৮. উলিল আমর।

নাম বিশ্লেষণ

০১. 'খলিফা' শব্দটি ইস্তিখলাফ ধাতু এসেছে। যার অর্থ কাউকে নিজের স্থলবর্তী করা। এ-জন্যই আবু বকর রা.-কে বলা হয় 'খলিফাতু রাসুলিল্লাহ'। হাদিসে আছে— যদি আমি তাকে খলিফা নিয়োগ করে যাই, তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। কারণ, আমার থেকে উত্তম ব্যক্তি খলিফা নিয়োগ করে গেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

'হে দাউদ, আমি তোমাকে জমিনে খলিফা বানিয়েছি। সুতরাং, তুমি মানুষের মাঝে হক অনুযায়ী ফায়সালা করো।'[৭০]

০২. 'ইমাম' মূলত এমন প্রত্যেককে বলা হয়, যাকে কোনো বিষয়ে অনুসরণ করা হয়। এজন্য মসজিদের ইমাম সাহেবকেও ইমাম বলা হয়। তদ্রূপ বিধিবিধানের ইমামকেও ইমাম বলা হয়। যেমন—ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ি, ইমাম আহমাদ। এখানে থেকে শাসককেও ইমাম বলা হয়। এর বহুবচন

'আয়িম্মা'। '*মুতলি*' গ্রন্থের লেখক বলেন, ইমাম মানে খলিফা। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

'আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহিমকে তাঁর রব কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন। অতঃপর তিনি সেগুলো পূর্ণ করেছিলেন। আল্লাহ বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে মানুষের ইমাম বানাবো।'[৭১]

এছাড়া বহু হাদিসে খলিফা অর্থে ইমাম শব্দ এসেছে। যেমন: হাদিসে আছে, ইমাম হচ্ছেঢালস্বরূপ।[৭২]

ইমামতের প্রকার : ইমামাত দুই প্রকার—

- ০১. দ্বীনি বিষয়ে ইমামত, এবং
- ০২. দুনিয়াবি বিষয়ে ইমামত।

০১. দ্বীনি বিষয়ে ইমামত : এটি তো দ্বীনি বিষয়গুলোতেই হয়ে থাকে, যা পরিচালনা করেন আম্বিয়ায়ে কিরাম ও উলামায়ে ইজাম। তারাই ইমামতের সবচেয়ে উঁচু স্থানে আছেন।

০২. দুনিয়াবি বিষয়ে ইমামত : এটি দ্বারা উদ্দেশ্য—জনগণের নেতৃত্ব গ্রহণ ও তাদের দেখাভাল করা ইত্যাদি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم،
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم

'তারাই সবচেয়ে উত্তম শাসক, যাদেরকে তোমরা ভালোবাসো, আর তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে। তারা তোমাদের জন্য দুআ করে, আর তোমারাও তাদের জন্য দুআ করো। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাসক তারা, যাদের তোমরা ঘৃণা করে, আর তারাও তোমাদের ঘৃণা করে। তোমরা তাদের জন্য বদ দুআ করো, তারাও তোমাদের জন্য বদ দুআ করে।'

সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে দ্বীনি ও দুনিয়াবি ইমামত; উভয়কে একসাথে সমন্বয় করা। তাহলে তিনি মানুষকে সত্যের পথও দেখাবেন, সেই সাথে শরিয়তের নির্দেশ মোতাবেক মানুষের জীবনও পরিচালনা করবেন।

০৩. আমিরুল মুমিনিন : এটি আমির ও মুমিনিন এই দুই শব্দের যুক্তরূপ। 'আমির' শব্দটি 'ইমারাত' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'বড়ো হওয়া'। হাদিসে আছে—

لقد أمر أمر ابن أبي كبشة

---

[৭১] সূরা বাকারা, আয়াত: ১২৪

[৭২] বুখারি [illegible]

ইবনু আবি কাবশার বিষয়টা তো (গুরুতর) হয়ে গেল।[৭৩]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন—

من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير
فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني (متفق عليه)

'যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহর অবাধ্যতা করল। আর যে আমিরের আনুগত্য করে, সে আমার আনুগত্য করে। আর যে আমিরের অবাধ্যতা করে, সে আমার অবাধ্যতা করে।'[৭৪]

আর 'মুমিনিন' শব্দটি 'মুমিন' শব্দের বহু বচন। সর্বপ্রথম আমিরুল মুমিনিন বলে নামকরণ করা হয় উমার ইবনুল খাত্তাব রা.-কে। ইবনু আবি শাইবা তার *তারিখুল মাদিনা* গ্রন্থে আব্দুল আজিজ ইবনু ইমরান থেকে (তিনি তার বাবা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে) বর্ণনা করেন—'একদিন উমার রা. সিংহাসনে বসলেন। তিনি বললেন—আমরা কীভাবে বলব, আবু বকর রা. খলিফাতুর রাসুল? এরকম করেই বলব? আর কি কোনো নাম নেই?

উপস্থিত লোকেরা বলল—'আমির' বলা যায়।

তিনি বললেন—সবাই-ই তো আমির।

তখন মুগিরা ইবনু শু'বা বলেন—আমরা হলাম মুমিনিন। আর আপনি আমাদের আমির। সুতরাং, আপনি হলেন আমিরুল মুমিনিন।

তখন উমার রা. বললেন, ঠিক আছে। তাহলে এখন থেকে 'আমিরুল মুমিনিন'।

ইমাম বুখারি রহ. রচিত *আল-আদাবুল মুফরাদে* আছে, উমার ইবনু আবদিল আজিজ রহ. একবার আবু বকর ইবনু সুলাইমান ইবনি হাসমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আবু বকর রা. পত্র লেখার সময় কেন লিখতেন 'আল্লাহর রাসুলের খলিফা আবু বকরের পক্ষ থেকে।' অতঃপর উমার রা. (প্রথম দিকে) লিখতেন 'আবু বকর রা.-এর খলিফা উমার ইবনুল খাত্তাবের পক্ষ থেকে।' আচ্ছা, সর্বপ্রথম 'আমিরুল মুমিনিন' কে লিখেছেন?

তখন আবু বকর ইবনু সুলাইমান বলেন—আমাকে আমার দাদি শিখিয়েছেন, তিনি অগ্রবর্তী মুহাজিরদের জামাআতে শামিল ছিলেন। উমার রা. যখন বাজারে যেতেন, তখন আমার দাদির ঘরে আসতেন। তিনি বলেন—একবার উমার রা. ইরাকের গভর্নরের কাছে পত্র পাঠিয়ে বললেন—তুমি দুজন শক্তিশালী অভিজাত ব্যক্তিকে

---

[৭৩] সহিহ বুখারি, ৭, ওহির প্রারম্ভিকতা অধ্যায়

[৭৪] সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম

আমার কাছে পাঠাও, যাতে করে আমি তাদের ইরাক ও ইরাকের অধিবাসীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করতে পারি।

তখন সেই গভর্নর লাবিদ ইবনু রবিআ ও আদি ইবনু হাতিমকে পাঠালেন। পরে তারা দুজন মদিনায় আগমন করেন এবং মসজিদে নববীর প্রাঙ্গণে উট রেখে মসজিদে প্রবেশ করেন! তারা আমর ইবনু আসকে দেখতে পেয়ে বললেন—তুমি 'আমিরুল মুমিনিন' উমারের কাছে আমাদের জন্য অনুমতি চাও। তিনি তাদের দুজনকে তার কাছে পাঠালেন। তারা উমার রা.-এর সামনে গিয়ে এভাবে সালাম দিল : আসসালামু আলাইকুম, ইয়া আমিরাল মুমিনিন।

তাদের এভাবে সালাম দেওয়ার কারণে উমার রা. জিজ্ঞেস করলেন, কে প্রথম শুরু করেছে এটা, আমর ইবনুল আস, তুমি তাদের অবশ্যই বের করবে। এরপর লাবিদ উবনু রবিআ এবং আদি ইবনু হাতিম এগিয়ে এলেন। তারাও বললেন, আমিরুল মুমিনিনের কাছে আমাদের আসার অনুমতি দেন।

তখন আমি তাদের দুজনকে বললাম—তোমরা ঠিকই বলেছ। তিনি আমাদের আমির, আর আমরা মুমিন। তাই, তিনি হলেন আমিরুল মুমিনিন। তখন থেকেই এভাবে পত্র লেখা শুরু হয়।

০৪. মালিক : (রাজা) এ নামটি জাহিলি যুগ এবং ইসলামি যুগের প্রথম নাম মুলক থেকে নির্গত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ

'আপনি যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে (মুলক) রাজত্ব দান করেন। আবার যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব নিয়ে নেন।'[৭৫]

সুলাইমান আ. এর কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِي

'আর আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন, যা আমার পর আর কারও জন্য অর্জিত হবে না।'[৭৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

বরকতময় ওই মহান সত্তা, যার হাতে রয়েছে রাজত্ব।'[৭৭]

'মালিক' শব্দের বহুবচন 'মুলক'। আল্লাহ তাআলা বলেন—

[৭৫] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১২৬

[৭৬] সূরা সোয়াদ, আয়াত: ৩৫

[৭৭] সূরা মুলক, আয়াত: ১

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً

'রাজারা যখন জনপদে প্রবেশ করে।'[৭৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ

'আর ওই সময়কে স্মরণ করো, যখন মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, হে কওম, তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদের মাঝ থেকে নবীদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে রাজত্বের অধিপতি বানিয়েছেন। আর তোমাদেরকে এমন সব নিয়ামত দান করেছেন, যা বিশ্ববাসীর মধ্য হতে (তোমাদের পূর্বে) আর কাউকে দেননি।'[79]

'মুলক' শব্দের অর্থ নেতৃত্ব ও ক্ষমতা। কেউ কেউ বলেন, 'মালিক' শব্দটি 'মিলক' থেকে এসেছে, যার অর্থ মালিক হওয়া।

০৫. রাইস : এসেছে রিয়াসাত থেকে। বলা হয় 'রায়িসুল কউম', মানে কোনো সম্প্রদায়ের ব্যবস্থাপক ও নীতিনির্ধারক। সুতরাং, এই শব্দটি ব্যাপক। ইমামকেও বলা যেতে পারে, আবার অন্যকেও। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا اتَّخذ الناس رؤوسًا جهالاً، فسُئِلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا))؛ متفق عليه.

'আল্লাহ তাআলা বান্দাদের অন্তর থেকে ইলম মুছে দিয়ে তুলে নেবেন না। বরং, আলিমদের তুলে নেওঃয়ার মাধ্যমে ইলম তুলে নেবেন। এভাবে যখন কোনো আলিমকে অবশিষ্ট থাকবে না, তখন মানুষ জাহিলদের রাইস বা প্রধান বানাবে। তাদের কাছে কিছু জানতে চাইলে তারা না-জেনে ফতোয়া দেবে। এভাবে নিজেরাও ভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরও ভ্রষ্ট করে ছাড়বে।'[৮০]

০৬. সুলতান : কুরআনে কারিমে আছে—

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

---

[৭৮] সূরা নামল, আয়াত: ৩৪

[৭৯] সূরা মায়িদা, আয়াত: ২০

[৮০] সহিহ বুখারি, ১০০

'নিঃসন্দেহে, তার কোনো ক্ষমতা নেই ওই ব্যক্তিদের ওপর, যারা ঈমান আনে আর তাদের প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে।'[৮১]

ইমাম জাওহারি বলেন—সুলতান অর্থ শাসক। আর *মুসতাওইব* গ্রন্থের লেখক বলেন—সুলতান মানে ইমাম। সুলতান শব্দটি সালতানাত থেকে নির্গত, যার অর্থ রাজত্ব। কেউ কেউ বলেন—এর অর্থ ক্ষমতা ও বিজয়। এ অর্থেই আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

'নিঃসন্দেহে, তার কোনো ক্ষমতা নেই ওই ব্যক্তিদের ওপর, যারা ঈমান আনে আর তাদের প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে।

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ

তার ক্ষমতা তো শুধু তাদের ওপর, যারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, আর আল্লাহর সাথে শরিক করে।'[৮২]

০৭. হাকিম : এই শব্দটি 'হুকুম' ধাতু থেকে এসেছে। যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে হুকুম আরোপ করে, তাকেই 'হাকিম' বলা হয়। সুতরাং, এটাও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইমামকেও বলা হয়, আবার অন্যকেও বলা হয়। তবে বেশি ব্যবহৃত হয় বিচারকের ক্ষেত্রে। হুকুমের মূল অর্থ কাউকে জুলুম থেকে বাধা দেওয়া।

০৮. ওলি : এই শব্দটিও ব্যাপক। ইমাম, গাইরে ইমাম সবার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। এই শব্দটি কুরআনে কারিমেও এসেছে—

وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

(আর নির্দেশ মেনে নাও রাসুলের) এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের।[৮৩]

এই নামগুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নাম আমিরুল মুমিনিন। খুলাফায়ে রাশিদার তিনজনকে, বনু উমাইয়া, বনু আব্বাস ও উসমানিদের আমিরুল মুমিনিন বলা হতো। অনুরূপ ইসলামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকেও আমির বলা হতো।

***

পতাকা ও ঝান্ডা

পতাকার প্রকার

(আরবিতে পতাকা বা ঝান্ডার জন্য দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয় (اللواء) ও (والراية), তবে বাংলায় পার্থক্য না থাকলেও আরবিতে কখনো কখনো পার্থক্য করা হয়। যেমন) সুলতানের পতাকাকে বলা হয় (اللواء), আর (والراية) বলা হয় যুদ্ধের কমান্ডারের পতাকাকে। যার অধীনে একদল লোক একসাথে থাকে।

তারহিত তাসরিব ফি শরহিত তাকরিব গ্রন্থে আছে, (والراية) লাম বর্ণে জের-সহ যে অর্থ প্রকাশ করে, তা হলো, এটি এমন চিহ্ন (পতাকা), যা যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়, যাতে বাহিনীর গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য রাখা যায়। আর এই পার্থক্য সম্ভবত প্রচলন হিসাবে। দেখা যায়, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও দুটো পতাকা ছিল। একটিকে (اللواء) এবং অপরটিকে (والراية) বলা হতো। সুতরাং, মানুষের ব্যবহারিক হিসাবের জন্য একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করা হয়, যদিও আভিধানিকভাবে উভয়টির অর্থই এক।

পতাকার রং

মুসলিমদের যুদ্ধ কমান্ডারের পতাকা হবে সাদা, আর সুলতানের পতাকা হবে কালো। বিভিন্ন হাদিসে এমনই এসেছে। রাশিদ ইবনু সাদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিগত (সাধারণ নেতৃত্বের) পতাকা সাদা ছিল, আর যুদ্ধ কমান্ডের পতাকা কালো ছিল।[৮৪]

যুদ্ধের পতাকা কালো হওয়া উত্তম। কারণ কালো রং যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক দল নিজেদের নির্দিষ্ট পতাকাতলে যুদ্ধে করে। পরবর্তী সময়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তারা সহজেই নিজেদের পতাকাতলে ফিরে আসতে পারে। কারণ, দিনের বেলায় কালো রং বেশি ফুটে থাকে; বিশেষ করে যুদ্ধের ময়দানে বিক্ষিপ্ত ধুলোবালির মাঝে। এ কারণেই কালো হওয়া উত্তম বলা হয়েছে। তবে শরিয়তের বিচারে কোনো

বাধ্যবাধকতা নেই। সাদা, লাল, হলুদ যেমন ইচ্ছা হতে পারে।[৮৭]

নেতৃত্বের পতাকার ক্ষেত্রে সাদা রং উত্তম। কারণ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> إن أحب الثياب عند الله تعالى البيض يلبسها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم
>
> 'আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় কাপড় হলো সাদা কাপড়। সুতরাং, সাদা কাপড় তোমরা জীবিতরা পরো, আর তোমাদের মৃতদেরও কাফন দাও।'

বাহিনীতে সাদা একটাই থাকবে, যেখানে সুলতান থাকেন; যাতে প্রয়োজনের সময় তারা সহজেই সুলতানের কাছে আসতে পারে। এ কারণে এখানে সাদা পতাকা হওয়া ভালো। যাতে সেনাপতিদের কালো পতাকা থেকে সেটাকে সহজেই পৃথক করা যায়।

শরিয়তে রঙের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কারণ, একেক হাদিসে একেক রঙের এর কথা এসেছে, যেমন—

০১. সুনানু আবি দাউদে আছে :

> رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء
>
> 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পতাকা হলুদ দেখেছি।'

০২. ইবনু আসিম প্রণীত *কিতাবুল জিহাদে* রয়েছে :
'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। তখন আনসাররা পতাকা বাঁধলেন, আর সেটা ছিল হলুদ।'

০৩. আরেকটি হাদিসে আছে, কারজ ইবনু উসামা বলেছেন—নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু সালিমের পতাকা লাল বানিয়েছেন।

০৪. ইবনু জামাআ বলেন—নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পতাকা ধূসর ছিল। তিনি আরও বলেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি কালো পতাকা ছিল, যা সাদাকালো ডোরাকাটা মসৃণ কাপড়ের চর্তুকোণবিশিষ্ট। সুতরাং, পতাকায় সব ধরনের রঙ দেওয়া যাবে, তবে নেতৃত্ব ও আমিরের ক্ষেত্রে উত্তম সাদা, আর যুদ্ধের ক্ষেত্রে উত্তম কালো।

পতাকার ওপর কী লেখা হবে?

ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধের পতাকা কালো ছিল, আর সাধারণ নেতৃত্বের পতাকা সাদা ছিল।

[৮৭] প্রাগুক্ত

[৮৮] প্রাগুক্ত

সেখানে লেখা ছিল : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।[৮৩]

মোটকথা, পতাকার রং, ধরন, পরিমাপ, তার ওপর কী লেখা হবে—এগুলো সব যুগের প্রচলন হিসাবে হবে। তবে হাদিসে যেভাবে বর্ণিত আছে, সেভাবেই উত্তম। মুসলিমদের কর্তব্য হলো—তারা ওই সব চিহ্ন পরিহার করবে, যেগুলো কাফিররা ব্যবহার করে।

মোল্লা আলি কারি রহ. তার প্রখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ *মিরকাতে* 'যে কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের মধ্য থেকেই গণ্য হবে'—এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন—'যে কাফিরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে; যেমন: পোশাক-পরিচ্ছদে, কিংবা ফাসিক-ফাজিরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, অথবা নেককারদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে; তাহলে সে তাদের মধ্য হতে গণ্য হবে। অর্থাৎ, গুনাহ বা সাওয়াবের ক্ষেত্রে।

আল্লামা কারি রহ. আরও বলেন—'এই সাদৃশ্য অবলম্বন ব্যাপক; চাই চারিত্রিকভাবে হোক, কিংবা বৈশিষ্ট্যগতভাবে।

তিনি একটি অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক ঘটনাও উল্লেখ করেছেন—আল্লাহ তাআলা যখন ফিরাউন ও তার গোষ্ঠীকে পানিতে ডুবিয়ে দেন, তখন তার এক দাস ও অনুচরকে ডুবিয়ে দেন নি। সেই দাস চলনে-বলনে ও পরনে মুসা আলাইহিস সালামের অনুকরণ করত তাকে উপহাস করার জন্য। আর ফিরাউন ও তার সভাসদবর্গ তার আচরণ ও চলাফেরা দেখে হাসি-ঠাট্টায় মেতে উঠত! (ওই লোকটির পানিতে না ডোবার কারণে) মুসা আ. আল্লাহ তাআলাকে বললেন—হে আমার রব, এ তো সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিত।

আল্লাহ তাআলা তাকে বললেন—আমি তাকে ডুবিয়ে দিই নি। কারণ, সে তোমার মতো পোশাক পরেছিল। আর আল্লাহ তাকে কষ্ট দেন না, যে তাঁর প্রেমাস্পদের মতো।

লক্ষ্য করেন—খারাপ ইচ্ছা পোষণ করেও যদি কেউ আহলে হকের সাদৃশ্য অবলম্বন করে, বাহ্যত দুনিয়াবি আজাব থেকে মুক্তি পায়; তাহলে যে খাঁটি নিয়তে, সত্যিকার অর্থেই আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুসরণ করবে, তার অবস্থা কেমন হবে?[৮৪]

***
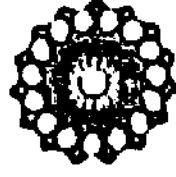
আমির বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন

রাষ্ট্রপ্রধান কাকে বলে?

রাষ্ট্রপ্রধান বা ইমামতে কুবরা বলা হয় ব্যাপক নেতৃত্বকে; যার লক্ষ্য দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। আর তা হতে পারে সামনে লিখিত বিষয়াবলি দ্বারা—

- ০১। দ্বীনি ইলমের শাখা-প্রশাখা প্রাণবন্ত রাখা;
- ০২। ইসলামের রুকনসমূহকে সমুজ্জ্বল রাখা;
- ০৩। জিহাদ কায়েম করা;
- ০৪। বাহিনীকে সুবিন্যস্ত রাখা;
- ০৫। মুজাহিদদের খরচ দেওয়া;
- ০৬। তাদেরকে 'ফাই' (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) দেওয়া;
- ০৭। আদালতের ব্যবস্থা করা;
- ০৮। হদ কায়েম করা;
- ০৯। জুলুম-নির্যাতন দূর (বন্ধ) করা;
- ১০। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা।

আর এগুলো যখন করা হবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে নায়েব হয়ে, তখনই সেটা হবে ইমামতে কুবরা।[৮৯]

আল্লামা তাফতাজানি রহ. ইমামতে কুবরার পরিচয় দিয়েছেন এভাবে—'ইমামতে কুবরা হচ্ছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলিফা হয়ে দ্বীনি ও দুনিয়াবি উভয় বিষয়াদিতে ব্যাপকভাবে ক্ষমতা অর্জন।'[৯০]

নির্বাচনের গুরুত্ব

রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শরিয়তের বহু ফরজ বিষয় রাষ্ট্রপ্রতি নির্বাচনের ওপর নির্ভরশীল। আর মূলনীতি হলো—ফরজ বা ওয়াজিব যার ওপর নির্ভরশীল, সেটা ওয়াজিব। সুতরাং, রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করাও ওয়াজিব। এ কারণেই 'আকায়াদে নাসাফিয়্যাতে' বলা হয়েছে—মুসলিমদের জন্য এমন একজন

খলিফা থাকা আবশ্যক, যিনি—

০১. মুসলিমদের বিধিবিধান কার্যকর করবেন;
০২. হদ কায়েম করবেন;
০৩. সীমান্ত পাহারা দেবেন;
০৪. সেনাবাহিনী প্রস্তুত করবেন;
০৫. জাকাত উসুল করবেন;
০৬. চোর, ডাকাত ও শত্রুদের দমন করবেন;
০৭. জুমুআ ও ঈদের নামাজের ব্যবস্থা করবেন;
০৮. বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন;
০৯. ছোটো এবং ইয়াতিমদের বিবাহ করাবেন;
১০. গনিমত বণ্টন করবেন।

এজন্যই সাহাবায়ে কিরাম খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি সাইয়িদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাফনের পূর্বে সম্পন্ন করেছিলেন। তাই যদি কারও মধ্যে খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার সমস্ত যোগ্যতা পরিপূর্ণভাবে থাকে, তাহলে সে শরিয়ত-বিবেচিত রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার নির্বাচন শরয়ি পদ্ধতিতে হয়।

নির্বাচনের শরয়ি পদ্ধতি

কুরআন-হাদিসে নির্বাচনের পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে নেই। সেখানে শুধু নেতৃত্ব সম্পর্কে ব্যাপকভাবে কিছু বিষয় উল্লেখ করা আছে। এ কারণে খুলাফায়ে রাশিদা যে পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন, আমাদেরকে এখন সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে। কারণ, আমরা বিশ্বাস করি, এই পদ্ধতিগুলোই শরয়ি পদ্ধতি। আমাদের বক্তব্যের দলিল—

০১. ইরবাজ ইবনু সারিয়া রা.-এর হাদিস

তিনি বলেন—একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নামাজ পড়িয়ে বেশ আবেগপূর্ণ ভাষায় ওয়াজ করলেন। যার ফলে আমাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরেছে, হৃদয় প্রকম্পিত হয়েছে। সেসময় সেখানে উপস্থিত একজন বলল—

> 'আল্লাহর রাসুল, মনে হচ্ছে, এটি বিদায়ের ভাষণ। তো, আপনি আমাদেরকে আর কীসের আদেশ করবেন?'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

> আমি তোমাদের অসিয়ত করছি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার, আমিরের কথা শোনার এবং তার আনুগত্য করার, যদিও সে হাবশি গোলাম হয়। তোমাদের মধ্য থেকে যে আমার পরে বেঁচে থাকবে, সে অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাহ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাহ আঁকড়ে ধোরো। তোমরা সেই সুন্নাহ দাঁত দিয়ে কামড়ে ধোরো। তোমরা প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থেকো। কারণ, প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত, আর বিদআতের পরিণাম ভ্রষ্টতা।[৯১]

সুতরাং, এখানে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, তার সুন্নাহ এবং খুলাফায়ে রাশিদার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার, যা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। আর খুলাফায়ে রাশিদার একটি সুন্নাহ হলো খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি।

ইবনু রজব হাম্বলি রহ. বলেন—এখানে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে শাসকদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন, তারপর আলাদাভাবে তার সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশিদার সুন্নাহ অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই বিষয়ে এটাই একটি বড়ো দলিল যে, শুধু খুলাফায়ে রাশিদার সুন্নাহ নবীজির সুন্নাহর পর অবশ্য পালনীয়। পক্ষান্তরে, পরবর্তী অন্যান্য শাসকদের কথা ভিন্ন।[৯২]

০২. হুজাইফা রা.-এর হাদিস

তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন—

> إني لا أدري ما بقى فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي
>
> 'আমি জানি না, আর কতদিন তোমাদের মাঝে বাকি থাকবে। সুতরাং, তোমরা আমার পর যে দুজন আছে, তাদের অনুসরণ করো।'

দুজন বলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর ও উমার রা. এর দিকে ইশারা করেছেন।[৯৩]

০৩. ইজমা

ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে—ইজমা বা উলামায়ে উম্মাতের একমত হওয়াও একটি শরয়ি দলিল। আর সেই ইজমা যদি সাহাবায়ে কিরামের ইজমা হয়, খাইরুল কুরুনের প্রথম যুগে হয়, তাহলে কত শক্তিশালী ইজমা হবে! কারণ, খুলাফায়ে

---

[৯১] সুনানে আবু দাউদ, ৪৬০৬

[৯২] জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম, ২৪৯

[৯৩] জামি তিরমিযি, ৩৬৬০

রাশিদার যুগেই ইসলাম পরিপূর্ণভাবে কার্যকর ও বাস্তবায়িত হয়েছিল। তারাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থেকে জিহাদ করেছেন, নিজেদের জান-মাল আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করেছেন, সেই সাথে ওহি নাজিলের প্রত্যেকটি সময়ে তারা উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং, তাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ইজমা শরয়ি দলিল হওয়াতে কী বাধা আছে?

***
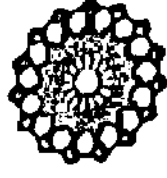
খুলাফায়ে রাশিদার নির্বাচনের পদ্ধতি

আবু বকর রা. এর নির্বাচন

ইমাম বুখারি রহ. উমার ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে অনেক বড়ো একটি হাদিস বর্ণনা করেন। যার একাংশ এমন, উমার রা. বলেন—

> যখন আল্লাহ তাঁর নবীকে মৃত্যু দিলেন, তখন আবু বকর রা. ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অবশ্য আনসারগণ আমাদের বিরোধিতা করেছেন। তারা সকলে বনু সায়িদার চত্বরে মিলিত হয়েছেন। আমাদের থেকে বিমুখ হয়ে আলি, জুবাইর ও তাদের সাথিরাও বিরোধিতা করেছেন। অপরদিকে, মুহাজিরগণ আবু বকরের কাছে সমবেত হলেন। তখন আমি আবু বকরকে বললাম—আবু বকর, একটা কাজ করেন, আমাদের নিয়ে আমাদের ওই আনসার ভাইদের কাছে চলেন।
>
> তিনি তাই করলেন। আমরা তাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যখন আমরা তাদের নিকটবর্তী হলাম, তখন আমাদের সঙ্গে তাদের দুজন পুণ্যবান ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলো। তারা উভয়েই এ বিষয়ে আলোচনা করলেন, যে বিষয়ে লোকেরা ঐকমত্য করছিল। এরপর তারা জিজ্ঞেস করলেন—হে মুহাজির দল, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?
>
> তখন আমরা বললাম—আমরা আমাদের ওই আনসার ভাইদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি।
>
> তারা বললেন—না, আপনাদের তাদের নিকট না যাওয়াই উচিত। আপনারা আপনাদের বিষয় সমাপ্ত করে নেন।
>
> তখন আমি বললাম—আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাদের কাছে যাব। আমরা যেতে শুরু করলাম। অবশেষে বনু সায়িদার চত্বরে তাদের কাছে এলাম। আমরা দেখতে পেলাম, তাদের মাঝখানে এক লোক বস্ত্রাবৃত

অবস্থায় রয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম—ওই লোকটি কে?

তারা জবাব দিল—তিনি সাদ ইবনু উবাদাহ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তার কী হয়েছে? তারা বলল, তিনি জ্বরে আক্রান্ত।

আমরা কিছুক্ষণ বসার পরই তাদের খতিব উঠে দাঁড়িয়ে কালিমায়ে শাহাদাত পড়লেন এবং আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন—অতঃপর আমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী ও ইসলামের সেনাদল এবং তোমরা, হে মুহাজির দল, একটি ছোটো দল মাত্র, যে দলটি তোমাদের গোত্র থেকে আলাদা হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। অথচ এরা এখন আমাদের মূল থেকে সরিয়ে দিতে এবং খিলাফত থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছে।

যখন তিনি নিশ্চুপ হলেন, তখন আমি কিছু বলার ইচ্ছে করলাম। আর আমি আগে থেকেই কিছু কথা সাজিয়ে রেখেছিলাম, যা আমার কাছে ভালো লাগছিল। আমি ইচ্ছে করলাম, আবু বকর রা.-এর সামনে কথাটি পেশ করব। আমি তার ভাষণ থেকে সৃষ্ট রাগকে কিছুটা ঠান্ডা করতে চাইলাম। আমি যখন কথা বলতে চাইলাম, তখন আবু বকর রা. বললেন—তুমি থামো। আমি তাকে রাগান্বিত করাটা পছন্দ করলাম না। তাই, আবু বকর রা. কথা বললেন। আর তিনি ছিলেন আমার চেয়ে সহনশীল ও গম্ভীর। আল্লাহর কসম! তিনি এমন কোনো কথা বাদ দেন নি, যা আমি সাজিয়ে রেখেছিলাম। অথচ তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ওই রকম, বরং তার থেকেও উত্তম কথা বললেন। অবশেষে তিনি কথা বন্ধ করে দিলেন। এরপর আবার বললেন—তোমরা তোমাদের ব্যাপারে যেসব উত্তম কাজের কথা বলেছ, আসলে তোমরা এর উপযুক্ত। তবে খিলাফতের ব্যাপারটি কেবল এই কুরাইশ বংশের জন্য নির্দিষ্ট। তারা হচ্ছে বংশ ও আবাসভূমির দিক দিয়ে সর্বোত্তম আরব। আর আমি এই দুজন হতে যেকোনো একজনকে তোমাদের জন্য নির্ধারিত করলাম। তোমরা যেকোনো একজনের হাতে ইচ্ছামতো বাইআত করে নাও। এরপর তিনি আমার ও আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.-এর হাত ধরলেন। তিনি আমাদের মাঝখানেই বসা ছিলেন। আমি তার এ কথা ব্যতীত, যত কথা বলেছেন কোনোটাকে অপছন্দ করি নি। আল্লাহর কসম! আবু বকর যে জাতির মধ্যে বর্তমান আছেন, সে জাতির ওপর আমি শাসক নিযুক্ত হওয়ার চেয়ে এটাই শ্রেয় যে, আমাকে পেশ করে আমার ঘাড় ভেঙে দেওয়া হবে। ফলে তা আমাকে কোনো গুনাহের কাছে নিয়ে যেতে পারবে না। হে আল্লাহ, হয়তো আমার

আত্মা আমার মৃত্যুর সময় এমন কিছু আকাঙ্ক্ষা করতে পারে, যা এখন আমি পাচ্ছি না।

তখন আনসারদের এক ব্যক্তি বলে উঠল—আমি এ জাতির অভিজ্ঞ ও বংশগত সম্ভ্রান্ত। হে কুরাইশ, আমাদের হতে হবে এক আমির, আর তোমাদের হতে হবে এক আমির।

এ সময় অনেক কথা ও হইচই শুরু হয়ে গেল। আমি এ মতবিরোধের দরুন শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। তাই আমি বললাম—আবু বকর, আপনি হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়ালেন। আমি তার হাতে বাইআত করলাম। মুহাজিরগণও তার হাতে বাইআত করলেন। অতঃপর আনসারগণও তার হাতে বাইআত করলেন। আর আমরা সাদ ইবনু উবাদাহ রা.-এর দিকে এগিয়ে গেলাম।

তখন তাদের এক লোক বলে উঠল—তোমরা সাদ ইবনু উবাদাহকে জানে মেরে ফেলেছ।

তখন আমি বললাম—আল্লাহ সাদ ইবনু উবাদাহকে শেষ করে দিয়েছেন।

উমার রা. বলেন—আল্লাহর কসম! আমরা সে সময়ের জরুরি বিষয়ের মধ্যে আবু বকরের বাইআতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছুকে মনে করি নি। আমাদের আশঙ্কা ছিল, যদি বাইআতের কাজ সম্পন্ন না করেই আমরা আনসারদের থেকে আলাদা হয়ে যাই, তাহলে তারা আমাদের পরে তাদের কারও হাতে বাইআত করে নেবে। তারপর হয়তো আমাদের নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের অনুসরণ করতে হতো, না হয় তাদের বিরোধিতা করতে হতো। ফলে তা মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াত। অতএব, যে ব্যক্তি মুসলিমদের পরামর্শ ছাড়া কোনো ব্যক্তির হাতে বাইআত করবে, তার অনুসরণ করা যাবে না। আর ওই লোকেরও অনুসরণ করা যাবে না, যে তার অনুসরণ করবে। কেননা, উভয়েরই নিহত হওয়ার আশঙ্কা আছে।[১৪]

এই হচ্ছে প্রথম বাইআত। আবু বকর রা.-এর হাতে মুহাজির-আনসারদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের বাইআত। তারপর আরেকবার বাইআত অনুষ্ঠিত হয়, যা মসজিদের মিম্বারে ব্যাপকভাবে সবার জন্য হয়েছিল।

প্রথম বাইআত ছিল নেতৃত্বগ্রহণের বা আমির হওয়ার বাইআত। আর দ্বিতীয়টি আনুগত্যের বাইআত। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, নেতৃত্ব গ্রহণ বা আমির

---

[১৪] সহিহ বুখারি : ৬৮৩০

হওয়ার জন্য গণ্যমান্য ও বড়ো বড়ো ব্যক্তিদের বাইআতই যথেষ্ট। তারাই সবকিছুর সমাধান করবেন, সেখানে সাধারণদের উপস্থিতি শর্ত নয়।

উপরে বলা হয়েছে, প্রথম বাইআতই নেতৃত্বগ্রহণের বাইআত ছিল। এর দলিল হলো, ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিস। তিনি বলেন—'আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের দায়িত্বভার আবু বকর রা. এর কাঁধে দিয়ে দিয়েছেন।'[৯৮]

উমার ইবনুল খাত্তাব রা. এর নির্বাচন

উমার রা. এর নির্বাচন ছিল অন্য পদ্ধতিতে। যখন আবু বকর রা. এর অসুস্থতা গুরুতর হয়ে গেল, তিনি তখন লোকদেরকে কাছে ডাকলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন—

> 'তোমরা তো আমার অবস্থা দেখতেই পাচ্ছো। আমি হয়তো খুব শীঘ্রই এ অসুস্থতার দরুন মৃত্যুবরণ করবো। অতএব, আল্লাহ তাআলা তোমাদের কৃত প্রতিশ্রুতিকে বাইআত মুক্ত করে দিয়েছেন। তোমাদের সাথে আমার করা চুক্তি তুলে দিয়েছেন, তোমাদের দায়িত্বভার তোমাদের কাছেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং, তোমাদের যাকে ইচ্ছা তাকে আমির বানাও। আর এটা আমার জীবদ্দশাতেই হওয়া ভালো। তাহলে, আমার পর আর বিরোধিতা সৃষ্টি হবে না।'

তখন সাহাবায়ে কিরাম পরস্পর আলাপ-আলোচনা করলেন। দেখা গেল, প্রত্যেকেই নিজে আমির না হয়ে তার অপর ভাইকে আমির বানাতে চাচ্ছে, যদি তার মাঝে যোগ্যতা দেখা যায়। তাই, তারা শাসনভারের বিষয়টি আবু বকর রা. এর হাতে সোপর্দ করে বললেন—'হে রাসুলের খলিফা, আমরা আপনার সিদ্ধান্ত চাচ্ছি।'

আবু বকর রা. বললেন—'তাহলে আমাকে কিছু সময় দাও, যাতে আল্লাহর জন্য, তাঁর দ্বীনের জন্য এবং তাঁর বান্দাদের জন্য চিন্তা করতে পারি (যে কাকে আমির বানানো যায়)।'

পরে আবু বকর সিদ্দিক আব্দুর রহমান ইবনু আউফকে ডেকে উমার রা. সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন—'আপনি আমার কাছে যা-ই জানতে চাইবেন, তার সবই তো আমার থেকে বেশ ভালো জানেন।'

আবু বকর রা. বললেন—'তবুও!'

তখন আব্দুর রহমান রা. বললেন—'আপনি যাদের ভালো মনে করেন, তিনি তো তাদের সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ।'

---

[৯৮] মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ৩৭০৪৩

তারপর উসমান ইবনু আফফান রা.-কে ডেকে উমার রা. সম্পর্কে জানতে চাইলেন। উসমান রা. বললেন—'আপনি তো তার সম্পর্কে আমার চাইতেও ভালো জানেন।'

আবু বকর রা. বললেন—'তবুও তুমি তোমার মতটা বলো!'

তখন উসমান রা. বললেন—'হায় আল্লাহ! আমার জানামতে তার প্রকাশ্য অবস্থা থেকে অপ্রকাশ্য অবস্থা উত্তম। আমাদের সাথে তার কোনো তুলনাই হয় না!'

তখন আবু বকর রা. বললেন—'আল্লাহ তোমার ওপর রহম করেন! যদি আমি তাকে খলিফা নাও বানাই, তাহলে তোমাকে বশ্যই বানাবো।'

তারপর উসাইদ ইবনু হুজাইর রা.-কে ডেকে অনুরূপ কথা বললেন, তখন উসাইদ রা. বললেন—'হায় আল্লাহ! আমি তো তাকে আপনার পর সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি বলে মনে করি। যেখানে সন্তুস্ট থাকতে হয়, তিনি সেখানে সন্তুষ্ট হন। যেখানে রুষ্ট হতে হয়, সেখানে তিনি রুস্ট হোন। তিনি প্রকাশ্যে যা করেন, তার চেয়ে অনেক ভালো করেন অপ্রকাশ্যে। এই খিলাফতের দায়িত্বভার শুধু তিনিই নিতে পারেন।'

এভাবে আবু বকর রা. সাদ ইবনু জায়িদ-সহ অনেক মুহাজির-আনসার সাহাবিদের কাছেই পরামর্শ চাইলেন। তাদের সবাই উমার রা. সম্পর্কে প্রায়ই একই মন্তব্য করলেন, শুধু তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ রা. উমার রা.-এর কঠোরতায় সংকিত হয়ে বললেন—যখন আপনাকে আপনার রব জিজ্ঞাসা করবেন, উমারের কঠোরতা সত্ত্বেও তুমি কেন তাকে খলিফা বানালে, তখন আপনি কী উত্তর দেবেন?

আবু বকর রা. বললেন—আমাকে একটু বসাও। তোমরা কি আমাকে আল্লাহর কথা বলে ভয় দেখাচ্ছ? শাসন-ব্যবস্থায় যেই জুলুম করবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি বলছি, আর আল্লাহ আপনি সর্বোত্তম ব্যক্তিকে মুসলিমদের আমির বানান। আবু বকর রা. সবার সামনে উমার রা.-এর কঠোরতার কারণ বর্ণনা করে বলেন—আমি খুব নরম ও সরল ছিলাম বলে, সে কঠোর ছিল। অন্যথায় যদি সে নিজেই শাসনভার গ্রহণ করত, তাহলে এখন তোমরা যা অন্য রকম দেখছ, তার সবকিছুই সে ছেড়ে দিত।[৮৮]

অসিয়তনামা

অতঃপর আবু বকর রা. জনগণের উদ্দেশ্যে একটি অসিয়তনামা লিখলেন, যা নিম্নরূপ—

> **বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।**
> **আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু,**
> **দুনিয়ায় শেষ মুহূর্তে, আখিরাতে যাত্রার প্রথম সময়ে আবু বকর ইবনু কুহাফা**

[৮৮] মাউসুআতুস সিয়ার, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৮০

এই অসিয়তনামা লিখছেন। এটা এমন একটি মুহূর্ত—যখন কাফিরও ঈমান আনতে চায়, ফাসিকও ভালো হয়ে যেতে চায়, মিথ্যুকও সত্য বলতে চায়। আমি এখন তোমাদের জন্য আমার পরবর্তী খলিফা উমার ইবনুল খাত্তাব রা.-কে বানিয়েছি। সুতরাং, তোমরা তার কথা শোনো এবং তাকে মান্য করো। আর আমি আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসুলের জন্য, তাঁর দ্বীনের জন্য এবং আমার ও তোমাদের জন্য কল্যাণ ছাড়া আর কোনোটারই ইচ্ছা করি নি। এখন যদি উমার ইনসাফ করে তাহলে তো এটা তার সম্পর্কে আমার সুধারণা ও পূর্বজ্ঞান: কিন্তু যদি ইনসাফের পরিবর্তে অন্য কিছু করে, তাহলে শুনে রাখো—প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের কর্মের ফল পাবে। তবে আমি কল্যাণটাই চেয়েছি, গায়েবের খবর তো আমার জানা নেই। 'জালিমরা অতিসত্বরই জানতে পারবে, কোন স্থানে তারা প্রত্যাবর্তন করবে।'[৯৭]

তিনি যখন এই অসিয়তনামা লিখে সম্পন্ন করলেন, তখন জনগণের সামনে তা পাঠ করে শোনাতে বললেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সবাইকে ডাকলেন আর অসিয়তনামা তার আজাদকৃত গোলামকে দিলেন। তার সাথে উমার রা.-ও ছিলেন। তখন উমার রা. সবাইকে বললেন—'তোমরা আল্লাহর রাসুলের খলিফার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং মান্য করো। কারণ, তিনি তোমাদের কল্যাণকামিতায় কোনো ত্রুটি করেন না।'

তখন সবাই স্থির হলো। পরে যখন উক্ত অসিয়তনামা জনগণকে পড়ে শোনানো হলো, তখন তারা বিষয়টি মেনে নিল। আবু বকর রা. তখন সামনে এসে বললেন, 'আমি যাকে তোমাদের জন্য খলিফা বানিয়েছি, তোমরা তাকে মেনে নিচ্ছ? দেখো, আমি নিজের কোনো আত্মীয়কে তোমাদের খলিফা বানাই নি; বরং, উমারের মতো ব্যক্তিকে খলিফা বানিয়েছি। সুতরাং, তোমরা তার কথা শোনো এবং মান্য করো। কারণ, আমি তোমাদের কল্যাণ সাধনে প্রাণপণ চেষ্টা করেছি।'

তখন সবাই বলল—'আমরা শুনলাম ও মানলাম।'

তারপর আবু বকর রা. উমার রা.-কে উপস্থিত করে বললেন—'দেখো, আমি তোমাকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবায়ে কিরামের আমির বানালাম!' তিনি তাকে তাকওয়ার অসিয়ত করলেন। তারপর বললেন—'দেখো, উমার, আল্লাহ তাআলার কিছু হক আছে রাতের, যা তিনি দিনে কবুল করেন না। আবার কিছু হক আছে দিনের, যা রাতে আদায় করলে কবুল করেন না। তদ্রূপ ফরজ আদায়ের আগ পর্যন্ত কোনো নফল ইবাদাতও কবুল করেন না। তুমি তো জানো, কিয়ামতের দিন যাদের নেক আমলনামার পাল্লা ভারী হবে, তা শুধু হককে অনুসরণ করার কারণেই ভারী হবে। সেদিন যে আমলনামায় হক থাকবে,

---

[৯৭] সূরা শুআরা, আয়াত: ২২৭; ইবনে আবি শাইবা, তারিখুল মাদিনা

সে আমলনামা ভারী হওয়া অপরিহার্য। তুমি এটাও জানো, যাদের আমলনামার পাল্লা হালকা হবে, তা শুধু বাতিলকে অনুসরণ করার কারণেই হালকা হবে। তুমি কি জানো না যে, কুরআন কঠোরতার সাথে নমনীয়তার কথাও বলেছে। আবার নমনীয়তার সাথে কঠোরতার কথাও বলেছে, যাতে মুমিন ভয় ও আশার মাঝে থাকে। এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ তাআলার কাছে এত আশা রাখে, যার যোগ্যতা তার নেই। আবার এত ভয়ও যেন না পায় যে, সে তার ভয়ের মাঝেই মারা যাবে।

দেখো উমার, তুমি তো জানো, আল্লাহ তাআলা জাহান্নামিদের কথা আলোচনা করেছেন, তাদের বদ আমলগুলো উল্লেখ করেছেন। তাদের কথা মনে পড়লে ভয় হয়। না-জানি আমিও তাদের একজন হয়ে যাই। আবার, জান্নাতবাসীর কথা আলোচনা করেছেন, তাদের উত্তম আমলগুলো উল্লেখ করেছেন। কারণ, তাদের গুনাহগুলো তিনি মাফ করে দিয়েছেন। তাদের আলোচনা যখন স্মরণে আসে, তখন ভাবতে থাকি, তাদের আমল কোথায় আর কোথায় আমার আমল?

এখন তুমি যদি আমার অসিয়ত রক্ষা করো, তাহলে আশা করছি তুমি তাদের মধ্যে হবে না, যাদের উপস্থিতির চেয়ে মৃত্যুই পছন্দ করে সাবই।[৯৮]

পরে উসমান রা. আবু বকর রা. এর মৃত্যুর আগেই উমার রা. এর জন্য জনগণ থেকে বাইআত নিয়ে নেন, যাতে বিষয়টি সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং কোনো প্রকার জোর-জবরদস্তি ছাড়াই এর ফায়সালা হয়ে যায়।[৯৯]

উসমান ইবনু আফফান রা. এর নির্বাচন

উমার ফারুক রা. যখন মৃত্যুশয্যায় খলিফা নির্বাচন করতে চাইলেন, তখন বললেন—দেখো, যদি আমি খলিফা নির্বাচন না করি, আদতে তাতে কোনো আপত্তি নেই। কারণ, আমার থেকে উত্তম ব্যক্তি আবু বকর রা. খলিফা নির্বাচন ছাড়াই রেখে চলে গেছেন। এছাড়া আমার থেকে আরও শতগুণ উত্তম ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নির্বাচন না করেই বিদায় নিয়েছেন। তবে এখন, আমি মনে করি, এই ছয়জনের মাঝে খিলাফত সীমাবদ্ধ, যাদের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তুষ্ট থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন..।[১০০] *সহিহ মুসলিমের* এক বর্ণনায় আছে, আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা. বলেন—যখন তিনি (উমার) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা বললেন, তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি নির্দিষ্ট করে কাউকে নির্বাচন করবেন না।[১০১]

---

[৯৮] আল কামিল ফিত তারিখ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৬৭

[৯৯] মাউসুআতুস সিয়ার, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৬৮

[১০০] মুসনাদু বাযযার, ১৫৩

[১০১] মুসলিম, [illegible]

আমর ইবনু মাইমুন রা.-এর এক দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, উমার ইবনুল খাত্তাবকে সাহাবায়ে কিরাম অনুরোধ করলেন—আমিরুল মুমিনিন, পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের বিষয়ে অসিয়ত করেন!

তখন তিনি বললেন—এই ছয়জনের চেয়ে আর কাউকে এ শাসনভারের উপযুক্ত দেখি না, যাদের ওপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তুষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। (অতঃপর তিনি সেই ছয়জনের নাম বললেন) তারা হলেন—(১) আলি, (২) উসমান, (৩) জুবাইর, (৪) তালহা, (৫) সাদ, এবং (৬) আব্দুর রহমান।

সাথে এও বললেন—পক্ষান্তরে আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা. মজলিসে উপস্থিত থাকবে, সে শাসনভার গ্রহণ করতে পারবে না। তিনি তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এ কথা বলেছেন।[১০২]

এখানে উমার রা. ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছেন, যা কালোপযোগী ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সময় সবাই আবু বকর রা. এর শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রবর্তিতায় একমুখ ছিলেন। তাই, বিরোধিতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা খুব কমই ছিল। বিশেষ করে যেহেতু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাবার্তায় উম্মাহকে এই ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন যে—তাঁর পরে খলিফা হওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত আবু বকর রা.।

এদিকে আবু বকর রা. যখন উমার রা.-কে খলিফা মনোনীত করেছেন, তখন তিনি জানতেন, সাহাবায়ে কিরাম সবাই একমত যে, শাসনভার গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনিই সবচেয়ে উপযুক্ত ও শ্রেষ্ঠ। তাই, তিনি বড়ো বড়ো সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শক্রমে তাকে খলিফা বানান। কেউ এর বিরোধিতাও করে নি। এভাবে উমার রা.-এর ব্যাপারে ইজমা সাব্যস্ত হয়।

পক্ষান্তরে, উমার রা. সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলেন। অর্থাৎ শাসন-ব্যবস্থার বিষয়টিকে নির্দিষ্ট কয়েকজন সাহাবির মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিলেন। যারা সবাই শাসনভারের উপযুক্ত। একই সাথে তিনি নির্বাচন-পদ্ধতিও নির্দিষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে—তারা সবাই একত্রে এক ঘরে পরামর্শ করবেন, তাদের সাথে আবদুল্লাহ ইবনু উমার শুধু পরামর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারবে। এর বাইরে সে আর কিছুই করতে পারবে না। আর এই পুরো বিষয়টা শেষ করার জন্য তিনদিনের সময় সীমাবদ্ধ করে দিলেন। তিনি আরও বলেন—চতুর্থ দিন যেন তোমাদের একজন আমির অবশ্যই থাকে। এর কারণ সম্ভবত এমন যে, তিন দিনের বেশি হলে বিরোধিতা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে।[১০৩]

---

[১০২] বুখারি, ৩৭০০

[১০৩] মাউসুআতুস সিয়াসা, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : [illegible]

আলি ইবনু আবি তালিব রা. এর নির্বাচন

আলি রা.-এর বাইআত নির্বাচনের মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছে। এর আগে যে ঘটনা ঘটেছিল, তা হচ্ছে : ৩৫ হিজরির জিলহজ মাসের ১৮ তারিখ শুক্রবার, বিভিন্ন এলাকা ও গোত্রের বহিরাগত ধর্মত্যাগী অপরিচিত লোকেরা অন্যায়ভাবে উসমান ইবনু আফফান রা.-কে শহিদ করে। এরপর মদিনায় অবস্থানরত সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম আলি রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। কারণ, শাব্দিক অর্থেই ওই সময়ে তার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ ছিল না। এজন্যই সাহাবায়ে কিরামের অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি খিলাফদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো আহলে ইলম আলি রা.-এর সেই নির্বাচনের পদ্ধতিটা বর্ণনা করেছেন। আবু বকর খল্লাল মুহাম্মাদ ইবনু হানাফিয়্যার সনদে মুহাম্মাদ রহ. বর্ণনা করেন—

(সেদিন) আমি, আলি ও উসমান রা.-এর সাথে অবরুদ্ধ ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে বলল—আমিরুল মুমিনিনকে অতিসত্বরই হত্যা করা হবে। তারপর আরেকজন এসে বলল—এখনই হত্যা করা হবে। তখন আলি রা. দাঁড়িয়ে গেলেন।

মুহাম্মাদ রহ. বলেন—আলি রা. উসমান রা. এর ঘরে এসে দেখেন, তিনি শহিদ হয়ে গেছেন। তখন আলি রা. নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দেন। তখন লোকেরা এসে দরজায় করাঘাত করলে তিনি দরজা খোলেন। তারা তার সামনে এসে বলে—উসমান রা.-কে তো শহিদ করা হয়ে গেছে, আর সবার একজন খলিফাও দরকার, কিন্তু আমরা আপনার চেয়ে আর কাউকে এই বিষয়ের যোগ্য মনে করি না।

আলি রা. তাদেরকে বললেন—তোমরা আমাকে খলিফা বানাতে চেয়ো না। কারণ, তোমাদের আমির হওয়ার চাইতে পরামর্শদাতা বা সাহায্যকারী হওয়াই উত্তম। তারা বলল, না, আল্লাহর কসম! আপনি ছাড়া আর কেউ এর হকদার হতে পারে না। তখন তিনি বললেন—তাহলে তোমরা যদি আমাকে খলিফা বানাতেই চাও, তাহলে আমার বাইআত গোপনে হলে চলবে না। বরং, আমি মসজিদে যাব, তখন যার ইচ্ছা আমার হাতে বাইআত গ্রহণ করবে। তখন লোকজন তার হাতে বাইআত গ্রহণ করে।[১০৪]

খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি

উপরে খুলাফায়ে রাশিদার নির্বাচন পদ্ধতির আলোচনা থেকে জানা যায়, নির্বাচনের মোট তিনটি পদ্ধতি রয়েছে, যার প্রত্যেকটি খুলাফায়ে রাশিদার কর্ম দ্বারা প্রমাণিত এবং এর ওপর সাহাবায়ে কিরামের ইজমাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে উলামায়ে কিরাম খলিফা নির্বাচনের চতুর্থ আরেকটি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন, যাকে তাগাল্লুব বা জোর-জবরদস্তির পদ্ধতি বলা হয়। এটা মূলত প্রয়োজন বা মাজবুরের পদ্ধতি।

---

[১০৪] আবু বকর খল্লাল, কিতাবুস সুন্নাহ, ৪১০

আমি এখন সংক্ষিপ্তভাবে এই চারটি পদ্ধতি উল্লেখ করছি। বিস্তারিত বিবরণ বড়ো বড়ো কিতাবে আছে। অতএব, প্রয়োজন হলে সেখান থেকে দেখে নেওয়া যাবে—

১ম পদ্ধতি—বাইআতগ্রহণ : আল্লামা ইবনু খালদুন বলেন—বাইআত মানে আনুগত্যের ওপর চুক্তি করা। বাইআত গ্রহণকারী যেন তার আমিরের সাথে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে যে—সে তার আমিরকে নিজের বিষয়ে এবং মুসলিমদের বিষয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা সোপর্দ করবে। আমিরের সাথে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ করবে না; বরং তাকে যা আদেশ করবে, তা পালন করবে, পছন্দ হোক বা অপছন্দ।

সাহাবিগণ যখন আমিরের হাতে বাইআত গ্রহণ এবং চুক্তিবদ্ধ হতেন, তখন চুক্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য নিজেদের হাত আমিরের হাতে রাখতেন। এখন যেন এক প্রকার ক্রেতা-বিক্রেতার মতো হয়ে গেল। এজন্যই বাইআত বলে নামকরণ করা হয়েছে (যা আরবি ক্রয়-বিক্রয় ক্রিয়াপদ 'বাই' থেকে নির্গত)। মূলত, হাতে হাত রাখাকে বাইআত বলে। এটাই আভিধানিক ও শরয়ি অর্থ। হাদিসে এই উদ্দেশ্যেই সব জায়গায় বাইআত শব্দটি এসেছে। যেমন—লাইলাতুল আকাবার বাইআত/আকাবার বাইআত, গাছের নিচে বাইআত। এখান থেকেই বলা হয়—খুলাফায়ে রাশিদার বাইআত।[১০৫]

বাইআতের প্রকার

বাইআতের বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে মূলত বাইআতের প্রকার নির্ণয় করা হয়। যেমন—

০১. ইসলামের ওপর বাইআত : এটা হচ্ছে বাইআতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকার, যা কাফির হওয়ার মাধ্যমে ভেঙে যায়। আর অন্যান্য বাইআত অবাধ্যতা বা কবিরা গুনাহের মাধ্যমে ভাঙে। জারির ইবনু আবদিল্লাহর রা.-এর হাদিসে এই বাইআতের কথাই বলা হয়েছে। তিনি বলেন—

> بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم
>
> আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে এই মর্মে বাইআত গ্রহণ করেছি যে—'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এবং (আমি এই মর্মেও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,) আমি নামাজ কায়েম করব, প্রত্যেক মুসলিম ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করব।'[১০৬]

---

[১০৫] মুকাদ্দামাতু ইবনু খালদুন, ২০৯

[১০৬] সহিহ বুখারি, [illegible]

০২. সাহায্য করার ওপর বাইআত : যেমন বাইআতে আকাবায় হয়েছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

وأبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نسائكم وأبنائكم

'আমি তোমাদের বাইআত করছি এই মর্মে যে, তোমরা আমাকে ওই সকল অপছন্দনীয় বিষয় থেকে রক্ষা করবে, যার থেকে তোমরা নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের রক্ষা করো।'

তখন যারা বিন মারুর রা. নবীজির হাত ধরে বললেন—"ঠিক আছে। ওই মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমরা অতি অবশ্যই আপনাকে রক্ষা করবো ওই সব অপছন্দনীয় বিষয় থেকে, যার থেকে আমরা (নিজেদের) রক্ষা করি। তখন আমরা আল্লাহর রাসুলের হাতে বাইআত গ্রহণ করলাম।[১০৭]

০৩. জিহাদের ওপর বাইআত: যেমনটা হুদাইবিয়ার বাইআতের সময় হয়েছিল।

০৪. হিজরতের ওপর বাইআত : যেমন মুজাশি রা. এর হাদিসে এসেছে। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমার ভাইকে নিয়ে মক্কা বিজয়ের পর এসে বললাম—'হে আল্লাহর রাসুল, আমি আমার ভাইকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি, যাতে আপনি তাকে হিজরতের ওপর বাইআত করেন।'

নবীজি বললেন—'মুহাজিররা তো (মক্কা থেকে) হিজরতের সাওয়ার নিয়ে গেছে।'

আমি বললাম—তাহলে কীসের ওপর বাইআত করবেন?

তিনি বললেন—'আমি তাকে বাইআত করবো ইসলাম, ইমামত ও জিহাদের ওপর।'[১০৮]

০৫. আনুগত্যের ওপর বাইআত : যেমন উবাদা রা.-এর হাদিসে এসেছে। তিনি বলেন—আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ করেছি কথা শোনা ও মানার ওপর। অসচ্ছল ও সচ্ছল অবস্থায়, সুখে ও দুঃখে এবং আমাদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেওয়ার ওপর। আর এই মর্মে যে, আমরা শাসকের বিরোধিতা করব না এবং যেখানেই থাকি সত্য কথা বলব, আল্লাহর ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করব না।"[১০৯]

---

[১০৭] মুসনাদু আহমাদ, ১৫৭৯৮

[১০৮] সহিহ বুখারি, ৪৩০৫

০৬. অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার ওপর বাইআত : যেমন পূর্বের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

০৭. হক কথা বলার ওপর বাইআত : যেমন পূর্বের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

০৮. প্রত্যেক মুসলিম ভাইয়ের কল্যাণ কামনার ওপর বাইআত : যেমন জারির রা. এর হাদিসে এসেছে।

০৯. আনুগত্যের ওপর বাইআত : এটাও জারির রা. এর হাদিসে উল্লেখ আছে। আর এটাই সুফিদের বাইআত।

খলিফা নির্বাচিত হওয়ার বাইআত তখনই বিবেচ্য হবে, যখন সেটা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের থেকে পাওয়া যাবে। তারা হলো মুসলিমদের উলামায়ে কিরাম ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ, যারা খুব সহজেই কোনোরূপ কষ্ট ছাড়াই বাইআতের সময় একত্র হতে পারবেন। তাদের কী কী গুণ থাকতে হবে, তা সামনে আলোচিত হবে। মূলত এটাই ইসলামের নির্ধারিত পন্থা, যা সালাফদের থেকে চলে আসছে। এই মূলনীতির আলোকেই আবু বকর রা. এর নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে।

ইমাম মাওয়ারদি রহ. বলেন—যখন গণ্যমান্য ব্যক্তি একত্র হবেন, তখন তারা নিজেদের মধ্য থেকে নেতৃত্বের উপযোগী ব্যক্তিদের মাঝে নেতৃত্বের শর্ত ও গুণাবলি যাচাই করবেন। তারপর তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তথা গুণাবলিতে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে পেশ করবেন, লোকজন যার আনুগত্য তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করবে। বাইআতের জন্য এমন ব্যক্তিকে পেশ করতে বিলম্ব করবে না। এভাবে যখন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ইজতিহাদ ও চিন্তাভাবনার মাধ্যমে কেউ নির্দিষ্ট হবে, তখন তার সামনে নেতৃত্ব পেশ করা হবে। তিনি যদি মেনে নেন, তাহলে তারা তার হাতে বাইআত গ্রহণ করবে। আর তাদের বাইআতের মাধ্যমেই তিনি খলিফা হয়ে যাবেন। সুতরাং, এখন সাধারণ মানুষদের জন্য অপরিহার্য তার হাতে বাইআত গ্রহণ করা এবং তার আদেশের সামনে মাথা নত করা; কিন্তু তিনি যদি নেতৃত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান, সেটা থেকে বিরত থাকেন; তাহলে তাকে বাধ্য করা হবে না। কারণ, বাইআত সন্তুষ্ট চিত্তে ও স্বেচ্ছায় চুক্তি করার নাম। এখানে, কোনো বাধ্যবাধকতা বা জোর-জবরদস্তি নেই। এখন, তিনি ছাড়া অন্য যে হকদার আছেন, এই হক তার দিকে ফিরে যাবে।[১১০]

২য় পদ্ধতি—পূর্ববর্তী খলিফার অসিয়ত : এটা দুই প্রকার—

এক. অসিয়তনামা একজনের জন্য হবে। যেমনটি আবু বকর রা. উমার রা.-এর নামে অসিয়ত লিখে গিয়েছেন। (যেটি কিছুদূর আগে একবার উল্লেখ করা হয়েছে। পেছনে গিয়ে আবার দেখা যেতে পারে।)

---

[১১০] সূত্র : আল-আহকামুস সুলতানিয়া

ইমাম বাগাভি রহ. বলেন—খলিফা মৃত্যুর আগে যদি একজন যোগ্য ব্যক্তিকে শাসনভার অর্পণ করেন, তাহলে তার বিরোধিতা করা বৈধ নয়। যেমন আবু বকর রা. তার পরে উমার রা.-কে খলিফা বানিয়েছেন।[১১১]

দুই. পূর্ববর্তী খলিফা শাসন-ব্যবস্থাকে একটি নির্দিষ্ট জামাআতের মাঝে শূরা বা পরামর্শভিত্তিক করে দেবেন, যাতে তারা নিজেদের মধ্য থেকে একজন নতুন খলিফা নির্বাচন করতে পারে। যেমনটি উমার রা. করেছেন।

উমার রা. খিলাফত-ব্যবস্থাকে ছয়জনের পরামর্শের ওপর ভিত্তি করে গিয়েছেন। এরপর তারা নিজেরা মিলে উসমান রা.-কে নির্বাচন করেছেন। যেমনটি আমর ইবনু মাইমুন রা.-এর দীর্ঘ হাদিসে এসেছে। তার একাংশ এমন—'হে আমিরুল মুমিনিন! আমাদের আপনার পরবর্তী খলিফার অসিয়ত করে যান।' উমার রা. বললেন, 'আমি তো ছয়জনের এই দল বা জামাআতের চেয়ে কাউকে শাসন-ব্যবস্থার উপযুক্ত মনে করি না, যাদের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।'

এরপর তিনি : ১। আলি ইবনু আবি তালিব, ২। উসমান ইবনু আফফান, ৩। জুবাইর, ৪। তালহা, ৫। সাদ, ৬। আব্দুর রহমান।—এই ছয়জনের নাম উল্লেখ করেন। (এই অংশেরও কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা পেছনে গেছে।)

আহকামে সুলতানিয়া গ্রন্থে মাওয়ারদি রহ. লিখেছেন : ইমাম নিযুক্ত হওয়া, এটার বৈধতাও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত, মুসলিমদের নির্দ্বিধায় দুটো কাজ করার কারণে—

০১. একটি হলো, আবু বকর রা. যখন উমার রা.-কে খলিফা হওয়ার নির্দেশ দেন, তখন মুসলিম উম্মাহ তার নেতৃত্ব মেনে নেয়।

০২. দ্বিতীয়টি হলো, উমার রা. যখন শাসন-ব্যবস্থাকে শুরা ভিত্তিক করে গেলেন, তখন তারা সবাই পরামর্শ সভা করতে রাজি হয়ে গেলেন।

মূলত, তখন এই অসিয়তনামাই পরবর্তী খলিফা হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। অসিয়তনামায় থাকা নাম/নামগুলোর মাধ্যমে এখানে না থাকা অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম এই শুরা থেকে বের হয়ে গেলেন। (যেমন উমারের পর ঘটিছল।)

আব্বাস রা. যখন শুরার মজলিসে যাওয়ার কারণে আলি রা.-কে নিন্দা করলেন, তখন আলি রা. বলেন—'দেখেন, বিষয়টি ছিল মুসলিম উম্মাহর জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ, তাই উক্ত মজলিসে অংশগ্রহণ না করাটা কল্যাণকর মনে হয় নি।' আর এর মাধ্যেমে এভাবে অসিয়তনামাও খলিফা মনোয়নের ক্ষেত্রে ইজমা হয়ে গেল।

সুতরাং, কোনো খলিফা যদি পরবর্তী খলিফার ব্যাপারে নির্দেশ দিতে চান, তাহলে তার কর্তব্য খুব ভালো করে চিন্তা করা যে—কে হতে পারে সবচেয়ে হকদার? কার মাঝে সবচেয়ে বেশি বৈশিষ্ট্য আছে?[১১২]

এই দুই প্রকার মূলত খলিফা নির্বাচনের দুটো আলাদা পদ্ধতি। এখন তাহলে মোট পদ্ধতি হলো তিনটি।

তৃতীয় পদ্ধতি—জোর-জবরদস্তি

এটা মূলত প্রভাব বিস্তার করার মাধ্যমে সুলতান হওয়ার একটি মজবুরি পদ্ধতি। অর্থাৎ, কোনো জালিম সাধারণ মানুষের ওপর অন্যায়-অত্যাচার করা শুরু করে এবং মানুষ তার আনুগত্য স্বীকার করার আগ পর্যন্ত এভাবেই শাসনকার্য চালিয়ে যায়। আর এভাবে একসময় তার নেতৃত্ব সাব্যস্ত হয়। জনগণের ওপর তার আনুগত্য আবশ্যক হয়ে যায়।

এরকম ঘটনা ঘটেছিল আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের সময়। কোনো এক মাধ্যমে একবার যখন তিনি জুবাইর রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তখন ঘটনাক্রমে আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইরের ওপর জোর-জবরদস্তি করে তিনি প্রাধান্য বিস্তার করেন। আর এই সময় কেউ সাগ্রহে, আর কেউ বাধ্য হয়ে তার হাতে বাইআত গ্রহণ করে। এভাবেই তার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

আদদুররুল মুখতারে আছে, প্রয়োজনের কারণে অর্থাৎ ফিতনা রোধ করার জন্য প্রভাব বিস্তারকারীর শাসন বৈধ হবে। তদ্রূপ আনাস ইবনু মালিক রা.-এর হাদিসও এর প্রমাণ বহন করে। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة
>
> 'তোমরা (শাসকের কথা) শোনো এবং মান্য করো, যদিও তোমাদের ওপর হাবশি গোলাম নিযুক্ত করা হয়, যার মাথা কিশমিশের মতো (কালো এবংস্থূল)।'[১১৩]

ইমাম আহমাদ রহ.-এর সূত্রে আবু ইয়ালা বলেন—'যখন কেউ তরবারির শক্তিবলে জোর-জবরদস্তি করে মুসলিমদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে খলিফা হয়, আর তাকে আমিরুল মুমিনিনও বলা হয়; তাহলে আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী কারও জন্য এই বৈধতা নেই যে—সে তার ওপর হামলা করবে,

---

[১১২] আহকামে সুলতানিয়া, ৩০

[১১৩] সহিহ বুখারি, ৭১৪২

তাকে ইমাম হিসাবে মেনে নেবে না; চাই সে সুলতান নেককার হোক বা ফাসিক (পাপাচারী)।'[১১৪]

ইবনু হাজার রহ. বলেন—'ফুকাহায়ে কিরাম একমত পোষণ করেছেন যে, প্রভাব বিস্তারকারী শাসকের আনুগত্য এবং তার সাথে জিহাদ করা ওয়াজিব। আর তার ওপর বিদ্রোহ করার চেয়ে আনুগত্যই অধিক কল্যাণকর। কারণ, এতে রক্তারক্তিও বন্ধ থাকবে, পরিবেশও শান্ত থাকবে।'[১১৫]

এই তিন পদ্ধতির কোনো এক পদ্ধতিতে যখন খলিফা মনোনীত হবে, তখন তার আনুগত্য থেকে বের হওয়াকে বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান বলা হবে। 'বিদ্রোহ করার' বিস্তারিত বিবরণ ও হুকুম ফিকাহের কিতাবে উল্লিখিত আছে। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা সম্ভব নয়।

জোর-জবরদস্তি করে শাসনের হুকুম

হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি রহ. 'ইজালাতুল খাফা' নামক কিতাবে বলেছেন—"খলিফা হওয়ার চতুর্থ পদ্ধতিটি হলো জবরদখল।" যেমন: কোনো খলিফা মারা গেল। এরপর যদি কেউ বাইআত বা প্রতিনিধি বানানো ছাড়াই খিলাফতের দায়িত্ব নেয়; জনগণের মনোতুষ্টি বা কোনো প্রকার বল প্রয়োগ, অথবা কোনো লড়াই ছাড়াই সবাইকে নিজের ওপর একত্র করে, তখন সে খলিফা হয়ে যাবে। আর মানুষের ওপর আবশ্যক হয়ে পড়বে তার আদর্শ অনুসরণ করা, যদি তার আদেশ শরিয়তসম্মত হয়।

জবরদখলকারী খলিফা দুই প্রকার

১ম প্রকার : প্রথম প্রকার এমন জবরদখলকারী খলিফা, যার মাঝে খলিফা হওয়ার সকল শর্ত বিদ্যমান এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে কোনো প্রকার হারামে জড়িত হওয়া ছাড়াই সে কোনো ব্যবস্থাপনা বা সন্ধির মাধ্যমে মিটমাট করে নেয়। এ প্রকার জবরদখল জায়িজ এবং ইসলামে এর সুযোগও রয়েছে।

আলি রা.-এর মৃত্যুর পর, মুআবিয়া রা. এর সাথে হাসান রা.-এর সাথে সন্ধি স্থাপন এবং পরবর্তী সময়ে মুয়াবিয়া রা.-এর খিলাফত সংগঠিত হওয়া এই প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দ্বিতীয় প্রকার : যার মধ্যে সকল শর্ত বিদ্যমান নেই এবং সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে যুদ্ধবিদ্রহ ও হারামে জড়িত হওয়ার মাধ্যমে সমঝোতা করে। তাহলে এই প্রকার জবরদখল জায়িজ হবে না; বরং সে গুনাহগার হবে। তবে তার আদেশ-নিষেধ মেনে নেওয়া মানুষের ওপর ওয়াজিব বা আবশ্যক হয়ে যাবে, যদি তার

[১১৪] আহকামে সুলতানিয়া, ২০
[১১৫] ফাতহুল বারি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৩

আদেশ-নিষেধ শরিয়তসম্মত হয়। তার জাকাত উসুলকারীরা যদি ধনীদের[১১৬] থেকে যাকাত উসুল করে, তাহলে জাকাত রহিত হয়ে যাবে; অর্থাৎ জাকাতদাতার জাকাত আদায় হয়ে যাবে। তার নিযুক্ত করা কাজি কোনো হুকুম দিলে তার হুকুম কার্যকর হবে। আর সে (খলিফা) জিহাদের ডাক দিলে তার সঙ্গী হয়ে জিহাদ করা যাবে।

আর এই প্রকার খিলাফত সংগঠিত হওয়ারও প্রয়োজন থাকে। কেননা, তার অপসারণে সাধারণ মুসলিমদের প্রাণনাশ ও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব ঘটবে। আর যেহেতু এ বিষয়টি নিশ্চিত নয় যে, আদৌ এই বিশৃঙ্খলার কোনো মীমাংসা হবে কি না? হতে পারে, প্রথমজনের থেকে অন্যজন আরও বেশি খারাপ। সুতরাং, যার ফলাফল খারাপ হওয়াটা নিশ্চিত,তা একটা ফিতনার মতো। আর এমন ফিতনায় জড়িত হওয়া কীভাবে সমচিত হবে? খলিফা আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ান এবং বনু আব্বাসের প্রথমদিকের খলিফাদের সংগঠিত খিলাফত এই প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দেহলভি রহ.-এর কথা থেকে জানা যায়, প্রাধান্য বিস্তারের বৈধতার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে—

- ০১। প্রাধান্য বিস্তারকারীর মাঝে খলিফা হওয়ার সমস্ত যোগ্যতা লাগবে।
- ০২। সময়টা এমন হতে হবে যে, তখন কোনো খলিফা ছিল না।
- ০৩। প্রাধান্য বিস্তার কোনো হারাম কাজ করার মাধ্যমে হওয়া যাবে না।

কিন্তু তখন যদি কোনো খলিফা থেকে থাকেন, তাহলে প্রাধান্য বিস্তার দুই প্রকার—

০১. প্রাধান্য বিস্তার অপর প্রাধান্য বিস্তারকারীর ওপর হবে। যদি এমনই হয়, তাহলে দ্বিতীয় প্রাধান্য বিস্তারকারী সুলতান হয়ে যাবে, প্রথমজন বরখাস্ত হবে।

ইবনু আবিদিন রহ. বলেন—'কেউ যদি পূর্বের কোনো প্রভাব বিস্তারকারীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং তার আসনে বসে, তাহলে প্রথমজন বরখাস্ত এবং দ্বিতীয়জন সুলতান হয়ে যাবে। আর সুলতানের আনুগত্য করা ওয়াজিব—চাই তিনি ন্যায় হোক বা জালিম, যতক্ষণ না শরিয়তের সাথে সাংঘর্ষিক হয়।'[১১৭]

০২. আগে থেকেই একজন খলিফা জীবিত আছেন, যার হাতে সবাই বাইআতও গ্রহণ করেছে—যদি এমন খলিফার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তাহলে পূর্বের

---

[১১৬] নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক

[১১৭] রদ্দুল মুহতার

খলিফা বরখাস্ত হবে না; বরং যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে আসার (বা পুনরায় ক্ষমতা দখলের) সম্ভাবনা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত মূলত খলিফা হয়েই থাকবেন।

খতিব শারবিনি রহ. বলেন—'যদি কোনো জীবিত সুলতানের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করা হয়, তাহলে যদি জীবিত সুলতানও প্রাধান্য বিস্তারকারী হন; তখন দ্বিতীয় প্রাধান্য বিস্তারকারীর ক্ষমতা সাব্যস্ত হবে। আর জীবিত সুলতান যদি বাইআত বা অসিয়তের মাধ্যমে সুলতান হন, তাহলে প্রাধান্য বিস্তারকারীর ক্ষমতা গ্রহণযোগ্য হবে না।'[১১৮]

জাকারিয়া আনসারি রহ. বলেন—'যার নেতৃত্ব বাইআত বা অসিয়তের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার ওপর প্রভাব বিস্তার করলে সেটি ধর্তব্য হবে না, পর্যুদস্ত সুলতান বরখাস্তও হবেন না।'[১১৯]

শত্রুদের হাতে সুলতানের বন্দী হওয়ার বিষয়টি সামনেই আলোচিত হবে।

এখন যদি প্রভাব বিস্তারকারী শাসকের মাঝে নেতৃত্বের শর্তাবলি না থাকে, তাহলে সাথে সাথেই বিরোধিতা করা উচিত নয়। তবে সে যদি কাফির হয়, তাহলে তাকে উৎখাত করতে হবে। খতিব শারবিনি রহ. বলেন—'হ্যাঁ, যদি কোনো কাফির আধিপত্য বিস্তার করে, তাহলে তার নেতৃত্ব গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

> 'আল্লাহ তাআলা কিছুতেই মুমিনদের ওপর কাফিরদের জন্য কোনো ক্ষমতা (প্রতিষ্ঠিত) রাখবেন না।'[১২০]

কিন্তু শাইখ ইজ্জুদ্দিন যে কথা বলেছেন যে—কাফিররা যদি কোনো ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করে কোনো মুসলিমকে সে ভূখণ্ডের কাজি বানায়, তাহলে তাদের আধিপত্য গ্রহণযোগ্য হবে। তার এ কথা থেকে যা বোঝা যায় (কাফিরদের আধিপত্য গ্রহণযোগ্য হওয়া), সেটা সঠিক নয়। কারণ, তিনি আরেক জায়গায় বলেছেন—যদি বড়োদের মতো বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো শিশু বা নারীকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়, তাহলে তাদের কোনো নির্দেশ—যেমন, কাউকে ওলি বা কাজী বানানো—গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং, তাদের এ নির্দেশ স্থগিত রাখা হবে। অতএব, যদি তাদের ক্ষেত্রে স্থগিত রাখতে হয়, তাহলে তো কাফিরের ক্ষেত্রে আরও আগেই স্থগিত রাখা উচিত।'[১২১]

---

[১১৮] মুগনিল মুহতাজ, ৫/৪৩৩
[১১৯] আসনাল মাতালিব, ৪/১১০
[১২০] সূরা নিসা, আয়াত: ১৪১
[১২১] মুগনিল মুহতাজ, ৫/৪২৫

জাহাইলি রহ. বলেন—কোনো শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়, যতক্ষণ না তিনি স্পষ্টভাবে কুফুরির ঘোষণা করেন। তিনি যদি দ্বীনের একটি বা সুস্পষ্ট কোনো বিষয় অস্বীকার করার মাধ্যমে কুফুরি করেন, তাহলে তাকে হত্যা করা বৈধ। বরং, তার ফিতনা-ফাসাদ থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য তাকে হত্যা করা ওয়াজিব; যেহেতু তাকে মনোয়নের ফায়দা বা উদ্দেশ্য পাওয়া যায় নি। আর যদি কুফুরি না করেন, তাহলে বৈধ নয়—যাতে উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট না হয়, বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি না হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يامر بمعصية فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعته
>
> 'একজন মুসলিমের ওপর কর্তব্য শাসকের নির্দেশকৃত বিষয় শোনা এবং মানা—চাই তার পছন্দনীয় হোক বা অপছন্দনীয়; যতক্ষণ না তাকে অবাধ্যতার আদেশ করা হয়। যখন অবাধ্যতার নির্দেশ করা হবে, তখন সেটা শোনাও যাবে না, মানাও যাবে না।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শাসকদের উৎখাত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে—'আমরা কি তাদের উৎখাত করবো না?'

তিনি বলেন—'না, যদি তারা নামাজ কায়েম করে। যতক্ষণ না তোমরা স্পষ্ট কুফুরি দেখতে পাও, যার ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণ রয়েছে।'[illegible]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি রহ. বলেন—'যদি এমন কেউ প্রাধান্য বিস্তার করে, যার মাঝে নেতৃত্বের শর্তাবলি পাওয়া যায় নি, তাহলে তার বিরোধিতা করা উচিত নয়। কারণ, তাকে উৎখাত করতে হলে অনেক যুদ্ধ-হাঙ্গামা করতে হবে। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতি অনেক বেশি। ফলে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। তাছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে—'আমরা কি তাদেরকে উৎখাত করবো না?' তিনি বলেন—'না, যদি তারা নামাজ কায়েম করে। যতক্ষণ না তোমরা স্পষ্ট কুফুরি দেখতে পাও, যার ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণ রয়েছে।'

মোটকথা, খলিফা যদি দ্বীনের কোনো অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করে, তাহলে তার সাথে লড়াই করা বৈধ, বরং ওয়াজিব। অন্যথায় নয়। কারণ, তখন তার খলিফা হওয়ার ফায়দা-ই হাতছাড়া হয়ে যায়। তখন মুসলিমজাতির ওপর তার ফিতনা-ফাসাদের সমূহ আশঙ্কা থাকে। তাই, তার বিরুদ্ধে লড়াই করাও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।[illegible]

[illegible] আল ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু, ২৮/২১১৬

[illegible] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ২/১৭৯

ইমাম বদরুদ্দিন আইনি রহ. বলেন, দাউদি বলেছেন—জালিম শাসকদের ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মত হলো—যদি ফিতনা ও কোনো প্রকার জুলুম ছাড়া তাদের বরখাস্ত করা সম্ভব হয়, তাহলে বরাস্ত করা ওয়াজিব, অন্যথায় সবর করা কর্তব্য। কারও কারও থেকে এ-রকম মতও বর্ণিত আছে—কোনো ফাসিকের নেতৃত্ব গ্রহণ শুরুতে জায়িজ নয়। তবে ন্যায়পরায়ণ হওয়ার পর জুলুম করলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ব্যাপারে ইখতিয়ার আছে। সঠিক মত হলো—বিরত থাকতে হবে। তবে কাফির হয়ে গেলে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব।[১২৪]

এতক্ষণ বিভিন্ন কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে যে সকল কথা বলা হলো, সেখান থেকে ফিসক এবং কুফুরির মাঝে পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে গেল। সুলতান যদি ফাসিক হন, তখন কোনো ফিতনা বা রক্তপাত ছাড়াই যদি তাকে উৎখাত করা যায়, তাহলে উৎখাত করা ওয়াজিব; অন্যথায় সবর করতে হবে। আর সুলতান যদি কাফির হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব।

কাজি ইয়াজ রহ. বলেন—ন্যায়পরায়ণ খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কারও মতেই বৈধ নয়। আর যদি ফাসিক বা জালিম হয়, তাহলে তার ফিসক যদি কুফুরির স্তরে চলে যায়, তাহলে তাকে উৎখাত করা ওয়াজিব; আর যদি কুফুরি ছাড়া অন্যান্য গুনাহ হয়, তাহলে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতে, তাকে বরখাস্ত করা হবে না। তারা এ মতের স্বপক্ষে অনেকগুলো হাদিস প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছেন। তাছাড়া তাকে উৎখাত করতে হলে অনেক রক্ত ঝরাতে হয়, নারীদের বেরিয়ে আসতে হয়। তখন সুলতানের ক্ষতির চেয়ে আরও বেশি ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে হয়।

কিন্তু মুতাজিলাদের মতে—তাকে উৎখাত করা হবে। কিন্তু আমরা যে কুফুর ও ফিসকের মাঝে পার্থক্য করি, সেটাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস সমর্থন করে—'তবে যদি তোমরা সুস্পষ্ট কোনো কুফুরি দেখতে পাও।' ইতোপূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সাল্লাম তাদের উৎখাত করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু এখানে তিনি সুস্পষ্ট কুফুরিকে পূর্বের হুকুম থেকে বাদ দিয়েছেন।[১২৫] এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা 'জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা' বিষয়ে আসবে।

ফায়দা: আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. বলেন—'বিদ্রোহীরা যদি দারুল হারবের লোকবল সাহায্য হিসাবে আনে, আর বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়; তাহলে দারুল হারবের লোকদের সাহায্য নেওয়াটা বিদ্রোহীদের জন্য 'আমান' বলে বিবেচিত হবে না। তাদের নিরাপদ রাখা আমাদের জন্য আবশ্যক হবে না। যেমনটা আমরা

---

[১২৪] উমদাতুল কারী, ২৪/১৭৯

[১২৫] ইকমালুল মুসলিম বি ফাওয়াইদি মুসলিম, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৩৬

পূর্বে বলে এসেছি। কারণ, ‘নিরাপত্তাপ্রত্যাশী’ তাকেই বলা হয়, যে যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ করে (পাসপোর্ট, ভিসা সহকারে) দারুল ইসলামে প্রবেশ করে। অথচ এদের উদ্দেশ্যই ছিল মুসলিমদের সাথে লড়াই করা।[১২৬]

বর্তমান গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি

বর্তমানে যেসব নির্বাচন পদ্ধতি (গণতন্ত্র বা অন্যান্য) আছে, তার কোনোটারই শরয়ি ভিত্তি নেই। একসময় মুসলিম উম্মাহর সাথেও এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। এগুলোতে যদি কল্যাণই থাকত, তাহলে সাহাবায়ে কিরাম তা বর্জন করতেন না। এটা আসলে কাফিরদের রচিত জাহিলি যুগের ষড়যন্ত্রের একটি অংশ। সুতরাং, এই পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করা মুসলিমদের জন্য শোভনীয় নয়।

এগুলোর মাঝে অনেক অপ্রীতিকর, অবৈধ ও ক্ষতিকর জিনিস আছে। যেমন—

০১. পরস্পরের মাঝে বিরোধিতা সৃষ্টি করে। গোত্র, দল ও ভাষাভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার দিকে আহ্বান করা হয়, যাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহিলি ও দুর্গন্ধযুক্ত বলেছেন। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমরা গাজায় ছিলাম, (বর্ণনাকারী সুফইয়ান আরেক আরেকবার ‘গাজা’ বলার জায়গা ‘জাইশ’ বলেছেন,) তখন মুহাজিরদের একজন এক আনসারি সাহাবির নিতম্বে আঘাত করেন। তখন আনসারি সাহাবি স্বগোত্রের লোকদের সাহায্যের জন্য তাদের ডেকে বললেন—হে আনসার ভাইয়েরা!

এদিকে মুহাজির সাহাবিও—‘হে মুহাজির ভাইগণ’ বলে ডাক দিয়ে তাদের সাহায্য চাইলেন।

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই আওয়াজ শুনে বললেন, ما بال دعوى الجاهلية “কী সমস্যা? জাহিলি যুগের স্লোগান দিচ্ছ কেন?’ উপস্থিত লোকেরা বলল—‘হে আল্লাহর রাসুল, এক মুহাজির অপর আনসারের নিতম্বে আঘাত করেছে।’

তখন তিনি বললেন—‘এই দুর্গন্ধযুক্ত আওয়াজ পরিহার করো।’[১২৭]

তাছাড়া এই ধরনের পারস্পরিক বিরোধিতার কারণে মুসলিম উম্মাহ দুর্বল হয়ে যাবে, ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলার শক্তি ফুরিয়ে যাবে। তাছাড়া আল্লাহ তাআলা বিরোধিতা থেকে নিষেধও করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

---

[১২৬] ফাতহুল কাদির, ৬/১০৯

[১২৭] সহিহ বুখারি, ৪৯০৫

'তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো, বিরোধিতা করো না।'[১২৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

তোমরা পরস্পর বিরোধিতা করো না। তাহলে তোমরা ব্যর্থ হবে, তোমাদের প্রতাপ চলে যাবে।[১২৯]

০২. বর্তমানে নির্বাচনের মূল ভিত্তিই হচ্ছে জ্ঞানী ও মূর্খের চিন্তা, আলিম ও ফাসিকের রায়, পুরুষ ও নারীর বিবেচনা এক সমান। মুমিন ও কাফিরের সিদ্ধান্তও এক পর্যায়ের। অর্থাৎ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবাই সমান। অথচ এই পদ্ধতি ইসলামি শিক্ষা ও জীবন-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

আপনি বলেন—যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?[১৩০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمٰى وَالْبَصِيرُ

বলেন—অন্ধ ও চক্ষুমাণ কি সমান হতে পারে?[১৩১]

০৩. ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ কোনো শরয়ি বা কল্যাণকর খাতে ব্যয় না করে প্রচুর পরিমাণে অপচয় করা হয়, যেমনটি প্রায় সব দেশেই দেখা যায়। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

আর তুমি অপচয় করো না। কারণ, নিঃসন্দেহে অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান তো তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।[১৩২]

কাতাদা রহ. থেকে বর্ণিত, *তাফসিরে তাবারিতে* আছে—'অপচয় করো না'—এটা দ্বারা উদ্দেশ্য—গুনাহের কাজে, বাতিল খাত ও ফ্যাসাদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে খরচ করা। অর্থাৎ, যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার ক্ষেত্রে ও অকল্যাণকর খাতে ব্যয় করে, তারাই শয়তানের ভাই তথা দোসর। যে অন্য কারও কাজকর্ম

---

[১২৮] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩

[১২৯] সূরা আনফাল, আয়াত: ৪৬

[১৩০] সূরা যুমার, আয়াত: ৯

[১৩১] সূরা আনআম, আয়াত: ৫০

[১৩২] সূরা ইসরা, আয়াত: ২৬-২৭

অনুসরণ করে, আরবরা তাকে অনুসৃত ব্যক্তির ভাই বলে। আর যেহেতু শয়তানকে সেগুলোর প্রতি অকৃতজ্ঞ, শোকর আদায় করে না। বরং, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আল্লাহ তাআলার আনুগত্য না করে, তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত থেকে, তেমনি আদম-সন্তানদের মধ্যে যারা শয়তানের দোসর, গুনাহের ক্ষেত্রে অপচয় করে, তারাও তাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে না, তাঁর বিরোধিতা ও অবাধ্যতা করে। বরং, আল্লাহ তাআলা তাদের যে সকল ধন-সম্পদ দান করে অনুগ্রহ করেছেন, সেগুলোর ক্ষেত্রেও তারা শয়তানের অনুসরণ করে। অর্থাৎ, তারা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

০৪. যারা নির্বাচনে দাঁড়ায়, তারা জনগণকে বিভিন্ন মিথ্যা ইশতিহার দিয়ে নিজেদের ভোট দেওয়ার আহ্বান করে। প্রকৃতপক্ষে এটা আগ বাড়িয়ে নেতৃত্ব চাওয়ারই নামান্তর, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। আব্দুর রহমান ইবনু সামুরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

> يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت اليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها..
>
> 'হে আব্দুর রহমান ইবনু সামুরা, তুমি কখনো নিজ থেকে নেতৃত্ব চেয়ো না। কারণ, যদি তোমাকে নেতৃত্ব দেওয়া হয় তোমার চাওয়ার কারণে, তাহলে তোমাকে সে কাজের দিকে ন্যস্ত করে দেওয়া হবে। আর যদি চাওয়া ছাড়াই দেওয়া হয়, তাহলে সে বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করা হবে।'[১৩৩]

সুতরাং, কোনো মর্যাদাবান বা মহৎ মানুষের জন্য এটা সমীচীন নয় যে, তারা এ সকল গণতান্ত্রিক কোনো মুমিনের কাজ নির্বাচনে ভোট দেবে। কারণ, ভোট দেওয়ার অর্থই হলো তাদের সাহায্য করা। এই নির্বাচনের উদ্দেশ্যই হলো, জনগণকে মানবরচিত আইন-কানুনের অভিমুখী করা। অথচ আমরা তো মানবের রব রচিত আইন-কানুনের অভিমুখী হতে চাই। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُوْنَ
>
> তারা কি জাহিলি যুগের বিধি-বিধান চায়? দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহ হতে কে বেশি শ্রেষ্ঠ?[১৩৪]

ইবনু কাসির রহ. বলেন—'এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের নিন্দা করছেন, যারা আল্লাহর কল্যাণময়, অনিষ্ট-মুক্ত বিধিবিধান ছেড়ে ওই সকল প্রবৃত্তি-রচিত মতাদর্শের দিকে ছোটে, যা কোনো শরয়ি প্রমাণ ছাড়াই মানুষ বানিয়েছে। যেমন—

[১৩৩] সহিহ বুখারি, ৬৬২২

[১৩৪] সূরা মায়িদা, আয়াত: ৫০

জাহিলি যুগে লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া ভ্রষ্টতা ও মূর্খতাপূর্ণ মনগড়া বিধিবিধান অনুযায়ী ফায়সালা করত। একইভাবে তাতারিরা যেমন তাদের প্রধান জাহাঙ্গির খান রচিত ইয়সিক বা ইয়াসা প্রধান নামের মতাদর্শে রাষ্ট্র পরিচালনা করত। ইয়াসিক বা ইয়াসনা আইন-কানুনের সমষ্টির নাম, যা জাহাঙ্গির বিভিন্ন ধর্ম তথা ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম থেকে লাভ করেছে। তবে বেশ কিছু আইন আছে, যা তার নিজের প্রবৃত্তি ও মনগড়া। পরবর্তী সময়ে তার বংশের কাছে এটাই ধর্মরূপ লাভ করেছে, যাকে তারা কিতাব-সুন্নাহর ওপর প্রাধান্য দিত। সুতরাং, যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে কাফির, তার সাথে লড়াই করা ওয়াজিব—যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানের দিকে ফিরে আসে। অতএব, আল্লাহ ছাড়া কারও কোনো বিধান প্রণয়নের অধিকার নেই—সামান্য হোক বা বেশি।

আল্লাহ তাআলা বলেন—তারা কি আল্লাহ তাআলার হুকুমের পরিবর্তে জাহিলিয়াতের বিধিবিধিন চায়? অর্থাৎ, 'যারা আল্লাহ তাআলার শরিয়ত ভালো করে অনুধাবন করে, তাঁর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস রাখে এবং মানে যে, আল্লাহ তাআলাই সমস্ত বিচারকদের বিচারক, সৃষ্টজীবের প্রতি তার মা-বাবার চাইতেও। যারা এটা বিশ্বাস করে, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার চাইতে বিধিবিধানের ক্ষেত্রে কে অধিক ইনসাফকারী?[১০৫]

০৫. এ সকল নির্বাচনে অনেক শরিয়তবিরোধী অবৈধ জিনিস পাওয়া যায়। যেমন—জনগণকে ধোঁকা দেওয়া। তাদেরকে ঘুষ দেওয়ার প্ররোচনা দেওয়া, প্রতারণা করা; যাতে তারা জনগণের ভোট পায়। কারণ, এটা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বেশ প্রভাব সৃষ্টি করে।

আমার যা বলার ছিল, তা তো আমি বললাম, বাকি আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

ইসলামে 'নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শাসক' এমন শাসন-ব্যবস্থা কখনোই ছিল না; না খুলাফায়ে রাশিদার যুগে, আর না উমাইয়া-আব্বাসিদের যুগে। বরং সবাই 'সব সময়ের' জন্য শাসক হিসাবে থাকতেন—মৃত্যু পর্যন্ত, কিংবা অন্য কেউ জোরপূর্বক ক্ষমতা নেওয়ার আগ পর্যন্ত, অথবা নিজেই পদ থেকে সরে আসার আগ পর্যন্ত। নির্দিষ্ট সময়ের দাবি করেছেন না কোনো সাহাবি, না কোনো তাবিয়ি, আর না কোনো তাবি-তাবিয়ি; বরং তারা আনুগত্যের ওপর বাইআত গ্রহণ করেছেন, যতদিন পর্যন্ত খলিফা আল্লাহ তাআলার হুকুম কার্যকর রাখেন। কিন্তু শেষ যুগে এসে নির্দিষ্ট শাসন-ব্যবস্থার দাবি উঠল—সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৫ বছরের কম বা

---

[১০৫] তাফসীরে ইবনে [illegible]

বেশি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা একটি বিদআত। পশ্চিমা চিন্তায় প্রভাবিত ব্যক্তিরাই শুধু এর স্লোগান দিতে পারে।

তাছাড়া এর কারণে জনগণের সম্পদ, বাইতুল মালের সম্পদ অপচয় করা হয়; কোনো নেক খাতে ব্যয় করা হয় না। এছাড়াও এর কারণে সাধারণ ও বিশিষ্টজনদের পরস্পরের মাঝে বিরোধিতা ও সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হয়, যেমনটি প্রায় সব দেশেই দেখা যায়। এর কারণে বহিরাগত শত্রুকেও একেবারে ঘরের কোণায় নিয়ে আসা হয়। এখন কিছু সমসাময়িক বুদ্ধিজীবী শাসন-ব্যবস্থা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত করার দাবি তুলছেন। দলিল হিসাবে তারা বলছেন—খিলাফত, এটা একটি ওকালাতের চুক্তি, অর্থাৎ নির্বাচন করা নির্বাচনকারীর পক্ষ থেকে পদপ্রার্থীকে উকিল বানানো, যাতে পদপ্রার্থী ভোটারদের পক্ষ থেকে নায়েব বা উকিল হয়ে যায় নেতৃত্বের পরিচালনার ক্ষেত্রে। আর জানা বিষয় যে—উকালতি চুক্তি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে যুক্ত করার ক্ষেত্রে শরিয়তের পক্ষ থেকে কোনো বাধা নেই।

আমাদের জবাব: খিলাফত মানে যদি উকালতের চুক্তি হতো, তাহলে ভোটার বা নির্বাচনকারীর এই সুযোগ থাকত যে, সে চাইলে পদপ্রার্থীকে শাসক হওয়ার পর বরখাস্ত করে দিতে পারে। কারণ, শাসক তো তার উকিল বা নায়েব। কেননা, ওকালাতের ক্ষেত্রে মক্কেলের এই অধিকার আছে যে, সে চাইলেই উকিলকে বরখাস্ত করে দিতে পারে। অথচ খিলাফতের ক্ষেত্রে তো এমনটা নেই। কারণ, *মুসনাদু আহমাদে* আবদুল্লাহ ইবনু আমর থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية فإن خلعها من بعدهعقدها في عنقه لقي الله تبارك وتعالى وليست له حجة
>
> যে ব্যক্তি বাইআত গ্রহণ না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যুর মতো। আর যদি বাইআত গ্রহণের পর তা খুলে ফেলে, তাহলে সে আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলার মুখোমুখি হবে এ অবস্থায় যে, তার সাথে কোনো প্রমাণ নেই।[১৩৬]

আরেকটি হাদিস আছে আবদুল্লাহ বিন উমার রা. এর। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

> من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات مِيتة جاهلية، رواه مسلم
>
> যে ব্যক্তি বাইআত থেকে হাত সরিয়ে ফেলে, সে কিয়ামতের দিন কোনো প্রমাণ ছাড়া আল্লাহ তাআলার মুখোমুখি হবে। আর যে মৃত্যুবরণ করবে

---

[১৩৬] [illegible]

> এ অবস্থায় যে, তার গলায় (জিম্মায়) কোনো বাইআত নেই, তাহলে তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যুর মতো হলো।[১৫৭]

বাইআত থেকে হাত সরিয়ে ফেলা বা খুলে ফেলার অর্থ বাইআত ভঙ্গ করা। বাইআত ভঙ্গ করাকে সরিয়ে ফেলা বলা হয় এ কারণে যে, বাইআত গ্রহণকারী বাইআতকারীর হাতে হাত রাখে। যেহেতু হাত রাখাকে বাইআত গ্রহণ করা বলা হয়, তাই বাইআত ভঙ্গ করাকে বলা হয় হাত সরিয়ে ফেলা। তবে আমি বলি, এখানে তিনটি বিষয় আছে—

এক. জ্ঞানী-গুণীদের মজলিসে খলিফা নির্বাচন করা। এটা মূলত পদপ্রার্থীকে ভোটারদের পক্ষ থেকে যাচাই করার এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তার যোগ্যতার বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো।

দুই. তার হাতে জ্ঞানী-গুণীদের বাইআত গ্রহণ, যাকে তারা নেতৃত্বের জন্য নির্দিষ্ট করেছে এবং তার যোগ্যতার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে। এটা তাদের মাঝে এবং নতুন খলিফার মাঝে চুক্তি এই মর্মে যে—তারা ইমামের কথা শোনা ও মানাকে আবশ্যক করে নেবে, যদি সেটা নাফরমানি না হয়। একই সাথে খলিফাও আবশ্যক করে নেবে তাদের হক আদায় করার এবং তাদের দ্বীনের হেফাজত করার। এই চুক্তির মাধ্যমেই তিনি খলিফা হবেন, তাই এই বাইআতকে (বাইআতুল ইনয়িকাদ) নেতৃত্ব সংগঠিত হওয়ার বাইআত বলে।

তিন. জ্ঞানী-গুণীদের বাইআত শেষ হওয়ার পর আনুগত্যের বিষয়ে সাধারণ জনগণের বাইআত। এই বাইআতকে আনুগত্যের বাইআত বলা হয়।

শাসন-ব্যবস্থা সুনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত হওয়ার বিষয়ে তাদের আরেকটি দলিল হলো—শরিয়তে এমন কোনো স্পষ্ট দলিল নেই, যা শাসন-ব্যবস্থা সুনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত হওয়াকে নিষেধ করে।

আমরা বলি—অনির্দিষ্টভাবে খুলাফায়ে রাশিদার এবং পরবর্তী ন্যায়নিষ্ঠ শাসকদের শাসন করাটাই এক্ষেত্রে আদর্শের মাপকাঠি। কারণ, আমাদেরকে খুলাফায়ে রাশিদার সুন্নাহর অনুসরণ করতে আদেশ করা হয়েছে। যেমন: ইরবাজা ইবনু সারিয়া রা.-এর দীর্ঘ হাদিসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> وسَتَرَوْن مِن بعدِي اختلافًا شديدًا؛ فعليكم بسنتي وسنةِ الخلفاءِ الراشدين المَهْدِيين، عَضُّوا عليها بالنَّواجِذِ وإيَّاكم والأمورَ المُحْدَثاتِ؛ فإن كلَّ بدعةٍ ضلالةٌ.
>
> আমার পরে তোমরা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাহ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাহকে আঁকড়ে

[১৫৭] সহিহ মুসলিম, ১৮৫১

ধরো। তোমরা সেই সুন্নাহকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরো। তোমরা প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থেকো। কারণ, প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত, আর বিদআতের পরিণাম ভ্রষ্টতা।[১৩৮]

আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, খুলাফায়ে রাশিদার একটি সুন্নাহ হলো অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত শাসন-ব্যবস্থা। তাছাড়া নির্দিষ্টকালের মাঝে বিভিন্ন ক্ষতি তো আছেই।

ফায়দা : ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ একবার মাসজিদুল হারামে বসে ছিলেন। তিনি বললেন—তোমরা আমাকে যা-ই জিজ্ঞাসা করবে, আমি কুরআনে কারিম থেকে এর উত্তর দেব।

তখন এক ব্যক্তি বলল, মুহরিম যদি কোনো ভিমরুলকে মেরে ফেলে, তাহলে এর হুকুম কী?

তিনি উত্তরে বললেন—মুহরিমের ওপর কোনো কিছুই আবশ্যক হবে না।

লোকটি এবার প্রশ্ন করল—এটা কুরআনের কোথায় আছে?

তিনি বললেন—আল্লাহ তাআলা বলেছেন—'আর রাসুল তোমাদের যা দেবে, সেটাই তোমরা গ্রহণ করো।' তারপর তিনি সনদ উল্লেখ করে বললেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত সনদ উল্লেখ করার পর বলেন—উমার রা. বলেছেন—মুহরিম ভিমরুলকে হত্যা করতে পারে।[১৩৯]

***

খলিফা হওয়ার শর্ত ও বৈশিষ্ট্য

ইমামতে কুবরা (বড়ো নেতৃত্ব) বলা হয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে দ্বীন-দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে নেতৃত্ব গ্রহণ।[১৪০] ইমামতকে কুবরা বলা হয়েছে যাতে ইমামতে সুগরা (ছোটো নেতৃত্ব) বের হয়ে যায়। ইমামতে সুগরা মানে নামাজের ইমামতি করা।

ইমামতে কুবরার জন্য শর্তাবলি—

০১. মুসলিম হওয়া। কারণ কোনো কাফির কোনো মুসলিমের ওপর কর্তৃত্ব রাখতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

আর কিছুতেই আল্লাহ মুসলিমদের ওপর কাফিরদের কর্তৃত্ব রাখবেন না।[১৪১]

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা আমাদের কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতেই নিষেধ করেছেন। তাহলে আমরা কীভাবে তাদেরকে আমাদের শাসক বানাবো? আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ

মুমিনগণ, তোমরা এমন সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করো না, যাদের ওপর আল্লাহ ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন।

আর এটা স্পষ্ট যে, তাদেরকে শাসক বানানো বন্ধুত্বের স্তর থেকেও অনেক উপরে।

০২. স্বাধীন হওয়া। কারণ, দাসের তো নিজের ওপরই কর্তৃত্ব নেই, অন্যের ওপর কর্তৃত্ব রাখবে কী করে। অন্যের ওপর কর্তৃত্ব থাকলে হলে নিজের ওপর কর্তৃত্ব থাকতে হয়।

০৩. পুরুষ হওয়া। কারণ, নারীদেরকে ঘরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং

মূল অবস্থাই হচ্ছে নিজেকে আবৃত করে রাখা। এদিকে ইশারা করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

যে জাতির শাসক কোনো নারী, সে জাতি কখনো সফল হতে পারে না।[১৪২]

আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সাল্লাম থেকে শোনা একটি হাদিস জঙ্গে জামালে আমার খুব উপকার করেছে। তখন আমি জঙ্গে জামালের যোদ্ধাদের সাথে মিলিত হয়ে লড়াই করতে চাচ্ছিলাম। (হাদিসটি হলো,) যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, পারসিকরা কিসরার মেয়েকে নিজেদের শাসক বানিয়েছে, তখন তিনি বললেন—

لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة

‘যে জাতির শাসক কোনো মহিলা, সে জাতি কখনো সফল হতে পারে না।[১৪৩]

আবু বাকরা রা. উক্ত হাদিসের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছেন যে, আয়িশা রা. যদিও তিনি উম্মুল মুমিনিন, নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ফকিহা, উভয় জাহানে নবীজির সঙ্গিনী তবুও তিনি এই হাদিসের কারণে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য নন। তাহলে অন্যান্য নারীরা তো আরও আগেই যোগ্য নয়! তাছাড়া শাসন-ব্যবস্থা অনেক গুরুদায়িত্বের দাবি রাখে, যা নারীদের স্বভাব-প্রকৃতির বাইরে! কারণ, নারীরা বুদ্ধি ও দ্বীনের ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ যেমনটি হাদিসে আছে।

আল্লাহ তাআলা নারীদের স্থান সুরক্ষিত করে রেখেছেন। অর্থাৎ, সন্তানদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঘরকে তার স্থান বানিয়েছেন তারই সুরক্ষার জন্য। কারণ, নারীরা খুবই দুর্বল। তারা নিজের থেকেই অন্যের ক্ষতি ঠেকাতে পারে না, তাহলে শাসক হওয়ার পর কীভাবে জনগণ থেকে অনিষ্ট রোধ করবে। এজন্যই সমস্ত আহলে ইলম একমত যে, কোনো নারীর শাসক হওয়া বৈধ নয়।

নারীরা শাসক হলে যে সকল সমস্যা দেখা দেবে—

প্রথমত : রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কাজে বের হতে হবে। আর এজন্য পুরুষদের সাথে আবশ্যিকভাবেই মিলতে হবে। অথচ ইসলাম নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ থেকে নিষেধ করেছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان

[১৪২] সহিহ বুখারি : ৪৪২৫

[১৪৩] সহিহ বুখারি : ৪৪২৫

> যখনই কোনো পুরুষ কোনো (গাইরে মাহরাম) নারীর সাথে মিলিত হয়, তখন শয়তানের তাদের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত হয়।[১৪৩]

তাছাড়া এরকমভাবে বাহিরে থাকলে নিজের ঘরে স্থির থাকা সম্ভব হয় না। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন—'আর তোমরা নিজেদের ঘরে স্থির থাকো।'[১৪৪]

এখানে 'তোমরা' বলে যদিও নবীপত্নীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু এই বিধান সমস্ত নারীর জন্যই কার্যকর। আল্লামা আলুসি রহ. বলেন—'এই আয়াতের উদ্দেশ্য নবীপত্নীদের রা. ঘরে থাকার নির্দেশ দেওয়া। আর ঘরে থাকার বিষয়টি প্রত্যেক নারীর কাছ থেকেই কাম্য।

ইবনু মাসউদ রা. থেকে ইমাম তিরমিজি এবং বাজ্জার রহ. বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> إن المرأة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها
>
> নারী হচ্ছে আবরণীয় সত্ত্বা। যখন সে (ঘর থেকে) বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষদের চোখে শোভামণ্ডিত করে তোলে। আর যখন সে ঘরে অবস্থান করে, তখন তার রবের অধিক নিকটবর্তী থাকে।

বাজ্জার রহ. আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—নারীরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, পুরুষরা তো ভালো ভালো কাজ ও জিহাদ করতে পারছে। অতএব, আমাদের কি এমন আমল করার সুযোগ আছে, যার মাধ্যমে মুজাহিদদের সাওয়াব অর্জন করতে পারি?'

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—'তোমাদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকবে, তারাই আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদদের সাওয়াব অর্জন করতে পারবে।[১৪৬]

তাফসিরে কুরতুবিতে (১৪/১৭৯) আছে—'এই আয়াতে ঘরে অবস্থান করার আদেশ করা হয়েছে। যদিও এখানে বাহ্যিকভাবে নবীপত্নীদেরকে রা. সম্বোধন করা হচ্ছে, তবে পরোক্ষভাবে অন্যান্য নারীরাও শামিল। কারণ, এখানে এমন কোনো নির্দেশনা নেই, যা নির্দিষ্ট বোঝায়। তাছাড়া নারীদের ঘরে থাকা এবং প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়ার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে শরিয়তে বহু প্রমাণাদি রয়েছে, যেমনটি অনেক জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ তাআলা নবীপত্নীদের রা. ঘরে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর তাদের সম্মানার্থে কেবল তাদেরকে সম্বোধন করেছেন।'

---

[১৪৩] জামি তিরমিজি, ২১৬৫

[১৪৪] সূরা আহজাব, আয়াত: ৩৩

[১৪৫] রুহুল মাআনি, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৮৮

দ্বিতীয়ত : রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কাজ করতে গেলে কখনো অনেক কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়, কখনো বিশাল বড়ো দায়িত্ব এবং গুরুভার বিষয় নিয়ে অগ্রসর হতে হয়, শক্তিধর পুরুষরা ছাড়া অন্য কেউ এক্ষেত্রে আগে বাড়তেই পারে না। তাহলে একজন দুর্বল নারী কীভাবে এ দায়িত্ব কাঁধে নেবেন।

তৃতীয়ত : কর্তৃত্ব শুধু পুরুষদের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন—

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

'পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্ববান।'[১৪৭]

০৪. বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া : মাওয়ারদি রহ. কাজির শর্তাবলি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন—সাধারণ জ্ঞানের মাধ্যমে অর্জিত যে বোধ-বুদ্ধি দ্বারা বান্দা মুকাল্লাফ[১৪৮] হয়, সে বোধবুদ্ধি বা আকল কাজি হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ না সে ভালো-খারাপের মাঝে নিখুঁতভাবে পার্থক্য করতে পারে, ভালোভাবে চৌকসতা লাভ করতে পারে, ভুল-ভ্রান্তি থেকে দূরে থাকতে পারে, মেধার প্রখরতা দিয়ে বিবেচনা করতে পারে, ভুল-ভ্রান্তি থেকে দূরে থাকতে পারে, মেধার মাধ্যমে কোনো জটিল বিষয়ের সমাধান দিতে পারে, যেকোনো দুর্বোধ্য জিনিসের ফায়সালা করতে পারে (এমন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই কাজি হওয়ার যোগ্য)।[১৪৯]

সুতরাং, যদি কাজি হওয়ার জন্যই মেধা, চৌকসতা শর্ত হয়, শুধু বিচারবুদ্ধি যথেষ্ট না নয়; তাহলে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তো আরও আগেই এটা শর্ত করা হবে। কারণ, নেতৃত্ব কাযার অনেক ঊর্ধ্বে।

০৫. বালেগ হওয়া।

০৬. সক্ষম হওয়া। অর্থাৎ এমন সামর্থ্য থাকা, যাতে সে হুকুম-আহকাম কার্যকর করতে পারে, জালিমের বিপক্ষে এবং মাজলুমের পক্ষে ইনসাফ করতে পারে, সীমান্ত পাহারা দিতে পারে, দ্বীন ইসলামকে রক্ষা করতে পারে, ইসলামের হদ কায়েম করতে পারে। কারণ, খলিফা নির্ধারণ করার এটাই উদ্দেশ্য।

০৭. কুরাইশ বংশের হতে হবে—হাশিমি বা উলাবি কিংবা মাসুম হওয়া শর্ত না। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—(الأئمة من قريش) নেতা হবে শুধু কুরাইশ বংশ থেকে।

এ কারণে আনসারি সাহাবিগণ কুরাইশদের জন্য খিলাফত ছেড়ে দিয়েছেন। এ হাদিসের মাধ্যমে দারারিয়্যা এবং কা'বিয়্যা সম্প্রদায়ের একটি আকিদা বাতিল প্রমাণিত হয়। দারারিয়্যারা বলে—নেতৃত্ব কুরাইশ বংশ ছাড়া অন্য বংশও গ্রহণ

[১৪৭] সূরা নিসা, আয়াত: ৩৪

[১৪৮] শরিয়তের বিধিবিধান পালন করা যায় ওপর আবশ্যক

[১৪৯] আল আহকামুস সুলতানিয়াহ

করতে পারে। আর কা'বিয়্যারা বলে—(কুরাইশ ছাড়া অন্যান্য বংশ নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে, তবে) কুরাইশ বংশ বেশি হকদার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم

নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সবাই কুরাইশের অনুসরণ করবে। তাদের মুসলিমরা মুসলিমদের এবং তাদের কাফিররা কাফিরদের।[১৫০]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন—

إن هذا الامر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين

এ বিষয়টি (নেতৃত্ব) শুধু কুরাইশদের মাঝেই থাকবে, যতদিন তারা দ্বীন কায়েম রাখবে। যে তাদের সাথে এ বিষয়ে শত্রুতা করবে, আল্লাহ তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করবেন।[১৫১]

তবে নেতৃত্বের জন্য হাশিমি হওয়া শর্ত নয়। হাশিমি দ্বারা উদ্দেশ্য হাশিম ইবনু আবদে মানাফের বংশ। শিয়ারা আবু বকর, উমার, উসমান রা.-এর খিলাফতকে বাতিল করার জন্য এটাকে শর্ত বলে।

তদ্রূপ উলাবি হওয়াও শর্ত নয়। উলাবি দ্বারা উদ্দেশ্য আলি রা.-এর বংশধর। কিছু কিছু শিয়ারা আব্বাসিদের খিলাফতকে বাতিল করার জন্য এটাকে শর্ত বলে।

তদ্রূপ মাসুম বা নিষ্পাপ হওয়া শর্ত নয়। ইসমাঈলিয়্যারা এবং ইসনা আশারিয়্যারা, অর্থাৎ ইমামিয়্যারা এটাকে শর্ত বলে।[১৫২]

কুরাইশদের মাঝে নেতৃত্ব সীমাবদ্ধ থাকার কারণ উল্লেখ করে দেহলভি রহ. বলেন—'আল্লাহ তাআলা নবীজির সামনে যে 'হক' তুলে ধরেছেন, সেটা কুরাইশদের ভাষা, রীতিনীতি অনুযায়ীই তুলে ধরেছেন। শরিয়তের আহকাম ও হুদুদের অধিকাংশই তাদের মাঝে আগে থেকেই ছিল। ফলে তারা এই দ্বীন ইসলামের ক্ষেত্রে অধিক যোগ্য এবং ইসলামের শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে তারাই বেশি দৃঢ়। তাছাড়া কুরাইশ বংশ হলো নবীর বংশ, শুধু নবীজির নিসবতেই তারা গৌরবান্বিত। তদ্রূপ তাদের মাঝে দ্বীনি গাইরত ও বংশীয় চেতনা দুটোই বিদ্যমান। তাই, তারা শরিয়ত কায়েম করা এবং তা ধরে রাখার প্রাণকেন্দ্র। তাছাড়া খলিফা হওয়ার জন্য আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন। যেমন—

[১৫০] সহিহ বুখারি, ৩৪৯৫
[১৫১] সহিহ বুখারি, ৩৫০০
[১৫২] রদ্দুল মুহতার

- (ক) এমন বংশের হতে হবে, যার বংশীয় প্রতাপ দেখেই মানুষ তার আনুগত্য করতে বাধ্য। কারণ, যার কোনো বংশ নেই মানুষ তাকে খুবই নিম্নশ্রেণির মনে করে।
- (খ) এমন বংশের হতে হবে, যারা পূর্ব থেকে নেতৃত্ব আঞ্জাম দিচ্ছে।
- (গ) তার বংশ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে, যেকোনো শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অভ্যস্ত।
- (ঘ) তার বংশধরকে এত শক্তিশালী হতে হবে, যাতে তাকে যেকোনো বিপদে রক্ষা করতে পারে, এমনকি তার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে।

বলাবাহুল্য যে, এ সকল গুণ শুধু কুরাইশ বংশের মাঝেই সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। বিশেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে আগমনের পর আবু বকর রা. এদিকে ইঙ্গিত করেই বলেছিলেন—এই নেতৃত্ব কুরাইশ বংশের মাঝে পাওয়া যাবে। কারণ, বাসস্থানের দিক থেকে তারাই আরবের শ্রেষ্ঠ।[১৫৩]

উপরোল্লিখিত সকল শর্ত আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সবার শর্ত। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সবার কাছে মানিত 'কুরাইশ' ছাড়া। কারণ, এক্ষেত্রে কিছু উলামায়ে কিরাম, যেমন—আবু বকর বাকিল্লানি-সহ আরও অনেকের কাছে কুরাইশ বংশের হওয়া শর্ত না। বিস্তারিত আলোচনা খিলাফত ও আকিদার কিতাবসমূহে আছে।

০৮. অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের নিকট আদেল বা নেককার হওয়া শর্ত। সুতরাং তাদের মতে—আদিল (ন্যায়পরায়ণ) পাওয়া গেলে ফাসিককে খলিফা বানানো যাবে না। তবে হানাফিদের নিকট এটা অগ্রাধিকার পাওয়ার শর্ত, নেতৃত্ব সহিহ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। সুতরাং, ফাসিককে শাসক বানানো জায়িজ তবে মাকরুহ। আর যদি কোনো আদিলকে শাসক বানানোর পর ফাসিকও জালিম হয়ে যায়, তাহলে সে বরখাস্ত হবে না। তবে উত্তম হচ্ছে, ফিতনা সৃষ্টি না হলে বরখাস্ত করে দেওয়া। তবে (ফিতনার ভয় থাকলে) তার বিরুদ্ধে করা যাবে না। বরং, তার আনুগত্যের দিকে মানুষকে ডাকা হবে।[১৫৪]

০৯. মুজতাহিদ হওয়া। এটাও প্রায় সবার কাছে নেতৃত্বের শুদ্ধতার জন্য শর্ত। কিন্তু হানাফিদের নিকট অন্যের ওপর অগ্রাধিকার পাওয়ার শর্ত। তবে এই যুগে যেহেতু কোনো মুজতাহিদ নেই, তাই মুকাল্লিদ (অন্যের মাজহাব অনুসরণকারী) আলেম হওয়াই যথেষ্ট।

[১৫৩] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ২/২৩১
[১৫৪] রদ্দুল মুহতার

ইমাম শাতিবি *ইতিসাম*-এ (২/১৫২) বলেন—উলামায়ে কিরাম একমত যে, ইমামতে কুবরার জন্য মুজতাহিদ ও মুফতি হওয়া শর্ত, যেভাবে তারা সবাই কিংবা প্রায় সবাই একমত যে, কাজি হওয়ার জন্য মুজতাহিদ হওয়া শর্ত।

তাদের এ কথা একদিক থেকে ঠিক আছে। কিন্তু আমরা যখন চিন্তা করি যে, বর্তমান যুগে কোনো মুজতাহিদ নেই, অথচ মুসলিমদের একজন ইমাম প্রয়োজন—যিনি হুকুম-আহকাম পরিচালনা করবেন, বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ দমন করবেন, মুসলিমদের জান-মালের নিরাপত্তা দেবেন, তাহলে একজন যোগ্য ব্যক্তিকেই নেতা বানানো হবে; যদিও সে মুজতাহিদ না হয়। কারণ, এখানে দুটো অবস্থা হয়—মানুষকে শাসকবিহীন রেখে দেওয়া হবে, যা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, অথবা একজন যোগ্য ব্যক্তিকে শাসক বানানো হবে, যাতে বিশৃঙ্খলা দূর হয়। সত্যি বলতে, একজন মুজতাহিদ শাসকও হয়তো খুঁজলে এমন পাওয়া যাবে না—যার কি না কোনো খুঁত বা সমস্যা নেই। কারণ, বিধিবিধান আবশ্যক হয় সাধ্যের বিবেচনায় (যা বর্তমানে আমাদের নেই)।

(মুজতাহিদের স্থানে) মুকাল্লিদ আলিমকে শাসক বানানো একটি কল্যাণমূলক চিন্তা, যার প্রয়োজনীয়তা খিলাফতের মূল উদ্দেশ্য থেকেই বুঝে আসে! এটা এতটাই সুনিশ্চিত যে, তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

এ বিষয়টি যদি বাহ্যত 'ইজমার' বিপরীত, কিন্তু বস্তুত ইজমা সাব্যস্ত হয়েছে এ কথা চিন্তা করে যে, সব যুগেই মুজতাহিদ থাকবেন (কিন্তু আমাদের যুগটা মুজতাহিদ শূন্য)। তাই বিষয়টি এমন হয়ে গেল যে, যেন এ বিষয়ে কোনো আলোচনা বা বিধানই পাওয়া যায় নি। (কারণ, তাদের ইজমা ছিল মুজতাহিদ-যুক্ত যুগের ক্ষেত্রে, মুজতাহিদ-মুক্ত যুগের জন্য কেউ কোনো আলোচনাই করেন নি)। সুতরাং, এখানে প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করা হবে।

১০. চোখ, কান, হাত ও পা সুস্থ থাকতে হবে। অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের অভিমত এই যে, এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভালো থাকা নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য শর্ত। সুতরাং, তাদের কাছে অন্ধ, বধির, হাত-পা কাটা লোক শাসক হতে পারবে না। আবার যদি পরবর্তী সময়ে এসব দেখা যায়, তাহলেও বরখাস্ত হয়ে যাবে। কারণ, তখন সে জনগণের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আঞ্জাম দিতে পারবে না। সুতরাং, এ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অচল হয়ে গেলে সে নেতৃত্বের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে।

কোনো কোনো ফকিহ বলেন—এগুলো শর্ত না। সুতরাং, শাসকের শরীর কাঠামোতে যদি শারীরিক অসুস্থতা বা অসম্পূর্ণতা থাকে; যেমন: অন্ধত্ব, বধিরতা, হাত-পা, নাক কাটা, কুষ্ঠরোগ থাকে, তাহলে তাদের মতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ,

কুরআন-হাদিস বা ইজমার কোথাও এগুলোকে নিষেধ করা হয় নি।[১১১] 'খলিফা অপসারণ করা' শিরোনামে এর কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

অযোগ্য শাসককে উৎখাত করা

যদি অযোগ্যকে শাসককে উৎখাত করা এবং যোগ্যকে শাসন ক্ষমতায় বসানোর ক্ষেত্রে ফিতনার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তাকে উৎখাত করা যাবে না। তদ্রূপ যদি যোগ্য ব্যক্তি না থাকায় অযোগ্য ব্যক্তিকে শাসন ক্ষমতায় বসানো হয়, সাথে সাথে তার ক্ষমতা পাকাপোক্তও হয়ে যায়, তারপর যোগ্য ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে; তাহলে তাকে উৎখাত করা, অথবা তার পরিবর্তে অন্য কাউকে শাসন ক্ষমতায় বসানো মুসলিমদের জন্য বৈধ নয়, যদি তাতে ফিতনা ছড়ানোর আশঙ্কা থাকে।

ইমাম শাতিবি রহ. *ইতিসাম* গ্রন্থে (২/১৫৩) লিখেছেন—'ইমাম গাজালি রহ. *বাইআতুল মাফযুল মাআ উজুদিল আফজাল* কিতাবে বলেন, মুজতাহিদ আর গাইরে মুজতাহিদের মাঝে যদি শাসন-পদের বিচার করা হয়, তাহলে মুজতাহিদকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। কারণ, মুজতাহিদ নিজের ইলমের ওপর স্বনির্ভর, আর গাইরে মুজতাহিদ পরনির্ভর; আর স্বনির্ভরতা একটি গুণ। মূলনীতি হলো, বৈশিষ্ট্য বা গুণকে বিবেচনা করার সুযোগ থাকলে সেটাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।'

অপরদিকে, যদি বাইআত বা পূববর্তী শাসকের অসিয়তনামার মাধ্যমে কোনো গাইরে মুজতাহিদকে শাসক বানানো হয়, অতঃপর তার শক্তি ও প্রতাপ পাকাপোক্ত হয়ে যায়, সবাই তার আনুগত্যও স্বীকার করে নেয়, তাহলে তাকে বহাল রাখা হবে, যদি তখন কুরাইশ, ইজতিহাদ ও অন্যান্য শর্তাবলি কারও মাঝে না পাওয়া যায়।

আর যদি পরবর্তী সময়ে খিলাফতের শর্তাবলি আছে এমন কাউকে পাওয়া যায়, কিন্তু অযোগ্যকে অপসারণ করলে অনেক ফিতনা ও সমস্যা সৃষ্টি হয়, তাহলে তাকে অপসারণ করা যাবে না, তার পরিবর্তে অন্য কাউকে আনা যাবে না; বরং তার আনুগত্য আবশ্যক থাকবে, তার শাসন চালিয়ে নেওয়া হবে।

মোটকথা, তার নেতৃত্ব সহিহ থাকবে। কারণ, ইজতিহাদের উদ্দেশ্য অতিরিক্ত ফায়দা। অর্থাৎ, অন্যের অনুসরণে অমুখাপেক্ষিতা এবং নিজের জ্ঞানের ওপর স্বনির্ভরতা লাভ। আর খিলাফতের উদ্দেশ্য মতপার্থক্যের দরুন যেন ফিতনা সৃষ্টি না হয়, সবাই যাতে এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়। এখন ক্ষুদ্র কিছু লাভের চিন্তা এবং নিছক অপ্রয়োজনীয় ফায়দা লাভের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করে, আইন-কানুনের ধার না ধরে গোলমাল করে বৃহৎ এবং মূল ফায়দা বিসর্জন দেওয়া কীভাবে বৈধ হতে পারে?
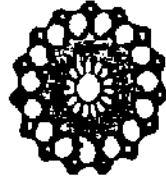
খলিফার দায়-দায়িত্ব

মানুষ সামাজিক প্রাণী। মানুষ সমাজ ছাড়া চলতে পারে না। ফলে বিভিন্ন সময় মতভিন্নতা ও বিরোধিতা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। তাই, এমন কিছু আইন-কানুন প্রণয়ন করা প্রয়োজন—যা সবাই মেনে নেবে। সবাই এসব বিধিবিধান পালন করবে। এ সকল বিধিবিধানের মাধ্যমে তাদের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করা হবে। এখন যদি এসব বিধিবিধান রাষ্ট্রের কর্ণধারদের থেকে প্রণয়ন করা হয়, তাহলে সেগুলো হয় ধর্মহীন কিছু দর্শন। আর এসব বিধিবিধান যদি সৃষ্টিকর্তা মহান রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে প্রণয়ন করা হয়, তাহলে সেগুলো হয় মানুষের দ্বীন-দুনিয়া উভয় জাহানের জন্য কল্যাণকর, ধর্মযুক্ত আইন-কানুন যা জীবনের প্রতিটি প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট। এসব বিধিবিধান বাস্তবায়নের জন্যই আল্লাহ তাআলা রাসুলদের এবং তাদের খলিফা হিসেবে ইসলামি রাষ্ট্রের শাসকদের প্রেরণ করেছেন। সুতরাং খলিফার কর্তব্য হলো এই বিধিবিধানগুলো জনগণের মাঝে বাস্তবায়ন করা।

এখানে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে খলিফার কিছু মৌলিক দায়িত্ব তুলে ধরছি। বড়ো বড়ো কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

নিজেকে পরিচালনা

খলিফার সর্বপ্রথম কাজ হলো নিজেকে পরিচালনা করা। নিজের মাঝে উত্তম আখলাক ধারণ করা, যাতে তিনি ভালো ভালো কাজ আঞ্জাম দিতে পারেন। তিনি নিজেকে পরিচালনা করার পর জনগণকে পরিচালনা করবেন, নিজেকে ঠিক করার পর তাদেরকে ঠিক করবেন, না হয় তিনি ওই ব্যক্তির মতো হয়ে যাবেন—যে কাঠ সোজা না করে কাঠের ছায়াকে সোজা করতে চায়। তিনি যদি নিজেকে পরিচালনা শুরু করেন, তাহলে অন্যকে আরও ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারবেন। আর যদি নিজেকে এড়িয়ে যান, তাহলে তিনি জনগণদেরও এড়িয়ে যাবেন। কারণ, যে নিজেই ভালো না সে আবার অন্যকে কীভাবে ভালো করবে?

অতএব, নিজের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। কারণ, নিজেকে ঠিক করার দায়িত্ব নিজেরই (অন্য কেউ করে দেবে না)। এখন, কেউ যদি নিজের কাছেই কাবু হয়ে যায়, তাহলে তো অন্যের কাছে পর্যদুস্ত হয়েই যাবে। নিজেকে পরিচালনা করাই যদি কষ্টকর হয়, তাহলে তো অন্যকে পরিচালনা করা অসাধ্যকর হয়ে পড়বে।[১৫৬]

নিজেকে পরিচালনা ও পরিশুদ্ধকরণের বেশ কিছু কার্যকর পদ্ধতি

এক. নিজের সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা : কারণ, মানুষ অধিকাংশ সময় চাল-চলন ঠিক করার ব্যাপারে বেখবর থাকে। নিজের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখলে আত্মতুষ্টি চলে আসে। আর আত্মতুষ্টি চলে আসলে নিজের দাসে পরিণত হয়। যার ফলে যে মন্দ স্বভাব ছিল, সেটা তো ভালো হয়ই না; বরং যে ভালো গুণ ছিল, সেটাও আর বাকি থাকে না। কারণ, খাহেশাত মানুষের চিন্তার চেয়েও শক্তিশালী, আর নফস শত্রুর চেয়েও ক্ষতিকর। কারণ, এই নফসই মন্দ বিষয়ের আদেশ করে, প্রবৃত্তির দিকে ছুটে বেড়ায় যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন—'নিঃসন্দেহে, নফস মন্দ বিষয়ে আদেশ দানকারী।'[১৫৭]

এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (ليس الشديد من غلب الناس ولكن الشديد من غلب نفسه) শক্তিশালী সে নয়, যে মানুষকে কাবু করে। বরং সে-ই প্রকৃত শক্তিশালী, যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।'[১৫৮]

দুই. বিনয় : আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান বলেন—'সে-ই শ্রেষ্ঠ মানুষ, যে বড়ো হয়েও দুনিয়ামুখীতা ত্যাগ করে, শক্তিশালী হয়েও ইনসাফ করে।'[১৫৯]

কেউ কেউ বলেন—'যখন কোনো মহৎ বিষয়ে বিনয় অবলম্বন করা হয়, তখন বিনয়ী সেই মহৎ বিষয় থেকে ঊর্ধ্বে উঠে যায়।'

ইমাম মাওয়ারদি রহ. বলেন—'রাজা বাদশাহরা সবচেয়ে বেশি ইচ্ছা-অভিপ্রায় করতে পারে, সবচেয়ে বিস্তৃত আশা-আকাঙ্ক্ষা করতে পারে। তাই, তাদের থেকেই যদি অহংকার ও আত্মতুষ্টি দেখা যায়, তাহলে সেটা খুবই মন্দ। বরং তা সামান্য প্রকাশ পাওয়াও লজ্জাজনক বিষয়। অহংকার ও আত্মতুষ্টির মাঝে পার্থক্য হচ্ছে, যদিও মন্দ হওয়ার ক্ষেত্রে দুটোই সমান, তবে অর্থগত দিক থেকে একটি অপরটি থেকে ভিন্ন। আত্মতুষ্টি নিজের ক্ষেত্রে এবং নিজের বিভিন্ন গুণের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। আর অহংকার বিভিন্ন মর্যাদা ও পদমর্যাদার ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। অতএব, অহংকার বাহির থেকে সৃষ্টি হয়, আর আত্মতুষ্টি নিজের ভেতর থেকেই

---

[১৫৬] তাসহিলুন নাজর, ৪৭

[১৫৭] সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫৩

[১৫৮] মুশকিলুল আসার, ১৬৪৫

[১৫৯] সুনানু বাইহাকি, ৭৮৭৭

সৃষ্টি হয়। আর তাই সেটি অনেকটা অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকে। তবে দুটোই মর্যাদাবান ও গুণী ব্যক্তিদের জন্য কলঙ্ক।[১৬০]

যিনি বলেছেন (প্রবাদ) কতই না সুন্দর বলেছেন—

إذا أردت شريف الناس كلهم/ فانظر الى ملك في زي مسكين/ ذلك الذي عظمت في الله رغبته/ وذاك يصلح للدنيا وللدين

'তুমি যদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে দেখতে চাও, তাহলে এমন বাদশাহকে দেখো—যে গরিব-মিসকিনের বেশে আছে। কারণ, আল্লাহকে পাওয়ার ব্যাকুলতা তার মাঝেই বেশি পরিমাণে রয়েছে। এমন বাদশাহই দ্বীন-দুনিয়ার বাদশাহ হওয়ার যোগ্যতা রাখে।'

তিন. বেশি বেশি পরামর্শ করা : কেননা, সাথিদের সাথে পরামর্শ করা নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি করে, আত্মতুষ্টি দূর করে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন, 'বুদ্ধির দাবি হলো—জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত শোনার পর নিজে সিদ্ধান্ত দেবে। দার্শনিকদের চিন্তা জানার পর নিজে চিন্তা করবে। কারণ, নিজের সিদ্ধান্ত অনেক সময় বিফলে যায়। তদ্রূপ কেবল নিজের একার চিন্তা প্রায় সময় বিপথে যায়।'

চার. আল্লাহর জন্য খাঁটি নিয়ত করা : বান্দা যে আমল আল্লাহর জন্য করে, শুধু সে আমলই আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করে আমল করলেই কেবল তা কবুল হয়। একইভাবে বান্দাদের নিয়ত অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা তাদের সাহায্য করেন। আর খলিফা আল্লাহর সাহায্যের সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী। সুতরাং তার নিয়তই সবচেয়ে বেশি শুদ্ধ হতে হবে।

সালিম ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি উমার রা. উমার ইবনু আবদিল আজিজের কাছে পত্র লিখে বলেন—'নিয়তের পরিমাণ অনুযায়ীই আল্লাহর থেকে সাহায্য আসে। অতএব, যদি বান্দার নিয়ত পূর্ণাঙ্গ হয়, তাহলে আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্তিও পূর্ণাঙ্গ হয়ে আসবে। আর যার নিয়ত কম হবে, আল্লাহর সাহায্য তার জন্য সে পরিমাণই হবে।'

***
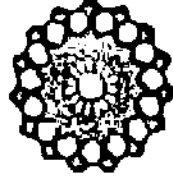
ইমামের সিয়াসাত

খলিফা এবং রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল, সমাজের সবাইকে শরয়ি বিশুদ্ধ সিয়াসাতের অধিকারী হতে হবে।

সিয়াসাত শব্দের তাহকিক: সিয়াসাত শব্দটি কয়েকটি অর্থ প্রকাশ করে—

০১. পরিচালনা করা এবং দেখভাল করা। যেমন, আসমা বিনতু আবি বকর রা. বলেন, আমি জুবাইর রা.-এর ঘরে পারিবারিক খিদমত করতাম। তার একটি ঘোড়া ছিল, আমি সেটার দেখভাল করতাম; কিন্তু ওই ঘোড়ার দেখভাল করার চেয়ে আর কোনো খিদমত আমার কাছে কষ্টকর মনে হতো না। আমি তার ঘাস কাটতাম, তাকে চরাতাম, তার দেখাশোনা করতাম।

আসমা রা. বলেন, তারপর তিনি একজন খাদেম পেয়ে গেলেন। অর্থাৎ, একদল বন্দী এসেছিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। তখন নবীজি তাকে একজন খাদেম দিলেন।

আসমা রা. বলেন—ওই খাদেম ঘোড়াটি দেখাশোনার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল। আর আমি কষ্টমুক্ত হয়ে গেলাম।[১১]

০২. নেতৃত্ব গ্রহণ করা। *মুজামুল লুগাতিল আরবিয়্যাতে* আছে (ساس الناس) মানে লোকদের বিচার করল, তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করল। যেমন বলা হয়—

كان الخلفاء الراشدون يسوسون الناس بالعدل

'খুলাফায়ে রাশিদা ন্যায় এবং ইনসাফের সাথে মানুষের নেতৃত্ব দিতেন।'[১২]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত এক হাদিসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم

বনু ইসরাইলের নেতৃত্ব দিতেন আম্বিয়ায়ে কিরাম আ.। যখনই কোনো নবী মৃত্যুবরণ করতেন, তার পরে আরেকজন নবী আসতেন। তবে শুনে রাখো, আমার পরে আর কোনো নবী নেই। তবে (আমার) খলিফারা থাকবে এবং তারা সংখ্যায় প্রচুর হবে। উপস্থিত সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, (এ ব্যাপারে) আপনি আমাদের কী নির্দেশ দেন?

তিনি বললেন—তোমরা যার হাতে প্রথমে বাইআত গ্রহণ করবে, তার বাইআত পালন করো। তাদেরকে তাদের হক দিয়ে দাও। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাদের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।

'সিয়াসাত' শব্দটির পারিভাষিক অর্থ : ইমাম গাজালি রহ. বলেন—'মানুষকে সংশোধন করা, তাদের সঠিক পথ দেখানো, যা দুনিয়া ও আখিরাতে নাজাত দেবে।'[১৬৩]

ইবনু নাজিম রহ. বলেন—'জনগণের আদব-শিষ্টাচার রক্ষার জন্য, কল্যাণ আনয়নের জন্য, সম্পদের ব্যবস্থা করার জন্য যে সকল আইন-কানুন প্রণয়ন করা হয়, সেগুলোকেই সিয়াসাত বলে।'[১৬৪]

উলামায়ে কিরাম সিয়াসাতের আরও বেশ কিছু অর্থ উল্লেখ করেছেন, প্রত্যেকটির মূল্য উদ্দেশ্য এক। অর্থাৎ, সংশোধন করা।

ইবনু ফারহুন মালিকি বলেন, সিয়াসাত দুই প্রকার—

- ০১. অন্যায়যুক্ত, যা শরিয়তে হারাম;
- ০২. ইনসাফযুক্ত, যা জালিমের কাছ থেকে মাজলুমের হক উদ্ধার করে আনে, অন্যায়-অবিচার রোধ করে, বিশৃঙ্খলাকারীদের দমন করে, যার মাধ্যমে শরিয়তের মৌলিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা যায়।

এ কারণেই শরিয়ত এই সিয়াসাতের আশ্রয় নিতে, সত্য প্রকাশে এই সিয়াসাতের ওপর নির্ভর করতে বলে। এটা বিরাট একটা অঙ্গন, যেখানে মানুষের ভুল বোঝাবুঝি ও পদস্খলন হয়। এই সিয়াসাত না থাকলে বান্দাদের হক নষ্ট হয়ে যাবে, হদ কায়েম বন্ধ হয়ে যাবে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা দুঃসাহস পাবে, হঠকারীদের সবাই রাষ্ট্রীয় সাহায্য পেয়ে থাকবে। তবে সিয়াসাত যত বিস্তৃত ও দলাদলিযুক্ত হবে, জুলুমের দরজা তত বেশি খুলে যাবে, রক্তপাত হবে, বে-আইনিভাবে সম্পদ আত্মসাৎ করা হবে।[১৬৫]

ইমাম গাজালি রহ. সিয়াসাতে শারইয়্যাহকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি বলেন—সিয়াসাত মানে মানুষকে সংশোধন করা, তাদের সঠিক পথ দেখানো, যা

---

[১৬৩] ইহয়াউ উলুমিদ্দিন, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪
[১৬৪] আল-বাহর, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৭৬
[১৬৫] তাবসিরাতুল হুক্কাম : ১৩০

দুনিয়া-আখিরাতে নাজাত দেবে। এই সিয়াসাত চার প্রকার—

০১. সম্মানিত নবীগণের সিয়াসাত : এই চার প্রকারের মাঝে এটা সবচেয়ে উঁচু স্তরের। তাদের যেকোনো হুকুম আম-খাস সবার জন্য, জাহিরি-বাতিনি উভয় ক্ষেত্রেই কার্যকর।

০২. খলিফা ও রাজা বাদশাহদের সিয়াসাত : তাদের সিয়াসাত সাধারণ ও বিশেষ/আম-খাস সবার জন্য, তবে শুধু বাহ্যিক ক্ষেত্রে ভেতরগত বিষয়ে নয়।

০৩. উলামায়ে দ্বীনের সিয়াসাত, যারা নবীদের ওয়ারিস : তাদের হুকুম শুধু বিশেষ ব্যক্তিদের বাতিনি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, সাধারণ লোকেরা তাদের (জালালে ইলমের কারণে, মানে ইলমের অত্যধিক তেজের কারণে) থেকে পুরোপুরি কায়দা হাসিল করতে পারবে না। তদ্রূপ বিশেষ ব্যক্তিদের শক্তি থাকার কারণে জাহিরি ক্ষেত্রে তাদের আদেশ-নিষেধের প্রভাব পড়বে না।

০৪. বক্তাদের সিয়াসাত : তাদের কথা সাধারণদের বাতিনি ক্ষেত্রে।

এই চার প্রকারের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত প্রকার নবুয়তের পর আলিমদের সিয়াসাত ও শিক্ষাদান, মানুষকে মন্দ স্বভাব থেকে পরিশুদ্ধ করা, উত্তম গুণাবলিতে গুণান্বিত করা, তালিম দ্বারা এগুলোই উদ্দেশ্য। এই তালিম অন্য সব ধরনের কাজকর্ম থেকে উত্তম এবং সম্মানিত। কারণ, তিনটি জিনিস বিবেচনায় একটি কাজ সম্মানিত হয়।

এক. স্বভাব-প্রকৃতি বিবেচনায়, যার মাধ্যমে ওই কাজ করা যায়। যেমন: দর্শন সাহিত্যের চাইতে উত্তম। এখানে, উত্তম হওয়া নির্ভর করছে তার স্বভাব-প্রকৃতির ওপর, যার মাধ্যমে দর্শন লাভ করা যায়। কারণ, দর্শন অর্জন করা হয় আকল দ্বারা; আর সাহিত্য শেখা হয় কান দ্বারা। আর জানা বিষয় যে, কানের চেয়েও আকল শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত।

দুই. উপকারের ব্যাপকতার দিকে তাকিয়ে। যেমন—জুয়েলারির চেয়ে কৃষিকাজ শ্রেষ্ঠ।

তিন. কাজের ক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে, যেখানে কাজ করা হয়। যেমন: দাবাগাতের (চামড়া পবিত্র করা) চেয়ে সিয়াসাত বা জুয়েলারি উত্তম। কারণ, জুয়েলারির ক্ষেত্র স্বর্ণ আর দাবাগতের ক্ষেত্র মৃত প্রাণীর চামড়া। তাছাড়া দ্বীনি ইলম—যার মাধ্যমে আখিরাতের পথ খুঁজে পাওয়া যায়—তখনই অর্জন করা যায়, যদি পূর্ণাঙ্গ বোধবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ মেধা থাকে। আর বোধবুদ্ধি একজন মানুষের সবচেয়ে দামি ও গুরুত্বপূর্ণ, যার বিবরণ সামনে আসছে। কারণ, এর মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার আমানত গ্রহণ করা যায়, আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য পাওয়া যায়।[১১১]

---

[১১১] ইয়াহয়াউ উলুমিদ্দিন, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৩

সিয়াসাতে আদেলা বা ইনসাফপূর্ণ শাসন-ব্যবস্থার কিছু মূলনীতি

আল্লামা মাওয়ারদি রহ.-এর আলোচনা অনুযায়ী মূলনীতি চারটি। যথা :

০১. আশা এবং আশ্বাস;

০২. ভয়ভীতি ও কড়াকড়ি;

০৩. ন্যায়নিষ্ঠ শাসন;

০৪. ইনতিসাফ।

এক. জনগণকে যদি আশা-প্রত্যাশা দেওয়া হয়, তাহলেই তারা শাসককে ভালোবাসে, তার আনুগত্য করে, শাসকের জন্য দয়ার উদ্রেক হয়। এই আশা-প্রত্যাশাই সাম্রাজ্য পরিচালনার অনেক শক্তিশালী মাধ্যম।

এখন শাসক যদি জনগণকে আশা-প্রত্যাশা না দেয়, তাহলে তার আইন প্রয়োগে শিথিলতা চলে আসবে, জনগণ কৃত্রিমতা ও অনিচ্ছার সাথে নিয়মনীতি মানবে, শাসকের অমঙ্গাল ও ক্ষয়ক্ষতির অপেক্ষায় থাকবে, সামান্য কোনো সমস্যা হলে খুব দ্রুতই অবাধ্য হয়ে পড়বে। মোটকথা, তখন শাসক হয় তাদের গোপন ষড়যন্ত্র অথবা প্রকাশ্য বিরোধিতার সম্মুখীন হবে। এ দুয়ের মাঝে অন্য কোনো কিছু নেই।

দুই. ভয়ভীতি অর্থাৎ কড়াকড়ি করলে বিরোধীরা ও শৃঙ্খলরা শাসকের ক্ষমতার প্রতাপে, ধর-পাকড়াও এর ভয়ে বিরোধিতা ও শৃঙ্খলা থেকে দূরে থাকে। মূলত এটাও রাজ্যকে সুষ্ঠু রাখার বড়ো একটি উপায়। এখন যদি আশা এবং আশঙ্কা দুটো একত্র করা হয়, তাহলে আশ্বাস তাদের আনুগত্যের পথে রাখবে। আর কড়াকড়ি তাদের অবাধ্যতা করতে বাধা দেবে। তাদের মাঝে আশার আলো জ্বলে উঠবে, শ্রদ্ধাবোধও তৈরি হবে। ফলে শাসকের ক্ষমতা শক্তিশালী হয়ে উঠবে, তার সহযোগিতাও ঠিক থাকবে।

তিন. শাসককে ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে, সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করতে হবে। এই ন্যায়ের মাধ্যমেই জনগণের অবস্থা ঠিক থাকবে, সাম্রাজ্যের বিষয়াদি সুবিন্যস্ত হবে। যে দেশের শাসক ইনসাফ করে না, ন্যায়ের চেয়ে অন্যায় বেশি করে; সে দেশ কখনোই টিকে থাকতে পারে না। কারণ, সামান্য জুলুমই বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে। এখন যদি জুলুমের পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে অবস্থা কী হতে পারে?

কোনো কোনো উলামায়ে কিরাম বলেন—কোনো কাফিরের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, কিন্তু কোনো জালিমের রাজত্ব বেশি দিন টিকতে পারে না। এ উক্তিকে একজন কবিতা বানিয়ে বলেছে—

عليك بالعدل إن وليت مملكه/ واحذر من الجور فيها غاية الحذر/ فالملك

يبقى على الكفر [illegible] ولا/ يبقى على الجور في بدو وفي حضر

'তোমাকে যখন কোনো ভূখণ্ডের অধিপতি বানানো হয়, তখন ইনসাফ করো, পুরোপুরি জুলুম থেকে বিরত থাকো সেখানে। কারণ, কোনো কট্টর কাফিরও রাজত্ব করলে দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে, কিন্তু কোনো জালিমের শাসন বেশি দিন টিকতে পারে না—না শহরে, আর না মরু-পল্লিতে।

চার. ইনতিসাফ : ইনতিসাফ মানে ন্যায্যভাবে (জনগণের ওপর) রাষ্ট্রের আবশ্যকীয় হকগুলো পূর্ণরূপে উসুল করা। কারণ, এতেই রাজত্ব গতিশীল থাকবে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, দেশের মর্যাদা প্রকাশ পাবে, দেশের আইন-কানুন সুদৃঢ় হবে।[১৬৭]

উল্লিখিত চারটি মূলনীতির আলোকে দেশ পরিচালনা করার শর্ত মোট তিনটি—

০১. মূলনীতিগুলোর ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে, প্রচলনের বাইরে যাওয়া যাবে না। যদি বেশি বাড়াবাড়ি বা অতি ছাড়াছাড়ি করে, তাহলে সেটা হবে নিন্দাযোগ্য কাজ। কারণ, বেশি আশা দেওয়া যেমন দূষণীয়, তেমনি বেশি কড়াকড়ি করাও একটি ত্রুটি। তদ্রূপ দুটোর ক্ষেত্রে ছাড়াছাড়ি করলে হিতে বিপরীত হবে।

০২. এই মূলনীতিগুলো যথোপযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করতে হবে। সুতরাং আশ্বাস দেওয়ার স্থানে ভয় দেখাবে না। আবার ভয় দেখানোর স্থানে আশ্বাস দেবে না। তাহলে কিন্তু দুটোই হাতছাড়া হয়ে যাবে। তখন অবস্থা হবে ওই ব্যক্তির মতো, যে ক্ষুধার কারণে পানি পান করে, আর পিপাসার কারণে খাবার খায়। ফলে পিপাসাও দূর হবে না, ক্ষুধাও মিটবে না। কোনো কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, রাজা বাদশাহদের একটা পাগলামি হলো—যারা অসন্তোষজনক কাজ করে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, আর যারা সন্তোষজনক কাজ করে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।

০৩. মূলনীতিগুলোকে যথোপযুক্ত সময়ে প্রয়োগ করা। আগে বা পরে কোনোটাই করবে না। কারণ, কোনো কাজ নির্দিষ্ট সময়ে না করলে উপকার না হয়ে কাজটা বরং নষ্ট হয়। যেমন: অনুপযুক্ত সময়ে রোগ চিকিৎসা করা।

কেউ কেউ বলেন—যদি কেউ কোনো কাজ পরবর্তী সময়ের জন্য পিছিয়ে নেয়, তাহলে সে যেন নিশ্চিত হয়ে যায় যে, ওই কাজটি তার হাতছাড়া হয়ে গেছে। একটি জিনিস যথোপযুক্ত সময়ে করা অনুপযুক্ত সময়ে করার চেয়ে অনেক বেশি উপকারী হয়। বরং অনুপযুক্ত সময়ে অনেক সময় উপকারের বদলে ক্ষতিই দেখা দেয়। যেমন: সুস্থ অবস্থায় ওষুধ খেলে ক্ষতি হয়। অথচ ওই একই জিনিস যথোপযুক্ত সময়ে উপকারী। সুতরাং শাসক যদি আশা ও আশ্বাস, ভয় ও কড়াকাড়ি সঠিক সময়ে করতে পারেন, তাহলে তার প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়িত হবে, উদ্দেশ্য সফল হবে এবং ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে।[১৬৮]

---

[১৬৭] তাসহিলুন নাজার : ১৮১

[১৬৮] প্রাগুক্ত

সিয়াসাতের প্রকারভেদ

সিয়াসাত বা শাসন-ব্যবস্থা তিন প্রকার—

- ০১. বাড়াবাড়ি,
- ০২. ছাড়াছাড়ি এবং
- ০৩. মধ্যপন্থা।

যারা প্রান্তিকতা নিয়ে থাকে, তারা মনে করে শরিয়ত এ-যুগের দাবি পূরণে অক্ষম। তাই কেউ এমন সব শাস্তি কার্যকর করে, যা শরিয়ত আদৌ বলে নি। তারা মনে করে, এটাই সিয়াসাত। আবার কেউ এত শিথিলতা করে যে, হদ কায়েম করে না। তারা মনে করে, শরিয়ত এসব ক্ষেত্রে খুব কঠোরতার পরিচয় দিয়েছে। এই বলে তারা নমনীয় করার চেষ্টা করে। ফলে চোরের হাতও কাটে না, অন্যান্য হদও কায়েম করে না। এভাবে তারা শরিয়তের হুদুদ উঠিয়ে ফেলে। আর সে-ই মধ্যমপন্থায় আছে, যে আল্লাহ তাআলার শরিয়ত অনুযায়ী ফায়সালা করে, শরিয়তের সীমা-পরিসীমা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে। আর যে আল্লাহ তাআলার শরিয়ত অনুযায়ী ফায়সালা করে, তার সিয়াসাতকেই সিয়াসাতে শারইয়্যাহ বলা হয়। জাতির ওই সব কল্যাণই এই সিয়াসাতের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে, যা শরিয়ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। সুতরাং ওই সকল প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য হবে, যা শরিয়তসম্মত।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সময় এই উম্মাহর সিয়াসাতের প্রথম নেতা ছিলেন, যখন আল্লাহ তাআলা বিশদভাবে, স্পষ্ট ভাষায় এবং পূর্ণাঙ্গরূপে এই সিয়াসাতের বিধিবিধান বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এতে না সামান্য ভুল আছে, আর না সামান্য ত্রুটি থাকতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
>
> আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম।[১৬১]

অতএব, আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন। সুতরাং কোনো খলিফা বা অন্য কারও প্রয়োজন নেই এই দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করার, বা এই দ্বীনের সঙ্গে তার মত বা চিন্তা যুক্ত করার। কারণ, কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ীই এই দ্বীন পূর্ণাঙ্গ। এখন যে দাবি করে—ইসলামের বিধিবিধান সেকেলে, আধুনিক যুগের সাথে তাল মেলাতে পারে না, তার এই দাবি শরয়ি এবং যুক্তিগতভাবে অগ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যাত। শরয়িভাবে বাতিল হওয়ার কারণ আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন—'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম তোমাদের ওপর

[১৬১] সূরা মায়িদা, আয়াত: ৩

আমার নিয়ামতকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম।'[১৭০]

এই আয়াতে দ্বীনের পূর্ণাঙ্গতা দ্বারা উদ্দেশ্য কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ (যত আধুনিক যুগই আসুক না কেন)। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী আসমানি ধর্মগুলোও পূর্ণাঙ্গ ছিল, তবে সেটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। আর এই দ্বীন ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা কিয়ামত পর্যন্ত। সুতরাং যুগের বিবর্তন হোক আর পরিবর্তন হোক কখনোই এই দ্বীনের নিয়মনীতির পরিবর্তন হবে না। বরং কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজনীয়তা এই দ্বীন ইসলামের মাধ্যমেই পূরণ হবে।

ইমাম রাজি রহ. এই আয়াতের তাফসির প্রসংঙ্গে বলেন—'আল্লাহ তাআলা থেকে প্রেরিত পূর্ববর্তী ধর্ম সব যুগে তার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ তাআলা ওই ধর্ম প্রেরণের পূর্বেই জানতেন যে, আজকে যেটা পূর্ণাঙ্গ সেটা আগামীতে পূর্ণাঙ্গ থাকবে না, বরং কোনো গ্রহণযোগ্যতাই থাকবে না।

সুতরাং যদি কোনো ধর্ম প্রেরণের পর রহিত করা হয়, বা কোনো বিধান না থাকার পর নতুন করে যুক্ত করা হয়, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। আর শেষ যুগে আল্লাহ তাআলা পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত প্রেরণ করেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। মোটকথা, শরিয়ত সবসময় পূর্ণাঙ্গ থাকে তবে কোনোটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, আর কোনোটি 'কিয়ামত পর্যন্ত'। এ কথাটি বোঝানোর জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন—

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

তার কথা যুক্তিগতভাবে প্রত্যাখ্যাত। কারণ, যেকোনো জিনিস মেরামত করতে হলে কিছু নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হয়। আর সেই নিয়মনীতি ওই ব্যক্তিই তৈরি করতে পারে, যে ওই জিনিসের প্রকৃত অবস্থা, যোগ্যতা, ধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে এবং কীসে তার উন্নতি আর কীসে তার ক্ষতি, সে সম্পর্কে জ্ঞান রাখে।[১৭১]

সুতরাং সার্বিক এবং পূর্ণাঙ্গভাবে একজন মানুষের অবস্থা সম্পর্কে তিনি জ্ঞানী হবেন যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে পরিচালনা করছেন। আর তিনি তো আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন, যিনি একক, সৃষ্টিকর্তা ও ক্ষমতাবান। অতএব, মানুষের সংশোধন ও আত্মশুদ্ধি করতে হলে আল্লাহরই প্রণয়নকৃত মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে। আর এটাই হলো ইসলাম, যাতে মানুষের প্রতিটি প্রয়োজনের বিধান রয়েছে। এ কথা একজন মূর্খ বা হঠকারী লোক ছাড়া কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। এই সিয়াসাতকেই সিয়াসাতে মুহাম্মাদিয়্যা বলে, যা অনুসরণ করেছেন খুলাফায়ে রাশিদিন এবং তাদের পরবর্তী ইসলামের আদর্শে

---

[১৭০] সূরা মায়িদা, আয়াত: ৩

[১৭১] তাফসিরে কাবির, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ২৮৭

আদর্শিত ন্যায়পরায়ণ শাসকগণ। সুতরাং একজন আদর্শ খলিফাকেও খুলাফায়ে রাশিদার জীবনচরিত, তাদের উপদেশ ও শাসননীতি অধ্যয়ন করতে হবে।

আবু বকর রা.-এর উপদেশ

আবদুল্লাহ ইবনু হাকিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের উদ্দেশ্যে আবু বকর রা. বক্তব্য প্রদান করলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর বললেন—আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার, তার যথোপযুক্ত প্রশংসা করার, আশা ও ভয় একত্র করার। কারণ, আল্লাহ তাআলা জাকারিয়া আ. এবং তার পরিবারবর্গের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন—

> إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ
>
> নিঃসন্দেহে তারা কল্যাণকর কাজসমূহে দ্রুত অগ্রবর্তী থাকত, আর আমাকে আশা ও ভয়ের সাথে ডাকত। আর তারা ছিল আমার সামনে বিনয়ী।[১৭২]

আল্লাহর বান্দারা! তোমরা শুনে রাখো—তিনি তার ওয়াদাকে (জান্নাতকে) তোমাদের জানের (ব্যয় করার) সাথে আবদ্ধ করে দিয়েছেন, সে বিষয়ে তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতিও নিয়েছেন, আর তিনি তোমাদের থেকে সামান্য জিনিস (নফস ও মাল) কিনে নিয়েছেন বিশাল বিনিময়ে (জান্নাত)। এই যে তোমাদের সামনে আল্লাহর কিতাব—যার নূর কখনো নিভে যাবে না, যার মুজিযা কখনো শেষ হবে না। সুতরাং তোমরা তাঁর নূর থেকে আলো গ্রহণ করো, তাঁর কিতাব থেকে উপদেশ গ্রহণ করো। তোমরা তাঁর থেকে নূর গ্রহণ করো অন্ধকার দিনের জন্য। তিনি তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্য। আর তোমাদের সাথে নিযুক্ত করে দিয়েছেন সম্মানিত লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদের, যারা তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানে।

আল্লাহর বান্দারা, তোমরা জেনে রাখো—তোমরা এমন সময়ে আসা-যাওয়া করছ, যার জ্ঞান তোমাদের থেকে অদৃশ্য করে রাখা হয়েছে। অতএব, তোমরা যদি চাও যে—তোমাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, আর তোমরা কাজ করতে থাকবে; তাহলে করো দেখি; কিন্তু তোমরা তা কিছুতেই করতে পারবে না আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। সুতরাং তোমরা তোমাদের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই পিছিয়ে রাখতে চেষ্টা করো তো দেখি, যা তোমাদের মন্দ আমলের দিকে নিয়ে যাবে। কারণ, এক জাতি ছিল—যারা নিজেদের নির্ধারিত মেয়াদ অন্যদের জন্য সাব্যস্ত করেছিল, নিজেদের তারা ভুলে গিয়েছিল। আজ কোথায় তাদের দৃষ্টান্ত? সুতরাং বাঁচো ভাই, বাঁচো! তারপর মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করো। কারণ, তোমাদের পেছনে এক তলবকারী রয়েছে, যার তিক্ততা খুবই দ্রুত।

---

[১৭২] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৯০

আবু বকর রা.-এর আরেকটি উপদেশ : তিনি বলেন—আজ কোথায় সেই রাজা-বাদশাহরা, যারা বিভিন্ন নগরী নির্মাণ করে চারপাশে বাগান দিয়ে সুরক্ষিত করেছিল। আজ তারা কোথায়, যারা যুদ্ধে শত্রুদের পরাস্ত করে দম্ভভরে ফুলে উঠত। আজ তারা অন্ধকার কবরে মিশে গেছে।

আবু বকর রা.-এর রাষ্ট্রনীতি

এক. তিনি একবার খুতবার শুরুতে বললেন—'হে লোকসকল, আমাকে তোমাদের শাসক বানানো হয়েছে, যদিও আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই। অতএব, আমি যদি ভালো কাজ করি, তাহলে আমাকে সাহায্য করো। আর আমি যদি মন্দ কাজ করি, তাহলে আমাকে সংশোধন করো। সত্য বলা আমানত, মিথ্যা বলা খিয়ানত। তোমাদের দুর্বল ব্যক্তি আমার কাছে শক্তিশালী যতক্ষণ না আমি তার হক ফিরিয়ে দেব, ইন শা আল্লাহ। আর তোমাদের শক্তিশালী (জালিম) ব্যক্তি আমার কাছে অসহায় ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না আমি তার থেকে (আরেক ব্যক্তির) হক তুলে আনি, ইন শা আল্লাহ।'[১৭৩]

তার এ কথায় বেশ কিছু বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে—

:: প্রথমত, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ সমান—শাসক হোক বা শাসিত, সাদা হোক বা কালো, আরব কিংবা আজমি। কোনোভাবেই একে অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নয়। এটা বোঝা যায় তার উল্লিখিত কথা—'যদিও আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই' থেকে।

:: দ্বিতীয়ত, তিনি বলেছেন—'যদি আমি ভালো কাজ করি, তাহলে আমাকে সাহায্য করো।' এখান থেকে বোঝা যায়, জনগণের সুযোগ আছে শাসকের ভুল শুধরে দেওয়ার। আসল বিষয় হচ্ছে—রাজার চালে রাজ্য চলে। শাসক যদি ঠিক থাকে তাহলে জনগণ এমনিতেই ঠিক হয়ে যায়। এজন্যই জনগণের কর্তব্য হচ্ছে শাসককে শুধরে দেওয়া, তবে সেটা শরিয়ত নির্দেশিত পন্থায় হতে হবে।

:: তৃতীয়ত, মানুষের মাঝে ইনসাফ ও সাম্যতা রক্ষা করা, যা ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য এবং শাসকের প্রধান কর্তব্য। এটা বোঝা যায় তার কথা—'তোমাদের দুর্বল ব্যক্তি...' থেকে।

দুই. তিনি বলেন—'সত্য বলা আমানত, মিথ্যা বলা খিয়ানত'। এখানে, সিদ্দিকে আকবর রা. উম্মাহকে পরিচালনা করার বড়ো একটি মূলনীতি ঘোষণা দিয়েছেন। কারণ, সত্যবাদিতাই হলো শাসক এবং শাসিতের মাঝে নির্ভরতার ভিত্তি। রাষ্ট্র শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে যার প্রভাব অনেক বিস্তৃত। তাছাড়া সত্যবাদিতা হলো ভিত্তিমূলক স্বভাব, ইসলাম যার কথা বলে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

[১৭৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৩৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গ অবলম্বনকরো।[১৭৪]

তিন. আবু বকর রা. প্রয়োজনগ্রস্ত এবং দুর্বলদের খিদমত করতেন। আবু সালিহ গিফারি রা. থেকে বর্ণিত, উমার রা. মদিনার ঝুপড়িতে বসবাস করা এক অন্ধ বৃদ্ধাকে প্রত্যেক রাতে ওয়াদা দিতেন যে—তিনি তাকে পানি এনে দেবেন, তার কাজ করে দেবেন; কিন্তু পরদিন এলে দেখতেন, অন্য কেউ তার আগে এসে সব কাজ করে দিয়েছে। একদিন তিনি কয়েকবার আসা যাওয়া করলেন, যাতে তার আগে কেউ যেতে না পারে। তিনি নজরদারি করছিলেন। তিনি হঠাৎ দেখলেন যে, আবু বকর রা. বৃদ্ধার কাছে যাচ্ছেন, অথচ তিনি তখন মুসলিম জাহানের খলিফা।[১৭৫]

চার. তিনি যেকোনো দায়িত্ব তার যোগ্য ব্যক্তির কাছেই অর্পণ করতেন। তাই দেখা যায়, তিনি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.-কে (যাকে নবীজি এই উম্মাহর আমিন ও বিশ্বস্ত বলেছেন) অর্থমন্ত্রী বানিয়েছেন, বাইতুল মালের যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্ব তাকে দিয়েছেন। উমার ইবনুল খাত্তাব রা.-কে কাজির (বিচারের) দায়িত্ব (আইন মন্ত্রণালয়) দিয়েছেন, জায়িদ ইবনু সাবিত রা.-কে লেখার (ডাক, চিঠি ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়) দায়িত্ব দিয়েছেন।[১৭৬]

পাঁচ. দ্বীন ইসলাম হিফাজতের দৃঢ় ইচ্ছা। যখন কিছু কাবিলা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, তখন তিনি জিহাদের ঘোষণা দেন; সমস্ত কাবিলার উদ্দেশ্যে একটি পত্র লেখেন, কিছু লোক পাঠিয়ে প্রত্যেক গোত্রের মাঝে সে পত্র পড়ে শোনাতে বলেন। পতাকা তৈরি করে এগারোজনকে পতাকা দেন—

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে পতাকা দিয়ে তুলাইহা ইবনু খুওয়াইলিদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তুলাইহার কাজ সম্পন্ন করার পর মালিক ইবনু নুওয়াইরার উদ্দেশ্যে বিতাহ নামক অঞ্চলে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন। পরবর্তী নির্দেশ আসার আগ পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করতে বলেন।

ইকরামাকে পতাকা দেন মুসাইলামার উদ্দেশ্যে। শুরাহবিল ইবনু হাসানাকে প্রথমে ইকরামার পেছনে পেছনে মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের উদ্দেশ্যে, তারপর বনু কুজাআর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।

মুহাজির ইবনু আবু উমাইয়াকে মিথ্যা নবী আনসির সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কাইস ইবনু মাকশুহ ছাড়া তার সন্তানদের সাহায্য করতে বলেন। কারণ, কাইস ইবনু মাকশুহ বাইআত ভঙ্গ করেছিল।

---

[১৭৪] সূরা তাওবা, আয়াত : ১১৯

[১৭৫] সুয়ুতি, তারিখুল খুলাফা

[১৭৬] মাওসুআতুস সিয়ার, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১০২

খালিদ ইবনু সায়িদকে পতাকা দিয়ে শামের উচ্চভূমির উদ্দেশ্যে পাঠান। আমর ইবনুল আসকে কুযাআ, ওয়াদিয়া এবং হারিস গোত্রের লোকদের উদ্দেশ্যে পাঠান। হুজাইফা ইবনু মুহসিন গাতফানিকে আম্মানের দাবা, ইরফাজা ও হারসামা-সহ অন্যান্য গোত্রের উদ্দেশ্যে পাঠান।

তারিফা ইবনু হাজিব রা.-কে বনু সালিম এবং তাদের সাথে অবস্থানকারী হাওয়াযিন গোত্রের যারা আছে, তাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। সুওয়াইদ ইবনু মুকরিন রা.-কে ইয়ামানের তিহামা অঞ্চলের (পাহাড় ও সাগরের মাঝে অবস্থিত নিম্নভূমি) উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।

আলা ইবনু হাজরামি রা.-কে বাইরাইনের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তিনি প্রত্যেক আমিরকে পৃথক একটি পত্র লিখে দেন, যাতে তার সাথে আলাদাভাবে চুক্তিবদ্ধ হন। তখন প্রত্যেক আমির তার সৈন্যদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।[১৭৭]

তার এ বিশাল পদক্ষেপ থেকে বোঝা যায়, মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মূল প্রেরণা ছিল তার গাইরত ও দ্বীনের হিফাজত।

উমার ইবনুল খাত্তাব রা.-এর উপদেশ

এক. একবার তিনি সাথিদের বললেন—'তোমরা যা ইচ্ছা কামনা করো।' তখন একজন বলল, 'আমার কামনা হলো, এই বাড়িটি যদি স্বর্ণ দিয়ে ভরে যেত, আর আমি তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতাম আর দান করতাম।'

আরেকজন বলল—'আমার ইচ্ছা হলো, এই বাড়িতে যদি অনেকগুলো হীরকখণ্ডের টুকরো থাকত, যা আমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতাম, আর দান করতাম।'

তারপর উমার রা. বললেন—'তোমরা যা পারো কামনা করো।'

উপস্থিত লোকেরা বলল—'হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি কী বলতে চাচ্ছেন, আমরা জানি না।'

তিনি বললেন—'আমার ইচ্ছা হলো, যদি এই বাড়িটি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, মুআজ ইবনু জাবাল, আবু হুজাইফার আজাদকৃত দাস সালিম, হুজাইফা ইবনুল ইয়ামানের মতো মহান লোকদের দ্বারা ভরে থাকত, যাদের দ্বারা মুসলিম উম্মাহর কাজ করব।'[১৭৮]

দুই. সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার রা. মানুষের উদ্দেশ্যে আঠারোটি বাক্য তৈরি করেন, যার প্রত্যেকটিই আলাদা একটি দর্শন ও নীতিবাক্য। যথা :

---

[১৭৭] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৪৮

[১৭৮] ইবনু আসাকির, তারিখু দিমাশক, খণ্ড : ৭১, পৃষ্ঠা : ৫৬

০১। যে তোমার কোনো জিনিসের ক্ষেত্রে আল্লাহর অবাধ্যতা করে, তোমার দেওয়া তার সবচেয়ে উত্তম শাস্তি হলো—ওই জিনিসের ক্ষেত্রে তার অবাধ্যতার সমপরিমাণ আল্লাহর আনুগত্য করবে।

০২। তুমি তোমার অপর ভাইয়ের যেকোনো বিষয় উত্তমভাবে সাজিয়ে রাখো, যদি না সে তোমাকে নিষেধ করে।

০৩। কোনো মুসলিম ভাই থেকে কোনো কথা বের হলে খারাপ ধারণা করো না, যদি তা ভালো হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

০৪। কেউ যদি অপবাদের সম্মুখীন হয়, তাহলে এমন কেউ যেন তাকে দোষ না দেয়, যার ব্যাপারে (পূর্ব থেকে) খারাপ ধারণা ছিল।

০৫। যে তার রহস্যময় বিষয় গোপন রাখবে, সে কল্যাণ লাভ করবে।

০৬। তুমি সৎ এবং সত্যবাদী বন্ধুদের সঙ্গ গ্রহণ করো, তাদের সাথে বাস করো। কারণ, তারা সুখে তোমার শোভা বর্ধন করবে, দুঃখে তোমাকে সাজসরঞ্জাম দেবে।

০৭। সবসময় সত্য কথা বলো, যদিও তার কারণে মরে যেতে হয়।

০৮। অনর্থক কাজে ব্যস্ত হয়ো না।

০৯। যে জিনিসটি ঘটেনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না। কারণ, সেটা অস্তিত্বহীন বিষয়ে ব্যস্ততা।

১০। এমন কারও প্রয়োজন পূরণ করতে যেয়ো না, যে প্রয়োজন পূরণ করতে চায় না।

১১। সংঘর্ষপূর্ণ শপথ করো না, অন্যথায় ধ্বংস হয়ে যাবে।

১২। পাপাচারী চেনার জন্য পাপাচারীদের সংস্পর্শে যেয়ো না।

১৩। শত্রুকে এড়িয়ে যাও।

১৪। বিশ্বস্ত ছাড়া অন্য কোনো বন্ধুকে প্রশ্রয় দিয়ো না। তবে শুনে রাখো, সে-ই বিশ্বস্ত যে আল্লাহকে ভয় করে।

১৫। কবরের সামনে বিনীত হয়ে দাঁড়াও।

১৬। আনুগত্য করার ক্ষেত্রে নমনীয় হও।

১৭। অবাধ্যতা করে ফেললে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করো।

১৮। যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদের সাথে নিজের বিষয়ে পরামর্শ করো। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

তার বান্দাদের মধ্য হতে শুধু আলিমরাই আল্লাহকে ভয় করে।[১৭১]

---

[১৭০] ইবনু আসাকির, তারিখু দিমাশক, খণ্ড : ৪৪, পৃষ্ঠা : [illegible]

তিন. ইসহাক ইবনু রাশিদ থেকে বর্ণিত, উমার রা. বলেন—'দোষী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, নিজের ভুল ত্রুটি না দেখে অন্যের ভুল ত্রুটি নিয়ে লেগে থাকে। নিজে যে দোষ করে, মানুষকে সে দোষের জন্য নিন্দা করে। সাথি বা মানুষকে অযথাই কষ্ট দেয়...

চতুর্থ. শাকিক রা. থেকে বর্ণিত, উমার রা. একটি চিঠিতে লেখেন—'দুনিয়া হলো সবুজ শ্যামল ও সুমিষ্ট। অতএব, যে তার হক অনুযায়ী দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করবে, তার জন্য দুনিয়াতে বরকত দেওয়া হবে। আর যে অবৈধভাবে গ্রহণ করবে, তার উদাহরণ হলো ওই লোকের মতো—যে খায় কিন্তু তৃপ্ত হয় না।'[১৮০]

উমার রা.-এর সিয়াসাত বা রাষ্ট্রনীতি

এক. তিনি যখন আবু বকর রা.-এর স্থানে আসেন, মানুষ তার কাঠিন্যের কারণে ভয়ে তটস্থ ছিলে। তিনি তখন প্রথম খুতবাতেই মানুষের ভয় দূর করার জন্য বলেন—'আয় আল্লাহ! আমি খুবই দুর্বল। সুতরাং আমাকে শক্তিশালী করে দেন। আমি অনেক বেশি দৃঢ়। অতএব, আমাকে নমনীয় করে দেন। আমি খুব কৃপণ। সুতরাং আমাকে দানশীল বানিয়ে দেন।'[১৮১]

আর-রিয়াজুন নাজিরাতু ফি মানাকিবিল আশারা কিতাবে (২/৩১৫) আছে, ইবনু শিহাব-সহ অন্যান্য আহলে ইলম বলেন—'মিম্বারে বসে উমার রা. সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন, তা হলো—আবু বকর রা. মিম্বারে যেখানে পা রাখতেন; অর্থাৎ মিম্বারের প্রথম ধাপে বসেন, আর মিম্বারের নিচে মাটিতে পা রাখেন।

তখন উপস্থিত লোকেরা বলল—'আবু বকর রা. যেখানে বসতেন, সেখানেই যদি আপনি বসতেন।'

তিনি বলেন—'আবু বকর রা.-এর পা যেখানে থাকত, সেখানে বসাই আমার জন্য যথেষ্ট।'

উমার রা. খিলাফত গ্রহণ করার পর সবাই এত ভয় পেয়েছিল যে, মসজিদের প্রাঙ্গনে বসারও সাহস হয় নি। তারা বলছিল—'আগে দেখি, উমার রা. কী বলেন!' বর্ণনাকারীরা বলেন—'আবু বকর রা. এতটাই নমনীয় ছিলেন যে, শিশুরা পর্যন্ত তাকে দেখলে তার কাছে ছুটে যেত, আর 'আব্বু' 'আব্বু' বলে ডাকত। তখন তিনি তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। বিপরীতে উমার রা. এতটাই গম্ভীর ছিলেন যে, বড়ো বড়ো ব্যক্তিরা পর্যন্ত তার মজলিস থেকে পালিয়ে অপেক্ষা করছিলেন যে, সামনে কী হবে।

---

[১৮০] মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা

[১৮১] মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ২৯৫১১

উমার রা. যখন লোকদের ভয় পাওয়ার বিষয়টি শুনলেন, তখন ঘোষণা করা হলো, নামাজ শুরু হতে যাচ্ছে। তখন সবাই উপস্থিত হলে উমার রা. মিম্বারে উঠে আবু বকর রা.-এর পা রাখার স্থানে বসলেন। হামদ ও সানা পাঠ করার পর বললেন—

'আমি শুনতে পেয়েছি, তোমরা আমার রূঢ়তা ও রূক্ষতাকে খুব ভয় পাচ্ছ। আর বলাবলি করছ—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে থাকা অবস্থাতেই উমার রা. আমাদের সাথে কঠোর আচরণ করতেন, তারপর আবু বকর রা. শাসক থাকা অবস্থাতেও আমাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করতেন, না জানি তিনি এখন নিজে শাসক হওয়ার পর কী করেন। যারা এ কথা বলাবলি করেছে সত্যই বলেছে। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গোলাম এবং খাদেমের মতোই ছিলাম। কোনো মানুষই তাঁর নম্রতা ও নমনীয়তার নাগাল ধরতে পারবে না। শুধু তাই নয়, আল্লাহ তাআলা নিজের সুন্দর নামগুলো থেকে দুটো নাম তাকে দান করে সেই নাম দুটো কুরআনে কারিমে উল্লেখ করেছেন رؤوف رحيم 'অত্যন্ত কোমল, দয়াশীল।'

তাই, আমি তাঁর জন্য খোলা তরবারি ছিলাম, যদি না তিনি কোষবদ্ধ করেন; কিংবা রেখে দেন আর আমি ফিরে আসি। এভাবে তাঁর সাথে থাকতে থাকতে একদিন তাঁর মৃত্যু হলো, আর তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, আলহামদু লিল্লাহ। আমি এ অবস্থা নিয়ে গৌরবান্বিত। তারপর মুসলিমদের শাসক হলেন আবু বকর রা.।

তার ধীরতা, বদান্যতা এবং নমনীয়তা অস্বীকার করবে—এমন কেউ এখানে নেই। আমি তার খাদেম ও সাহায্যকারী ছিলাম। তার নমনীয়তার সাথে আমার কাঠিন্যকে মিলিয়ে রাখতাম। এক কথায়, আমি তার জন্য ছিলাম খোলা তরবারি, যতক্ষণ না তিনি কোষবদ্ধ করেন বা রেখে দেন, আর আমি ফিরে আসি। এভাবে থাকতে থাকতে একসময় তারও মৃত্যু হলো। আর তখন তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, আলহামদু লিল্লাহ। সেজন্য আমি সৌভাগ্যবান।

এখন আমাকে তোমাদের শাসক বানানো হয়েছে। সুতরাং জেনে রাখো, আমার রূঢ়তাও দ্বিগুণ রূপ লাভ করেছে। তবে এটা শুধু জালিম ও দুষ্কৃতিদের জন্য। আর যারা ধার্মিক, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও ভালো মানুষ, তাদের জন্য আমি খুবই নমনীয়। তবে আমি কাউকে এ সুযোগ দেব না যে, সে জুলুম বা সীমালঙ্ঘন করবে; বরং আমি তার মাথার এক পাশ মাটির ওপর রেখে অপর পাশের ওপর দুই পা রেখে চাপ দেব, যদি না সে সত্যের অনুগত হয়।

আমার ওপর তোমাদের কিছু হক রয়েছে, যা তোমাদের সামনে উল্লেখ করছি। সুতরাং সেগুলো তোমরা আমার থেকে আদায় করবে। আমার ওপর তোমাদের একটি অধিকার, তোমাদের আল্লাহ তাআলা যে সকল 'ফাই' বা গনিমত দেবেন

সেগুলো এবং আমি খাজনা আত্মসাৎ না করে যথাযথ খাতে ব্যয় করব। আমার ওপর তোমাদের আরেকটি অধিকার, যখন তোমাদের কোনো সম্পদ আমার কাছে জমা হবে, সে সম্পদ আপন খাতেই ব্যয় হবে। আমার ওপর তোমাদের আরেকটি অধিকার, আমি তোমাদের ভাতা ও অনুদান তোমাদের দান করব, ইন শা আল্লাহ। আমার ওপর তোমাদের আরেকটি অধিকার, তোমাদের কখনো ধ্বংসাত্মক কাজে নিক্ষেপ করবো না। একই সাথে যখন তোমরা যুদ্ধে যাবে, তখন তোমাদের ফিরে আসার আগ পর্যন্ত পরিবারের দেখাশোনার দায়ভার আমার ওপর। আমি এসব কথা বলছি আর নিজের জন্য এবং তোমাদের জন্য ইস্তিগফার করছি।'

সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব ও আবু সালামা ইবনু আবদির রহমান রহ. বলেন—'আল্লাহর কসম! উমার রা. নিজের প্রত্যেকটি ওয়াদা রক্ষা করেছেন। কাঠিন্যের স্থানে কাঠিন্য অবলম্বন করেছেন। নমনীয়তার স্থানে নমনীয়তা অবলম্বন করেছেন। তিনি পরিবারের দেখাশোনা করতেন। মুজাহিদদের দরজার সামনে গিয়ে সালাম দিতেন। তাদের স্ত্রীদের (পর্দার আড়াল থেকে) বলতেন—বাজার থেকে তোমাদের জন্য কিছু নিয়ে আসবো? কারণ, কিছু কিনতে গিয়ে তোমরা ঠকবে, সেটা আমি চাই না। তখন তার সাথে ছোটো ছোটো কিশোর-কিশোরীদের পাঠিয়ে দিত। তিনি যখন বাজারে যেতেন, তখন তার সাথে অসংখ্য কিশোর-কিশোরী থাকত। তাদের তিনি প্রয়োজনীয় সামান কিনে দিতেন। যাদের কাছে কেনার কিছু ছিল না, তাদের জন্য নিজের টাকা দিয়েই কিনতেন। যুদ্ধ থেকে যখন কোনো দূত আসত, তখন তিনি নিজে তাদের কাছে তাদের স্বামীদের চিঠি নিয়ে যেতেন। তাদের বলতেন—তোমাদের স্বামীরা আল্লাহর রাস্তায় আছে, আর তোমরা আল্লাহর রাসুলের শহরে আছ। যদি তোমরা নিজেরাই পড়তে পার, তাহলে তো ভালো, আর না হলে দরজার কাছে আসো, যাতে তোমাদের পড়ে শোনাতে পারি। তারপর বলতেন—আমাদের দূত অমুক দিন যাবে। তাই, তোমরা চাইলে চিঠি লিখে জমা দাও, যাতে তোমাদের চিঠি পাঠাতে পারি। তারপর তিনি কাগজ নিয়ে তাদের বলতেন, এই যে দোয়াত-কাগজ। দরজার কাছে এসে বলো আমি লিখে দিই। এভাবে তিনি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে চিঠি লিখে আনতেন। তারপর তাদের চিঠি পাঠিয়ে দিতেন। আর তিনি যখন সফরের ইচ্ছা করতেন, সফরের সময় হলে সবার উদ্দেশ্যে বলতেন—যাত্রার প্রস্তুতি নাও। তখন ঘোষক সবার কাছে তার কথা পৌঁছে দিয়ে বলত, আমিরুল মুমিনিন তোমাদেরকে সফরের প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। সুতরাং উঠো, বাহনকে পানি পান করাও, সফরের প্রস্তুতি নাও। তারপর দ্বিতীয়বার বলতেন, সফর শুরু করো। তখন সবাই বলাবলি করত, বাহনে আরোহণ করো, আমিরুল মুমিনিন আবার আমাদের সফরের কথা বলেছেন। যখন তারা আরোহণ করত, তিনিও আরোহণ করতেন।

তার সাথে দুটো থলে থাকত। একটিতে ছাতু, অপরটিতে খেজুর। সামনে মশকে পানি থাকত, পেছনে থাকত একটি পাত্র। কখনো যাত্রাবিরতি করলে পাত্রে ছাতু নিতেন, একটু পানি ঢালতেন, একটি শিনার বিছাতেন। বর্ণনাকারী বলেন—শিনার মানে ছোটো মাদুর বিশেষ। কেউ যদি দাবি দাওয়া, পানি বা অন্য কোনো প্রয়োজনে তার কাছে আসত, তিনি তাকে বলতেন, ছাতু আর খেজুর খাও। তারপর যেখান থেকে সফর করেছেন সেখানে যেতেন। সেখানে যদি কোনো সামান পড়ে আছে দেখতেন, তাহলে উঠিয়ে নিতেন, কিংবা কোনো পঙ্গু ব্যক্তিকে দেখতেন অথবা কারও বাহনে কোনো সমস্যা হয়েছে দেখতেন, তাহলে তার জন্য একটা বাহন ভাড়া নিয়ে সেটাতে তাকে উঠাতেন। ফিরে আসার পথে যদি কোনো সামান দেখতেন, তুলে নিতেন কিংবা কাউকে সমস্যায় পড়া পেতেন তাকে পেছনে বসাতেন। পরদিন কেউ যখন দেখত তার সামান হারিয়ে গেছে, তখন সে আমিরুল মুমিনিন আসার আগ পর্যন্ত সামান খুঁজত না। উমার রা. যখন আসতেন, তার উটটি মানুষের সামানে বড়ো স্তূপে পরিণত হতো। তখন লোকজন তাকে গিয়ে বলত—'আমিরুল মুমিনিন, এই আমার হারিয়ে যাওয়া পাত্র।'

তখন উমার রা. বলতেন—'কেউ কি তার পাত্র সম্পর্কে এতটা বেখবর থাকে, যা দিয়ে সে পান করে, নামাজের জন্য ওজু করে, সবসময় কি আমি এ রকম পড়ে যাওয়া জিনিসের খেয়াল রাখব, সবসময় কি আমি না ঘুমিয়ে থাকব?' তারপর তাকে তার পাত্র দিতেন।

আরেকজন এসে বলত—এটা আমার ধনুক। অপরজন বলত—এটা আমার দড়ি। এই এই...আরকি..। তিনি তখন তাদের একটু তিরস্কার করে দিয়ে দিতেন।

তিনি যখন শামে গেলেন, সেখানকার মুসলিম নেতৃস্থানীয়রা বৃহদাকার ঘোড়া ও সাদা কাপড় নিয়ে এলো। তারা তাকে ওই বড় ঘোড়ায় আরোহণ করতে বললেন, যাতে শত্রুদের কাছে গম্ভীর দেখা যায়। পশমের কাপড়ের পরিবর্তে সাদা কাপড় পড়তে বললেন। কিন্তু তিনি না করলেন। পরে তারা বার বার বলাতে পশমের কাপড় নিয়েই ঘোড়ায় উঠলেন, তখন ঘোড়া দ্রুত ছোটায় হাতে থাকা উটের রশি টান খেল। তখন ঘোড়া থেকে নেমে নিজের উটে উঠে বললেন, এটা তো দেখি আমাকে অন্যরকম করে দিল যেন নিজেকেই চিনতে পারছিলাম না। (পুরো ঘটনাটি আবু হুজাইফা ইসহাক ইবনু বাশার, *ফুতুহুশ শাম* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।)

উমার রা.-এর রাষ্ট্রনীতি

এক. আবু ফারাস রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন—'লোকসকল, দেখো, আমরা তোমাদের সম্পর্কে জানতাম যখন আমাদের সামনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন। যখন ওহি নাজিল হতো, তখন

আল্লাহ তাআলা তোমাদের সম্পর্কে কিছু বলতেন। কিন্তু এখন দেখো, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় নিয়েছেন, ওহি চলে গেছে। এখন তোমাদের মুখের কথা দিয়েই তোমাদের আমরা চিনব। যে ভালো কিছু প্রকাশ করবে, তার সম্পর্কে ভালো ধারণা করবো এবং সে কারণেই তাকে ভালোবাসব। আর যে খারাপ কিছু প্রকাশ করবে, তার সম্পর্কে খারাপ ধারণাই করতে হবে এবং সে কারণেই তাকে অপছন্দ করবো। আর তোমাদের মনের ও অভ্যন্তরীণ বিষয় তোমাদের মাঝে এবং তোমাদের রবের মাঝে থাকবে। দেখো একটা সময় ছিল, যখন আমি মনে করতাম, যে কুরআনে কারিম তিলাওয়াত করত তার উদ্দেশ্য থাকত শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর প্রতিদান। শেষ পর্যন্ত এটাই আমাদের ধারণা ছিল; কিন্তু এখন দেখছি, কিছু লোক মানুষের সন্তুষ্টির আশায় কুরআন তিলাওয়াত করে। তোমরা কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তিলাওয়াত করবে, তাঁর উদ্দেশ্যেই আমল করবে। শোনো, আল্লাহর কসম। আমি আমার শাসকদেরকে তোমাদের কাছে এজন্য পাঠাই না যে, তারা তোমাদের মারধর করবে, তোমাদের সম্পদ আত্মসাৎ করবে; বরং এ-জন্যই পাঠাই যে, তারা তোমাদের দ্বীন ও নবীর সুন্নাহ শিক্ষা দেবে। এখন কেউ যদি ভিন্ন কিছু করে তাহলে তার বিষয়টি আমার সামনে পেশ করো। ওই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ তার থেকে আমি কিসাস গ্রহণ করব।'

তখন আমর ইবনুল আস রা. দাঁড়িয়ে বললেন—'আমিরুল মুমিনিন, মুসলিম শাসক হওয়ার পর কোনো জনগণকে শাস্তি দিলে তার থেকে আপনি কিসাস নেবেন?'

তিনি বললেন—'হ্যাঁ, যার হাতে উমারের জান তার কসম করে বলছি, অবশ্যই আমি তার থেকে কিসাস নেব। কেন নেব না? অথচ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি নিজের থেকে কিসাস গ্রহণ করছেন। সুতরাং সাবধান! মুসলিমদের গায়ে হাত দিয়ো না, না তাদের অপদস্থ করবে। তাদের পরিবারের সাথে মিলিত হতে বাধা দিয়ো না, তাহলে তাদের ফিতনায় ফেলে দেবে। তাদের হক আটকে রেখো না, হয়তো এটা তাদের কুফুরির দিকে নিয়ে যাবে। তাদের নিয়ে বড়ো কোনো গাছের কাছে যাত্রাবিরতি করো না। তাহলে তাদের হারিয়ে ফেলবে (কারণ, তখন তারা ছড়িয়ে পড়বে)।[৮২]

দুই. তারিখ বা সন প্রবর্তন : তিনিই প্রথম ইসলামি সন প্রবর্তন করেন। তারিখ অর্থ সময় জানানো। তদ্রূপ তাওরিখেরও একই অর্থ। ইমাম সাইদাবি রহ. বলেন, তারিখ أرخ 'আরখ' ধাতু থেকে নেওয়া হয়েছে। যার অর্থ সৃষ্টি হওয়া, যেমন: সন্তান সৃষ্টি হওয়া।

ইমাম সাগানি রহ. বলেন—কেউ কেউ বলে, তারিখ ماه وروز থেকে আরবি করা হয়েছে। যার অর্থ দিন, মাস, বছর গণনা করা। পরবর্তীতে আরবরা শব্দটিকে আরবিতে রূপান্তরিত করে। ইসলামি সন প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট নিয়ে কয়েকটি বর্ণনা আছে—

(ক) ইবনু সামারকান্দি রহ. বর্ণনা করেন, আবু মুসা আশআরি রা. উমার রা.-এর কাছে চিঠি লেখেন—আপনার যে সকল চিঠি আমাদের কাছে আসে, সেগুলোতে তারিখ লেখা থাকে না। তাই, বিভিন্ন অবস্থা ঠিক রাখার জন্য সন রচনা করলে ভালো হয়। তখন তিনি সন প্রবর্তন করলেন।

(খ) আবু ইয়াকজান রহ. বলেন—উমার রা.-এর সামনে একটি সিল পেশ করা হলে সেখানে শাবান মাস দেখতে পান। তিনি তখন বলেন—এটা কোন শাবান মাস—বর্তমান, অতীত না ভবিষ্যৎ।

(গ) ইবনু আব্বাস রা. বলেন—উমার রা. যখন সন প্রণয়নের ইচ্ছা করেন, তখন সাহাবায়ে কিরামকে একত্র করে পরামর্শ চাইলে সাদ ইবনু আব্বাস রা. বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তারিখ রচনা করেন। তালহা রা. বলেন—তাকে প্রেরণের সময়কে কেন্দ্র করে, আলি ইবনু আবি তালিব রা.-এর মত ছিল হিজরতকে কেন্দ্র করে হোক। কারণ, হিজরতের মাধ্যমেই সত্য-মিথ্যা পৃথক করা হয়েছে। অন্যরা বলল—জন্মকে কেন্দ্র করে। একদল বলল—নবুয়তকে কেন্দ্র করে।

সময়টি ছিল ১৭ হিজরির। কেউ কেউ বলেন—১৬ হিজরির। পরে তারা আলি রা.-এর মতের ওপর একমত পোষণ করেন।[১৮৩]

সহিহ বুখারির প্রখ্যাত ভাষ্যকার ইবনু হাজার রহ. *ফাতহুল বারিতে* বলেন, সুহাইলি রহ. বলেন, সাহাবায়ে কিরাম হিজরি সন প্রবর্তন করেছেন কুরআনে কারিমের এই আয়াতকে লক্ষ্য করে—

لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ

'যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর, প্রথম দিন থেকে।'

কারণ জানা বিষয়, এখানে অনির্দিষ্ট প্রথম দিন উদ্দেশ্য নয়; বরং নির্দিষ্ট দিনই উদ্দেশ্য। আর সেটা ওই সময় যখন ইসলাম বিজয় লাভ করেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চিন্তে মহান রব্বুল আলামিনের ইবাদাত করেছেন এবং প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেছেন। তাই, সাহাবায়ে কিরাম একমত হলেন যে, তারিখের সূচনা সেই দিনকে কেন্দ্র করেই হোক। তাদের এই কাজ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ তথা প্রথম দিন বলে উদ্দেশ্য ইসলামি ইতিহাসের প্রথম দিন।

[১৮৩] উমদাতুল কারি, খণ্ড : ১৭, পৃষ্ঠা : ৬৬

তিনি আরও বলেন—চারটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সন প্রবর্তন করা যায়—নবীজির জন্ম, প্রেরণ, হিজরত এবং মৃত্যু; কিন্তু তাদের কাছে হিজরতকে কেন্দ্র করে প্রবর্তন করাই অগ্রাধিকার পেল। কারণ, জন্ম ও প্রেরণের সময়কাল বিরোধপূর্ণ। আর তারা মৃত্যুকে নির্ধারণ করেন নি। কারণ, তা শুনলেই মন দুঃখ-কষ্টে ভরে যাবে। তাই হিজরতই প্রাধান্য পেল।

মুহাররম মাস থেকে শুরু করার কারণ: ইবনু হাজার রহ. বলেন—'(হিজরতের মাস) রবিউল আউয়াল মাসে হিজরি সনের গণনা শুরু না হয়ে মুহাররম মাস থেকে শুরু করা হয়েছে। কারণ, হিজরতের পরিকল্পনা হয় মুহাররম মাসে। নবীজির হাতে (আনসারদের) বাইআত সংগঠিত হয় জিলহজের মাঝ বরাবর। আর এই বাইআতই ছিল হিজরতের মূল ভূমিকা। আর বাইআতের পর সর্বপ্রথম যে মাসের সূচনা হয়, তা ছিল মুহাররম। তাই, এই মাসকে দিয়ে সূচনা করাই যুক্তিযুক্ত ছিল। মুহাররম মাসে শুরু করার আরও যতগুলো যুক্তি আছে, তার মধ্যে এটাকেই আমার শক্তিশালী মনে হয়েছে।'

সূরা ফজরের তাফসির করতে গিয়ে ইমাম সুয়ুতি রহ. *ইকলিল* গ্রন্থে বলেন, সায়িদ ইবনু মানসুর এবং বাইহাকি রহ. ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন—মুহাররম মাসই হলো বছরের প্রভাত।

ইবনু হাজার রহ. বলেন—এর মাধ্যমে বুঝে আসে, কেন সাহাবায়ে কিরাম হিজরতের মাস রবিউল আউয়াল থেকে হিজরি সনের গণনা শুরু না করে মুহাররম মাস থেকে শুরু করেছেন।

তিন. বাইতুল মালের সূচনা;

চার. দিওয়ানের প্রবর্তন;

বাইতুল মাল হলো যেখানে রাষ্ট্রের অর্থ সঞ্চয় ও হিফাজত করে রাখা হয়। আর দিওয়ান বলে রাষ্ট্রীয় নথি ও খতিয়ানকে, যেখানে রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি রেকর্ড করে রাখা হয়। ইসলামি রাষ্ট্রের প্রাথমিক যুগে প্রচলিত বাইতুল মাল ছিল না। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যখনই কোনো অর্থ আসত, তিনি সাথে সাথেই তা বণ্টন করে দিতেন। আবু বকর রা.-ও একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। শুরুর যুগে উমার রা.-ও একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন; কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন ইসলামি খিলাফত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত হলো, তখন তিনি একটি পদ্ধতি অবলম্বনের চিন্তা করলেন, যার মাধ্যমে খলিফার দায়িত্বে থাকা যাবতীয় অর্থ, এবং সৈন্যদের বিপুল সংখ্য হিসাব রাখা সম্ভব হয়। এ কারণে সৈন্য ও বিভিন্ন পদে থাকা ব্যক্তিদের নাম সংরক্ষণ করার প্রয়োজন দেখা দিল। কারণ, এছাড়া জানার উপায় নেই যে, কাকে একবার দেওয়া হলো, আবার কাকে দেওয়া হলো

না। তখন আবার মুসলিম উম্মাহর বিজয় একটার পর একটা হতেই থাকল। ফলে এত পরিমাণ সম্পদ জমা হলো, যা ইতোপূর্বে মুসলিমদের আর কখনোই ছিল না। তখন উমার রা. দেখলেন—এভাবে এগুলোর হিসাব রাখা খলিফা ও শাসকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া এত বিশাল অর্থ-সম্পদ কোনো হিসাব-কিতাব ছাড়াই ব্যক্তিবর্গের হাতে রেখে দেওয়াটাও অর্থনীতির খিলাফ। তখন তার সেই অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নের চিন্তার ফসলই ছিল বাইতুল মাল। এখান থেকেই দিওয়ান তৈরি করা হয়। মূলত উমার রা. এই ইসলামি রাষ্ট্রে প্রথম দিওয়ান প্রণয়ন করেন।[১৮৪]

যখন বাহরাইন থেকে অঢেল সম্পদ আসে, তখন অর্থনীতি নিয়ে তার এই চিন্তা শুরু হয়েছিল। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—'বাহরাইন থেকে আমি পাঁচ লক্ষ দিরহাম নিয়ে উমার রা.-এর কাছে রাতে এলাম। বললাম—আমিরুল মুমিনিন! এই অর্থগুলো রাখেন।'

তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'কী পরিমাণ?'

আমি বললাম—'৫ লক্ষ পরিমাণ।'

তিনি বললেন—'আপনি জানেন, ৫ লক্ষ দিরহাম কী পরিমাণ?'

আমি বললাম—'হ্যাঁ, এক লক্ষ দিরহাম ৫ দিয়ে গুণ করলেই ৫ লক্ষ দিরহাম।'

তিনি বললেন—'আপনার চোখে ঘুম ঘুম ভাব, রাতে ঘুমিয়ে সকালে আসেন।'

সকাল হলে আবার তার কাছে গিয়ে বললাম—'এই সম্পদগুলো রেখে দেন।'

তিনি বললেন—'কী পরিমাণ?'

আমি বললাম—'৫ লক্ষ দিরহাম।'

তিনি বললেন—'বৈধ উপায়ে এসেছে তো?'

আমি বললাম—'আমার জানামতে বৈধ উপায়েই এসেছে।'

তখন তিনি লোকদের বললেন—'দেখো, এখন প্রচুর সম্পদ এসেছে। তোমরা যদি চাও, তাহলে পাত্রে মেপে দেব, না হয় ওজন করে দেব, কিংবা চাইলে গুণেও দেব!'

তখন এক লোক বলল—'আমিরুল মুমিনিন, আপনি সবার নামগুলো একটি ফাইলে সংরক্ষণ করে রাখেন। এরপর সে অনুযায়ী বণ্টন করবেন।'

উমার রা.-এর কাছে প্রস্তাবটি বেশ ভালো লাগল।[১৮৫]

পাঁচ. উমার রা. প্রত্যেক এলাকায় তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রশাসক নিযুক্ত করতেন। আবু ইউসুফ রহ.-এর *খারাজ* নামক গ্রন্থে আছে, উমার রা. কুফাবাসীর কাছে পত্র

---

[১৮৪] সিয়াসাতুল মাল ফীল ইসলাম, ১৫৭

[১৮৫] খারাজ নামক কিতাবে আবু ইউসুফ রহ. বর্ণনা করেন, পৃষ্ঠা : ৫৬

লিখে বলেন যে, তারা যেন তার কাছে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ব্যক্তিকে প্রেরণ করে, বসরা ও শামবাসীদের কাছেও অনুরূপ পত্র লেখেন। তখন কুফাবাসী উসমান ইবনু ফারকাদকে, শামবাসী মান ইবনু ইয়াজিদ, বসরার অধিবাসী হাজ্জাজ ইবনু গালাতকে পাঠান। তাদের প্রত্যেকেই একে অপরের সমতুল্য ছিলেন।

উমার রা. তাদের প্রত্যেককেই খারাজের (জমির রাজস্ব-ভার) দায়িত্ব দিয়েছেন।

ছয়. উমার রা. যেকোনো নতুন বিষয়ে পরামর্শ করতেন। নিয়ার আসলামি রহ. থেকে বর্ণিত, উমার রা.-এর সামনে কোনো নতুন বিষয় দেখা দিলে পরামর্শ সভার সাথে, আনসারদের থেকে মুআজ ইবনু জাবাল, উবাই ইবনু কাব এবং জায়িদ ইবনু সাবিত রা.-দের সাথে পরার্মশ করতেন।[১৮৬]

সাত. আদালতে উমার রা.-এর রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ: উমার রা.-এর যুগে ইসলাম যখন চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ল, খিলাফত যখন চারপাশে বিস্তৃত হলো, তখন খলিফার ব্যস্ততা বেড়ে গেল, বড়ো বড়ো শহরের গভর্নরদের কাজ বেড়ে গেল, মামলা-মোকদ্দমাও বৃদ্ধি পেতে থাকল। তখন উমার রা. সবগুলো ব্যবস্থাপনা স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চিন্তা করলেন, যাতে প্রশাসক শাসনাধীন বিষয়গুলোতে ভালোভাবে সময় দিতে পারেন। সে সময় উমার রা. বিভিন্ন শহরে; যেমন: কুফা, বসরা, শাম, মিসরে কাজি নিয়োগ দেন। অতএব, উমার রা.-ই সর্বপ্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কাজি নিযুক্ত করেন, বিচার-ব্যবস্থাকে শুধু তাদের সাথেই নির্দিষ্ট করে দেন এবং শাসক-প্রশাসকদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করেন। তিনি নিজেই তাদের নিয়োগ দিতেন, তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। তিনি বলতেন—বিচার-ব্যবস্থায় কোনো সমস্যা হলে শুধু তার কাছেই যেন পেশ করে, কোনো শাসক যেন সেখানে অনধিকার চর্চা না করে।

তদ্রূপ উমার রা.-ই সর্বপ্রথম কাজিদের ভাতা আলাদাভাবে বাইতুল মাল থেকে প্রদান করতেন। তার পূর্বে এই পদ্ধতি ছিল না। কারণ, আলাদাভাবে কাজীদের ভাতা-ব্যবস্থা নববি যুগেও ছিল না, আবু বকর রা.-এর যুগেও ছিল না।

আট. তার আরেকটি রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ ছিল, তিনি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-কে নেতৃত্ব থেকে বরখাস্ত করেন। কারণ, মানুষ তার ব্যাপারে ফিতনায় পড়ে গিয়েছিল। সব যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার ফলে সবাই আল্লাহকে ভুলে গিয়ে তাকেই বিজয় দানকারী মনে করত।

আদি ইবনু সাহল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—উমার রা. বিভিন্ন শহরে পত্র লিখে পাঠান যে, আমি খালিদ রা.-কে কোনো অসন্তুষ্টি বা খিয়ানতের কারণে বরখাস্ত করি নি। আসলে মানুষ তার ব্যাপারে ফিতনায় আক্রান্ত হয়েছিল। তাই,

---

[১৮৬] কানজুল উম্মাল

আমার আশঙ্কা ছিল যে, তারা খালিদ রা.-এর ওপর নির্ভর হয়ে পরীক্ষায় পড়ে যাবে। তখন আমি চাইলাম, সবাই জানুক প্রকৃতপক্ষে সমস্ত কাজ সম্পাদনা করেন একমাত্র আল্লাহই। তারা যেন এ ব্যাপারে ফিতনায় পড়ে না যায়।[১৮৭]

উসমান রা.-এর কিছু উপদেশ

এক. তার বাইআত গ্রহণ করার পর তিনি সবার উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন, সেখানে তিনি বললেন—'এই দুনিয়া সবুজ শ্যামলরূপে মানুষের সামনে শোভিত করে রাখা হয়েছে। ফলে বহু মানুষ তার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তোমরা কিন্তু দুনিয়ার দিকে ঝুঁকবে না, তাকে বিশ্বাসও করবে না। কারণ, সে বিশ্বাসের যোগ্য নয়। মনে রাখবে, যে এই দুনিয়াকে এড়িয়ে যাবে, দুনিয়াই তার পেছনে ছুটবে।'[১৮৮]

দুই. একবার তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে পত্র লিখে বলেন—'তোমরা অনুসন্ধান করার মাধ্যমে অনেক উপরে উন্নীত হয়েছ, তবে সাবধান! দুনিয়া যেন তোমাদেরকে তোমাদের নিজে দায়িত্ব থেকে ফেরাতে না পারে। কারণ, তিনটি জিনিস পাওয়া যাওয়ার পর এই উম্মাহ অচিরেই বিদআতের দিকে ধাবিত হবে—

- ০১. নিয়ামতের পূর্ণতা,
- ০২. মণিমুক্তার সাথে তোমাদের সন্তানদের বেড়ে ওঠা,
- ০৩. বেদুইন ও অনারবদের কুরআন পড়তে পারা।

কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—অস্পষ্টতার কারণে কুফুরি সৃষ্টি হয়। অনারবদের কাছে যখন কোনো বিষয় অস্পষ্ট হয়, তখন তারা কৃত্রিমভাবে ব্যাখ্যা করে আর বিদআত তথা নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করে।[১৮৯]

এই খুতবার লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে—উসমান রা. সাধারণ জনগণকে অনুসরণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং কৃত্রিমতা ও বিদআত বর্জন করার কথা বলেছেন। বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন করেছেন, যখন তিনটি অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি তাদের মাঝে চলে আসবে—

- ০১. নিয়ামতের পরিপূর্ণতা, যা মানুষকে অহংকারী ও কাপুরুষ করে ছাড়ে, শৌখিনতা ও বিলাসিতায় ভাসিয়ে দেয়। ফলে এক সময় তার ইচ্ছাশক্তিও দুর্বল হয়ে যায়।
- ০২. মণিমুক্তার সাথে সন্তান বেড়ে ওঠা।
- ০৩. বেদুইন ও অনারবদের কুরআন পড়তে পারা।

বেদুঈন দ্বারা উসমান রা. তাদের রূক্ষতা ও কর্কশতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যার ফলে কুরআনের হিদায়াতের পয়গাম তাদের অন্তরে পৌঁছতে পারে না। একইভাবে

[১৮৭] কানযুল উম্মাল, ৩৭০১৯
[১৮৮] তারিখুত তাবারি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৪৩
[১৮৯] তারিখুত তাবারি, খ...

অনারব দ্বারা বুঝিয়েছেন, তাদের পূর্ববর্তীদের থেকে পাওয়া স্বভাব-চরিত্র, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, যা তাদের কুরআনে কারিমের হিদায়াতের পথ থেকে দূরে রাখে। এজন্যই দেখা যায়, অধিকাংশ বিদআতই বেদুইন ও অনারবদের থেকে সৃষ্ট।

উসমান রা.-এর রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ

প্রশাসক ও গভর্নরদের ক্ষেত্রে তার একটি রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ ছিল, তিনি তার প্রশাসকদের কাছে পত্র লিখে বলেন—'দেখো, আল্লাহ তাআলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন রক্ষক হয়। তাদের এ-কথা বলেন—তারা যেন রক্ষক হয় (কর আদায়কারী) এই উম্মাহর অগ্রভাগ জামাআত রক্ষক ছিল, ভক্ষক ছিল না। তবে খুবই আশঙ্কা যে, শাসকরা ভক্ষক হয়ে যাবে, (শুধু রাজস্ব নিয়েই চিন্তা করবে) রক্ষক থাকবে না (প্রজাদের দেখভাল করবে না)। যদি তারা এমনটাই করে, তাহলে লজ্জা উঠে যাবে, আমানতদারিতা ও আনুগত্য চলে যাবে। শোনো, সবচেয়ে উত্তম পন্থা হচ্ছে—তোমরা মুসলিমদের বিষয়াদির দেখভাল করবে, একই সাথে তাদের কর্তব্যেরও খেয়াল রাখবে। তাদের প্রাপ্য তাদের দেবে। তাদের কর্তব্য তাদের থেকে আদায় করবে। জিম্মিদের ক্ষেত্রেও দুটো বিষয় খেয়াল করবে—তাদের প্রাপ্য তাদের দেবে এবং তাদের দায়িত্ব তাদের থেকে বুঝে নেবে। তারপর যে সকল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, তাদের সাথে আনুগত্যের সাথে বিজয় লাভ করো।'[১১০]

এখান থেকে বোঝা যায় যে, উসমান রা. প্রশাসকদের কাছে পাঠানো এই পত্রে জনগণের ওপর তাদের দায়-দায়িত্বের বিষয়ে খুব জোর দিয়েছেন। তিনি তাদের ভালো করে বুঝিয়েছেন যে—তাদের দায়িত্ব সম্পদ জমা করা নয়, বরং তাদের কর্তব্য হচ্ছে জনগণের দেখভাল করা। এ কারণে তিনি সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, কীভাবে মানুষদের শাসন করবে। অর্থাৎ, জনগণ থেকে তাদের কর্তব্য আদায় করা এবং তাদের তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া। তারা যদি এমনটা করে, তাহলে এই উম্মাহ ঠিক থাকবে। আর তারা যদি রক্ষক হয়ে যায়, শুধু সম্পদ নিয়েই চিন্তা করে, তাহলে লজ্জা-শরম উঠে যাবে, আমানতদারিতা ও বিশ্বস্ততা চলে যাবে।

আলি রা. এর কিছু উপদেশ

০১. আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলি রা. বলেছেন—'কিছু উপদেশ এমন আছে, সে অনুযায়ী যদি তোমরা কোনো পশুকেও চালাতে থাকো, তাহলে তার মতো আরেকটা পশুর নাগাল পাওয়ার আগেই সেটাকে ক্লান্ত করে ফেলবে। তাই, একজন বান্দার উচিত হলো :

- (ক) বান্দা যেন তার রবের কাছেই শুধু আশা করে;
- (খ) তার গুনাহকেই যেন ভয় করে;

[১১০] তারিখুত তাবারি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৪৪

- (গ) যে জানে না সে যেন জানতে লজ্জাবোধ না করে;
- (ঘ) যখন কোনো আলিমকে তার অজানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন যেন এ কথা বলতে লজ্জাবোধ না করে—'আল্লাহই ভালো জানেন'।

শুনে রাখো—ঈমান থেকে সবরের স্থান হলো শরীর থেকে মাথার স্থানের মতো। যদি মাথাই না থাকে, তাহলে শরীরের কোনো মূল্য নেই। তদ্রূপ যদি সবর না থাকে, তাহলে ঈমানের কোনো মূল্য নেই।[১১১]

০২. হারিস থেকে বর্ণিত, তিনি আলি রা. থেকে বর্ণনা করেন—'যে ঈমান আনার পর কুরআন শিখবে, তার উদাহরণ হচ্ছে এমন ফলের মতো, যার ঘ্রাণও সুন্দর, স্বাদও মিষ্ট। আর যে ঈমানও আনে নি, কুরআনও শেখে নি, তার উদাহরণ হলো এমন টক ফলের মতো, যার ঘ্রাণও অসুন্দর, স্বাদও তিতা।'[১১২]

০৩. বনু আমির গোত্রের একজন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলি রা. বলেছেন—'আমি তোমাদের ব্যাপারে দুটো জিনিসের আশঙ্কা করি—

- এক. দীর্ঘায়ুর আকাঙ্ক্ষা; ও
- দুই. খাহেশাতের অনুসরণ।

দীর্ঘায়ু কামনা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয়, আর খাহেশাতের অনুসরণ সত্য থেকে বিমুখ করে। দুনিয়া পশ্চাতে চলে গেছে, আর আখিরাত সামনেই আসছে। দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টিরই অনেক গোলাম আছে, তোমরা আখিরাতের গোলাম হও। কারণ আজ আমলের সুযোগ আছে, কিন্তু হিসাব নেওয়া হবে না। আর আগামীকাল হিসাব হবে, কিন্তু আমলের সুযোগ হবে না।''[১১৩]

০৪. হাসান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলি রা. বলেছেন—'এমন ব্যক্তি বড়োই সৌভাগ্যবান যে গুমনাম—সবাইকে চেনে, কিন্তু সবাই তাকে চেনে না। তবে আল্লাহ তাআলা তাকে সন্তোষজনক হিসাবে জানেন। তারাই হলো হিদায়াতের প্রদীপ, যাদের মাধ্যমে প্রতিটি অন্ধকারও যেন দূরীভূত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তাদের আপন রহমতে দাখিল করবেন। তারা মানুষের গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করে বেড়ায় না, রূঢ় ব্যবহার করে না, মানুষকে দেখিয়ে আমল করে না।[১১৪]

ইবনু হাজার হাইতামি রহ.-এর *সাওয়াইক* গ্রন্থে আছে, আলি রা. এর নীতিবাক্য—

০১. মানুষ এতটাই অসচেতন যে, মৃত্যুর আগে তার চেতন ফিরে পাবে না।

---

[১১১] মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা
[১১২] মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা
[১১৩] মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা
[১১৪] মুসান্নাফ ইবনি আবি ...

০২. যে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খেয়াল রাখে, সে ব্যর্থ হয় না। মানুষকে যা সুন্দর করে তোলে সেটার বিচারেই তাকে মূল্য দেওয়া হবে।

০৩. যে নিজেকে ভালো করে চেনে, সে তার রবকেও চিনতে পারে।

০৪. মানুষ তার জিহ্বার কাছে লুক্কায়িত। (অর্থাৎ, নিজের খারাপ অবস্থা সম্পর্কে বলে না, বরং অন্যের ব্যাপার নিয়ে মুখ চালু রাখে..)

০৫. যে নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার অনেক সঙ্গী তৈরি হয়।

০৬. ইহসান ও সদাচারের মাধ্যমে স্বাধীন ব্যক্তিকেও দাস ও গোলাম বানানো যায়।

০৭. বিপদের সময় ছটফট করলে বিপদ মহাবিপদে পরিণত হয়।

০৮. বিদ্রোহ করে বিজয় অর্জন করাকে বিজয় বলে না।

০৯. অহংকারী কখনো প্রশংসার যোগ্য নয়।

১০. অতিভোজন স্বাস্থ্যসম্মত নয়।

১১. বেয়াদবের কোনো সম্মান নেই।

১২. হিংসুকের শান্তি নেই।

১৩. প্রতিশোধের ইচ্ছা থাকলে নেতৃত্ব দেওয়া যায় না।

১৪. পরামর্শ ব্যতীত কোনো কাজ করলে সেটা সঠিক হতে পারে না।

১৫. মিথ্যুক কখনো অভিজাত হতে পারে না।

১৬. মুত্তাকির সম্মানের চেয়ে আর কোনো মর্যাদাপূর্ণ সম্মান হয় না।

১৭. তাওবার চেয়ে সফল কোনো সুপারিশকারী নেই।

১৮. পবিত্রতার চাইতে সুন্দর কোনো লিবাস (আবরণকারী) হতে পারে না।

১৯. মূর্খতার চাইতে ভয়ংকর কোনো রোগ নেই।

২০. মানুষ যা জানে না, তাকে শত্রু মনে করে।

২১. যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন থাকে, সীমানা অতিক্রম করে না—এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ রহম করুন।

২২. বার বার ওজর পেশ করা ব্যক্তির গুনাহের দিকে ইঙ্গিত করে।

২৩. সভাসদবর্গকে উপদেশ দেওয়ার অর্থ নিন্দা করা।

২৪. কোনো জাহেলের ওপর ইহসান করার অর্থ হলো আবর্জনার ওপর বাগান তৈরি করা।

২৫. অস্থিরতা সবরের চেয়েও বেশি কষ্ট দেয়।

২৬. জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি (উত্তরের) ওয়াদা দেওয়ার আগ পর্যন্ত স্বাধীন।

২৭. যার ষড়যন্ত্র যত বেশি গোপনীয়, সেই তত বড়ো শত্রু।

২৮. হিকমত ও প্রজ্ঞা মুমিনের হারানো সম্পদ।

২৯. কৃপণতা সব ধরনের দোষের মূল।

৩০. যখন তাকদির নেমে আসে, তখন চেষ্টা-তদবির ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রবৃত্তির দাস গোলামির দাসের চেয়েও লাঞ্ছিত।

৩১. যার কোনো দোষ নেই, হিংসুক তার ওপরও বেজার।

৩২. অপরাধের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে কোনো অপরাধীর সুপারিশ করে।

৩৩. সে-ই সৌভাগ্যবান, যে অনেক নসিহত গ্রহণ করে।

৩৪. ইহসান ও সদাচার শত্রুর মুখ বন্ধ করে দেয়।

৩৫. সে-ই সবচেয়ে দরিদ্র, যার বুদ্ধি নেই।

৩৬. যার জ্ঞান আছে, সে-ই সেরা ধনী।

৩৭. লোভী অপদস্থতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

৩৮. অধিকাংশ সময় লোভের বেড়াজালে আটকা পড়েই মানুষ পরাস্ত হয়।

৩৯. যখন তোমাদের কাছে অনেক নিয়ামত আসে, তখন না-শোকরি করে সেগুলোকে বিলুপ্ত করে দিও না।

৪০. যখন শত্রুকে নাগালে পাও, তখন নাগালে পাওয়ার শুকরিয়া হিসেবে তাকে ক্ষমা করে দাও।

৪১. কৃপণতা মূলত দারিদ্র্যকেই ডেকে নিয়ে আসে। দুনিয়াতে গরিবদের মতো বসবাস করে, অথচ আখিরাতে ধনীদের কাতারে হিসাব নেওয়া হবে।

৪২. জ্ঞানী ব্যক্তির মুখ অন্তরের পেছনে থাকে, আর মূর্খ ব্যক্তির অন্তর মুখের পেছনে থাকে।

৪৩. ইলম সাধারণকেও অসাধারণ করে তোলে, আর মূর্খতা উচ্চকেও অনুচ্চ করে ছাড়ে।

৪৪. ইলম সম্পদের চেয়ে শতভাগ শ্রেষ্ঠ।

৪৫. ইলম তোমাকে রক্ষা করে, অথচ তুমি সম্পদকে রক্ষা করো।

৪৬. ইলম বিচার করে, আর সম্পদের বিচার করা হয়।

৪৭. আমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে রাখে নির্লজ্জ আলিম এবং অজ্ঞ আবেদ। নির্লজ্জ আলিম মানুষকে ফতোয়া দেয়, আর তার নির্লজ্জতা দিয়ে মানুষকে দূরে সরিয়ে

রাখে। আর অজ্ঞ আবেদ তার ইবাদতের মাধ্যমে মানুষকে ভ্রষ্ট করে।

৪৮. যার ইলম কম, সে-ই সবচেয়ে কম মূল্যবান। কারণ, প্রত্যেক মানুষের মূল্যমান নির্ধারণ করা হয় ওই জিনিসের মাধ্যমে, যা তাকে উত্তম করে তোলে।

আলি রা. এর রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ

এক. তিনি পূর্ববর্তী খলিফাদের খুব প্রশংসা করতেন। ইমাম সুয়ুতি রহ.-এর *তারিখুল খুলাফাতে* উল্লেখ আছে, হাসান রা. থেকে ইবনু আসাকির রহ. বর্ণনা করেন—আলি রা. যখন বসরায় আগমন করেন, তখন ইবনু কাওয়া ও কাইস ইবনু আব্বাদ তার কাছে এসে বলল : 'আচ্ছা বলেন তো, আপনি কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন? উম্মাহর নেতৃত্ব গ্রহণ করে একে অপরকে মারামারিতে লিপ্ত করছেন। আসলে কি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে (নেতৃত্ব গ্রহণের) নির্দেশ দিয়েছেন? আপনি কিছু শুনে থাকলে বলেন। কারণ, আপনি যা শুনেছেন সে বিষয়ে আপনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, নিরাপদ।'

তখন আলি রা. বলেন—'শোনো, এ ব্যাপারে আমার কাছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো নির্দেশ নেই। আল্লাহর কসম! আমি যদি তাকে সর্বপ্রথম সত্যায়ন করে থাকি, তাহলে তো আমি কখনোই তার নামে মিথ্যা কথা বলতে পারি না। আর যদি আমার কাছে এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো নির্দেশ থাকত, তাহলে তো আমি আবু বকর রা. ও উমার রা.-কে মিম্বারের ওপর বসতেই দিতাম না। তখন আমার নিজ হাতেই আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতাম, যদিও আমার হাতে এই রুমালটি ছাড়া আর কিছুই না থাকত। বস্তুত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যাও করা হয় নি, তিনি আচমকাও মৃত্যুবরণ করেন নি। অসুস্থ অবস্থায় কিছু কাল ছিলেন, মুয়াজ্জিন তার কাছে এসে নামাজের অনুমতি চাইলে তিনি আবু বকর রা.-কে নামাজ পড়ানোর আদেশ করতেন, যদিও আমার মর্যাদা তার কাছে কেমন, কতটুকু তার সেটা অজানা ছিল না। আবু বকরকে ইমামতির নির্দেশ দেওয়ার পর নবীজির স্ত্রীদের একজন (আম্মাজান আয়িশা) আবু বকর রা.-কে নামাজ পড়ানো থেকে ফেরাতে চাইলে তিনি কষ্ট পান এবং তার কথা না করে দিয়ে বলেন—

انتن صواحب يوسف مروء ابا بكر يصلي بالناس

'তোমরা নারীরা আসলে ইউসুফ আ. এর (সাথে চক্রান্ত করা নারীদের মতো)। যাও আবু বকরকে নামাজ পড়াতে বলো।'

পরে যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করলেন, তখন আমরা চিন্তা করে আমাদের দুনিয়াবি বিষয়ের জন্য তাকে নির্বাচন করলাম, যাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দ্বীনের জন্য মনোনীত করেছিলেন। কারণ, নামাজই ইসলামের ভিত্তি, নামাজই দ্বীনের মূল ও প্রধান।

তাই, আমরা আবু বকর রা. এর হাতে বাইআত গ্রহণ করলাম। আর তিনি তার যোগ্যও ছিলেন। তার বিষয়ে কেউ ইখতিলাফও করে নি, কেউ তার বিরুদ্ধে উসকেও দেয় নি, তার থেকে দায়মুক্তিও ঘোষণা করে নি। তাই, আমি আবু বকর রা.-এর হক আদায় করি। তার আনুগত্য মেনে নিই। তার সাথেই তার বাহিনীতে যুদ্ধ করি। তিনি কিছু দিলে সেটা আমি গ্রহণ করতাম, তিনি যুদ্ধের আদেশ করলে যুদ্ধ করতাম। তার আদেশে নিজের চাবুক দিয়ে হদ প্রয়োগ করতাম।

তার মৃত্যুর পর উমার রা. যখন শাসনভার গ্রহণ করলেন, তিনি তার ভাই আবু বকর রা. এর নির্দেশেই শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। তখন আমরা তার বাইআত গ্রহণ করলাম। তার বিষয়েও কেউ মতবিরোধ করে নি। কেউ তার বিরুদ্ধে উসকেও দেয় নি, সম্পর্কমুক্তও ঘোষণা করে নি। আমি উমার রা. এর হক আদায় করেছি। তার আনুগত্য স্বীকার করেছি। তার বাহিনীতে তারই সাথে যুদ্ধ করেছি। তিনি কিছু দিলে সেটা আমি গ্রহণ করতাম। তিনি যুদ্ধের কথা বললে আমি যুদ্ধ করতাম। তার নির্দেশে আমার নিজ হাতে হদ প্রয়োগ করতাম।

তিনি যখন ইনতিকাল করলেন, তখন মনে মনে নবীজির আত্মীয়তার কথা, ইসলামের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তিতা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা চিন্তায় এলো। আমার মনে হচ্ছিল যে, আমার সাথে ইনসাফ করা হচ্ছে না। উমার রা. জীবিত থাকাবস্থায় আশঙ্কা করেছিলেন, না-জানি পরবর্তী খলিফা কোনো পাপ করে ফেলতে পারে। তাই, তিনি খিলাফত থেকে নিজেও বের হয়ে এলেন, নিজের ছেলেকেও বের করে ফেললেন। যদি তিনি পক্ষপাতিত্ব করতে চাইতেন, তাহলে খিলাফতের ক্ষেত্রে তার ছেলেকেই অগ্রাধিকার দিতেন; কিন্তু তিনি খিলাফতের বিষয়টি কুরাইশের ছয়জনের একটি দলের কাছে সোপর্দ করলেন, যাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। যখন সবাই একত্র হলো, তখন আমার মনে হলো আমার সাথে ইনসাফ করা হবে না। যাই হোক, আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রা. আমাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন, যার হাতে আল্লাহ তাআলা এই শাসনভার সোপর্দ করবেন আমরা তার কথা শুনবো এবং মানবো। তারপর তিনি উসমান রা. এর হাতে হাত রেখে বাইআত গ্রহণ করলেন। তখন আমি চিন্তা করে দেখি—এবারও আমাকে নিজ হাতে বাইআত গ্রহণের পরিবর্তে আনুগত্য করতে হলো। এবারও দেখি আমাকে অন্যের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হলো। যাই হোক, আমরা উসমান রা. এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেছি। তার

হকও আদায় করেছি, আনুগত্যও স্বীকার করেছি। তার বাহিনীতে তারই সাথে যুদ্ধ করেছি। তার সময়ে আমি নিজের চাবুক দিয়েই হদ প্রয়োগ করতাম।

যখন তিনি শহিদ হলেন, তখন আমি নিজের বিষয়ে চিন্তা করলাম। যখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (নামাজ পড়ানোর নির্দেশে) নির্দেশিত দুই খলিফা চলে গেলেন এবং পরবর্তী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তৃতীয় খলিফা শহিদ হলেন, তখন দেখি মক্কা-মদিনার অধিবাসী, কুফা-বসরার অধিবাসীরা আমার হাতে বাইআত গ্রহণ করে। আর তখনই আমার বিরুদ্ধে আমার সমতুল্য নয় এমন এক ব্যক্তি বিদ্রোহ করে বসল—যে কিনা আমার মতো রাসুলের নিকটাত্মীয়ও নয়, আমার মতো আলিমও নয়, তদ্রূপ ইসলাম গ্রহণে আমার চেয়ে অগ্রবর্তীও নয়। মূলত আমিই তার চেয়ে বেশি হকদার ছিলাম।'

আলি রা.-এর দীর্ঘ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, পূর্ববর্তী খলিফাদের প্রশংসা বর্ণনা করাও খলিফার একটি রাষ্ট্রীয় বক্তব্য। তাহলে জনগণও তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। খলিফাদের ভুলত্রুটি হয়ে গেলেও সেগুলো উল্লেখ করবে না, বরং সে বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করবে।

দুই. রাষ্ট্রীয় আরও কিছু কর্তব্য আছে, যা আলি রা. বলেন—শাসকের কর্তব্য, শাসনকার্যে তিনটি মূলনীতি অবলম্বন করা। যথা:

- (ক) রাগের সময় শাস্তি না দেওয়া;
- (খ) সদাচারীকে যত দ্রুত সম্ভব পুরস্কৃত করা;
- (গ) নতুন কোনো কিছু করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে ধীরে সুস্থে করা।

কারণ, রাগের সময় শাস্তি না দিয়ে বিলম্বিত করলে মাফ করার মানসিকতা তৈরি হতে পারে। আর সদাচারীকে দ্রুত পুরস্কৃত করলে জনগণও খুব সহজেই তার ডাকে সাড়া দেবে। আর ধীর সুস্থে কাজ করলে কাজের বিভিন্ন পদ্ধতি চিন্তায় আসতে পারে, ফলে সঠিক পদ্ধতি স্পষ্ট হবে।

তিন. তিনি একবার এক ইহুদির সাথে আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন। ঘটনাটি মাসিরা থেকে তিনি কাজি শুরাইহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—আলি রা. যখন সিফফিন যুদ্ধে গমন করেন, তখন হঠাৎ তার শিরস্ত্রাণটি হারিয়ে যায়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর কুফায় ফিরে এলে তিনি শিরস্ত্রাণটি এক ইহুদির হাতে দেখতে পান। তখন তিনি ওই ইহুদিকে বলেন—'শিরস্ত্রাণটি তো আমার। এটা আমি বিক্রি করি নি, কাউকে হাদিয়াও দিই নি।'

ইহুদিও বলল—'না! শিরস্ত্রাণটি আমার।'

তখন আলি রা. বললেন—'তাহলে কাজির কাছে চলো।'

আলি রা. আদালতে গিয়ে কাজি শুরাইহর পাশে বসে বললেন, বিবাদী যদি ইহুদি না হতো, তাহলে আমি তার সাথেই বসতাম; কিন্তু আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

أصغروهم من حيث أصغرهم الله

আল্লাহ তাআলা যে সকল ক্ষেত্রে তাদেরকে (আহলে কিতাব) লাঞ্ছিত করেছেন, তোমরাও সেসব স্থানে তাদেরকে লাঞ্ছিত করো।

তখন কাজি শুরাইহ বললেন—'আচ্ছা, আমিরুল মুমিনিন! এবার বলেন—আপনার দাবি কী?'

তিনি বললেন—'ইহুদির এই যে শিরস্ত্রাণটি হাতে দেখতে পাচ্ছ, এটা আমার। আমি এটা বিক্রিও করি নি, কাউকে দানও করি নি।'

শুরাইহ ইহুদিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এ ব্যাপারে তুমি কী বলো?'

সে বলল—'এটা আমারই শিরস্ত্রাণ। এটা আগে থেকেই আমার কাছে আছে।'

তখন শুরাইহ আমিরুল মুমিনিনকে বললেন—'আপনার কাছে কি কোনো প্রমাণ আছে?'

তিনি বললেন—'আছে। হাসান হুসাইনই সাক্ষ্য দেবে যে—শিরস্ত্রাণটি আমার।'

শুরাইহ বললেন—'সন্তানের সাক্ষ্য পিতার ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য।'

তখন আলি রা. বললেন—'জান্নাতি ব্যক্তির সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য? আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة

'হাসান হুসাইন জান্নাতি যুবকদের সর্দার।'

তখন ওই ইহুদি বলে উঠলে—'আমিরুল মুমিনিন আমাকে তার কাজির কাছে নিয়ে এসেছেন, অথচ তার কাজিই তার বিরুদ্ধে ফায়সালা করেছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এই দ্বীন ইসলামই সত্য। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল। আসলে শিরস্ত্রাণটি আপনারই ছিল।'[১১৫]

সুতরাং এখান থেকে বোঝা গেল, শাসকের কর্তব্য হলো—তিনি নিজেও শরিয়তের বিধিবিধান পালন করবেন। ফলে তাকে দেখেই মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শরিয়তের পাবন্দি করবে। কারণ, রাজার চালেই রাজ্য চলে। এজন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্রাট হিরক্লিয়াসের কাছে লেখা পত্রে বলেছিলেন—

---

[১১৫] সুয়ুতি, তারিখুল খুলাফা

فإن توليت فإن عليك إثم الأريثين

'যদি তুমি (ইসলাম গ্রহণ থেকে) ফিরে যাও, না হলে প্রজাদের গুনাহ তোমারই ওপর বর্তাবে।'[১৯৬]

আলি রা. এর চমৎকার বিচার

জুর ইবনু হাবিশ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—দুজন লোক একসাথে খেতে বসেছে। একজনের কাছে ৩টি রুটি, অপরজনের কাছে ৫টি। তারা যখন রুটিগুলো সামনে রেখেছে, তখন এক লোক তাদের সামনে এসে সালাম দেয়। তারা তাকে তাদের সাথে খেতে বলে। লোকটিও তাদের সাথে শরিক হয়। তিন জন মিলে ৮টি রুটি খায়। যাওয়ার সময় লোকটি আট দিরহাম দিয়ে বলে—'এই নাও তোমাদের খাবারের বিনিময়।'

এখন দুজন ঝগড়া শুরু করে দেয়। পাঁচ রুটিওয়ালা বলে—'আমার পাঁচ দিরহাম, আর তোমার তিন দিরহাম।'

তিন দিরহামওয়ালা বলে—'দেখো! সমান সমান ভাগ ছাড়া আমি নেব না।'

তখন তারা দুজন আমিরুল মুমিনিন আলি রা.-এর কাছে পুরো ঘটনাটি খুলে বলে। আলি রা. তিন রুটিওয়ালাকে বলেন—'দেখো, তোমার সাথি তো একটি সুন্দর মতই পেশ করেছে। কারণ, তার রুটি তোমার চেয়েও বেশি। সুতরাং, তুমি তিনটিই মেনে নাও।'

সে বলে উঠল—'আমি ইনসাফ পেতে চাই।'

তখন আলি রা. বললেন—'তুমি যদি ইনসাফ পেতে চাও, তাহলে তো তোমার ভাগ্যে একটাই জুটবে!'

লোকটি বলল—'আরে! এটা কী?'

তিনি বললেন—'এটাই ইনসাফ।'

সে বলল—'তাহলে আমাকে বুঝিয়ে দেন—ইনসাফ কীভাবে হলো, যাতে আমি মেনে নিতে পারি?'

আলি রা. বললেন—'তাহলে শোনো, আটটি রুটিকে ২৪ ভাগ করো। তোমরা তিনজনই মিলেমিশে এই ২৪ ভাগ রুটি খেয়েছ। যেহেতু কে কম খেয়েছে, আর কে বেশি খেয়েছে জানা নাই; সুতরাং ধরা হবে, সবাই সমান সমান খেয়েছ। তাহলে তুমি খেয়েছ ২৪ ভাগের ৮ ভাগ। মূলত, ২৪ ভাগের ৯ ভাগ তোমার নিজের। আর তোমার সাথি খেয়েছে ৮ ভাগ। প্রকৃত পক্ষে, সে ১৫ ভাগের মালিক। সেখান থেকে শুধু ৮ ভাগ খেয়েছে। তার আরও বাকি আছে ৭ ভাগ, যা দিরহামওয়ালা খেয়েছে।

[১৯৬] সহিহ বুখারি, ৪৫৫৩

আর তোমার বাকি ছিল এক ভাগ, যা দিরহামওয়ালা খেয়েছে। সুতরাং, তোমার একভাগের বিনিময়ে এক দিরহাম, আর তার ৭ ভাগের বিনিময়ে ৭ দিরহাম।' তখন লোকটি বলল—'এখন আমি বুঝলাম।'[১৯৭]

যুদ্ধে শাসকের কর্তব্য

শত্রুদের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি করা : যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাজওয়াতুল আহজাবে মতভেদ সৃষ্টি করেছেন। ঘটনাটি সংক্ষিপ্তভাবে বললে এ-রকম—ইহুদিদের ক্ষুদ্র একটা দল, যাদের মাঝে সালাম ইবনু আবু হাকিফ, ফিনানা ইবনু রাবি ইবনি আবিল হাকিফ, সালাম ইবনু মুশকিম—এরা ছিল বনু নাজির গোত্রের লোক। হাওজা ইবনু কাইস এবং আম্মার, এরা দুইজন ছিল ওয়াইলি গোত্রের। এরা আরবের বড়ো বড়ো গোত্রকে সম্মিলিত করার পরিকল্পনা করে। প্রথমে মক্কার মুশরিকদের কাছে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তাব পেশ করে, সাথে সাথে সাহায্য করারও প্রতিশ্রুতি দেয়। কুরাইশরা প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। তারপর এরা গাতফান গোত্রের কাছে গিয়ে একই প্রস্তাব পেশ করলে তারাও প্রস্তাবে সাড়া দেয়।

যুদ্ধের সময় হলে কুরাইশ গোত্র তাদের নেতা আবু সুফইয়ানের সাথে বের হয়, গাতফান গোত্র তিন দলে ভাগ হয়ে বের হয় তাদের নেতা উওয়াইনা ইবনু হিসন বনু ফাজারা গোত্রের দায়িত্বে থাকেন, হারিস ইবনু আতফ বনু মুরবা গোত্রের থাকে আর মুসইর ইবনু রাখিলা আশজা গোত্রের দায়িত্বে থাকেন। যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিষয়টা জানতে পারলেন, তখন মদিনার সীমান্তে খন্দক তৈরির আদেশ দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও প্রচুর পরিশ্রম করেন। এভাবেই খন্দকের কাজটা সম্পূর্ণ হলো। খন্দক তৈরির সময় বেশ কিছু মুজিজা দেখা গিয়েছে, যা সিরাতের কিতাবে উল্লেখ আছে। তারা একে একে রুমা উপাত্যকার স্রোতের মিলনকেন্দ্রে তাঁবু ফেলেছে, যা জারফ ও জাগাবা নামক জায়গার মাঝে। বিভিন্ন সম্প্রদায় মিলে এরা হাজার খানেক ছিল সংখ্যায়। কিনান গোত্রও তাদের অনুগামী হয়ে এসেছে। তারা উহুদ-প্রান্তর অভিমুখী নিকমা এলাকার শেষ অংশে তাঁবু ফেলেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন হাজার মুসলিম বাহিনী নিয়ে মদিনা শহর থেকে বের হন, কেউ কেউ বলে সংখ্যা ছিল মাত্র ৯০০জন।

কাব ইবনু আসাদ ছিল বনু কুরাইজার প্রধান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সন্ধিতে আবদ্ধ ছিল তো হুয়াই ইবনু আখতাব তার কাছে এসে সন্ধি ভঙ্গ করার জন্য তাদের উস্কে দিতে থাকে, কাবও না করছিল; কিন্তু একসময় তার প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে

---

[১৯৭] তারিখুল খুলাফা, ১৩১

কৃত সন্ধি ভেঙে ফেলল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টা জানতে পারলে সাদ ইবনু মুআজ, সাদ ইবনু উবাদা—তারা দুজন আউস ও খাজরোজ গোত্রপ্রধান—আমর ইবনু আউফ গোত্রের বন্ধু খাওয়াত ইবনু জুবাইর, হারিস ইবনু খাজরাজ গোত্রের বন্ধু আব্দুল্লাহ ইবনু রবাহা রা.-কে তাদের বিষয়টা যাচাই করার জন্য পাঠান। তারা বন কুরাইজা বস্তিতে পৌঁছলে তাদের প্রকাশ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখেন। শুধু তাই নয়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে তারা বিভিন্ন খারাপ শব্দ ও ব্যবহার করেছিল। তখন সাদ ইবনু মুআজ তাদের তিরস্কার করেন। তারপর সবাই চলে আসেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বলে দিয়েছেন, যদি সত্যিই বুন কুরাইজা বিশ্বাস ভঙ্গা করে থাকে, তাহলে যেন তাকে অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিতে বিষয়টা জানিয়ে দেয়। তখন তারা এসে নবী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন—আজল ও কারাহ। অর্থাৎ আজল ও কারাহ ‘রাজি’ অভিযানে যেমন চুক্তি ভঙ্গা করেছিল, তদ্রুপ বনু কুরইজাও চুক্তি ভঙ্গা করেছে।

ফলে বিষয়টা গুরুতর হয়ে গেল, চতুর্দিক থেকে মুসলিমরা শত্রুদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে গেল, যখন এইরকম গুরুতর কঠিন অবস্থা, তখন নুআইম ইবনু মাসউদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছি। যদিও আমার কাউম এ-বিষয়ে কিছুই জানে না। এখন আমাকে তাদের বিরুদ্ধে যে কোনো কিছুর আদেশ করতে পারেন।

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন—তুমি তো একাই আছ। আমাদের পক্ষে যদি পার, তাহলে যুদ্ধটা কোনো কৌশলে বন্ধ করার চেষ্টা করো। কারণ, যুদ্ধ মানেই ধোঁকা।

তখন নুআইম রা. বনু কুরাইজার কাছে এসে বললেন—জাহিলি যুগে তাদের সাথে নুআইম রা.-এর চলাফেরা হতো, দেখো, তোমরা জানো আমি তোমাদের কেমন ভালোবাসি, আমাদের এবং তোমাদের মাঝে কতটা দৃঢ় সম্পর্ক।

তারা বলল—তা তো বটেই।

তিনি বললেন—তোমরা কিন্তু কুরাইশ ও গাতফানের মতো নও। এ শহরটা যেহেতু তোমাদেরই, তাই তোমরা কুরাইশ ও গাতফানের মতো পালাতে পারবে না। যদি যুদ্ধে তোমরা জিতে যাও, তাহলে তো হলো। আর না-হয় তারা তোমাদের ছেড়ে নিজেদের এলাকায় চলে যাবে। আর তখন তোমরা একা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে যুদ্ধ করার সামার্থ্য রাখবে না। এখন যদি কুরাইশ ও গাতফানের সাথে হয়ে যুদ্ধ করতেই চাও, তাহলে আগে তাদের থেকে কোনো কিছু বন্ধক হিসাবে নিয়ে রেখো।

তারা বলল—আপনি তো সুন্দর পরামর্শ দিলেন।

তারপর তিনি কুরাইশের কাছে গিয়ে আবু সুফইয়ানকে বললেন—তোমরা যে আমার সম্পর্কে সুধারণাই রাখো। তো শোনো, তোমাদের অনতিবিলম্বে জানাতে হবে এমন একটা বিষয় আমার কানে এসেছে। এখন শুনতে চাইলে আমার নাম গোপন রাখতে হবে।

তারা বলল—কী সে বিষয়?

তিনি বললেন—ইহুদিরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে এখন খুব অনুতপ্ত হয়েছে। তারা এখন এই ওয়াদা করেছে যে, তোমাদের থেকে একদল যোদ্ধাকে বন্ধক হিসাবে নিয়ে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে সোপর্দ করবে, তারপর তার সাথে মিলে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তখন কুরাইশ তাকে ধন্যবাদ জানাল।

তারপর গাতফানের কাছে এসে একই কথা বলল। তারপর চতুর্থ হিজরির শাউয়াল মাসের শনিবার রাতে আবু সুফইয়ান ও গাতফান বনু কুরাইজার কাছে দূত পাঠিয়ে বলল—দেখো আমাদের এখন আর থাকার মতো জায়গা নেই, সুতরাং তোমরাই যুদ্ধ শুরু করে দাও।

তখন ইহুদিরা দূত পাঠিয়ে বলল—আজ কিন্তু শনিবার, তবুও তোমাদের সাথে লড়াই করব না, যতক্ষণ না তোমরা আমাদের বন্ধক দাও।

তখন কুরাইশ ও গাতফান আবার দূত পাঠিয়ে বলল—আল্লাহর কসম, কখনোই তোমাদের বন্ধক দেব না। তোমরা বরং বেরিয়ে পড়ো।

তখন বনু কুরাইজা বলাবলি করল—তাহলে তো নুআইম সত্যই বলল! যখন দূত ফিরে এসে তাদের এই প্রত্যাখানের কথা বলল তখন কুরাইশরাও বলল—নুআইম তো তাহলে ঠিকই বলেছে। ফলে তারা লড়াই করার ইচ্ছা বাদ দিলে এভাবে এই বিশাল দশ হাজারের বাহিনীও দুর্বল হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা তাদের পরাজিত করেন।

মোটকথা, শত্রুরা যখন পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে যায়, তখন এমনিতেই দুর্বল হয়ে যায়। কারণ, মতবিরোধ থেকে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, শক্তি ও রাষ্ট্র হাতছাড়া হয়। এ-জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

তোমরা পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হয়ো না তাহলে ব্যর্থ হবে, শক্তিও প্রতাপ চলে যাবে।[১১৮]

[১১৮] সূরা আনফাল, আয়াত : ৪৬
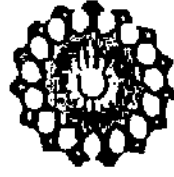
খলিফার দায়িত্ব

খলিফার যে-সব দায়িত্ব

খলিফা রাষ্ট্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একজন দায়িত্বশীল। যে কারণে তার দায়-দায়িত্বের সীমা-পরিসীমাও অনেক বেশি। আমরা এখানে তার দায়িত্বগুলো দেখব—

০১. দ্বীনের হিফাজত : এটা দুই পদ্ধতিতে হবে—

প্রথম পদ্ধতি : দ্বীনের বিভিন্ন হক রক্ষা করার মাধ্যমে, মুসলিমদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তবে সেটা ওইভাবে হতে হবে যেভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন, যে পন্থায় সাহাবায়ে কিরাম দ্বীনের হক-সমূহ রক্ষা করেছেন এবং পরবর্তীদের কাছে অর্পন করেছেন, যেভাবে সর্ব সম্মতিক্রমে নিযুক্ত খলিফারা এর ব্যাখ্যা করেছেন। আবু ইয়ালা রহ. বলেন—খলিফার ওপর দ্বীন রক্ষা করা কর্তব্য ওই নিয়ম-নীতির আলোকে, যার ওপর সালাফে সালিহিন একমত পোষণ করেন। এখন কারও যদি দ্বীনের বিষয়ে সন্দেহ জাগে, তাহলে তার সামনে তিনি প্রমাণ পেশ করবেন, সঠিকটা স্পষ্ট করবেন। যে সকল বিধিবিধান ও শাস্তি আছে সেগুলো প্রয়োগ করবেন যাতে দ্বীন ভুল ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকে, মানুষও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষিত থাকে।[১৯৯]

এটা তখনই করা সম্ভব যখন বিদআতিদের বাধা দেওয়া যাবে, উলামায়ে হককে সাহায্য করা হবে দ্বীনি মাদরাসা কায়েম করা হবে, দ্বীনি ইলম ব্যাপকভাবে প্রচার করা হবে, এই ইলমকে প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : দ্বীন হিফাজতের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো ইসলামের বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা। এটা তখনই সফল হবে যখন মানুষের যাবতীয় পারস্পরিক লেনদেন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে শরিয়তের আহকাম প্রয়োগ করা হবে, মানুষকে শরিয়তের সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত রাখবে, আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন

[১৯৯] আহকামে সুলতানিয়্যা : ২৭

করবে, এসব বিষয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করা হবে, অবাধ্যদের শাস্তির আওতায় আনা হবে, সমাজ থেকে অন্যায়-দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা দূর করতে হবে। কারণ, সক্ষমতা থাকলেও অন্যায় বিশৃঙ্খলা দূর না করে দ্বীনের হিফাজত কখনোই সম্ভব না। আবু ইয়ালা রহ. বলেন—খলিফার কর্তব্য বিবাদের মাঝে শরিয়তের যে বিধিবিধান আছে সেগুলো প্রয়োগ করা, তাদের ঝগড়া নিরসন করা, যাতে সুবিচার করা সম্ভব হয়, তাহলে কোনো জালিমও শক্তি 'প্রদর্শন' করতে আসার সাহস করবে না, মজলুমকেও দুর্বল নিরুপায় হতে হবে না। প্রয়োজন দেখা দিলে হদও কায়েম করবে। যাতে কেউ আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ ভঙ্গা করা, অসম্মানি করা থেকে রক্ষা করা যা এবং যাতে বান্দাদের হকও অযথায় বিফলে না যায়।[২০০]

০২. দ্বীন মোতাবেক দুনিয়া পরিচালনা : এটা দ্বারা উদ্দেশ্য, শরিয়াহ মোতাবেক দুনিয়াবি বিষয় কার্যকর করা ও জনগণের দেখভাল করা; যা ইসলামি খিলাফতের বড়ো এবং মৌলিক একটি উদ্দেশ্য। এই পরিচালনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র—

এক. জনগণের মাঝে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

ইয়াজ ইবনু হিমার থেকে বর্ণিত, যে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আইলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

اهل الجنه ثلاثه موفق ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم ورجل فقير عفيف متصدق...

তিন শ্রেণির মানুষ জান্নাতবাসী হবে—

- (এক) ন্যায়-বিচারক যে (বিবাদীদের মাঝে) মিল করে দেয়
- (দুই) কোমল হৃদয়ের অধিকারী, নিকট আত্মীয় হোক অন্যান্য মুসলিম ভাই হোক সবার প্রতি দয়ালু
- (তিন) দরিদ্র ব্যক্তি (গুনাহ থেকে) পবিত্র (সামান্য হলেও) দান ছদকা করে।[২০১]

দ্বীন মোতাবেক রাষ্ট্র-পরিচালনার বড়ো একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ন্যায়বিচার কায়েম করা, ইনসাফ ছাড়া কোনো ইসলামি রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। এটা হারানো মানে ওই জাতির বাকি থাকার অধিকার বিলুপ্ত। রাসুল-প্রেরণেরও বড়ো একটি উদ্দেশ্য ইনসাফ কায়েম করা। কারণ, এর মাধ্যমেই উম্মতকে পুতঃপবিত্র করা সম্ভব। ইউনুস ইবনু মাইসারা ইবনি হালস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাসলামা ইবনু মুখাল্লাদ মিসরে থাকা অবস্থায় মুআবিয়া রা. তার কাছে পত্র লিখে বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু উমারকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[২০০] আল-আহকামুস সুলতানিয়া : ২২৭

[২০১] সহিহ ইবনু হিব্বান : ৭৪৫৫

ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন—

لا يقدس الله أمة لا يقضى فيها بالحق و يأخذ الضعيف حقه من القوي غير مضطهد

(আল্লাহ তাআলা ওই জাতিকে কখনো পবিত্র করবেন না, যাদের মাঝে ন্যায়বিচার করা হয় না, যেখানে দুর্বল নিজের হক জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়ে আদায় করতে হয়।)

তো, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার যদি তোমাকে বলে যে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ হাদিস শুনেছেন, তাহলে তাকে বলো—তিনি যেন ডাক-বিভাগ থেকে বাহনে করে আমার কাছে চলে আসেন।

তিনি বলেন, ঠিক আছে। তখন তিনি পত্র প্রেরণ করলেন, আর ইবনু উমার রা. ডাক বিভাগের বাহনে করে মুআবিয়া রা.-এর কাছে এলেন। তারপর ওই হাদিসের ব্যাপারে বলেন—আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওই হাদিস বলতে শুনেছি। তখন মুআবিয়া রা. বললেন—তোমার মতো আমিও শুনেছি।[২০২]

ইনসাফ কাকে বলে?

ইনসাফ বলতে বোঝায়—প্রত্যেককে তার হক দেওয়া; শরিয়ত থেকে নির্দেশ করা হয় নি—এমন কিছু তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া; অন্যায়ভাবে তার সম্পদ গ্রাস না করা; তাকে নিজের হক থেকে বাধা না দেওয়া।

আল্লামা ইবনু খালদুন বলেন—জুলুমের অর্থ খুব সীমিত নয়। শুধু অন্যের কোনো জিনিস বিনিময় বা কারণ ছাড়া নেওয়াকেই জুলুম বলে না, যেমনটা সবাই মনে করে! বরং জুলুমের অর্থ এর থেকেও অনেক ব্যাপক, কারও মালিকানাধীন জিনিস নেওয়া, কাজের ক্ষেত্রে ফাঁকি দেওয়া, অন্যায়ভাবে কারও থেকে কিছু দাবি করা, শরিয়ত আবশ্যক করে নি এমন কোনো কিছু আবশ্যক করা—এই সব কিছুকেই জুলুম বলে। এখন যারা জনগণ থেকে অন্যায়ভাবে ট্যাক্স নেয়, এরাও জালিম। যারা সে বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে, তারাও জালিম। যারা লুট করে, তারাও জালিম। যারা জনগণের সম্পদ আটকে রাখে, এরাও জালিম। যারা বলপ্রয়োগ বা জোর-জবরদস্তি করে নেয়, তারাও জালিম। এর সবই জুলুমের অন্তর্ভুক্ত। এর পরিণামও রাষ্ট্রের ওপর বর্তাবে। একসময় রাষ্ট্র জনশূন্য হয়ে থাকবে, যে জনগণ ছিল রাষ্ট্রের মূল সম্পদ। কারণ, রাষ্ট্র নিজেই তার জনগণের আশা ও আস্থা হারিয়েছে।

জুলুম নিষিদ্ধ ঘোষণা করার বড়ো একটা কারণ ও হিকমত এটাই। অর্থাৎ, জুলুমের কারণে রাষ্ট্র যে জনশূন্য হয়ে না পড়ে। কারণ, জুলুমই বলে দেয় যে, এটা আর মানুষের বসবাসের উপযোগী কোনো রাষ্ট্র না।

[২০২] মুজামুত তাবারানি : ৩১৫

শরিয়ত যে মূল পাঁচটি বিষয়ের ব্যাপারে এত বেশি গুরুত্ব দেয়, সেই পাঁচটি বিষয় হচ্ছে : দ্বীন, জান, মাল, আকল, নাসল বা বংশ;—এগুলো। এই পাঁচটি বিষয় হিফাজত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণও কিন্তু উপরে যা বলা হলো, সেটাই। যে, এই জুলুমই যেহেতু মানুষকে একটি রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, একটি রাষ্ট্র জনশূন্য করে দেয়, তাই এটা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা খুবই জরুরি। এর নিষিদ্ধতার বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহয় এত দলিল-প্রমাণ আছে যে, গুনে শেষ করা যাবে না।[২০৩]

দুই. নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা।

মুসলিম শাসকদের ওপর কর্তব্য, একইসাথে খিলাফাতে ইসলামিয়্যার বড়ো একটি উদ্দেশ্য দারুল ইসলামের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা। যাতে জনগণের জান, মাল ও ইজ্জত নিরাপদ থাকে। যেন দারুল ইসলামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সবাই নিশ্চিন্ত মনে নিঃশঙ্কায় বিচরণ করতে পারে। আদি ইবনু হাতেম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় এক লোক এসে তার কাছে দারিদ্রের কথা বলল, তারপর আরেকজন এসে ডাকাত-রাহাজানির অভিযোগ করল, তখন নবীজি বললেন—

> يا عدي، هل رأيت الحيرة قلت لم أرها وقد مات عنها قال فإن طالت بك حياة لترين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا الا الله
>
> আচ্ছা আদি, তুমি কি হিরা অঞ্চল চেন? আমি বললাম—না, তবে নাম শুনেছি। তিনি বললেন, যদি দীর্ঘ হায়াত পাও, তাহলে দেখতে পাবে—উটে আরোহণ করে হিরা থেকে একজন নারী সফর করে কাবা তাওয়াফ করবে, আল্লাহ ছাড়া (পথে) আর কারও ভয় থাকবে না।[২০৪]

এই উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গভাবে তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন নিরাপত্তা ভঙ্গকারীদের ও স্বেচ্ছাচারীদের শাস্তির আওতায় নিয়ে আনা হবে। তবে শর্ত হচ্ছে—শাস্তি ইনসাফপূর্ণ হতে হবে, ক্ষমতাশীল হোক বা দুর্বল, ধনী হোক বা গরীব নিকটাত্মীয় হোক বা দূরবর্তী; কারণ, এই ভেদাভেদই জাতির ধ্বংস ডেকে আনে। আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, একবার মাখজুম গোত্রের এক নারী চুরি করলে কুরাইশরা (হাত কাটা হবে বলে) খুব পেরেশান হলো। তারা বলাবলি করতে লাগল, উসামা ইবনু জায়িদ রা. ছাড়া নবীজির কাছে (এ বিষয়ে) কারও (মাফ চাওয়ার) সাহস নেই। কারণ, সেই একমাত্র আদরের টুকরো। তখন উসামা রা. (তাদের পীড়াপীড়িতে) মাফ চাইতে গেলেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

أتشفع في حد من حدود الله؟

---

[২০৩] মুকাদ্দামাতু ইবনি খালদুন : ২৮৮

[২০৪] সহিহ বুখারি : ৩৫৯৫

তুমি আল্লাহ তাআলার হদের বিষয়ে আমার কাছে সুপারিশ করতে এসেছো?

তারপর উঠে বক্তব্য দিলেন—

إنما أهلك الذين قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

শোনো তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের এটাই ধ্বংস করেছে যে, তাদের মাঝে কোনো অভিজাত ব্যক্তি চুরি করত, তারা তাকে ছেড়ে দিত আর কোনো দুর্বল চুরি করলে তার ওপর হদ লাগাত। আল্লাহর কসম যদি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মেয়ে ফাতিমাও চুরি করত, তাহলে আমি নিজে তার হাত কেটে ফেলতাম।[২০৫]

আবু ইয়ালা রহ. বলেন—খলিফার কর্তব্য দ্বীনের ইসলাম রক্ষা করা, সীমান্ত পাহারা দেওয়া; যাতে জনগণ নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারে, সফরে বের হতে পারে।

তিন. রাষ্ট্রীয় আয়কে কাজে লাগানো।

খলিফার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে—রাষ্ট্রীয় আয়-অর্থ কাজে লাগানোর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা; যা জনগণের সাচ্ছন্দ্যবোধ, অর্থনৈতিক শক্তি ও উপযোগী বসবাসের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। সে জন্য সময় উপযোগী কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। যা রাষ্ট্রীয় বৃদ্ধির সহায়ক হবে যেমন—নদী খনন করা, কৃষি কাজের উন্নতি করা, ধাতব পদার্থগুলো বের করা, কারখানা তৈরি করা, রাস্তার উন্নতি করা, বিশেষ করে যেগুলোর ওপর রাষ্ট্রীয় উপার্জনের বিভিন্ন ভিত্তি নির্ভর করে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আনা-নেওয়া করা হয়, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য রাস্তা তৈরি করা, ব্যবসায়ীদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেয়। খুলাফায়ে রাশিদা জনগণের সমৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিতেন, আবু বকর রা. সেনাপতিদের আলাদাভাবে কৃষক ও গ্রামবাসীদের জন্য অসিয়ত করতেন। কারণ, তিনি আশা রাখতেন যে—এতে সাধারণ মানুষ ইসলামগ্রহণ করবে তদ্রুপ অর্থনীতির চাকাও সচল থাকবে, তাছাড়া তিনি জানতেন—অর্থনীতির চাকা সচল হওয়া ছাড়া কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। আর এই অর্থনীতির বড়ো একটা উৎস এই কৃষি কাজ। এই কৃষি কাজই মানুষের জীবন ও জীবনধারনের সাথে সম্পৃক্ত।[২০৬]

খলিফার কর্তব্য, জনগণকে কৃষিকাজ ও বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করা। সাধ্যমতো তাদের সাহায্য করা। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও উম্মতকে এ-বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ

---

[২০৫] সহিহ বুখারি : ৩৪৭৫

[২০৬] তারিখুল ইসলাম [illegible]

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه خيرا او انسان او بهيمة إلا كان له به صدقة

কোনো মুসলিম যদি গাছ রোপণ করে চাষাবাদ করে তারপর সেখান থেকে কোনো পাখি বা মানুষ অথবা কোনো পশু খায় তাহলে বিনিময়ে তার নামে সাদকার সাওয়াব লেখা হয়ে যাবে।[২০৭]

সহিহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে—

إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة

কিয়ামত পর্যন্ত তার সাদকার সাওয়াব লেখা থাকবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য, যত দিন পর্যন্ত তার গাছ বা ফসল থেকে খাওয়া হবে, ততদিন পর্যন্ত তার সাওয়াব হতে থাকবে চাই সে মারা যাক এমনকি যদিও অন্যের মালিকানায় চলে যায়। উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, গাছ রোপণ ও চাষাবাদে দুনিয়াবি যেমন ফায়দা আছে, তেমনি আখিরাতেরও ফায়দা আছে। দুনিয়াবি ফায়দা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় আয়ের সমৃদ্ধি; কারণ, এর মাধ্যমে শুধু গাছ রোপণকারী বা চাষীর উপকার হবে না। বরং রাষ্ট্রের সবার এমনকি পশুপাখী ও কীটপতঙ্গেরও। আর আখিরাতের উপকার তো হাদিসেই উল্লেখ করা হলো।

আইনি রহ. বলেন—হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, গাছ রোপণকারী ও চাষী সাওয়াব লাভ করবে। যদিও তারা নিয়ত না করে। এমনকি গাছ রোপণ করে বা চাষ করে যদি বিক্রিও করে ফেলে, তবুও তার সাদকার সাওয়াব হতে থাকবে। কারণ, এটা অন্যদের খাদ্যের উপকরণ হয়েছে; যেমন, হাদিসে আমদানিকারীর সাওয়াবের কথা উল্লেখ আছে; যদিও সে ব্যবসা ও উপার্জনের উদ্দেশ্যে আমদানি করছে।[২০৮]

চার. উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে দায়িত্ব অর্পণ করা।

খলিফার কর্তব্য উপযুক্ত ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে বসানো। এতটুকুই যথেষ্ট নয়; বরং তাদের পর্যবেক্ষণ করাও তার কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের আদেশ করছেন যাতে তোমরা আমানত তার হকদারদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও এবং যখন ফায়সালা করবে, তখন

---

[২০৭] সহিহ বুখারি : ২৩২০

[২০৮] উমদাতুল কারি

ইনসাফের সাথে ফায়সালা করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের কতইনা উত্তম উপদেশ দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[৩০৯]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة..

যখন আমানত নষ্ট করে ফেলা শুরু হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করতে থাকবে। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম বললেন, নষ্ট করার ধরন কী? তিনি বললেন, যখন অযোগ্যকে দায়িত্ব দেওয়া হবে, তখন থেকে অপেক্ষা করো।

ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

من استعمل رجلا من وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين..

যে-ব্যক্তি কাউকে কোনো কাউমের দায়িত্ব দিল, অথচ সে কাউমে এমনও ব্যক্তি আছে, যে তার চেয়েও আল্লাহ কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য। তাহলে সেই নিযুক্তকারী খিয়ানত করল, আল্লাহর সাথে সে খিয়ানত করল, তাঁর রাসুলের সাথে সে খিয়ানত করল, মুমিনদের সাথে।[৩১০]

ইয়াজিদ ইবনু আবি সুফয়ান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আবু বকর রা. যখন আমাকে শাসক হিসাবে শামের পাঠ দিচ্ছিলেন, তখন বললেন ইয়াজিদ (ওখানে) তোমার কিছু নিকটাত্মীয় আছে, আমার আশঙ্কা তুমি নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য দেবে, তোমার ওপর এটাই আমার সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم..

কেউ মুসলিমদের কোনো দায়িত্ব পাওয়ার পর যদি স্বজন-প্রীতির কারণে কাউকে মুসলিমদের আমির বানায় তাহলে তার ওপর আল্লাহর লানত তার থেকে আল্লাহ তাআলা না কোনো বদল গ্রহণ করবেন আর না মুক্তিপণ; বরং তাকে জাহান্নামে ঢোকাবেনই।[৩১১]

---

[৩০৯] সূরা নিসা, আয়াত : ৫৮

[৩১০] মুসতাদারক আল-হাকিম : ৭০২৩

[৩১১] মুস...

খুলাফায়ে রাশিদিন শুধু যোগ্য লোকদের দায়িত্ব দিয়েই ক্ষ্যান্ত হতেন না, বরং সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন তাদের সব সময় পর্যবেক্ষণে রাখার; যাতে তাদের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। উমার রা.-এর বৈশিষ্ট্য ছিল, এক মুহূর্তের জন্য কোনো জালিমকে রাখার চেয়ে প্রত্যক দিন একজন একজন করে বরখাস্ত করাটা আমার কাছে উত্তম। তিনি একদিন চারপাশের লোকদের বলেন—আচ্ছা, বলো দেখি, আমার জানামতে তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে কোনো দায়িত্ব দিয়ে তাকে ইনসাফ করার নির্দেশ দিলেই কি আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে?

তারা বলল—হ্যাঁ।

উমার রা. বলেন—কক্ষনো না! যতক্ষণ না আমি তার কাজ পর্যবেক্ষণ করি, সে কি আদিষ্ট বিষয় পালন করেছে নাকি করে নি।[১১২]

আবু ইয়ালা রহ. বলেন—খলিফার কর্তব্য হচ্ছে, বিভিন্ন দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে হিতাকাঙ্খীদের দায়িত্ব দেওয়া। আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বস্তদের নিযুক্ত করা। এর উল্টো করবে না । এটাও কর্তব্য যে তিনি নিজে সবার দায়িত্বের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন, পর্যবেক্ষণ করবেন। যাতে জাতির নেতৃত্ব ও দ্বীনের হিফাজতের ক্ষেত্রে ত্রুটি না হয়ে যায়। শুধু দায়িত্ব দিয়েই অন্য কাজে ব্যস্ত হবে পড়বে না। কারণ, কখনো কখনো বিশ্বস্ত ব্যক্তিও খেয়ানত করে, হিতাকাঙ্খীও ধোঁকার আশ্রয় নেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
>
> হে দাউদ, নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে জমিনে খলিফা নিযুক্ত করেছি, সুতরাং তুমি মানুষের মাঝে সত্যানুযায়ী ফায়সালা করো, খাহেশাতের অনুসরণ করো না।

তো, এখানে আল্লাহ তাআলা শুধু নিযুক্ত করাকেই যথেষ্ট মনে করেন নি; বরং দায়িত্বের কথাও বলে দিয়েছেন। আল্লাহর নবী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

> كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
>
> তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকরাহবে।[১১৩]

পাঁচ. সেনাবাহিনী প্রস্তুত করা, সীমান্ত পাহারা দেওয়া।

শত্রুদের থেকে দেশ রক্ষা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে আগে বেড়ে হামলা করার জন্য

---

[১১২] তারিখুল খুলাফা, সাল্লাবি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪২০

[১১৩] আল-আহকামুস [illegible]

এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সুতরাং ইমামের কর্তব্য হচ্ছে যুগানুসারে রাষ্ট্রের প্রয়োজন মতো অস্ত্র তৈরি করা, শত্রুদের সন্ত্রস্ত করার জন্য অস্ত্রের মহড়া দেওয়া।

আবু ইয়ালা রহ. বলেন—খলিফার কর্তব্য প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র দিয়ে সীমান্ত রক্ষা করা; যাতে শত্রুরা সুযোগ পেয়ে কোনো অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে না পারে, কোনো মুসলিম বা জিম্মির জানের ক্ষতি করতে না পারে। তদ্রুপ যাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার পরও ইসলামের বিরোধিতা করে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, যতক্ষণ না ইসলাম গ্রহণ না করে, অথবা চুক্তিবদ্ধ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ
>
> আর তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য (সমর শক্তি) ও ঘোড়ার দল প্রস্তুত রাখো; যার দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত্র করে রাখবে, আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে এবং তাদের ছাড়া অন্যদের, যাদের তোমরা জানো না, আল্লাহ জানেন তাদের।[২১৪]

প্রত্যেক যুগের প্রস্তুতি-গ্রহণ সেই জিনিস দ্বারাই হবে, যা ওই যুগের উপযোগী। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তির-যুদ্ধ প্রচলিত ছিল। তাই তিনি তির-নিক্ষেপ শেখার ওপর উদ্বুদ্ধ করেছেন, পক্ষান্তরে বর্তমান যুগের প্রস্তুতি হবে, যে সকল আগ্নেয়াস্ত্র এখন প্রচলিত, সেগুলোর ব্যবহার শেখার ওপর। কারণ, প্রশিক্ষণ প্রস্তুতিগ্রহণের ওপর উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই হচ্ছে জিহাদ। অন্য কোনো উদ্দেশ্য না। আর যখন বর্তমান যুগে তির-যুদ্ধের প্রচলন নেই।

সুতরাং এটা শেখার কোনো ফায়দাও নেই। অতএব, উদ্বুদ্ধ করারও কোনো প্রশ্ন নেই। খলিফা এটাকে সামান্য কিছু মনে করে অলসতা করে বসে থাকতে পারেন না। কারণ, আমাদের শত্রুরা জলস্থল আকাশ পথ সব দিক থেকেই হামলা করে, অথচ সেগুলো থেকে প্রতিরক্ষা করার সামান্য শক্তিও আমাদের নেই।

ছয়. ফাই (যুদ্ধ করা ব্যতিরেকে অর্জিত গনিমত) এবং সাদাকাত আদায় করা এবং ভাতা নির্ধারণ করা।

আবু ইয়ালা রহ. বলেন—খলিফার কর্তব্য হচ্ছে, অন্যায় পদ্ধতিতে না নিয়ে শরিয়ত নির্ধারিত পরিমাণ ফাই ও সাদাকাত আদায় করা। তদ্রুপ বাইতুল মাল থেকে ভাতা ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ব্যয় নির্ধারণ করা, বেশিও না কমও না এবং সেটা নির্দিষ্ট সময়ে করবেন আগেও না পরেও না। খলিফা যদি উল্লিখিত হকগুলো আদায় করে তাহলে বলা হবে তিনি আল্লাহ তাআলার হক আদায় করেছেন তাই সে হক জনগণের পক্ষে

---

[২১৪] সুরা আনফাল, আয়াত...

হোক বা বিপক্ষে। সেই সাথে তার জন্য জনগণের ওপর দুটো হক ওয়াজিব হবে—

- এক. নাফরমানি ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে আনুগত্য;
- দুই. সাহায্য করা।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য : শাসকের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশ)

শাসক হলো আল্লাহর জমিনে আল্লাহর খলিফা। অতএব, আল্লাহ তাআলার নির্দেশের বিরোধিতা করে আল্লাহ তাআলার খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব কখনোই সুষ্ঠ থাকতে পারে না। সুতরাং ভাগ্যবান সেই শাসক যে রাজত্ব বিসর্জন দিয়ে হলেও দ্বীন রক্ষা করে, রাজত্ব রক্ষা করে দ্বীনকে বিসর্জন দেবে না, ন্যায়-বিচারের মাধ্যমে সুন্নাহকে জীবিত করে, জুলুম করে মৃত বানিয়ে ফেলে না, সুষ্ঠ পরিচালনা করে জনগণকে এগিয়ে নিয়ে যায়, খারাপভাবে শাসন করে তাদের ভবিষ্যৎ বিনষ্ট করে না, যাতে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা জোরদার করতে পারে, রাষ্ট্রীয় ভিত্তিকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে, আল্লাহ তাআলার জমিনে তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করতে পারে। কারণ, রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ও প্রজাদের পরিচালনা করতে গিয়ে দ্বীনের ওপর অটল থাকা কিছুতেই অসম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলার ফরজ বিধান পালন করার পর একজন শাসকের কর্তব্য জনগণের মাঝে ইনসাফ করা। তাদের সাথে সদাচরণ করা, দ্বীন ও শরিয়তের মাকাম বুলন্দ করা। তাকে মনে রাখতে হবে—যদি তার সৈন্য বা জনগণও জুলুম করে, তাহলে এর গুনাহ তার উপরেই চাপবে। যদি তিনি জেনে-বুঝেও নিষেধ না করেন, অথচ তিনি নিষেধ করতে সক্ষম ছিলেন। ঠিক তিনি যদি জনগণের মাঝে ইনসাফ কায়েম করেন, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ফায়সালা করেন, তাহলে তার একার একদিনের ইবাদাতের সাওয়াবই সমস্ত জনগণের ইবাদতের সমান বা বেশি হবে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة

ষাট বছর ইবাদাতের চেয়ে এক মুহূর্ত ইনসাফ করাই শ্রেয়।

আর তখন তিনি হাদিসে বর্ণিত ওই সাত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবেন, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন আরশের নীচে ছায়া দেবেন।

খলিফা যে দশটি মূলনীতি রক্ষা করবেন:

০১. যখনই দেশে কোনো সমস্যা দেখা হবে, তিনি সেক্ষেত্রে নিজেকে জনগণ ভাববেন আর অপরজনকে শাসক ভাববেন, তখন যেটা নিজের কাছে ভালো লাগবে না, সেটা জনগণের ওপর চাপিয়ে দেবেন না।

০২. তার দরজায় প্রয়োজনগ্রস্ত লোক এলে সেটাকে তুচ্ছ মনে করবেন না; বরং এর চিন্তা থেকেও দূরে থাকবেন। কারণ, আল্লাহ তাআলা চান না যে, জনগণের প্রয়োজন বিলম্বে পুরা করা হোক।

এই ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। বিখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটল একদিন তাদের বাদশাহকে উপদেশ দিয়ে বললেন—বাদশাহ, কেউ যখন প্রয়োজনে পড়ে আপনার দরবারে আসে, আপনি তাদের প্রয়োজনপূরণে শিথিলতা করবেন না। যাতে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত বঞ্চিত না হয়ে যান।

০৩. দিনের পুরো সময় ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করবেন না; বরং চেষ্টা করবেন—কীভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা জনগণের দেখভাল করায় সময় বেশি ব্যয় করা যায়।

ঘটনা বর্ণিত আছে যে—গ্রিসের এক দার্শনিক তাদের এক শাসককে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন—গাফেলদের মতো ঘুমিয়ে থাকবেন না, যাতে আপনার আদালত থেকে সুবিচারপ্রার্থীরা বঞ্চিত হয়ে আল্লাহর দরবারে বিচার না দিয়ে বসে। তখন আপনার রাষ্ট্র ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যাবে। কারণ, রাষ্ট্র তো একটা সূর্যের মতো, যার আলো সকালে এক দেওয়ালে পড়ে, বিকালে অপর দেওয়ালে পড়ে। তদ্রুপ রাষ্ট্রক্ষমতা শাসকের নাফরমানির কারণে (সূর্যের আলোর মতো) এক শাসক থেকে অপর শাসকের কাছে হস্তান্তিরিত হয়।

০৪. প্রত্যেকটা কাজ সহজে কোমলভাবে সমাধানের চেষ্টা করবেন, কঠোরভাবে করবেন না। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাসকদের জন্য দুআ করে বলেন—

> اللهم ارفق على كل وال رفق على رعيته واعنف على كل وال عنف على فعلى رعيته
>
> আয় আল্লাহ, যে সকল শাসকরা জনগণের সাথে কোমল আচরণ করে, আপনিও তাদের সাথে কোমল আচরণ করেন। আর যারা জনগণের সাথে কঠোর আচরণ করে আপনিও তাদের সাথে কঠোরতা করেন।

হিশাম ইবনু মালিকের ঘটনা: তিনি অনেক বড়ো একজন খলিফা ছিলেন। বর্ণিত আছে, তিনি একবার আবু হাজিম রহ.-কে—যিনি ওই যুগের একজন প্রসিদ্ধ আলিম ও জাহিদ ছিলেন—জিজ্ঞাসা করেন শাসনকার্যে জুলুম না করার উপায় কী। তখন আবু হাজিম রহ. বলেন, আপনি যদি আসলেই জুলুম থেকে মুক্ত হতে চান তাহলে আপনার কর্তব্য, নির্দিষ্ট স্থান থেকেই শুধু কর নেবেন। আবার শরিয়ত নির্দেশিত খাতেই সেগুলো ব্যয় করবেন। তখন হিশাম বলেন—সেটা কার পক্ষেই

বা সম্ভব? আবু হাজিম রহ. বলেন—তার পক্ষেই সম্ভব যে জাহান্নামের আগুন সহ্য করতে পারে না।

০৫. তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন, যাতে অধিকাংশ জনগণ তার প্রতি খুশি থাকে। তবে সেই খুশিটা শরিয়তসম্মত কারণেই হতে হবে।

ঘটনা : একবার একজন শ্রেষ্ঠ আলিম এক বাদশাহকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন—আপনি যদি চান, আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুক, তাঁর রহমত আপনার ওপর বর্ষিত হোক, তাহলে কোনো সাধারণ কারণ বা শরয়ি কারণ ছাড়া জনগণের সমালোচনাও করবেন না, তাদের মারবেনও না, জনগণের সন্তুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে যেন শুধুই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়।

০৬. আল্লাহ তাআলার হুকুমের বিরোধিতা করে অন্য কারও সন্তুষ্টি অর্জনের পেছনে ছুটবেন না, নিজের ইচ্ছার ওপর শরিয়তের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেবেন। তিনি শরিয়তের বিধি মোতাবেক কারও বিরুদ্ধে রায় দিলে যদি কেউ তার সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তাহলে তার কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ, এটাই তো তার দায়িত্ব।

০৭. জনগণ যদি শাসকের পক্ষ থেকে শাসকের কাছে বিচার চান, তাহলে তিনি ইনসাফ করবেন। যদি দয়া চান, তাহলে তিনি মাফ করে দেবেন। যদি তাদের সাথে কোনো বিষয়ে ওয়াদা দেন, তাহলে তিনি এর খিলাফ করবেন না

০৮. শাসকের কর্তব্য মুত্তাকি একনিষ্ঠ আমলি আলিমদের সোহবত গ্রহণ করা, তাদের ওয়াজ নসিহত শোনা, সাথে সাথে ওই সব আলিমদের থেকে বিরত থাকবেন, যাদের অভ্যাসই হলো শাসকের প্রশংসা করা, তার চাহিদানুযায়ী নসিহত করা, যাতে শাসক তাদের উপহার-উপঢৌকন দেন; চাই হালাল হোক বা হারাম।

০৯. তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন যাতে গর্ব, অহংকার না চলে আসে, বিশেষ করে ক্রোধ। কারণ, এই ক্রোধই আকল-বুদ্ধির শত্রু। তাছাড়া এর এত এত ক্ষতি আছে যে, বলে শেষ করা যাবে না।

১০. তিনি নিজেই জুলুম থেকে বিরত থাকবেন না, বরং তার কর্তব্য হলো—তার সৈন্য, নায়িব, কাতিব, খাদিমসহ আরও যারা অধীনে থেকে কাজ করছে, সবাইকে জনগণের ওপর জুলুম করা থেকে বিরত রাখবেন। কারণ, এই জুলুমই সুলতানদের নেতৃত্ব শেষ করে দেয়।[৬০]

***

[৬০] আদ দুররাতুল গাররা, ফি নাসিহাতিস সালাতিনি ওয়াল কুযাতি

খলিফার শাসন-ক্ষমতার সমাপ্তি

প্রতিটি জিনিসের শুরু এবং শেষ, দুটো প্রান্তই থাকে। শাসনক্ষমতাও এমনই। একজন খলিফার শাসন-ক্ষমতার শুরু যেন আছে, তেমনই এর সমাপ্তিও আছে। সমাপ্তিটা তিনটি মাধ্যমে ঘটে—

- ০১. নিজেই নিজেকে বরখাস্ত করা;
- ০২. নিজে নিজে বরখাস্ত হওয়া;
- ০৩. তার পদচ্যুত হওয়া।

নিজেকে বরখাস্ত করা

এটা হয়তো কোনো অক্ষমতা বা দুর্বলতার কারণে যেমন অসুস্থতা বা বার্ধক্যে কিংবা অক্ষমতা বা দুর্বলতার কারণে নয়। বরং দুনিয়া আখিরাতের কর্ম বোঝা হালকা করার আশায় শাসন পদত্যাগ করছেন।

প্রথম অবস্থা : অর্থাৎ জনগণের দায় দায়িত্ব পালনে অক্ষমতার কারণে বা দুর্বলতা কিংবা বার্ধক্যের কারণে নিজেই নিজেকে বরখাস্ত করবেন । তো এক্ষেত্রে তিনি বরখাস্ত হয়ে যাবেন। কারণ, অক্ষমতা সাব্যস্ত হয়ে গেলে কোনো ফায়দা না থাকায় তার নেতৃত্ব বাতিল হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। বরং তার নিজেরই কর্তব্য বরখাস্ত হয়ে যাওয়া, যখন তিনি অক্ষমতা অনুধাবন করবেন, মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ রক্ষার জন্য, চাই সে অক্ষমতা মানুষ জানুক বা তিনি নিজেই অনুভব করেন, এই অক্ষমতাই তাকে এই পদ ছাড়ার জন্য আবশ্যক করে।

কুরতুবি রহ. বলেন—খলিফা যখন নিজের দুর্বলতা অনুভব করবেন, যা খিলাফতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, তখন তার কর্তব্য হচ্ছে নিজে নিজেই বরখাস্ত হয়ে যাওয়া।[২২]

তদ্রুপ তদ্রুপ যদি এমন হয়, তিনি শাসক হিসেবে বাকি থাকলে ফিতনা বাড়বে আর বরখাস্ত হয়ে গেলে ফিতনা থেমে যাবে, এক্ষেত্রেও উত্তম হলো নিজেই বরখাস্ত হয়ে যাওয়া, এ-জন্যই হাসান ইবনু আলি রা. এর হাতে ইরাকবাসী বাইআত গ্রহণ

করার পরও তিনি মুআবিয়া রা.-এর জন্য খিলাফত ছেড়ে দেন। যাতে মুসলিম উম্মাহর রক্তপাত না হয়, তখন সবাই তার খুব প্রশংসা করেছিলেন। এই ঘটনা ঘটার পূর্বেই তাঁর নানা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রশংসা করে বলেন—

ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين ..

আমার এ নাতি একজন যোগ্য নেতা। আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে (আমার উম্মতের) দুইটা বিরাট দলের মাঝে সন্ধি করে দেবেন। সহিহ বুখারি

দ্বিতীয় অবস্থা : অর্থাৎ কোনো অক্ষমতা বা দুর্বলতার কারণে না, বরং শাসন থেকে পদত্যাগ করেছেন দুনিয়ার বোঝাটা হালকা করার জন্য। পদত্যাগ করবেন যাতে খলিফার কাঁধে ন্যস্ত হওয়া বিরাট বিরাট দায়িত্ব তাকে বহন করতে না হয়। কিংবা আখিরাতের বোঝা হালকা করার আশায়। যাতে আখিরাতের হিসাব অনেক বেশি না হয়ে যায়।

তো, এক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কিরামের দুটো মত—

এক. তিনি বরখাস্ত হয়ে যাবেন, কারণ, বাইআত নেওয়া যেমন তার জন্য অপরিহার্য না, তদ্রুপ বাইআতের পর শাসনপদে থাকাটাও তার জন্য আবশ্যক না।

দুই. তিনি বরখাস্ত হবেন না, কারণ, আবু বকর সিদ্দিক রা. মুসলিম উম্মাহর কাছে আবদার করেছিলেন, যাতে তারা খিলাফত পদ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেন।

তো, এখানে তিনি অব্যাহতি চাওয়ার মাধ্যমেই তিনি নিজেকে বরখাস্ত করে দেন। অথচ তিনি প্রকৃতপক্ষে বরখাস্ত হন নি।

খলিফা যে কাজে নিজে নিজেই বরখাস্ত হন

নিজে নিজেই বরখাস্ত হওয়ার মাধ্যমে ক্ষমতার সমাপ্তি, এক্ষেত্রে উলামায়ে কিরাম একমত যে, খলিফা যতদিন পর্যন্ত তার ওপর ন্যাস্ত করা দায় দায়িত্ব পালন করবেন, জনগণের যাবতীয় বিষয়াদি সুষ্ঠভাবে পালন করে যেতে পারেন, তাদের মাঝে ইনসাফ করবেন, ততদিন পর্যন্ত তিনি বরখাস্ত হবেন না। তাকে বরখাস্তও করা যাবে না, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করা যাবে না। বরং এসব থেকে ইসলাম খুব সতর্ক করেছে। তদ্রুপ খলিফার সামান্য কিছু ভুলত্রুটি হলেও তাকে বরখাস্ত করা যাবে না। কারণ, ভুলত্রুটির উর্ধ্বে কেবল আল্লাহ তাআলাই। আর গুনাহ বা ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত থাকতে পারেন কেবল সেই, যাকে আল্লাহ তাআলা মুক্ত রাখেন। মূলত প্রত্যেক মানুষই ভুল করে, তাদের মধ্যে তারাই উত্তম ভুলকারী যারা ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তবে কিছু বিষয় আছে যা মুসলিমদের দ্বীনি ও দুনিয়াবি জীবনে খুব প্রভাব ফেলে, যার কারণে খলিফাকে বরখাস্ত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ সকল বিষয়ের (যা করলে খলিফা বরখাস্ত হয়ে যান) কিছু আছে যা বরখাস্ত

হওয়ার 'কারণ' হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্ত উলামায়ে কিরামের সবাই একমত। আর কিছু আছে বিরোধপূর্ণ, এখন সে-সকল কারণ উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে আলিমদের বক্তব্য আমরা জানতে পারি—

এক. ইসলামগ্রহণের পর কুফুরি ও ধর্মান্তর : খলিফা যদি এমন কোনো গুরুতর অপরাধ করে ফেলেন, যার কারণে স্পষ্টভাবে কুফুরি বা ধর্মান্তর বোঝা যায়, তাহলে তিনি নিজে নিজেই বরখাস্ত হয়ে যাবেন। কোনো মুসলিমের ওপর তার ক্ষমতা বাকি থাকবে না। জুনাদা ইবনু আবি উমাইয়া রহ. বলেন—আমরা উবাদা ইবনু সামিত রা.-এর কাছে এলাম, তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। আমরা বললাম—আল্লাহ তাআলা যেন আপনাকে সুস্থ করে দেন। এখন আপনি এমন একটি হাদিস বর্ণনা করেন, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আপনার উপকার করছেন, যা আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন। তিনি বললেন—আমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডাকলে আমরা তার হাতে বাইআত গ্রহণ করি, যে সকল বিষয়ে বাইআত গ্রহণ করি তা হচ্ছে—

> ان بايعنا على السمع في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ننازع الأمر أهله إلا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ..
>
> (খলিফার কথা) শোনা এবং মানার ওপর, চাই সেটা আমাদের ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, কষ্ট হোক বা সহজ, এবং (বাইআত গ্রহণ করেছি) আমাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করলে তা মেনে নেওয়ার ওপর, এবং শাসকদের সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হওয়ার ওপর। তবে যদি তোমরা (তাদের থেকে) স্পষ্ট কুফুরি দেখতে পাও, যা (কুফুরি হওয়ার) ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণ আছে।[২১৭]

ইমাম খাত্তাবি রহ. বলেন—এখানে (إلا ان تروا كفرا بواحا) মধ্যে (بواحا) শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট, যেমন বলা হয়—(باح به الشيء يبوح به بوحا ومباح اذا صرح به) 'কোনো কিছু স্পষ্ট করল'।

হাদিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে—এমন কুফুরি কথা যা দ্ব্যার্থহীন, কোনো ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না। তো যদি এমনই হয়, তাহলে শাসকদের সাথে লড়াই করা বৈধ হবে পক্ষান্তরে কোনো ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকলে বৈধ নয়। (عندكم من الله فيه برهان- তোমাদের কাছে তার স্বপক্ষে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রমান রয়েছে) এখানে প্রমাণ বলতে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত এবং হাদিস উদ্দেশ্য, যা কোনো ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না।

---

[২১৭] সূত্র : সহিহ বুখারি

হাফিজ ইবনু হাজার রহ. বলেন—কুফুরি বাক্য বলার মাধ্যমে শাসক পদচ্যুত হয়ে যাবেন, প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ওয়াজিব সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া। যে, যে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে, তার সাওয়াব হবে; আর যে তার তোষামোদি করবে, তার গুনাহ হবে। তবে কেউ যদি অক্ষম থাকে, তাহলে তার ওপর ওই দেশ থেকে হিজরত করা ওয়াজিব।[২১৮]

দুই. ফিসক ও পাপাচার : এক্ষেত্রে ইখতিলাফ আছে। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে, খলিফা ফাসিক হয়ে গেলে পদচ্যুত হবেন না। বরং আপন পদেই বহাল থাকবেন। তবে ফিতনার আশংকা না থাকলে তাকে বরখাস্ত করা উত্তম। ইমাম নববি রহ. মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের অধিকাংশ ফুকাহা এবং মুহাদ্দিসিনে কিরাম এবং কালাম শাস্ত্রবিদ বলেন—পাপাচার, জুলুম, হক না প্রদানের মাধ্যমে শাসক বরখাস্ত হবে না, তাকে বরখাস্ত করাও যাবে না, এ সব কারণে তার বিরুদ্ধে বিদ্রাহও করা যাবে না। তবে কুরআন-হাদিসের মাধ্যমে তাকে ওয়াজ-নসিহত করা হবে, ভয় দেখানো হবে।

ইবনু আবিদীন রহ. বলেন—কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে শাসক বানানোর পর জুলুম শুরু করলে বা পাপাচার করলে তিনি বরখাস্ত হবেন না। তবে ফিতনার আশংকা না থাকলে তাকে বরখাস্ত করাই উত্তম এবং তাকে ও বরখাস্ত হওয়ার আহবান করবে। তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না।[২১৯]

জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মাসআলা

কোনো কোনো উলামায়ে কিরাম বলেন—কোনো জালিম শাসকের বিরুদ্ধে কোনো অবস্থাতেই বিদ্রোহ করা যাবে না, যতক্ষণ তিনি মুসলিম নাম ধারণ করে আছেন। তবে মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের স্পষ্ট কথা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে—জালিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করার বিষয়টা এতটা ব্যাপক না যে, কোনো অবস্থাতেই কোনো জালিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না; বরং বিষয়টা একটু বিস্তারিত বিবরণের অবকাশ রাখে। ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ. ('আমার প্রতিশ্রুতি জালিমদের নিকট পৌঁছবে না।' সূরা বাকারা, আয়াত : ২৪)-এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন—জালিম ও অত্যাচারী শাসকদের সাথে লড়াইয়ের বৈধতার ব্যাপারে আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল, এ-জন্যই ইমাম আউঝায়ি রহ. বলেন—আবু হানিফা রহ. সব কথাকে আমরা (সহিহ হওয়ার) সম্ভাবনাময় মনে করতাম। কিন্তু যখন তিনি তরবারিরর ক্ষেত্রে অর্থাৎ জালিম শাসকদের সাথে লড়াইয়ের কথা বললেন, তখন আর সেটাকে সম্ভাবনাময়

---

[২১৮] ফাতহুল বারি, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ১২৩

[২১৯] রদ্দুল মুহতার, বাবুল ইমামাহ

মনে করতে পারি নি। তিনি বলতেন—জালিম শাসককে মুখে 'আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার' তথা সৎকাজের আদেশ অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা ফরজ। এরপরও যদি কাজ না হয়, তাহলে তরবারি দিয়ে তাকে আদেশ-নিষেধ করা হবে। তাছাড়া জায়িদ ইবনু আলি রা.-এর ক্ষেত্রে তো তাঁর পদক্ষেপ অর্থাৎ তাকে সম্পদ দিয়ে সাহায্য করা তাকে সাহায্য করা ওয়াজিব বলে মানুষকে গোপনে ফতোয়া প্রদান এবং তার সাথে লড়াই করার ব্যাপারে এসব ক্ষেত্রে আবু হানিফা রহ. খুবই প্রসিদ্ধ। তদ্রুপ মুহাম্মাদ ও ইবরাহিম ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি হাসানের সাথেও তিনি এমন করেছেন।[২০]

জাস্সাস রহ. জায়িদ ইবনু আলি রহ.-এর কথা বলে যে ঘটনা বোঝাতে চেয়েছেন তা হলো—আব্দুল্লাহ ইবনু মালিক ইবনি সুলাইমান থেকে ইতিহাসবিদরা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—জায়িদ ইবনু আলি রহ. ইমাম আবু হানিফার রহ.-এর কাছে বাইআত গ্রহণের আবেদন জানিয়ে দূত পাঠালেন।

তখন আবু হানিফা রহ. দূতকে বলেন—তার বাবাকে যেমন লোকেরা পরিত্যাগ করেছে, তাকেও সবাই পরিত্যাগ করবে না বলে যদি জানতাম, তাহলে অবশ্যই তার সাথে আমি জিহাদ করতাম। কারণ, তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক। তবে জিহাদ করার পরিবর্তে তাকে আমি সম্পদ দিয়ে সাহায্য করব। তখন তিনি তার উদ্দেশ্যে দশ হাজার দিরহাম দিলেন। আর দূতকে বলে দিলেন—আমার ওজরটা কিন্তু তাকে খুলে বলবে।

আরেক রিওয়াতে আছে, তিনি বলেছেন—তার সামনে ওজর পেশ করো যে, আমি অসুস্থ তবে তার দলে যোগ দিতে কোনো বাধা নেই। আবু হানিফা রহ.-কে জায়িদ ইবনু আলি রহ.-এর সাথে জিহাদ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এটা বদরের উদ্দেশ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বের হওয়ার মতো হবে।

তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো—তাহলে আপনি কেন বের হন না?

তিনি বললেন—আমার কাছে থাকা মানুষের আমানতগুলোর কারণে বের হতে পারছি না। সেগুলো ইবনু আবি লাইলার সামনে পেশ করলে সে না করে, তাই আমার আশঙ্কা হচ্ছে—যদি আমি অজ্ঞাত স্থানে মারা যাই, তাহলে তো (আমানতগুলো) ফেরত দিতে পারব না। পরবর্তী সময়ে তিনি যখনই বের না হওয়ার কথা স্মরণ করতেন, খুব কাঁদতেন।[২১]

---

[২০] আহকামুল কুরআন জাস্সাস, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৫
[২১] আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যা, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৯৭

আর মুহাম্মাদ ও তার ভাই ইবরাহিম ইবনু আবদিল্লাহর সাথে আবু হানিফা রহ.-এর ঘটনা হচ্ছে, তারা দুই ভাই খলিফা মানসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ইমাম মক্কি রহ. 'মানাকিব' কিতাবে লেখেন—আবু হানিফা রহ. মানুষকে ইবরাহিমের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতেন, তাকে অনুসরণ করার আদেশ করতেন। বলা হয়, এ-জন্যই মানসুর আবু হানিফা রহ.-কে বিষ প্রয়োগ করে মেরেছিল।

তো, এ বিষয়ে আয়াত ও হাদিস ফুকাহা ও মুহাদ্দিসিনে কিরামের কথা থেকে যা বোঝা যায়—আল্লাহই ভালো জানেন—পাপাচার মূলত চার প্রকার :

এক. এমন পাপাচার, যা নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে; যেমন—জিনা ও মদপান। এর হুকুম হচ্ছে, শাসক নিজে নিজেই বরখাস্ত হয়ে যাবেন না, তবে বরখাস্ত হওয়ার মতো কাজ করেছেন। সুতরাং সবার কর্তব্য ফিতনার আশংকা না থাকলে তাকে বরখাস্ত করা, যেমন, ইবনু আবিদিনের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাসক বরখাস্ত হওয়ার উপযুক্ত। তবে এ কারণে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। কারণ, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হবে। যারা বলেন—ফাসিক বা জালিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে, না তাদের কথা দ্বারা এ প্রকার পাপাচারই উদ্দেশ্য।

দুই. এমন পাপাচার, যা অন্যদের সম্পদের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে, যেমন মানুষের সম্পদ নেওয়ার ক্ষেত্রে জুলুম করা। তবে এগুলো করার সাথে সাথে এমনভাবে ব্যাখ্যাও করে নেন, যা থেকে মনে হয়—পুরোপুরি বৈধ না হলেও বৈধ হওয়ার মতো। যেমন—মানুষের ওপর বিভিন্ন কর চাপিয়ে জাতির কল্যাণের কথা বলেন। এর হুকুমও একই অর্থাৎ এর মাধ্যমে তিনি বরখাস্ত হবেন না, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা তো দূরের কথা, বরং তার আনুগত্য করা আবশ্যক। যেমন—ইবনু আবিদিন রহ.-এর কথা সামনে আসছে।

তিন. জনগণের ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে জুলুম করবেন, কিন্তু এর স্বপক্ষে তার কাছে কোনো ব্যাখ্যাও নেই, যাতে বোঝা যায় যে বৈধ হতে পারে, এক্ষেত্রে হুকুম হচ্ছে যে মাজলুম চাইলে যে কোনো উপায়ে লড়াই করে হলেও নিজের থেকে জুলুম প্রতিহত করবেন, আবার চাইলে ধৈর্যও ধরতে পারেন, এক্ষেত্রে সাওয়াবও পাবে। তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে—এখানে যে লড়াইয়ে কথা বলা হচ্ছে, সেটা দ্বারা বিদ্রোহ করা উদ্দেশ্য নয়। বরং তার জুলুম প্রতিহত করা। এখন শাসক যদি জুলুম থেকে বিরত হন, তাকেও লড়াই থেকে বিরত থাকতে হবে। ইবনু আবিদিন রহ. ফাতহুল কাদিরের রেফারেন্স দিয়ে বলেন—যারা প্রতিহত করতে সক্ষম তাদের ওপর শাসকের সাথে থেকে লড়াই করা ওয়াজিব। তবে শাসক থেকে যদি এমন কিছু প্রকাশ পায়, যা তার বিরুদ্ধে লড়াই করাকে বৈধ করে ফেলে, যেমন তাদের ওপর বা অন্যদের ওপর এমন জুলুম করা, যা জুলুম হওয়ার ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা

নেই, তাহলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা বৈধ। বরং তাদের কর্তব্য মজলুমদের সাহায্য করা, যতক্ষণ না তারা ন্যায়বিচার পায়, শাসক জুলুম বন্ধ করেন।

তবে জুলুম না হওয়ার ব্যাপারে যদি কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে তার বিরুদ্ধে লড়াই বৈধ নয়। যেমন—অনেক কর চাপিয়ে দেওয়া, যার বৈধতা (সামান্য হওয়ার ক্ষেত্রে) শাসকের আছে। কারণ, ব্যাপক ক্ষতি দূর করার জন্য ব্যক্তিগত ক্ষতি তিনি চাপাতে পারেন।[২২২] এই হুকুম—লড়াইয়ের বৈধতা—ওই মাজলুমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে নিজের থেকে জুলুম রোধ করার জন্য লড়াই করবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তার সাথে অন্য কেউ কি শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে? এক্ষেত্রে উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। *ফাতহুল কাদিরে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার ওপর বরং ওয়াজিব এই মাজলুমকে সাহায্য করা, যতক্ষণ না শাসক ইনসাফের পথে ফিরে আসেন। যেমন ইতিপূর্বে *ফাতহুল কাদিরের* রেফারেন্স দিয়ে *রদ্দুল মুহতারে* বলা হয়েছে। তবে *জামিউল ফুসুলিয়্যিন, মুবতাগা* এবং *সিরাজ* গ্রন্থে বলা হয়েছে—অন্যদের জন্য সমীচীন নয়, না সুলতানকে সাহায্য করা, আর না মাজলুমকে। আর ইবনু আবিদিন দুই কথা একত্র করে বলেন যে—তখন যদি এর ফলে বিদ্রোহের আশংকা না থাকে, মাজলুমকে সাহায্য করা ওয়াজিব। অন্যথায় নয়।[২২৩] এ-অবস্থায়, সবর করাটা উত্তম বলা হয়েছে হুজাইফা ইবনু ইয়ামান রা.-এর হাদিসের ভিত্তিতে। সেখানে আছে—

> يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع..
>
> আমার পর এমন কিছু শাসক আসবে, যারা আমার নির্দেশিত পথে চলবে না, আমার সুন্নাতের অনুসরণ করবে না, অচিরেই তাদের মাঝে এমন কিছু মানুষের উদ্ভব ঘটবে। যারা দেখতে মানুষের মতো হলেও মনটা হবে যেন শয়তানের মনের মতো। হুজাইফা রা. বলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি যদি সেই যুগ পাই, তাহলে আমার কী করণীয়?

তিনি বললেন—শাসকের কথা শুনবে এবং মানবে, যদিও সে তোমাকে মারধর করে, তোমার সম্পদ লুণ্ঠন করে, তবুও তুমি তার কথা শোনো এবং মান্য করো।[২২৪]

এখানে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এই তৃতীয় অবস্থাতে বিদ্রোহ করা যাবে না। জুলুম প্রতিহত করার জন্য যে লড়াইয়ের কথা বলা হয়েছে, তার

---

[২২২] রদ্দুল মুহতার, বাবুল বুগাত

[২২৩] রদ্দুল মুহতার, বাবুল বুগাত

[২২৪] সূত্র : সহিহ মুসলিম

দলিল ওই সকল হাদিস—যেখানে নিজের জান-মালের জন্য লড়াই করার বৈধতা দেওয়া হয়েছে। তবে, যেহেতু এই লড়াইটাও অনেকটা বিদ্রোহের মতো, দ্বীনের কল্যাণ কামনার স্বার্থে তাই লড়াই না করাই উত্তম।

চার. এমন পাপাচার, যা জনগণের ধর্মের ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টি করে; যেমন—তাদের গুনাহের করতে বাধ্য করা, এটা 'ইকরাহ' তথা বাধ্য করানোর হুকুমের মতো, যার বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে আছে। এখানে উল্লেখ করার অবকাশ নেই। এই বাধ্য করানোটা কখনো কখনো স্পষ্টভাবেই কুফুর বলে সাব্যস্ত হবে আবার কখনো কখনো পরোক্ষভাবে সাব্যস্ত হবে। যেমন—কুফুরের বিভিন্ন প্রদর্শনী করা, তার বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা তার আইন-কানুন বাস্তবায়ন করা, ইসলামের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে শিথিলতা করা, সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অপছন্দের কারণে শরিয়তের হুকুম কার্যকর করা থেকে বিরত থাকা, অন্য ধর্মকে শরিয়তের ওপর প্রাধান্য দেওয়া তো এসব কিছু হাদিসে বর্ণিত 'কুফরে বাওয়াহ' তথা সুস্পষ্ট কুফুরির শমিল। তখন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ। তবে শর্ত হচ্ছে—সেই জন্য শক্তি এবং প্রতিরোধবাহিনী দুটোই থাকতে হবে, তদ্রুপ শাসকের পর এমন শাসকের নেতৃত্ব পাওয়া যেতে হবে, যার মাঝে নেতৃত্বের শর্ত বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু যদি এক জালিম থেকে আরেক জালিমের হাতে নেতৃত্ব আসে কিংবা এ-জন্য আরও বড়ো বড়ো ক্ষতি আসতে পারে, যেমন কাফিররা বিদ্রোহ করার সুযোগে মুসলিমদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে, তাহলে এই দুই অবস্থাতে বিদ্রোহ করা যাবে না।

ইমাম নববি রহ. মুসলিম শরিফের হাদিস[225] প্রসংঙ্গে বলেন—এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, শুধু জুলুম বা পাপাচারের কারণে শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না যদি না তারা ইসলামের কোনো মূলনীতিতে হস্তক্ষেপ করে? আল্লাহই ভালো জানেন।[226]

তিন. শাসনকার্যে দুর্বলতা[২২৭] : বরখাস্ত হওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে, শাসনকার্যে খলিফার দুর্বল হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ এমন কিছু সৃষ্টি হওয়া, যা খলিফার শাসনক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। অথবা একবারেই অক্ষম করে দেয়। এটা দুই প্রকার—

- এক. হাজর, (প্রভাববিস্তার)
- দুই. কহর। (জোরপ্রয়োগ)

---

[২২৫] (أفلا نقاتلهم ؟ قال لا ما صلوا - আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো না? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—না যতক্ষণ না পর্যন্ত ওরা নামাজ পড়ে।)

[২২৬] ইমদাদুল ফাতওয়া আশরাফ আলি থানবি রহ., খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১২৪-১৩৫

[২২৭] খলিফা যে কাজে নিজে নিজেই বরখাস্ত

এক. হাজর, (প্রভাববিস্তার করা) : হাজর হলো খলিফার সহকারী বা মন্ত্রীদের এমনভাবে আধিপত্য বিস্তার করা যে তারাই রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, বাস্তবায়ন করে. তবে খলিফার অবাধ্যতাও করে না বিরোধিতাও করে না। তো এক্ষেত্রে খলিফার ক্ষমতা বাতিলও হবে না ত্রুটিযুক্তও হবে না, তবে যারা আধিপত্য বিস্তার করেছে তাদের লক্ষ্য করা হবে, তারা যদি ইসলামের বিধিবিধান বাস্তবায়ন করেন, ইনসাফ করেন তাহলে তাদেরকে এ অবস্থার ওপর রেখে দেওয়া হবে যাতে যে কোনভাবে ইসলামের বিধিবিধান বাস্তবায়ন হতে পারে, না হয় তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিলে হিতে বিপরীতও হয়ে যেতে পারে কিন্তু যদি, তারা দ্বীনের হুকুম আহকামও কায়েম করে না, ইনসাফও করে না তাহলে খলিফার জন্য তাদেরকে এ অবস্থায় রেখে দেওয়া বৈধ হবে না বরং তার কর্তব্য হচ্ছে এমন কারও সাহায্য গ্রহণ করা যারা তার ক্ষমতা তাদের হাত থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে (আল আহকামুস সুলতানিয়া-আবু ইয়ালা ২২)

দুই. কহর (জোরপ্রয়োগ) : এটি আবার দুই প্রকার—

০১. বন্দি হওয়া অর্থাৎ কোনো শক্তিশালী শত্রুর হাতে বন্দি হওয়া। যার হাত থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। তো, এক্ষেত্রে তাকে খিলাফত পদ থেকে অব্যাহিত দেওয়া হবে। কারণ, তিনি এখন মুসলিমদের পরিচালনা করতে অক্ষম। চাই শত্রু কাফির হোক বা বিদ্রোহী হোক। এখন নির্বাচন কমিশন তার পরিবর্তে সক্ষম কোনো ব্যক্তিকে খিলাফত পদে নিযুক্ত করবে। তবে যদি তিনি সবার হাতে বাইআতপ্রাপ্ত হন, তাহলে সবার কর্তব্য তাকে যে কোনোভাবে উদ্ধার করা। কারণ, বাইআতগ্রহণের মাধ্যমেই তাকে সাহায্য করা আবশ্যক হয়ে গেছে। তিনি খিলাফত পদেই বহাল থাকবেন, যতদিন পর্যন্ত তাকে মুক্তি ও উদ্ধার করার আশা করা যায়; লড়াইয়ের মাধ্যমে হোক বা মুক্তিপণের মাধ্যমে।

এখন তার মুক্তি যদি সম্ভবই না হয়, তাহলে দুটো অবস্থা হতে পারে—হয় তারা মুশরিক হবে বা বিদ্রোহী; যদি মুশরিকদের হাতে বন্দি হন, তাহলে তার মুক্তি অসম্ভব হওয়ার কারণে খিলাফত পদ থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। নির্বাচন কমিশন অন্য কারও বাইআত গ্রহণ করাবেন। আর যদি তিনি বিদ্রোহীদের হাতে বন্দি হন, তাহলে মুক্তির সম্ভাবনা থাকলে তিনি খলিফা হিসাবেই বাকি থাকবেন। আর মুক্তির সম্ভাবনা না থাকলে বিদ্রোহীদের দুটো অবস্থা হতে পারে—হয় তাদের কোনো শাসক আছে বা নেই। যদি কোনো শাসক না থাকে, তাহলে খলিফা আপন পদেই বহাল থাকবেন। (এবং বিদ্রোহীদেরও খলিফা হিসাবে থাকবেন।) কারণ, তার খিলাফত বিদ্রোহীদের জন্য আবশ্যক, তার আনুগত্য বিদ্রোহীদের ওপরও ওয়াজিব। তো, খলিফার জন্য তাদের সাথে থাকাটা যে আহলে আদলের (যারা বিদ্রোহ করে নি) সাথে সীমাবন্ধ হয়ে থাকার মতো হয়ে গেল। আর নির্বাচন

কমিশন তার পরিবর্তে একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করবেন, যিনি তার পক্ষ হয়ে দেখাশোনা করবেন।

এটা তখন, যখন খলিফা নিজে কাউকে নায়েব বানাতে না পারে। আর যদি তিনি নায়েব নিযুক্ত করার সুযোগ পান, তাহলে তিনিই নায়েব নিযুক্ত করার অধিক হকদার। এখন যদি খলিফা নিজে নিজেই অব্যাহতি নেন, বা পদচ্যুত হন কিংবা মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে নায়েব খলিফার পদ পাবে না। কারণ, তিনি একজন জীবিত ব্যক্তির নায়েব ছিলেন। সুতরাং জীবিত ব্যক্তি বিদ্যমান না থাকলে তিনিও আর নায়েব থাকবেন না। আর যদি বিদ্রোহীরা নিজেদের জন্য একজন শাসক নির্ধারণ করে নেয়, যার হাতে তারা বাইআত করেছে, তার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে, তাহলে তার মুক্তি অসম্ভব বলে খলিফা খিলাফত পদ থেকে বের হয়ে যাবেন। কারণ, বিদ্রোহীরা আলাদা ভূখণ্ড নিয়ে আলাদা শাসনব্যবস্থা কায়েম করছে। খলিফার আনুগত্য থেকে পুরোপুরিই বের হয়ে গেছে। ফলে আহলে আদলেরও সাহায্য করার সুযোগ থাকল না, খলিফারও কিছু করার থাকল না। এখন নির্বাচন কমিশনের কর্তব্য হচ্ছে—তাদের সবার সন্তুষ্টি-মতো অন্য আরেকজনকে খলিফা বানানো। এরপর যদি পূর্বের খলিফা মুক্তও হয়ে যান তবুও তিনি খিলাফত ফিরে পাবেন না কারণ, তিনি পূর্বেই খিলাফাত থেকে বের হয়ে গেছেন।[২২৮]

০২. কহরের দ্বিতীয় প্রকার: খলিফার খিলাফাতের ওপর শক্তি বলে প্রাধান্য বিস্তার করা। এটাও মূলত খলিফা হওয়ার একটা পদ্ধতি যেমন পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ অবস্থায় প্রাধান্য বিস্তারকারী যদি পুরোপুরিভাবে ক্ষমতা দখল করে ফেলে, খলিফাকে কাবু করে ফেলে, খিলাফত-ব্যবস্থার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে, তাহলে পূববর্তী খলিফা বরখাস্ত হয়ে যাবেন এবং প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে প্রাধান্য বিস্তারকারী খলিফা হবেন। যাতে রাষ্ট্রে নৈরাজ্য, ফিতনা-ফাসাদ ব্যাপক আকারে ধারণ না করে। মূলত জনগণের কল্যাণই মূল। আসল উদ্দেশ্য। কারণ, এখন প্রাধান্য বিস্তারকারীর নেতৃত্ব মেনে না নিয়ে ফিতনা করলে আরও বড়ো ফিতনা আবশ্যক হবে। ইমাম শাতিবি রহ. বলেন—ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়াকে জিজ্ঞাসা করা হয়, বাইআত করা কি মাকরুহ?

তিনি বলেন—না তো!

তাকে বলা হলো—যদি তারা জালিম হয় তাহলে?

তিনি বললেন—ইবনু উমার রা. তো আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের বাইআত হয়েছেন। অথচ তিনি তরবারির মাধ্যমে জোর জর্বদস্তি করে শাসক হয়েছেন। ইমাম শাতিবি আরও বলেন—মালিক রহ.-এর কাছে এসে উমরি রহ. বললেন,

---

[২২৮] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা, মা...

আচ্ছা, আবু আবদিল্লাহ, আহলুল হারামাইন বা মক্কা ও মদিনাবাসী তো আমার হাতে বাইআত গ্রহণ করেছে, অপরদিকে আবু জাফরের চরিত্রও দেখতে পাচ্ছেন। এই অবস্থায় কী করব?

তখন তাকে মালিক রহ. বললেন—আপনার কি জানা আছে, উমার ইবনু আবদিল আজিজ কেন তারপর কোনো যোগ্য নেকাকারকে নেতৃত্ব দিয়ে যান নি।

উমরি বললেন, না তো!

মালিক রহ. বলেন—আমার জানা আছে; উমার ইবনু আবদিল আজিজের পর ইয়াজিদের হাতেই বাইআত হয়েছিল। উমার ইবনু আবদিল আজিজ এই আশঙ্কা করেছিলেন যে, যোগ্য নেককার কাউকে নেতৃত্ব দিলে ইয়াজিদ যে কোনো উপায়ে জোরজর্বদস্তি করে নেতৃত্ব নিতে পারে। ফলে যতটুকু ভালো ছিল, আরও খারাপ হয়ে যাবে। অর্থাৎ, হিতে বিপরীত হবে।

তখন উমরি রহ. মালিক রহ.-এর কথা মেনে নিলেন।[২৯৯]

চার. সক্ষমতায় ত্রুটি[৩০০] : সক্ষমতার ক্ষেত্রে ত্রুটি আবার দুই প্রকার হতে পারে—

- ০১. ইন্দ্রিয় শক্তিতে ত্রুটি;
- ০২. অঙ্গা-প্রত্যঙ্গো ত্রুটি।

ইন্দ্রিয় শক্তির প্রথম প্রকার : প্রকার সম্পর্কে মাওয়ারদি রহ. বলেন—ইন্দ্রিয় শক্তি ত্রুটিপূর্ণ হলে তিন প্রকার হবে—

- ০১. নেতৃত্ব বাতিল হয়ে যাবে;
- ০২. বাতিল হবে না;
- ০৩. (হওয়া না হওয়াতে) বিরোধপূর্ণ।

বাতিল করার ক্ষেত্রে দুই প্রকার সমস্যা থাকতে হবে—

- **প্রথম** : মানসিক শক্তি বিলুপ্ত হওয়া
- **দ্বিতীয়** : দৃষ্টি শক্তি বিলুপ্ত হওয়া।

মানসিক শক্তি লোপ পাওয়ার ক্ষেত্রে দুই প্রকার—

প্রথম : লোপ পাওয়াটা তাৎক্ষণিক, চলে যেতে পারে। যেমন, বেহুঁশ হয়ে যাওয়া। তো, এটা নেতৃত্ব লাভ করার ক্ষেত্রেও বাধা হবে না, আবার নেতৃত্ব থেকে বেরও হবে না। কারণ, এটা সাময়িক অসুস্থতার মতো দ্রুতই দূর হয়ে যাবে। অর্তাৎ জ্ঞান ফিরে পাবে। তাছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অসুস্থতার সময়ে বেহুঁশ হয়েছিলেন।

---

[২৯৯] ইতিসাম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৫৩

[৩০০] খলিফা যে কারণে নিজে নিজেই বরখাস্ত হন, এটি তা চতুর্থ প্রকার।

দ্বিতীয় : লোপ পাওয়াটা চিরস্থায়ী, ভালো হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যেমন, পাগল বা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়া। এটা আবার দুই প্রকার—

০১. সব সময়ের জন্য মানসিক শক্তি লোপ পেয়ে থাকে। মাঝে মাঝেও সুস্থতা লাভ হয় না। এমন হলে নেতৃত্ব গ্রহণও করা যাবে না, নেতা হিসাবে তার অধিকারও বাকি থাকবে না। তো, এমনটা সৃষ্টি হলে নেতৃত্ব বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে এই অবস্থাটা ভালোভাবে বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর করতে হবে।

০২. সুস্থতা লাভ হয়, মানসিক ভারসাম্য ফিরে আসে। এক্ষেত্রে দেখা হবে যদি অসুস্থতার সময় সুস্থতার চাইতে বেশি হয় তাহলে সব সময় অসুস্থ বলে বিবেচিত হবে, তখন এমন কারও নেতৃত্বও গ্রহণ করা যাবে না, আবার খলিফার খিলাফতও বাকি থাকবে না। এমন অসুস্থতা সৃষ্টি হলে খিলাফত থেকে অব্যাহতি পাবেন। আর যদি সুস্থতার সময় অসুস্থতা থেকে বেশি হয়, তাহলে এমন অসুস্থ ব্যক্তির নেতৃত্ব গ্রহণ করা যাবে না। আর খলিফার খিলাফত বাকি থাকবে কি না এক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন—এমন খলিফার খিলাফত বাকি থাকবে না। যেমন, এমন অসুস্থ ব্যক্তির নেতৃত্ব গ্রহণ করা হবে না। অতএব, যখন এমন অসুস্থতা কোনো খলিফার সৃষ্টি হবে, তার খিলাফত বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, এভাবে অব্যাহত থাকলে শাসনব্যবস্থায় ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দেখা দেবে।

আবার কেউ বলেন—খিলাফত অব্যাহত থাকবে। যদিও এমন অসুস্থ ব্যক্তির নেতৃত্ব গ্রহণ করা হয়। কারণ, নেতৃত্ব গ্রহণের শুরুতে পূর্ণ সুস্থতা শর্ত। আর নেতৃত্ব বাতিল হওয়ার জন্য পূর্ণ অসুস্থতা শর্ত।

নেতৃত্ব বাতিল হওয়ার জন্য দ্বিতীয় যে প্রকার বা কারণ আছে, সেটি হলো—দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া। তো এক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণও করাও যাবে না, অব্যাহতও রাখা যাবে না। সুতরাং যখন দৃষ্টিশক্তি চলে যাবে, নেতৃত্বও বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, দৃষ্টিশক্তি না থাকার কারণে কাজি তথা বিচারকও নিযুক্ত করা যায় না, সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হয় না। তাহলে নেতৃত্ব তো আরও আগেই গ্রহণ করা হবে না। আর যদি রাতের বেলা দৃষ্টিশক্তি অকার্যকর থাকে তাহলে এটা নেতৃত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রেও বাধা হবে না, অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রেও সমস্যা হবে না। কারণ, এই রোগ সাময়িক। অতিশীঘ্রই সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। আর যদি দৃষ্টিশক্তি পুরাপুরি চলে যায়, অন্ধ হয়, তাহলে বিবেচ্য হলো—এক্ষেত্রে তিনি যদি মানুষকে চিনতে পারেন, তাহলে নেতৃত্ব বাকি থাকবে, আর যদি চিনতে না পারেন, তাহলে নেতৃত্ব গ্রহণও করা যাবে না, অব্যাহতও রাখা যাবে না।

ইন্দ্রিয় শক্তির দ্বিতীয় প্রকার : অর্থাৎ নেতৃত্বের জন্য বাধা হয়ে দাড়ায় না এটা দুটো জিনিসের ক্ষেত্রে হয়। প্রথমত যদি ঘ্রান শক্তি বিলপ্ত হয়ে যায়, যার কারণে ঘ্রাণ

নেওয়া যায় না, দ্বিতীয়ত রুচিবোধ লোপ পাওয়া যার কারণে বিভিন্ন প্রকার খাবারের মাঝে পার্থক্য করা যায় না, তো এটা নেতৃত্ব গ্রহণের জন্যও বাধা হয়ে দাড়ায় না কারণ এর প্রভাব শুধুই স্বাদের মধ্যে, সিদ্ধান্ত বা কোনো পদক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টি করে না।

ইন্দ্রিয় শক্তি তৃতীয় প্রকার : যা বিরোধ পূর্ণ, এটাও দুটো জিনিসের মাঝে অর্থাৎ বধিরতা এবং বোবা। এই দুটো রোগ নেতৃত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, খলিফা হওয়ার পূর্ণাঙ্গ গুণাবলির মাঝে এই দুটোও অন্তর্ভুক্ত। তবে এর কারণে নেতৃত্ব বাতিল হওয়ার বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

একদল আলিম বলেন—নেতৃত্ব বাতিল হয়ে যাবে; যেমন—দৃষ্টিশক্তি চলে গেলে। কারণ, এর প্রভাব শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হবে।

অন্যরা বলেন—নেতৃত্ব বাতিল হবে না। কারণ, এক্ষেত্রে ইশারা-ইঙ্গিতেই যথেষ্ট। সুতরাং পূর্ণ অক্ষমতা ছাড়া নেতৃত্ব বাতিল হবে না।

আরেক দল বলেন—যদি তিনি লিখতে পারেন, তাহলে সমস্যা নেই। আর যদি লিখতে না পারেন, তাহলে নেতৃত্ব বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, লেখা থেকে উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। পক্ষান্তরে ইশারা থেকে ধারণা পাওয়া যায়।

তবে প্রথম মতটিই বিশুদ্ধতম মত। আর যদি কথা অস্পষ্ট থাকে, অথবা কম শুনতে পান, তাহলে নেতৃত্ব বাতিল হবে না; কিন্তু নেতৃত্ব গ্রহণ করা যাবে কি না—সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

কেউ বলেন—নেতৃত্ব গ্রহণ করা যাবে না। কারণ, এই দুটো রোগ পরিপূর্ণ থাকলে নেতৃত্বই বাতিল হয়ে যায়।

আবার কেউ বলেন—নেতৃত্ব গ্রহণ করা যাবে। কারণ, যেখানে ও মুসা আলাইহিস সাল্লামের মুখের জড়তা নবুয়তের জন্য বাধা ছিল না, সেখানে নেতৃত্বের জন্য আরও আগেই সক্ষমতার ত্রুটির এই দ্বিতীয় প্রকারটি বাধা হবে না।

অংঙ্গা-প্রত্যঙ্গ ত্রুটিপূর্ণ হওয়াটা আবার চার প্রকার—

এক. এমন ত্রুটি, যা নেতৃত্বগ্রহণের ক্ষেত্রেও বাধা হয় না, আবার স্থির থাকার জন্যও সমস্যা হয় না। এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে ওই সকল অঙ্গাপ্রত্যঙ্গ, যার হানি হলে শাসনব্যবস্থায় কোনো প্রভাব ফেলে না, দেখতেও অসুন্দর দেখায় না। যেমন—পুরুষাঙ্গ এবং অণ্ডকোষ। তো, এই দুটো অঙ্গ না থাকলেও নেতৃত্ব গ্রহণ করা যাবে, খিলাফতও বাকি থাকবে। কারণ, এই দুটো অঙ্গের না-থাকা সন্তানাদি জন্মের ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টি করবে, রাষ্ট্রীয় কাজ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে না।

সুতরাং এটা পুরুষত্বহীনতার মতো হয়ে গেল। তদ্রুপ দুই কান কাটা থাকলেও সমস্যা নেই। কারণ, রাষ্ট্রীয় কাজের ক্ষেত্রে এই দুটো তেমন প্রভাব ফেলে না। তবে একটু অসুন্দর দেখা যায়; যা ঢেকে রাখা সম্ভব। *মাআসিরুল ইনাফাতি ফি মাআলিমিল খিলাফাত* কিতাবে আছে—আমি বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্র থেকে জেনেছি, নয় বছরের পূর্বে যদি কাউকে 'খোজা' বানানো হয়, তাহলে তার ভেতরে সব সময়ের জন্য শিশুসুলভ গুণ থাকে। এমনকি (বড়ো হয়ে) রাগ করলেও শিশুর মতোই কাঁদে। আর যদি আঠারো বছর পর 'খোজা' বানানো হয়, তাহলে তার মাঝে পুরুষদের বৈশিষ্ট্য বাকি থাকে, আর যদি এ দুই সময়ের মাঝে হয়, তাহলে যে সময় নিকটবর্তী, সে সময়ের গুণ তার মাঝে থাকে। এটা যদি নেতৃত্বের জন্য বাধা না হয়, তাহলে পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডের ক্ষেত্রেও এমনটাই করা চাই।

দুই. নেতৃত্বগ্রহণ এবং অব্যাহত রাখা—দুটোর জন্যই বাধা। এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে ওই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—যা না থাকলে রাষ্ট্রীয় কাজ করা সম্ভব হয় না। কিংবা হাঁটা যায় না। যেমন—হাত পা।

তো, এক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণও করা যাবে না, অব্যাহতও রাখা যাবে না। কারণ, হাত বা পায়ের সম্পৃক্ত যে সকল হক তার ওপর অপরিহার্য, সেগুলো করতে তিনি অক্ষম।

তিন. নেতৃত্ব গ্রহণ করা যায় না, তবে অব্যাহত রাখার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। অর্থাৎ, আংশিক অঙ্গ থাকা। যেমন—এক হাত এক পা। তো, এক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করা যাবে না। কারণ, তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে কাজ করতে অক্ষম। এখন নতুন করে যদি সৃষ্টি হয়, তাহলে খিলাফত বাতিল হবে কি না, সে বিষয়ে দুটো মাজহাব রয়েছে—

প্রথম মাজহাব : খিলাফত বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, এ অক্ষমতা তো নেতৃত্ব গ্রহণ করা থেকেই বাধা দেয়। সুতরাং অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে তো আরও বড়ো বাধা হবে।

দ্বিতীয় মাজহাব : তারা বলেন—নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য বাধা হলেও নেতৃত্ব বাতিল হবে না। কারণ, নেতৃত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে শর্ত হলো—পূর্ব-সুস্থতা, আর নেতৃত্ব বাতিল হওয়ার জন্য শর্ত হলো—পূর্ণ অসম্পূর্ণতা।

চার. এমন ত্রুটি, যা নেতৃত্ব অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে বাধা হয় না। তবে নেতৃত্ব গ্রহণ করা যাবে কি না সেক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে ওই সকল ত্রুটি—যা দেখতে অসুন্দর দেখালেও শাসনকার্যে কোনো প্রভাব ফেলে না। যেমন—নাক উপড়ে ফেলা, এক চোখ নষ্ট করে ফেলা।

তো, এক্ষেত্রে নেতৃত্ব বাতিল হবে না। কারণ, ব্যক্তির শাসনকার্যে এটা কোনো প্রভাব ফেলবে না। তবে নেতৃত্ব গ্রহণের ...

০১. প্রথমত, নেতৃত্ব গ্রহণ করা যাবে। কারণ, এটা তেমন কোনো বিবেচ্য শর্ত নয়। কেননা, তা শাসনকার্যে প্রভাব ফেলে না।

০২. দ্বিতীয়ত, নেতৃত্ব গ্রহণ করা যাবে না। কারণ, পূর্ণ সুস্থতা নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য শর্ত; যাতে শাসকরা সর্বপ্রকার দোষত্রুটি থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। অন্যথায় গাম্ভীর্য কমে যাবে। ফলে আনুগত্যের ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দেবে। আর এমন অসম্পূর্ণতা পুরো জাতির জন্যই তো সম্পূর্ণতা।[২৩১]

তৃতীয় অবস্থা[২৩২] : পদচ্যুত করার মাধ্যমে খলিফার ক্ষমতার সমাপ্তি। পদচ্যুত করা হবে হয়তো তরবারি ও অস্ত্র দিয়ে বিদ্রোহ করার মাধ্যমে অথবা তার থেকে অব্যাহতি চাওয়ার মাধ্যমে।

প্রথমটা অর্থাৎ, বিদ্রোহ করা হবে, যদি খলিফা ধর্ম ত্যাগ করে। অথবা চূড়ান্ত পাপাচারে লিপ্ত হয়। এই দুটোর হুকুম পূর্বে 'বরখাস্ত হওয়ার' অধীনে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়টা অর্থাৎ, অব্যাহতি চাওয়া হবে যদি খলিফার শারীরিক অবস্থায় বড়ো কোনো ত্রুটি দেখা দেয়। আর যদি সুস্থ অবস্থায় থাকেন, তাহলে অব্যাহতি চাওয়া বৈধ নয়। কারণ, এটা বৈধ হলে অনেক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। কারণ, মানুষ হিসাবে বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি হতেই পারে।

সুতরাং এটা উচিত নয়। অন্যথায় একজনকে বরখাস্ত করে। আরেকজনকে নিযুক্ত করতেই থাকবে। অথচ বেশি বেশি বরখাস্ত করলে খিলাফতের গম্ভীর্য বজায় থাকে না। খিলাফতের মূল উদ্দেশ্যও ঠিক থাকে না।

জালিম শাসক পদচ্যুত করার নিরাপদ পদ্ধতি নিরাপদ

নিরাপদ পদ্ধতি হচ্ছে—প্রথমে আহলুল হিল্লি ওয়াল আকদ (নির্বাচন কমিশন)—যারা তার হাতে বাইআত গ্রহণ করেছে—জালিম শাসকের কাছে উপস্থিত হবে। তাকে নসিহত করবে। হক থেকে বিচ্যুতির পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করবে। তারপর কয়েকদিন সুযোগ দেবে এবং সবর করবে। হয়তো বা এতে তিনি জুলুম স্বেচ্ছাচার থেকে ফিরে আসবেন; কিন্তু তিনি যদি এমনটা বারবার করতেই থাকেন, তাহলে তাদের কর্তব্য হলো—যথাসম্ভব তার পদচ্যুতির জন্য যথাসময়ে সবকিছুর ব্যবস্থা করবে। তবে শর্ত হচ্ছে—যে ক্ষতি রোধ করার জন্য এত সব করা হচ্ছে, এর কারণে যেন আরও বড়ো ক্ষতি না চলে আসে; কারণ, তাকে পদচ্যুত করাও একপ্রকার 'নাহি আনিল মুনকার' অসৎ কাজ হতে নিষেধ আর কখনো অসৎ কাজ

---

[২৩১] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা : ২০-২২

[২৩২] শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করার তিনটি অবস্থার শেষটি।

তার চেয়ে বড়ো অসৎ কাজ দিয়ে দূর করা যায় না। এ-জন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবস্থায় সবর করতে বলেছেন। ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية..
>
> কেউ যদি তার শাসক থেকে কোনো কিছু অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন সবর করে। কারণ, কেউ যদি শাসকের আনুগত্য থেকে সামান্যও বের হয়ে যায়, তাহলে সে যেন জাহিলি মৃত্যুবরণ করলেন।[২৩৩]

আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> انكم سترون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم
>
> আমার পর তোমরা পক্ষপাতিত্ব-সহ আরও কিছু বিষয় দেখতে পাবে, যা অস্বীকার করবে। তারা বললেন—তাহলে ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমাদের আপনি কী আদেশ করেন?
>
> তিনি বললেন—তোমরা তাদের হক আদায় করো, আর তোমাদের হক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো।[২৩৪]

এর থেকে আরও নিরাপদ পদ্ধতি হচ্ছে—যদি মুসলিম উম্মাহ এ অনুযায়ী আমল করে, যার দিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন (انما الطاعه في المعروف -কল্যাণ ও সৎ কাজের ক্ষেত্রেই আনুগত্য) বলে; কারণ, জনগণ যদি জুলুমের ক্ষেত্রে তার আনুগত্য থেকে বিরত থাকে, তাহলে সে হকের পথে ফিরে আসতে, ইসলামি শরিয়ত বাস্তবায়ন করতে বাধ্য। যেমন কাজিরা যদি শরিয়তবিরোধী কোনো হুকুম বাস্তবায়ন না করে, শাসনকাজে নিয়োজিত কর্মকর্তারা যদি আল্লাহর আদেশ বিরোধ কাজ না করে, ব্যাংক মালিকরা যদি সুদব্যবস্থা পরিহার করে, সাধারণ জনগণ যদি হারাম ব্যবসা থেকে বিরত থাকে, সুদভিত্তিক ব্যাংকে টাকা জমা রাখা থেকে বিরত থাকে, মোটকথা, প্রত্যেক মুসলিম যদি শরিয়তবিরোধী যে কোনো হুকুমের সামনে মাথানত করা থেকে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে শাসক আপনা আপনিতেই ইসলামি শরিয়তবিরোধী মানবরচিত বিধিবিধান উপেক্ষা করতে বাধ্য হবে। প্রচলিত শাসনব্যবস্থাকে শরিয়তের দিকে নিয়ে আসার এটা শরিয়তসম্মত পদ্ধতি।

---

[২৩৩] সূত্র : সহিহ বুখারি

[২৩৪] সূত্র : সহিহ বুখারি

পক্ষান্তরে বর্তমানে মানুষ পাশ্চাত্য থেকে শেখে। এ-জন্য যা যা করে, অর্থাৎ রাস্তাঘাট আটকে রেখে হরতাল করা, রাষ্ট্রীয় সম্পদ নষ্ট করা, আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া—ইসলামে কোনোই স্থান নেই এগুলোর। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

***
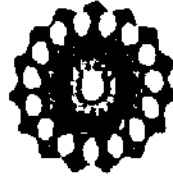
নেতৃত্বে আবেদন করা

কোনো বুঝমান মুসলিমের উচিত নয়—নিজে আগ বেড়ে নেতৃত্ব চাওয়া। নেতৃত্বের জন্য সব ধরনের চেষ্টা ও দৌড়ঝাঁপ করা নিষেধ। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগে বেড়ে নেতৃত্ব চাওয়ার ভয়ংকার পরিণাম বিভিন্ন হাদিসে বলে গেছেন। তিনি বলেন—

> إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فليعمل المرضعة وبئس الفاطمة
>
> অচিরেই তোমরা নেতৃত্বের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে। তবে কিয়ামতের দিন এর জন্য কতইনা আফসোস হবে। নেতার প্রথম অবস্থা তো অনেক ভালো থাকবে, কিন্তু শেষ অবস্থা কতই না ভয়ংকর।[২৩৫]

'এর জন্য কতইনা আফসোস হবে'—এই কথা দ্বারা বোঝা যায়, নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া ব্যক্তি সেদিন তার এই চেয়ে নেওয়া নেতৃত্বের জন্য খুবই আফসোস করবে। এটা দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায়—শাসক ইনসাফ না করলে এই নেতৃত্ব চাওয়াটা তার মন্দ পরিণামের কারণ হবে। আল্লামা আইনি রহ. বলেন—নেতৃত্বটা তার জন্য আফসোসের কারণ হবে। অর্থাৎ যে নেতৃত্বের দাবিনুযায়ী কাজ করে নি।

'তার প্রথম অবস্থাটা ভালো হবে'; কারণ, তার সাথে তখন সম্পদ, খ্যাতি ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাপন—সবই থাকে, আর 'শেষ অবস্থাটা বড়োই করুণ হবে'; কারণ, কখনো কখনো তাকে লড়াই-বিদ্রোহের স্বীকার হতে হবে, কখনো পদচ্যুত করা হবে. আর আখিরাতে প্রত্যেকটা জিনিসের হিসাব তো আছেই।

ইমাম দাউদি রহ. বলেন—হাদিসের অর্থ, তার প্রথম অবস্থা, অর্থাৎ দুনিয়ার অবস্থা কতইনা ভালো হবে, আর শেষ অবস্থা, অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা কতইনা বিপদজনক হবে। কারণ, প্রত্যেকটা বিষয়ে তাকে হিসাব দিতে হবে। ফলে

তার অবস্থা শিশুর মতো হবে, যার প্রয়োজন শেষ হওয়ার পূর্বেই দুধ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে তার ক্ষতির কারণ হয়।[২৩৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন—

> يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فان أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها
>
> আব্দুর রহমান ইবনু সামুরা, শোনো, তুমি কখনো নিজে আগে বেড়ে নেতৃত্ব চেয়ো না। কারণ, তোমার চাওয়ার ভিত্তিতে যদি দেওয়া হয়, তাহলে তোমাকে নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল করে দেওয়া হবে। আর চাওয়া ছাড়া দেওয়া হলে তোমাকে সাহায্য করা হবে।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, উমার রা. তাকে রাষ্ট্রীয় কোনো কাজে নিযুক্ত করার জন্য ডাকলে তিনি অস্বীকার করেন। তখন উমার রা. বললেন, আপনি কি রাষ্ট্রীয় কাজ করতে অপছন্দ করছেন? অথচ আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি এই কাজ তলব করেছেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কে তিনি?

উমার রা. বললেন—ইউসুফ ইবনু ইয়াকুব আ.।

তখন আবু হুরাইরা রা. বললেন—ইউসুফ আ. তো ছিলেন, নবীর পুত্র নবী। আর আমি হচ্ছি আবু হুরাইয়রা ইবনু উমাইয়্যা! তো, আমি দুটো বা তিনটা জিনিসের আশংকা করি।

উমার রা. বললেন—(পূর্বে) আপনি না বললেন পাঁচটা?।

তিনি বললেন—(হ্যাঁ) (সেগুলো হচ্ছে) :

- ০১. না জেনে কথা বলে ফেলব;
- ০২. না-হক ফায়সালা করবে;
- ০৩. আমাকে বেত্রাঘাত করা হবে;
- ০৪. আমার সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হওয়া হবে;
- ০৫. আমার ইজ্জতের লুণ্ঠন করা হবে।[২৩৭]

পক্ষান্তরে যদি তার সামনে নেতৃত্ব বা বিচারব্যবস্থা পেশ করা হয়, তাহলে তিনি গ্রহণ করবেন কি করবেন না—এক্ষেত্রে পাঁচটা দিক :

- ০১. ওয়াজিব : তিনি একাই উপযুক্ত, অন্য কেউ নেই।

---

[২৩৬] উমদাতুল কারি, খণ্ড : ২৪, পৃষ্ঠা : ২২৭

[২৩৭] সূত্র : আবু নুআইম

- ০২. মুসতাহাব : আরও অনেকে আছে তবে তিনি বেশি উপযুক্ত।
- ০৩. ইচ্ছাপ্রাপ্ত : চাইলে গ্রহণ করবেন অন্যথায় নয়:- তিনিসহ অন্যান্যরা সমানযোগ্য।
- ০৪. মাকরুহ : তিনি উপযুক্ত তবে তার চেয়ে আরও বেশি যোগ্য আছে।
- ০৫. হারাম : তিনি বুঝতে পারছেন যে, এই কাজ তার দ্বারা হবে না, তিনি ইনসাফ করতে পারবেন না। কারণ, তার মাঝে খাহেশাতের অনুসরণ প্রবল।[২৩৮]

***
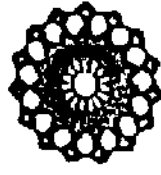
জনগণের করণীয়

একটি রাষ্ট্রে শুধু দায়িত্বপ্রাপ্ত শাসকই না, বরং সেখানে বসবাসরত প্রতিটি নাগরিকের কিছু করণীয় রয়েছে। এখানে জনগণের সেই কারণগুলো হলো—

এক. সৎ কাজে খলিফার আনুগত্য করা। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ..
>
> একজন মুসলিমের কর্তব্য, শাসকের কথা শোনা এবং মানা তার পছন্দনীয় হোক বা অপছন্দনীয় যদি না নাফরমানির আদেশ করা হয়, তো যদি নাফরমানির আদেশ করে তাহলে তার কথা শোনাও যাবে না, মানাও যাবে না।[২৩৯]

তো খলিফা বা তার নায়েব যদি জনগণকে কোনো আদেশ করেন, যা নাফরমানি নয়। তাহলে তাদের ওপর ওয়াজিব তার আনুগত্য করা, আপত্তি না করা। কারণ, খলিফার আদেশ বাস্তবায়ন করা মানে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার আদেশ বাস্তবায়ন করা। যদি আমরা খলিফার আনুগত্য করি, তাহলে যেন আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করছি। সুতরাং আমরা সাওয়াবও পাবো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني (رواه البخاري)
>
> যে আমার আনুগত্য করল, সে যেন আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করল, আর যে আমার অবাধ্যতা করল, সে যেন আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করল। আর যে আমিরের আনুগত্য করল সে যেন আমার আনুগত্য করল, আর যে আমিরের অবাধ্যতা করল, সে যেন আমারই অবাধ্যতা করল।[২৪০]

---

[২৩৯] সহিহ বুখারি : ৭১৪৪

[২৪০] সহিহ বুখারি : ২৯৫৭

একথা তো সুস্পষ্ট যে, আনুগত্যের ফলে শাসক-শাসিতের মাঝে সম্প্রীতি ও নৈকট্য বৃদ্ধি পায়, বিতৃষ্ণা ও ফাটল দূর হয়। ইবনুল ইয হানাফি বলেন—কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, শাসক, প্রশাসক, সেনাপ্রধান সাদকার দায়িত্বশীল, তাদের নিজেদের চিন্তা-মত গ্রহণ করা হবে। তবে তার নিজস্ব চিন্তার ক্ষেত্রে জনগণকে বাধ্য করবেন না। বরং তাদের কর্তব্য শুধু বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রে আনুগত্য করা, নিজেদের মত তার মতের সামনে ছেড়ে দেওয়া। কারণ, এখানে সামষ্টিক স্বার্থ রয়েছে। তদ্রুপ ইখতিলাফ ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার ক্ষতি ব্যক্তিগত বিষয়ের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এ-জন্যই এক শাসক অন্য শাসকের হুকুম বাতিল সাব্যস্ত করতে পারবে না।[২৪১]

তবে এই আনুগত্যটা উল্লিখিত হাদিসের কারণে অবাধ্যতার ক্ষেত্রে চলবে না। ইবনু উমার রা. বলেন—শাসকরা যদি আমাদের আল্লাহর পথে ডাকে, তাহলে তাদের কথায় সাড়া দেব; আর যদি শয়তানের দিকে ডাকে, তাহলে তাদের কথা বর্জন করব।[২৪২]

এরপরও যে অবাধ্যতার ক্ষেত্রে শাসকের আনুগত্য করবে, তার গুনাহ হবে, সেই সাথে ইহুদি নাসারাদের সাথে সাদৃশ্যও হবে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ

ওরা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের ধর্মপণ্ডিত ও সন্যাসীদের রব বানিয়ে নিয়েছে।

দুই. নেক কাজে খলিফাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা। জীবনের প্রত্যেকটা জিনিসের ক্ষেত্রে শরিয়ত কায়েম করার জন্য খলিফার সাহায্য ও সহযোগিতা আবশ্যক। আবু বকর সিদ্দিক রা. বলেন—যদি আমি উত্তম কাজ করি, তাহলে তোমরা আমাকে সাহায্য করো।

ইবনু বাতাল রহ. বলেন—খলিফা যদি এমন কোনো অঞ্চলে যান, সেখানে তার শত্রু আছে, তাহলে মুসলিমদের কর্তব্য হচ্ছে—তার সাথে থেকে তাকে রক্ষা করা। শত্রুরা যদি তার সাথে কঠোর আচরণ করে, তাহলে মুসলিমরা তাকে সাহায্য করবে। যেমনটা আবদুল্লাহ ইবনু রাবাহা রহ. করেছিলেন। তিনি বলেন—আল্লাহর কসম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গাধা তো তোমার চেয়েও অনেক সুন্দর, ঘ্রাণযুক্ত।

[২৪১] শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা : ৩৭৬

[২৪২] রিয়ায়াত : ইমাম খাত্তাবি।

শত্রুরা যদি খলিফার মাঝে বিবাদে লিপ্ত হতে চায়, তাহলে তারাও তার পক্ষে লড়াই করবে।[২৪৩]

তিন. খলিফাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> ان من آجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط ..
>
> মুসলিম বৃদ্ধকে সম্মান করা, কুরআনের হাফিজ, তবে কুরআন নিয়ে বিষয়ে বাড়াবাড়িও করে না, শিথিলতাও করে না, এমন ব্যক্তিকে সম্মান করা, এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা। এদের সবাইকে সম্মান করার অর্থ হলো আল্লাহ তাআলাকে সম্মান করা।[২৪৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন—

> خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس..

পাঁচটি কাজ এমন আছে যার একটাও যদি কেউ করে তাহলে সে আল্লাহর জিম্মায় থাকবে—

- ০১. অসুস্থকে দেখতে যাওয়া;
- ০২. জানাজার সাথে বের হওয়া;
- ০৩. খলিফাকে সম্মান করার উদ্দেশ্যে তার নিকট গমন করা;
- ০৫. নিজের ঘরে বসে থাকা, যাতে মানুষও তার অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকে, সেও মানুষের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকে।[২৪৫]

চার. খলিফা ও তার আমিরদের অভিশাপ না দেওয়া, তাদের গিবত ও দোষচর্চা না করা। আবু দারদা রা. বলেন—

কেমন হবে যদি তোমাদের শাসকরা প্রকাশ্যে তোমাদের অভিশাপ করে আর তোমরাও গোপনে তাদের অভিশাপ করো! আসলে তখন তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।[২৪৬]

---

[২৪৩] শারহু ইবনি বাতাল, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৮০

[২৪৪] সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৪২

[২৪৫] সুন্নাহ, আবু আসিম : ১০২১

[২৪৬] জামিউ মামার ইবনু রাশিদ : ২০৭১৬

আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বড়ো বড়ো সাহাবায়ে কিরাম আমাদের নিষেধ করেছেন শাসকদের মন্দ বলা থেকে।[২৪৭]

এই দোষারোপের কারণে অনেকগুলো অপ্রীতিকর বিষয় সৃষ্টি হয়। যেমন—

- ০১. শাসকদের প্রতি বিদ্বেষ;
- ০২. তাদের মাঝে আনাস্থা দেখা যাওয়া
- ০৩. জনগণের বিচ্ছিন্ন হওয়া।

এগুলোর মাধ্যমে মুসলিমদের শুধু দুর্বলতাই দেখা দেবে, তাদের শক্তি খর্ব হতে থাকবে, তাদের প্রতি শত্রুদের ভয় চলে যাবে। কারণ, মিলে থাকার মানেই শক্তি, বিচ্ছিন্ন হওয়ার মাঝে শুধুই দুর্বলতা।

পাঁচ. খলিফা ও শাসকদের জন্য দুআ করা। তামিম দারি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> الدين النصيحة الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم
>
> দ্বীন হলো কল্যাণকামিতা, দ্বীন হলো হীতাকাঙ্খা।
>
> জিজ্ঞেস করা হলো—কাদের জন্য কল্যাণকামিতা, ইয়া রাসুলাল্লাহ?
>
> তিনি বললেন—আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর নবীর জন্য, মুসলিমদের শাসকবর্গ ও সাধারণদের জন্য।

আবু উসমান রহ. বলেন—সুতরাং তুমি সুলতানের জন্য কল্যাণকামী হও; তার জন্য বেশি বেশি কল্যাণের দুআ করো। কথায় কাজে আদেশের ক্ষেত্রে সুষ্ঠতার দুআ করো। কারণ, যদি তারা ঠিক হয়ে যায়, সবাই ঠিক হয়ে যাবে। আর ভুলেও কখনো তাদের ওপর বদদুআ করো না। যাতে তাদের অনিষ্টতা আরও বৃদ্ধি পায়।

অন্যথা মুসলিমদের ওপরই বিপদ নেমে আসবে। বরং তাদের জন্য দুআ করো, যাতে তারা তাওবা করে। তাহলে তাদের অনিষ্টতা চলে যাবে, মুমিনদের থেকেও মুসিবত দূর হবে।[২৪৮]

ইবনু আজরাক বলেন—শাসকের জন্য কল্যাণের দুআ করা মুসলিমদের বড়ো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ, তিনি ভালো হলেই মুসলিমরা ভালো হবে।[২৪৯]

---

[২৪৭] সূত্র : বাইহাকি, শুআবুল ঈমান

[২৪৮] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান

[২৪৯] সূত্র : বাদাইউস সালাক, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : [illegible]

শাসকদের কাজের নিন্দা বা প্রত্যাখান

নিন্দা বা প্রত্যাখান করা জায়িজ না ওয়াজিব, না অন্য কিছু, সেটা নির্ভর করে নিন্দিত ব্যক্তির ওপর। শাসকের নিন্দা করা হলে তিনি যদি আরও বেশি খারাপ কাজ করে বসেন, তাহলে নিন্দা করা যাবে না। অন্যথায় শাসকের ভুল তুলে ধরা আবশ্যক। তো, শাসক যদি জনগণের ওপর জুলুম করে, তাদের হক প্রদান করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে তাদের কর্তব্য সবর করা, মনে মনে তাদের কাজকে নিন্দা করা (যদি আরও বেশি জুলুমের আশঙ্কা থাকে) এটাই শুধু তারা করতে পারবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا..
>
> অচিরেই কিছু শাসক আসবে, যাদের থেকে তোমরা ভালো কাজও পাবে, মন্দ কাজও দেখবে, তো যে ভালো কাজ দেখতে পাবে সে তো দায়মুক্ত আর যে খারাপ কাজ দেখে নিন্দা করবে সেও নিরাপদ। কিন্তু যে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, তাদের পিছু পিছু হাটবে সে..!

সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন—আমরা কি তাদের সাথে লড়াই করব না?

তিনি বললেন—না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নামাজ পড়ে।

নবীজি আরও বলেন—

> ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن من طاعة ..
>
> শোনো, যার কোনো শাসক থাকবে অতঃপর তাকে আল্লাহর নাফরমানির কিছু করতে দেখে, তাহলে সে যেন আল্লাহর নাফরমানিকে অপছন্দ করে। তবে আনুগত্য থেকে বিরত থাকা যাবে না।[১৫০]

সুতরাং শাসকদের নিন্দা জানানো হবে হয় মনে মনে। কিংবা কোমল আচরণের মাধ্যমে। কিংবা নরম নরম দ্বারা। কারণ, শাসকদের সম্বোধন করা আর সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করা এক নয়, একেক স্থানে একেকভাবে কথা বলতে হবে। এ-জন্যই যে ফেরআউন নিজেকে রব বলে দাবি করেছিল, তাকে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহি সালামকে নরম ও কোমলতার সাথে কথা বলার আদেশ করেছেন। তিনি মুসা আ.-কে সম্বোধন করে বলেন—

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

[১৫০] [illegible]

তোমরা দুইজন তা সাথে নরম করে কথা বলো; যাতে সে উপদেশ গ্রহণ করে অথবা ভয় করে।[২৫১]

তো, যারা ফেরআউনের চেয়েও নিচুস্তরের জালিম, তারা তো আরও বেশি হকদার কোমলতা পাওয়ার ক্ষেত্রে। আল্লামা জুহাইলি রহ. বলেন—যদি শাসক ভিত্তিহীন কোনো ভুল করে বসেন, যার সাথে শরিয়তের কোনো সম্পর্ক নেই, তাহলে জনগণের কর্তব্য আন্তরিকতা, প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তাকে বোঝানো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ..

দ্বীন হলো হিতাকাঙ্খার নাম। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—কার জন্য হিতাকাঙ্খা, ইয়া রাসুলাল্লাহ?

তিনি বলেন—আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসুলের জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, মুসলিমদের শাসকবর্গএবং সাধারণদেরজন্য।[২৫২]

তাছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নসিহত প্রদান, হক প্রকাশের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন—

أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر..

শ্রেষ্ঠ জিহাদ হচ্ছে জালিম শাসকের সত্য কথা বলা।[২৫৩]

তিনি আরও বলেন—

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان..

তোমাদের কেউ যখন খারাপ কাজ দেখবে, তখন যেন খারাপ কাজটা দূর করে হাতের মাধ্যমে, তা না পারলে মুখের মাধ্যমে তাও যদি না পারে তাহলে মনে মনে ঘৃণা প্রকাশ করবে। আর এটা হলো ঈমানের সর্বনিম্নস্তর।[২৫৪]

এরপরও যদি শাসক জুলুম থেকে ফিরে না আসে, তাহলে সবর করা কর্তব্য। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

[২৫১] সূরা ত্ব-হা, আয়াত : ৪৪
[২৫২] সূত্র : সহিহ মুসলিম
[২৫৩] সুনানু ইবনি মাজাহ
[২৫৪] সূত্র : সহিহ মুসলিম

من رأى من أميره شيئا فكره فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا إلا مات ميتة جاهلية..

কেউ শাসক থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখলে সে যেন ছবর করে অন্যথায় যেই জামাআত থেকে সামান্য বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহিলিয়াতের মরা মরল।

তবে হ্যাঁ যদি এমন কোনো নাফরমানি প্রকাশ পায়, যা ইসলামের অকাট্য বিষয়গুলোর সাথে সংঘর্ষপূর্ণ, তাহলে আনুগত্য করা যাবে না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف

আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার ক্ষেত্রে কারও আনুগত্য করা যাবে না, আনুগত্য শুধু নেক কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

তিনি আরও বলেন—

لا طاعة لمن لم يطيع الله

যে আল্লাহর তাআলার আনুগত্য করে না, তার আনুগত্য করা যাবে না।[২২২]

শাসকদের উপদেশ দেওয়ার চারটি শর্ত

যে কেউ, যে কোনো সময়, যে কোনোভাবে, ইচ্ছে করলেই শাসককে উপদেশ দিতে যাবে না। শাসককে উপদেশ দেওয়ার জন্য চারটি শর্ত রয়েছে। শর্তগুলো হলো—

এক. ইখলাস, সুতরাং শাসককে উপদেশ দিয়ে পদ, সম্পদ বা খ্যাতির আশা করা যাবে না।

দুই. উপদেশ আন্তরিকতা ও কোমল কথার মধ্যেমে হতে হবে। কারণ, কোমলতার পরিণাম কল্যাণকর, আর কঠোরতার পরিণতি অশুভ।

তিন. উপদেশ গোপনে হতে হবে। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية وليأخذ بيده وليخل به فإن قبلها قبلها وإلا كان قد ادى الذي عليه والذي له(رواه الحاكم في المستدرك)

কেউ যদি শাসককে উপদেশ দিতে চায়, তাহলে যেন সেটা প্রকাশ্যে না বলে। বরং শাসকের হাত ধরে একান্তে গিয়ে উপদেশ দেবে। এখন গ্রহণ

[২২২] আল-ফিকহুল ইসলামি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪১১২

করলে তো করলই, আর যদি না করে, তাহলে (কোনো সমস্যা নেই)।
কারণ, যে দায়িত্ব ও কর্তব্য তার ওপর ছিল, সেটা সে পৌঁছে দিয়েছে।[২৫৬]

সায়িদ ইবনু জুবাইর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি ইবনু আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞাসা করলাম—আমি কি নিজের শাসককে সৎ কাজের আদেশ করব?

তিনি বলেন—যদি আশংকা করো যে, সে তোমাকে হত্যা করে ফেলবে, তাহলে প্রয়োজন নেই। আর যদি করতেই হয়, তাহলে তোমার এবং তার মাঝেই যেন সীমাবদ্ধ থাকে।[২৫৭]

চার. এই উপদেশের কারণে যেন অন্য কোনো ফিতনা চলে না আসে। তাউস রহ. বলেন—এক ব্যক্তি ইবনু আব্বাস রা.-এর কাছে এসে বলল—আমি কি বাদশাহকে আদেশ নিষেধ করব না?

তিনি বললেন—না। কারণ, সেটা তোমার জন্য ফিতনার কারণ হবে।

লোকটা বললে—আচ্ছা, যদি আমাকে নাফরমানি করার আদেশ করে?

তিনি বললেন—সেটাই কি জানতে চাচ্ছ? তাহলে শোনো, তখন তুমি সত্যের ওপর অটল থাকবে।[২৫৮]

***

[২৫৬] মুসতাদরাক আল-হাকিম : ৫২৬৯
[২৫৭] সূত্র : বাইহাকি, শুআবুল ঈমান : ৭১৮৬
[২৫৮] সূত্র : বাইহাকি : ৭১৮৫

আহলুল হিল্লি ওয়াল আকদ

ইমাম নববি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাদের পরিচয় দিয়েছেন, তারা হলেন—উলামায়ে কিরাম, নেতৃবর্গ, গণ্যমান্য ব্যক্তি, যারা সহজে কোনো বিষয়ে একমত হতে পারেন।[২২৯]

আর জুওয়াইনি রহ. বলেন—তারা হলেন স্বাতন্ত্রের অধিকারী, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা যাদের সুদক্ষ করে তুলেছে, বিভিন্ন পথ পন্থা যাদের গড়ে তুলেছে, জনগণের নেতৃত্ব কার হাতে হতে পারে। তার গুণ কী কী হতে পারে, সে সম্পর্কে তারা জ্ঞান রাখে।[২৩০]

আহলুল হিল্লি ওয়াল আকদ হওয়ার শর্ত

এই বিশেষ দলে নিযুক্ত হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত পূর্ণাঙ্গরূপে পাওয়া আবশ্যক, সেগুলো উলামায়ে কিরাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিছু আছে, যেগুলো শাসক হওয়ার জন্য শর্ত, অর্থাৎ ইসলাম বোধবুদ্ধি, প্রাপ্তবয়স্কতা, পুরুষ হওয়া, স্বাধীনতা থাকা, এগুলো নির্দিষ্ট করেছেন। আর কিছু আছে, যেগুলো তাদের সাথে খাস। সেগুলো তিনটি, আল্লামা মাওয়ারদি বলেন—তাদের মাঝে তিনটি শর্ত পাওয়া যেতে হবে—

- ০১. আদালত থাকা, যা অন্যান্য শর্তকেও সন্নিবেশ করে।
- ০২. ইলম, যার মাধ্যমে জানা যাবে—শর্ত-শারায়েতসহ কে নেতৃত্বের বেশি হকদার..;
- ০৩. চিন্তা এবং প্রজ্ঞা, যার দ্বারা বোঝা যাবে—কে বেশি নেতৃত্বের যোগ্য, শাসন ব্যবস্থাপনার জন্য অধিকনিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ।

এই শর্তাগুলো পাওয়া গেলেই তারা নির্বাচন করবেন তাকে, যে নেতৃত্বের যোগ্য এবং মুসলিমদের জন্য উপকারী।

---

[২২৯] মিনহাজুত তালিবিন : ২৯২

[২৩০] গিয়াসুল উমাম : ৬৪

ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য : দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান রাখা জাতির সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখা তবে এই জ্ঞানের ধরন যুগের পার্থক্যের কারণে পরিবর্তন হতে পারে।

বর্তমান যুগে শাসক এবং শুরা সদস্যদের—যারা নেতৃত্বের ভিত্তি শাসন ক্ষমতার মূল—তাদের জ্ঞান রাখতে হবে রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন সম্পর্কে, চুক্তি ও সন্ধি সম্পর্কে, পার্শ্ববর্তী দেশ ও জাতি সম্পর্কে, তাদের সাথে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী সম্পর্ক সম্বন্ধে, অর্থাৎ তাদের রাজনৈতিক শক্তি কেমন, তাদের থেকে কী আশা করা যায়, কী আশঙ্কা করা যায়। তাদের ক্ষতি রোধ করার জন্য, তাদের মাধ্যমে উপকার গ্রহণ করার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন—এসব সম্পর্কেও জ্ঞান রাখা জরুরি। তবে সবার মাঝেই এসব শর্ত পরিপূর্ণভাবে থাকা জরুরি না, বরং সামষ্টিগতভাবে পাওয়া গেলেই যথেষ্ট। সদস্যের মাঝে যে শর্ত থাকতে হবে, এ সম্পর্কে যে সকল 'আসার'(সাহাবায়ে কিরামের কর্ম বা বাণী) পাওয়া যায়, সেগুলো থেকে হাফিজ ইবনু হাজারের বক্তব্য পাওয়া যায়। তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইআত প্রসঙ্গে বলেন—উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশাসক নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার নীতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, তিনি শুধু দ্বীনি যোগ্যতা দেখতেন না, বরং সাথে সাথে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও—তবে শরিয়তবিরোধী কিছু থাকলে পরিহার করতেন—দেখতেন। এজন্যই দেখা যায়, শামে আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু, কুফায় ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, এদের মতো মহান সাহাবি দায়িত্বে থাকা সত্ত্বেও তিনি মুআবিয়া, মুগিরা ইবনু শুবা, এবং আমরা ইবনুল আস রহ.-কে প্রশাসক বানিয়েছিলেন।[২৬১]

এজন্যই সাধারণত খিলাফত সম্পর্কিত বিষয়ে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর নীতি অবলম্বন করা হয়। বিশেষ করে বড়ো বড়ো এবং দেশ ও জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي' وأشار الى أبي بكر وعمر
>
> আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। তিনি বললেন—জানি না, আর কতদিন তোমাদের মাঝে আমি আছি। সুতরাং তোমরা আমার পর যে দুজন আসবে, তাদের অনুসরণ করবে। তখন তিনি আবু বকর এবং উমার রা.-এর দিকে ইশারা করেছেন।[২৬২]

---

[২৬১] ফাতহুল বারি, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ১৯৭

[২৬২] জামি তিরমিজি : ৩৬৬৩

যারা রাজনীতির বা রাষ্ট্রের মূল কেন্দ্রে থাকে, অন্যাদের ওপর তাদের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই স্বতন্ত্র নেই। আবু ইয়ালা রহ. বলেন—যারা খলিফার শহরে থাকবে, অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের ওপর তাদের কোনো আলাদা বৈশিষ্ট্য নেই, যার মাধ্যমে তারা কোনো ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে। হ্যাঁ, সর্বোচ্চ এটা হতে পারে যে, যে খলিফার শহরে থাকবে সে নেতৃত্ব বিষয়ে ব্যবস্থাপক হতে পারে। কারণ, সে খলিফার মৃত্যু সম্পর্কে আগে জানবে, তাছাড়া যারা খলিফার শহরে থাকে, সাধারণত তারাই খিলাফতের যোগ্য হয়।[২৬৩]

আহলুল হিল্লি ওয়াল আকদ ছাড়া অন্যদের বাইআত গ্রহণ : আহলুল হিল্লি ওয়াল আকদ ছাড়া অন্যদের বাইআত গ্রহণ বিবেচ্য নয়।[২৬৪]

ইমাম জুহাইলি বলেন—সাধারণ জনগণের জন্য এতটুকুই বিশ্বাস করা যথেষ্ট যে, তারা নিযুক্ত শাসকের দায়িত্বে আছে। এর চেয়ে ভিন্ন কিছু যদি মনে করে, তাহলে তারা ফাসিক। তাদের ক্ষেত্রেও এ হাদিস প্রযোজ্য হবে—

من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

যে বাইআত গ্রহণ ছাড়া মৃত্যুবরণ করল সে জাহেলিয়াতের মরা মরল।[২৬৫]

নারীদের বাইআতগ্রহণ

তদ্রুপ খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীর বাইআত ধর্তব্য নয়। *গিয়াসুল উমাম* কিতাবে আছে—আমরা অকাট্যভাবে জানি যে, খলিফা নির্বাচনের বাইআতগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের কোনো অধিকার নেই। কারণ, ইসলামি উম্মাহর খিলাফতকালে তাদের কাছে এ বিষয়ে কখনো পরামর্শ চাওয়া হয় নি। যদি কোনো নারীর কাছে পরামর্শ চাওয়াই যেত, তাহলে এ বিষয়ে সবচেয়ে যোগ্য ও হকদার হতেন ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা, তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ; যারা ছিলেন উম্মাহাতুল মুমিনিন, তথা মুমিনদের 'মা'। অথচ আমরা সুস্পষ্টভাবেই জানি যে—এক্ষেত্রে কোনো কোনো যুগেই তাদের কোনো পদচারণা ছিল না। তেমনি যারা উলামায়ে কিরাম নন, বিচক্ষণ নন, তাদেরও এক্ষেত্রে কোনো অধিকার নেই। একইভাবে জিম্মিদেরও কোনো সুযোগ নেই খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে।

তারপর তিনি (*গিয়াসুল উমামের লেখক*) কয়েক লাইন পরে বলেন—নারীদের কর্তব্য তো সবসময় পর্দার ভেতর থাকা, তাদের যাবতীয় বিষয় তো পুরুষদের হাতে ন্যাস্ত। সুতরাং তারা বহিরাগত অবস্থানে মাথা ঘামাবে না, তারা পুরুষদের মতো বাহিরে কথা কাটাকাটি করবে না। তাছাড়া তারা তো বড়ো বড়ো প্রকল্প,

---

[২৬৩] আহকামুস সুলতানিয়া : ১৯

[২৬৪] নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪১০

[২৬৫] আল-ফিকহুল ইসলামিয়া

পদক্ষেপ খুব কম বাস্তবায়ন করতে পারে। এজন্যই অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে—নারীরা একা একা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না।[২৬৬]

আল্লামা দামিজি রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন—যে সকল আধুনিক লেখকরা বর্তমানে নারীদের ঘর থেকে বের হয়ে আসার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে, সংসদে বসার কথা বলে এবং বলে যে, এটা মূলত ইসলামেরই দেওয়া হক, তাদের সকল ভিত্তিহীন কথার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। কারণ, এরা ইসলামের স্বচ্ছ আয়না দিয়ে নারীদের বিষয়টা দেখে না; বরং ধর্মহীন প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য চিন্তাচেতনায় প্রভাবিত হয়ে তাদের আয়না দিয়ে নারীদের বিষয় নিয়ে কথা বলে। এরা মূলত এই সকল বিজাতিদের কৃষ্টি-কালচারে অন্ধ হয়ে থাকে। পরবর্তী সময়ে কুরআন ও সুন্নাহর 'নসে'র (স্পষ্ট বিষয়গুলো) অপব্যাখ্যা করে ভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করে, যাতে তাদের খাহেশাত মোতাবেক হয়। তারপর বলে—এটাই মূলত ইসলামের শিক্ষা, এ শিক্ষা দিয়েই রাসুলদের প্রেরণ করা হয়েছে।[২৬৭]

শাসক নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী

ইসলামি ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায় না যে, খলিফা নির্বাচনে নারীর কোনো অধিকার ছিল। এই কথাও শোনা যায় নি যে, বনু সায়িদার সাকিফাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর খলিফা নির্বাচনের জন্য সাহাবায়ে কিরামের সাথে কোনো নারী একত্র হয়েছিলেন। এটাও শোনা যায় নি যে, নারীরা পুরুষের সাথে নির্বাচনে অংশীদার হতো, অথবা নারীদের রাষ্ট্রীয় বিষয়ে পরামর্শের জন্য ডাকা হতো; যেমনটা পুরুষদের ক্ষেত্রে হতো।

এটাও জানা যায় নি যে, কোনো নারী খলিফার সাথে সাথে রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে, যুদ্ধ-পরিচালনার ক্ষেত্রে থাকতেন। হ্যাঁ, ইতিহাস থেকে এতটুকু জানা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের থেকে বাইআত নিয়েছেন, তাদের হাত স্পর্শ করা ছাড়া। আরও জানা যায় যে—কিছু নারী মুজাহিদদের সাথে রণাঙ্গনে যেতেন। আহতদের ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দিতেন। পিপাসার্তদেরকে পান করাতেন। তাদের জন্য আলাদা একটি তাঁবু টানানো হতো, যেখানে আহতদের সেবা করা হতো। তারপর যখন কেউ আক্রান্ত হতো, তখন রাসুলুল্লাহ সা. বলতেন—তাকে যেন নারীদের তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হয়।

এ দুটো বিষয় থেকে এটা কিছুতেই বোঝা যায় না যে, নারীরাও রাজনীতিতে জড়াতে পারবে। যে এমনটা ধারণা করবে—সে মারাত্মক ভুল করল! তাছাড়া এ সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর মাঝে পার্থক্য করা হয়। অর্থাৎ পুরুষরা খলিফার

---

[২৬৬] গিয়াসুল উমাম, ইমামুল হারামাইন, মৃত : ৪৭৮ হিজরি : ৬২-৬৩

[২৬৭] আল-ইমামাতুল উজমা : ১৬৫

হাতে হাত রেখে বাইআত গ্রহণ করে, নারীরা এর ব্যতিক্রম। তাছাড়া নারীরা রণাঙ্গনে আসত সেবার উদ্দেশ্যে, লড়াইয়ের জন্য নয় (প্রয়োজন হলে ভিন্ন কথা); কিন্তু পুরুষরা এর ব্যতিক্রম।

এখন যদি বলা হয়—উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তো জঙ্গে জামাল-রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছিলেন; হাওদার ওপর থেকে পর্দার আড়ালে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তো এক্ষেত্রে মূল কথা হলো—আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে কেউ দেখে নি, তিনি হাউদার[২৬৮] ভেতরে ছিলেন। সেখানে তাকে দেখাও যাচ্ছিল না, তার আওয়াজও শোনা যাচ্ছিল না। সুতরাং এই কথা বলা যাবে না যে, তিনি সে সময় মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তাছাড়া যুদ্ধ করার জন্যও তিনি বের হন নি, যোদ্ধাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যও বের হন নি। তিনি শুধু মুসলিমদের দুই দলের মাঝে অর্থাৎ আলি—কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু—এবং মুআবিয়া রা.-এর মাঝে সন্ধি ও মিটমাট করে দেওয়ার জন্য বের হয়েছিলেন। কিন্তু সেটা ঘটনাক্রমে হয়ে ওঠে নি; বরং যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার *মুসনাদে* কাইস রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন রাতে আমের গোত্রের জলাশয়ের কাছে পৌঁছলেন, তখন কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করা শুরু করল। তিনি বললেন—কোন্ জলসা এটা?

উপস্থিত লোকেরা বলল—হাওআব[২৬৯] জলাশয়।

তিনি বললেন—তাহলে তো আমার ফিরে যাওয়াটাই নিরাপদ মনে করছি। তখন কেউ কেউ বলল—আপনি বরং আমাদের সাথে সামনে এগিয়ে যান; যাতে মুসলিমরা আপনাকে দেখে। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে মিটমাট করে দেবেন।

তিনি বললেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আমাদের বলেছিলেন—

كيف بإحدى كنا تنبح عليها كلاب الحوأب

তোমাদের কারও তখন কী অবস্থা হবে, যখন তার সামনে হাওআব জলাশয়ের কুকুর ঘেউ ঘেউ করবে?

আরেক বর্ণনায় আছে—আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন হাওআব জলাশয়ের সামনে এলেন তখন কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ শুনতে পান, তখন তিনি

---

[২৬৮] হাউদা এক ধরনের পর্দাকে বলা হয়, যা উটের ওপর রাখা গদির চারদিকে বেষ্টিত থাকে।

[২৬৯] হাওআব মক্কা এবং বসার মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম, যেখানে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সন্ধি করার জন্য নেমেছিলেন; কিন্তু সেটা করার সুযোগ হয় নি। ফলে জঙ্গে জামাল সৃষ্টি হয়ে যায়।

বললেন—আমার ফিরে যাওয়াটাই কল্যাণ মনে করছি। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বলেছেন—

ايتكن تنبح عليها كلاب الحوأب

দেখো! তোমাদের কোনো একজনকে দেখে হাওআব জলাশয়ের কুকুররা ঘেউ ঘেউ করবে!

তখন তাকে জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনি আমাদের সাথেই আসেন। হয়তো আল্লাহ তাআলা আপনার মাধ্যমে সবার মাঝে সন্ধি করে দেবেন।[১১০]

ইবনু হিব্বান রহমতুল্লাহি আলাইহি *সিকাত* নামক কিতাবে বলেন—জায়িদ ইবনু সুহান আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহার কাছ থেকে কুফার প্রশাসক আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গমন করেন। তার সাথে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার দুটো পত্র ছিল। দুটোতেই লেখা ছিল—

بسم الله الرحمن الرحيم

من عائشة أم المؤمنين الى عبد الله بن قيس الأشعري سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنه كان من قتل عثمان ما قد علمت وقد خرجت مصلحة بين الناس من قبلك بالقرار في منازلهم والرضا بالعافية حتى يأتيهم ما يحبون من صلاح أمر المسلمين ..

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার পক্ষ থেকে, আব্দুল্লাহ ইবনু কায়িস আশআরির কাছে, আপনার প্রতি সালাম।

আপনার জন্য আমি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। পর কথা হলো—উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার ঘটনার পর কী হলো, তা তো আপনি জানেন। আর এখন আমি মুসলিমদের মাঝে সন্ধি করার উদ্দেশ্যে বের হলাম।

সুতরাং আপনার নিজের পক্ষ থেকে সবাইকে আদেশ করেন, যাতে তারা নিজেদের ঘরে অবস্থান করে। সুস্থতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। যতক্ষণ না তাদের কাছে মুসলিমদের কল্যাণের সংবাদ পৌঁছে, যা তারা পছন্দ করে।[১১১]

তারিখু ইবনি খালদুন কিতাবে আছে—আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু কাকা ইবনু আমরকে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং তার সাথে থাকা অন্যদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। যাতে তিনি তার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

[১১০] মুসনাদু আহমাদ, প্রথম বর্ণনা : ২৪২৫৪; দ্বিতীয় বর্ণনা : ২৪৬৫৪

[১১১] আস-সিকাত, ইবনু হিব্বান, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৯১

তো. কাকা তাকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আম্মাজান কী কারণে আপনি এলেন?

তিনি বললেন—প্রিয় বৎস, শুধু মুসলিমদের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে।[২৭২]

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আলি রা. আয়িশা রাদিয়াল্লাহার কাছে এসে বললেন—আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দেন।

তিনি বললেন—আপনাকেও। আপনি তো এখন শাসক তো আপনার কাছে সুন্দর আচরণ আশা করি। কারণ, আমি শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠায় চেয়েছিলাম; কিন্তু এখন কী যে হয়ে গেল, আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন।

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দেন।

তিনি বললেন—আপনাকেও।

তারপর বসরাবাসীর বিশজন দ্বীনদার সম্মানিতা নারীকে তার সাথে থাকার আদেশ করেন। যাতে তারা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে মদিনা পর্যন্ত যায়। তাকে অনেক ভালো একটা জায়গায় থাকার ব্যবস্থাও করে দেন। পরের দিন তাকে মদিনা শরিফের দিকে রওনা করে দিলেন। তাকে বিদায় জানিয়ে সন্তানদের (মুসলিমদের) সাথেপাঠিয়েদিলেন।[২৭৩]

তো, এসব থেকে এটাই বোঝা গেল যে—আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই বের হয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তাদের কথা প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেল, যারা বলে—আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যুদ্ধের জন্য বের হয়েছেন। আর নেতৃত্বও তার হাতে ছিল। তদ্রুপ ইমামিয়্যা ও শিয়াদের কথাও প্রত্যাখাত হয়ে গেল। যারা বলে যে—তিনি ঘর থেকে বের হয়ে আল্লাহ তাআলার আদেশের খিলাফ করেছেন। আল্লাহ তাআলা নবী-পত্নীদের ঘরে স্থির থাকার আদেশ করে বলেন—

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

> আর তোমরা ঘরে স্থির থাকো জাহিলি যুগের মতো সৌন্দর্য প্রকাশ করে বেড়িওনা।[২৭৪]

তাদের কথা প্রত্যাখ্যাত, এ কারণে যে আনুগত্য বা নেক কাজের উদ্দেশ্যে সফর করাটা ঘরে স্থির থাকা বা ঘর থেকে বের না হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তাছাড়া তার সাথে তার মাহরাম অর্থাৎ তার বোন আসমা রা. এর ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনু জুবায়ের ছিলেন। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

---

[২৭২] তারিখে ইবনু খালদুন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৯১
[২৭৩] মিরআতুল জানান, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮১
[২৭৪] সূরা

নারীদের রাজনৈতিক কাজে জড়ানো

বর্তমান রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ করা বৈধ নয়। কারণ, নারীদের আলাদা কাজ রয়েছে; আল্লাহ তাআলা তাদের যে উদ্দেশ্য সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ, সন্তান ধারণ করা, তাদের জন্ম দেওয়া ও লালন-পালন করা। এগুলো হচ্ছে নারীদের বিশেষ কাজ। পুরুষরা এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। পুরুষদের কাজ বাহিরে। অর্থাৎ নিজের জন্য, স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য, বৃদ্ধ ও দুর্বল মা-বাবার জন্য উপার্জন করা; তাদের কাজ হচ্ছে—চাষাবাদ করা, তৈরি করা, ব্যবসা করা, অথবা রাষ্ট্রীয় কাজ করা। এগুলোই পুরুষের দিন-রাতের কাজ। আর এটাই প্রকৃতির রীতি। আল্লাহ তাআলার বিধানও।

এক্ষেত্রে কাফির ও মূর্খরা কী বলল, সেদিকে তাকানোই যাবে না! আফসোসের বিষয়—মুসলিমবিশ্বের প্রায় সবাই এভাবেই চলছে। যদি-না আল্লাহ তাআলা কাউকে কুফর বা নাস্তিকতা থেকে রহম করেন। যেমন আফগানিস্তানের ইমারতে ইসলামিয়া—আল্লাহ যেন তাকে রক্ষা করেন।

এখন নতুন আরেকটা ফিতনা বের হয়েছে ঐশী বিধানের বিরুদ্ধে যাকে বলা হয়—শিক্ষা ও নারী অধিকার! আফসোসের বিষয় হচ্ছে, এখন মুসলিম দেশগুলোতেও এটা ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং সকল মুসলিমের কর্তব্য, বিশেষ করে আলিমদের কর্তব্য হলো—কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহের আলোকে নারী-পুরুষের যৌথ অধিকার এবং বিশেষ অধিকার ব্যাখ্যা করা।

রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা ব্যক্তি ও সমাজের কাছে এর বার্তা পৌঁছে দেওয়া। চাই তা মুখের মাধ্যমে হোক বা কলমের মাধ্যমে। হোক লেখার মাধ্যমে হোক কিংবা জিহাদের মাধ্যমে। কারণ, এটাই প্রত্যেক মুসলিমের ওপর কর্তব্য। কুরআন কারিমে ঘোষিত হয়েছে—

> كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
>
> তোমরা হলে উত্তম জাতি, যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে। আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখবে।[৩৭৫]

এ যুগে রাজনীতিতে যে নারীদের অংশগ্রহণ করা নিষেধ, এর একটা দলিল হচ্ছে—সর্বাবস্থার জন্য এখন নারীদের মসজিদে যাওয়া নিষেধ। হাফিজ ঝাইলায়ি রহ. বলেন—আমাদের যুগে এখন এটাই গ্রহণযোগ্য মত। সর্বাবস্থার জন্য নারীদের মসজিদে যাওয়া নিষেধ। যুগ পরিবর্তনের কারণে এ দলিল আরও শক্তিশালী করে ওই হাদিস, যা আম্মাজান আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

---

[৩৭৫] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১১০

لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني اسرائيل

নারীরা পরবর্তী সময়ে যা কিছু করেছে, এগুলো যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে পেতেন, তাহলে তাদেরকেও বাইরে যেতে নিষেধ করতেন। যেমন বনি ইসরাইলের নারীদের নিষেধ করা হয়েছিল।[৭৬]

তো, যখন নারীদের মসজিদে যাওয়াই নিষিদ্ধ, যা দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা, যেখানে নেককার লোকেরাই শুধু থাকে, তাহলে রাস্তায় বা বাজারে বের হওয়ার বিধান, গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে যোগদানের বিধান কী হতে পারে!

নারীরা যে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না, এর আর আরেকটি দলিল হচ্ছে—আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঘরে অবস্থান করার আদেশ করেছেন। সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ নারী পুরুষের সংমিশ্রণ থেকে নিষেধ করেছেন। চাই সেটা কোনো কাজের কারণে হোক, অথবা সফরের কারণে হোক, কিংবা অন্য যে কোনো কারণ হোক। কেননা, এই ময়দানে আসাটাই নারীকে খারাপ কাজে নিয়ে যাবে। যার ফলে আল্লাহ তাআলার আদেশ লঙ্ঘিত হবে, একজন মুসলিম নারীর কাছে আল্লাহ তাআলা যে সকল দাবি পূরণের আশা করেন, সেটাও বিফলে যাবে। কুরআন কারিম স্পষ্ট করে প্রমাণ করে, নারী পুরুষ সংমিশ্রণ ও তার আরও যত উপায় আছে সবই হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ ٣١(النور)

আপনি মুমিন পুরুষদের বলে দেন, যেন তারা নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে, লজ্জাস্থান হিফাজত করে রাখে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্রদায়ক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অধিক অবগত। আর মুমিন নারীদের বলে দেন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে, লজ্জাস্থান হিফাজত করে রাখে। আর যেন নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। সাথে, তারা যেন নিজের বক্ষদেশের ওপর ওড়না দিয়ে রাখে।[৭৭]

---

[৭৬] সহিহ বুখারি : ৮৬৯

[৭৭] সূরা নূর, আয়াত : ৩০-৩১

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করেছেন—তিনি যেন মুমিন নর নারীদের একথা পৌঁছে দেন, তারা যেন আবশ্যকীয়ভাবে দৃষ্টি অবনত রাখে, জিনা থেকে লজ্জাস্থানকে হিফাজত করে। তারপর সুস্পষ্ট করে এটাও বলে দিয়েছেন যে—এটাই তাদের জন্য উত্তম।

এটা সবার জানা কথা যে, অশ্লীল কাজ থেকে লজ্জাস্থান তখনই হিফাজত করা সম্ভব, যদি তার সহায়ক উপায় ও মাধ্যমগুলো থেকে বেঁচে থাকা যায়। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কর্মক্ষেত্র বা অন্যান্য অঙ্গানে নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ বা পুরুষ নারী সংমিশ্রণই অশ্লীল কাজের সবচেয়ে বড়ো সহায়ক এবং উপায়। আর এই দুটো বিষয় (অর্থাৎ দৃষ্টি অবনত রাখা ও লজ্জাস্থান হিফাজত রাখা) তখনই কখনোই সম্ভব নয়, যদি পুরুষ-নারী একই সাথে একই জায়গায় কাজ করে।

মোটকথা, তখন নিজেকে পবিত্র রাখা অসম্ভব। এজন্যই আল্লাহ তাআলা মুমিন নারীদের আদেশ করেছেন দৃষ্টি অবনত রাখতে, লজ্জাস্থান হিফাজত করতে, সৌন্দর্য প্রকাশ না করতে (তবে যা সাধারণত প্রকাশ পেয়েই যায় তার কথা ভিন্ন) বুকের ওপর ওড়না দিয়ে আবৃত করে রাখতেন। তাহলে কীভাবে সম্ভব দৃষ্টি অবনত রাখা, লজ্জাস্থান হিফাজত রাখা, সৌন্দর্য প্রকাশ না করা, যদি নারীরা পুরুষদের সাথে যুক্ত হয়, তাদের সাথে কর্মক্ষেত্রে মিশে যায়?

মূলত, সংমিশ্রণই সকল খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার কারণ। কিছুতেই দৃষ্টি অবরোধ রাখা সম্ভব নয়, যদি নারী পুরুষের ডানে বামে চলাফেরা করে এই যুক্তিতে যে, সেও পুরুষের কাজে অংশীদার হবে, বা সমান অধিকার পাবে।

ইসলাম হারামকে যেমন হারাম বলেছে, তদ্রূপ হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার উপায় উপকরণ বা সহায়ককেও হারাম বলেছে। এজন্যই নারীদেরকে পুরুষের সাথে নরম কণ্ঠে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, নরম কথার মাধ্যমেই তাদের দিকে পুরুষদের মন আকৃষ্ট হয়ে যায় যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

> يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (٣٢)
>
> হে নবীপত্নীগণ, তোমরা সাধারণ কোনো নারীদের মতো নও, যদি তোমরা তাকওয়াবান হও। আর তোমরা কোমলভাবে পরপুরুষদের সাথে কথা বলো না। তাহলে যার মনে ব্যাধি আছে, সে আকৃষ্ট হয়ে যাবে।[২৭৮]

ব্যাধি দ্বারা উদ্দেশ্য, খাহেশাত ও প্রবৃত্তির ব্যাধি। এখন একসাথে মিশে থাকলে কীভাবে এটা থেকে রক্ষা পাবে? কারণ, এটা তো স্পষ্ট যে, কোনো নারী যদি পুরুষদের কর্মক্ষেত্রে যোগ দেয়, তাহলে তাকেও পরপুরুষদের সাথে কথা বলতে

---

[২৭৮] সূরা আহযাব, আয়াত : ৩২

হবে, তাদেরকেও তার সাথে কথা বলতে হবে, শয়তান তাদের কথা আরও চাকচিক্য করে তুলবে, অশ্লীল কাজের দিকে ডাকবে। আর একসময় তারা শয়তানের শিকারে আটকে পড়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বড়োই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী। এজন্য তিনি নারীদের পর্দা ব্যবহারের আদেশ করেছেন। এর কারণ হচ্ছে—স্বভাবতই কিছু মানুষ নেককার; তবে কিছু মানুষ কিছু বদকারও। কিছু মানুষ পবিত্র আর কিছু অপবিত্র। তো, এ পর্দাই আল্লাহ তাআলার রহমতে ফিতনা থেকে তাদের রক্ষা করবে। ফিতনার সহায়ক বিষয়গুলো থেকে তাদের দূরে রাখবে। আর এর মাধ্যমে নারী-পুরুষের পবিত্রতা রক্ষা পাবে। অপবাদের আশঙ্কা থেকেও বেঁচে থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

আর যখন তোমরা তাদের কাছে (নবী-পত্নীগণ) কিছু চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও। এই বিধানই তোমাদের অন্তর এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিক পবিত্রদায়ক।

কাপড় দিয়ে চেহারা ও শরীর ঢাকার পর নারীদের জন্য সবচেয়ে উত্তম পর্দা হচ্ছে তাদের ঘর। ইসলাম নারীর জন্য পুরুষদের সাথে মেলামেশাকে হারাম করেছে। যাতে নারী সরাসরি বা অন্য কোনোভাবে ফিতনার সম্মুখীন না হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন—

المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان

নারী হলো আবরণীয় সত্তা। সে যখন বের হয়, তখন শয়তান তার দিকে উঁকি দেয়।[২৭]

এ-জন্যই আল্লাহ তাআলা নারীকে ঘরে স্থির থাকার আদেশ করেছেন, ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেছেন। তবে গ্রহণযোগ্য প্রয়োজন থাকলে শরয়ি বিধান রক্ষা করে বের হতে পারবে। আল্লাহ তাআলা নারীর ঘরে অবস্থান করাকে قرار -কারার- তথা 'স্থির থাকা' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। কারণ, ঘরই হলো তার মূল বাসস্থান; যা তার সৃষ্টিগত স্বভাবের উপযোগী। এখানেই তার হৃদয়ের তৃপ্ততা, মনের উন্মুক্ততা। ঘর থেকে বের হলেই তার অস্থিরতা শুরু হয়ে যায়। হৃদয়ের তৃপ্তি হারিয়ে যায়। মন সংকীর্ণ হয়ে যায়। কখনো কখনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতিরও সম্মুখীন হতে হয়।

---

[২৭] জামি তিরমিজি : ১১৭৩

আশ্চর্য হয়ে যখন দেখি—কিছু নামধারী মুসলিম, বরং কোনো কোনো আলিমও, যাদের চিন্তাচেতনা পাশ্চাত্য দ্বারা প্রভাবিত, বলতে শুনি—নারী-পুরুষ সবার সমান অধিকার চাই, জীবনের প্রত্যেকটা অঙ্গনে, ঘরের বাইরে ও ভেতরে, শাসন-ব্যবস্থা ও রাজনীতিতে নেতৃত্ব ও মন্ত্রীতে, মোটকথা, কাজ করার যতগুলো ক্ষেত্রে আছে, সবগুলোতে। তখন বলতেই হবে—এটা স্রেফ অন্ধকারচ্ছন্ন মূর্খতা; যা কুরআন-সুন্নাহরও বিরোধী, যুক্তিরও বিরোধী, এটা আসমান জমিনের মহান সৃষ্টিকর্তার হুকুমের বিপরীত। আল্লাহ তাআলা আমাদের এবং সকল মুসলিমকে এই ধরনের অহেতুক চিন্তা, ভ্রান্ত আকিদা থেকে রক্ষা করেন। আমিন।

প্রশ্ন করতে পারেন, যুক্তিবিরোধী কেন?

বলতে হবে, এর কারণ আছে। কারণ হলো, নারী-পুরুষের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে, যা কোনো সমঝদার ব্যক্তি অস্বীকার করবে না। কত বিষয়ই তো এমন আছে, যা পুরুষের তবিয়তের উপযোগী, আর নারীদের সাথে সাংঘর্ষিক। আবার কত বিষয় এমন আছে, যা নারী প্রকৃতির সাথে খাপ খায়, কিন্তু পুরুষদের স্বভাবের বিরোধী! তাহলে যুক্তি কীভাবে সমান অধিকারের কথা বলে!

আর এটি কুরআনের বিরোধী যুক্তি। কেন? কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন—

> وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)
>
> আল্লাহ তাআলা তোমাদের কাউকে অপরের ওপর যে বিষয় দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, সেটা তোমরা (পাওয়ার) আকাঙ্ক্ষা করো না। পুরুষদের জন্য রয়েছে তাদের কৃতকর্মের অংশ, আর নারীদের জন্য রয়েছে তাদের কৃতকর্মের অংশ। আর তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।[২৮০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

> الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
>
> পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্ববান। এ কারণে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের কাউকে (পুরুষদের) কারও (নারীদের) ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এবং এ কারণে যে, পুরুষরা তাদের ধনসম্পদ থেকে (নারীদের জন্য) খরচ করে।[২৮১]

---

[২৮০] সূরা নিসা, আয়াত : ৩২

[২৮১] সূরা নিসা, আয়াত : ৩৪

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আর তা দুইভাবে—

এক. প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাআলা নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এর কারণ অনেকগুলো, সবগুলোর সারনির্যাস দুটো কারণ—

- ০১. জ্ঞান, এবং
- ০২. সক্ষমতা।

পুরুষদের বুদ্ধি-জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচুর, কঠিন কঠিন কাজগুলোর ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতাও বেশি। এই দুই কারণে নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধির ক্ষেত্রে, শক্তি ও সাহসের ক্ষেত্রে, যুদ্ধ পরিচালনা ও লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তারা এগিয়ে থাকে। তাই পুরুষরাই আম্বিয়া এবং বড়ো বড়ো আলিম হন, তারাই ইমামতে কুবরা—রাষ্ট্র পরিচালনা—ইমামতে সুগরা—মসজিদের ইমামতি—জিহাদ, আজান ও খুতবার দায়িত্ব পালন করেন। তাদের মিরাসের ক্ষেত্রে বেশি দেওয়া হয়। তারা মিরাসের ক্ষেত্রে 'আসাবা' হন। ভুল করে হত্যা করলে দিয়তই তাদের জন্য যথেষ্ট হয়। তারা স্ত্রীদের পালা বণ্টন করে দেন। ডিভোর্স দেওয়ার এবং ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা রাখেন। একাধিক স্ত্রীও গ্রহণ করতে পারেন।

দুই. তাদের প্রাধান্য দেওয়ার দ্বিতীয় কারণ, বিবাহের ক্ষেত্রে তারা নারীদের মোহর দেয়। তাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালন করে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তিনি সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

'আহালুল হিল্লি ওয়ালা আকদ' এর দায়িত্ব

'আহালুল হিল্লি ওয়ালা আকদ' এর দায়িত্ব দুইটি—

এক. খলিফা নির্বাচন এবং তার হাতে বাইআত গ্রহণ। কারণ, তাদের প্রথম দায়িত্বই হলো খলিফা নির্বাচন করা এবং তার হাতে বাইআত গ্রহণ করা।

দুই. নেতৃত্বের জন্য অধিক যোগ্য এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্তকে নির্ধারণ করা। কারণ এটাও তাদের একটি দায়িত্ব যে, তারা এমন কাউকে নির্ধারণ করবে—যিনি জনগণের পরিচালনায় অধিক যোগ্য, সবক্ষেত্রেই তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে।

এখন যদি দুজনকেই যোগ্য পায়, তবে একজন বেশি জ্ঞানী এবং অপরজন অধিক বীর সাহসী; তাহলে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সময়ের দাবি কী বলে, সেটাই রক্ষা করবে। যদি সাহসের বেশি প্রয়োজন থাকে, তাহলে সাহসী ব্যক্তিকেই অগ্রাধিকার দেবে। আর যদি জ্ঞানের বেশি প্রয়োজন থাকে, তাহলে জ্ঞানী ব্যক্তিই প্রাধান্য পাবে। সব ক্ষেত্রেই যদি সমান হয়, তাহলে সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেবে। তবে যে বেশি বয়স্ক নয়, তার হাতে বাইআত করলেও জায়িজ হবে। এখন যদি

প্রার্থিত সব বিষয়েই সমান সমান হয়, আর দুজনেই নেতৃত্ব নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়; তাহলে কীভাবে তাদের বিবাদ নিরসন করা হবে, এক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে ইখতিলাফ আছে।

একদল বলেন—লটারি করা হবে। লটারিতে যার নাম উঠবে, সে-ই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

অপরদল বলেন—বরং 'আহলুল হিল্লি ওয়াল আকদ' যাকে ইচ্ছা করেন, তার হাতে বাইআত গ্রহণ করবে। লটারির প্রয়োজন নেই।

তাই, যদি পুরো জামাআতের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে একজন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হিসেবে নির্ধারিত হন, তাহলে সবাই তার হাতে বাইআত গ্রহণ করবে। তারপর যদি পরবর্তী সময়ে তার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তির বিকাশ ঘটে, তাহলে প্রথম ব্যক্তির নেতৃত্ব গ্রহণযোগ্য হবে। তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাবে না। আর যদি অধিক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও শুধু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হাতে বাইআত গ্রহণ করা হয়, যদি সেটা গ্রহণযোগ্য ওজরের কারণে হয়—যেমন: অধিক শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি অসুস্থ বা অনুপস্থিত ছিল; অথবা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে সবাই শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির চেয়ে বেশি আনুগত্য করে, তার প্রতি জনগণের ভালোবাসা থাকে—তাহলে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নেতৃত্ব গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি ওজরের কারণে না হয়, তাহলে তার বাইআত ও নেতৃত্ব সহিহ হবে কি না—এ বিষয়ে ইখতিলাফ আছে।

কেউ কেউ বলেন—(তাদের একজন ইমাম জাহিজ রহ.), তার বাইআত গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, নির্বাচনের ক্ষেত্রে অধিক যোগ্য ব্যক্তিই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। সুতরাং, তার চেয়ে নিচের যোগ্য ব্যক্তির হাতে বাইআত গ্রহণ করা যাবে না। যেমন—আহকামে শারইয়্যাহর ক্ষেত্রে ইজতিহাদের যোগ্যতা যার মাঝে বেশি পরিমাণে আছে, নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সে-ই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

তবে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরাম ও মুতাকাল্লিমিন বলেন—তার বাইআতও সহিহ হবে, নেতৃত্বও গ্রহণযোগ্য হবে। অধিক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থাকা শুধু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নেতৃত্বের জন্য বাধার কারণ হবে না, যদি-না নেতৃত্বের শর্তাবলির ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকে। যেমন—কাজা ও বিচার-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অধিক যোগ্য ব্যক্তি থাকলেও শুধু যোগ্য ব্যক্তিকে নির্ধারণ করা যায়। কারণ 'অধিক'এর কথা বলা হয়েছে মূলত অতিশয়তা বোঝানোর জন্য, এটা নেতৃত্বের হকদার হওয়ার জন্য তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য শর্ত নয়।

'আহলুল হিল্লি ওয়াল আকদ'-এর সংখ্যা

'আহলুল হিল্লি ওয়াল আকদ'-এর সদস্য সংখ্যা কী পরিমাণ হলে নেতৃত্ব সংঘটিত হবে—এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো :

এক. একদল উলামায়ে কিরাম নির্বাচিত খলিফার ব্যাপারে আহলুল হিল্লি ওয়াল আকদের সকল সদস্যের ঐকমত্য শর্ত করেছেন। নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই। এই মত অনেকটা মুতাজিলা সম্প্রদায়ের ইমাম আসামের কথার মতো। তিনি বলেন—ইজমা ছাড়া নেতৃত্ব কায়েম হবে না।[৮২]

এমনটাই ইমাম আহমাদ রহ.-এর এক বর্ণনাতে পাওয়া যায়। ইবনু হানি বলেন—আমি আবু আব্দুল্লাহকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদিসের অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম—

من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية

যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, তার কোনো ইমাম নেই, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করে নিল।

তিনি বললেন—তুমি কি জানো, এখানে 'ইমাম' দ্বারা কী উদ্দেশ্য? ইমাম বা খলিফা তাকেই বলে, যার ব্যাপারে সমস্ত মুসলিম ঐকমত্য হয়ে বলে—ইনিই ইমাম। এটাই হাদিসের অর্থ।[৮৩]

দুই. আরেকদল উলামায়ে কিরাম আহলুল হিল্লি ওয়াল আকদের সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন—সর্বনিম্ন সংখ্যা ৪০জন। কারণ, মর্যাদার দিক থেকে ইমামতে কুবরা জুমুআর নামাজের ঊর্ধ্বে। আর ৪০-এর কমে জুমুআর নামাজ সংঘটিত হয় না।

কেউ কেউ বলেন—পাঁচজন।

কেউ বলেন—চারজন।

আবার কেউ বলেন—দুজন দ্বারাও তৃতীয় ব্যক্তির ইমামত সংঘটিত হয়ে যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে—কয়েকজন সাক্ষীর সামনে হতে হবে; যাতে পরবর্তী সময়ে অস্বীকার করলে প্রমাণ পেশ করা যায়। কেউ কেউ এই মতকে ইমাম আবুল হাসান আশআরি রহ.-এর সাথে নিসবত করেছেন, যেমন *রদ্দুল মুহতারে* আছে।

শাফিয়ি মাজহাবের অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে, বাইআতের সময় উলামায়ে কিরাম, নেতৃবৃন্দ, অভিজাত শ্রেণির যারা যারা সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য এবং সহজে উপস্থিত হতে পারবে, তাদের দ্বারাই নেতৃত্ব কায়েম হবে, এমনকি যদি একজনও থাকে তবুও যথেষ্ট।

ইমাম কলকাশান্দি বলেন—আমাদের শাফিয়ি মাজহাবের উলামায়ে কিরামের নিকট এটাই বিশুদ্ধ মত।

---

[৮২] আল ফারকু বাইনাল ফারকি, ১৫০

[৮৩] আল জামি লিউলুমুল ইমাম আহমাদ, ১৯১৭

ইমাম দামিজি রহ. বলেন—ইমাম আবুল হাসান আশআরি রহ.-এর মত এবং শাফিয়ি উলামায়ে কিরামের মাঝে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পার্থক্যটি হলো, শাফিয়ি উলামায়ে কিরামের নিকট আহলুল হিল্লি ওয়াল আকদের একজন সদস্য দ্বারাই ইমামত সহিহ হবে এই শর্তে যে—সেখানে সদস্য হিসেবে গণ্য করা যায়, এমন কেউ উপস্থিত না থাকা। আর ইমাম আশআরি রহ.-এর মতে, একজন সদস্য দ্বারাই ইমামত সহিহ হয়ে যাবে, অন্য কেউ থাকুক বা না থাকুক।[২৮৪]

তিন. আরেকদল বলেন—আহলুল হিল্লি ওয়াল আকদের অধিকাংশ সদস্য দ্বারাই ইমামত সহিহ হবে।

তারা সবার ঐকমত্যও শর্ত করেন না, নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যাও বলেন না। আবু ইয়ালা রহ. বলেন—আহলুল হিল্লি ওয়াল আকদের অধিকাংশ সদস্য দ্বারাই ইমামত সহিহ হবে।

অনেক উলামায়ে কিরাম এই মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, কুরআন-হাদিস থেকেও এ ব্যাপারে কোনো দলিল নেই। আবার উলামায়ে কিরামের ইজমাও নেই যে, ঐকমত্য শর্ত না-কি নির্দিষ্ট সংখ্যা শর্ত। অগ্রাধিকার পাওয়ার কারণ হলো, উম্মতে মুসলিমা আহলুল হিল্লি ওয়াল আকদের সদস্যদের ওপর নির্ভর করে। তারাই জাতির চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করেন। তাদের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলিও পূর্ণাঙ্গভাবে পাওয়া যায়। এটা আহলুল হিল্লি ওয়াল আকদের সকল সদস্যদের (প্রত্যেকের মধ্যে সমষ্টিগতভাবে) মাঝে যেমন পাওয়া যায়, আবার তাদের 'অধিকাংশের' মাঝেও পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্যা হলো, বাইআতের সময় সবার (প্রত্যেকের) উপস্থিতি অসম্ভব না হলেও কিছুটা কঠিন। তাই, অধিকাংশ উপস্থিত থাকলেই যথেষ্ট। মোটকথা, বাইআতের ক্ষেত্রে নির্বাচিত খলিফার পক্ষে এই পরিমাণ অনুসারী, সাহায্যকারী ও সমর্থনকারী থাকা প্রয়োজন যাদের দ্বারা খলিফার আসন পাকাপোক্ত হতে পারে, তার পাশে শক্তিশালী দল থাকতে পারে, যারা তাকে রক্ষা করবে; যাতে পরবর্তী সময়ে খলিফার বিরুদ্ধে ঝড় বয়ে গেলেও খলিফার অনুসারীদের মূলৎপাটন করা সম্ভব হবে না। অতএব, যখন তার বাইআত শক্তি দ্বারা সুদৃঢ় হবে, সদলবলে প্রতিষ্ঠিত হবে, মজবুত হবে, সাহায্য দ্বারা সমর্থিত হবে, শত্রুদের ওপর বিজয়ী হওয়ার শক্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে; তখনই ইমামত সুসাব্যস্ত ও স্থির হবে, নেতৃত্ব দৃঢ় হবে এবং অবিচল থাকবে। ইমামত সহিহ হওয়ার জন্য ইজমা মূলত শর্ত নয়।

বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আবু বকর রা. এর বাইআতের ঘটনা লক্ষ্য করা যেতে পারে। বাইআতের পর তিনি হুকুম করেছেন, বিচার করেছেন, ফায়সালা করেছেন,

---

[২৮৪] ইমামতে উযমা, ১৭৮

সুসংহত করেছেন, মুজাহিদ বাহিনী প্রস্তুত করেছেন, ইসলামের ঝান্ডা উঁচু করেছেন, জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন, ট্যাক্স নিয়েছেন এবং সেগুলো বণ্টন করেছেন। কিন্তু এগুলো করার আগে, মদিনাবাসীর বাইআতের পর তিনি এই অপেক্ষা করেন নি যে, তার বাইআতের খবর ইসলামের দূরদূরান্ত জনপদেও পৌঁছে যাক। যারা মদিনায় ছিল তারা ছাড়া অন্য কারও থেকেও স্বীকারোক্তির অপেক্ষা তিনি করেন নি। একইভাবে অপর তিন খলিফার বাইআতের ক্ষেত্রেও এমনটি হয়েছিল। এতে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। তারপর আমাদের এই ক্ষুদ্র জ্ঞানকে যে বিষয়টি আরও শক্তিশালী করে, তা হলো—খলিফা নির্বাচনের মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের হিফাজত, ইসলামের মৌলিক বিষয়-সহ অন্যান্য যাবতীয় নাজুক বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান। এখানে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সামান্য অবকাশেরও সুযোগ থাকে না। কারণ, বিলম্ব করা হলে এমন জটিল সমস্যা হতে পারে, যার সমাধান হবে না। এমন মারাত্মক ভুল হতে পারে, যার ক্ষতিপূরণ হবে না! এখান থেকেই বোঝা যায় যে, ইমামতের জন্য ইজমা শর্ত নয়।[৮৫]

***
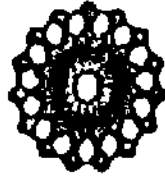
ইসলামে বিধান-ব্যবস্থা

ইসলামের প্রত্যেকটি বিধানের তিনটি ভিত্তি রয়েছে—

- ০১. সালতাতুত তাশরি
- ০২. সালতাতুত তানফিজ
- ০৩. সালতাতুত কাজা

০১. সালতাতুত তাশরি : তাশরি দ্বারা উদ্দেশ্য 'মজলিসে শুরা', যার সদস্যদেরকে কিছু শর্তসাপেক্ষে এবং বিশেষ গুণাবলির ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়; যেমনটি সামনে আলোচিত হবে।

এই বিভাগটিকে আধুনিক রাজনীতির ভাষায় অধিকাংশ দেশে পার্লামেন্ট নামে নামকরণ করা হয়, কোনো কোনো দেশে 'মজলিসে শুরা' বলা হয়।

এর সদস্যদেরকে কীভাবে নির্ধারণ করা হয়, সেটা আসবে 'শুরা' অধ্যায়ে।

তাশরি শব্দের অর্থ : এর দুটো অর্থ রয়েছে। প্রথম অর্থ নতুন কোনো শরিয়ত প্রণয়ন করা। দ্বিতীয় অর্থ এমন কোনো বিধিবিধান বর্ণনা করা, যা কোনো শরিয়ত বা আইন দাবি করে। এই দ্বিতীয় অর্থেই সাহাবায়ে কিরাম, তাবিয়িন, মুজতাহিদিন এবং উলামায়ে কিরাম— রাদিয়াল্লাহু আনহুম—ইসলামের খিদমত করেছেন।

মজলিসে শুরার ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। এই বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব হলো শরিয়তের আলোকে ভিত্তিমূলক আইন সুবিন্যস্ত করা

ভিত্তিমূলক আইন

যেকোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় কিছু নীতিমালা ও মূলনীতি রয়েছে, যার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে থাকে। এর মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের গঠন এবং প্রধান বিভাগগুলো নির্ধারিত হয়। এর মাধ্যমেই জনগণ সুবিন্যস্ত থাকে, জুলুম প্রতিরোধ করা যায়, হকদারদের হক রক্ষা করা যায় এবং সামষ্টিকভাবে ও বিচারের ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েম করা যায়।

আইন প্রণয়নের উৎস কী হবে এক্ষেত্রে অনেক আগে থেকেই এমনকি বর্তমান যুগেও রাজনীতিবিদদের মতবিরোধ রয়েছে—এটা কি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হবে, না-কি নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে, না-কি কোনো নির্দিষ্ট দলের পক্ষ থেকে হবে?

একদল আলিম বলেন—আইন প্রণয়নের একমাত্র অধিকার শাসকের। এক্ষেত্রে তিনি নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের অধিকারী, অন্য কারও অধিকার নেই; যেমনটি একনায়কতন্ত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

স্বাভাবিকভাবেই ইসলাম এমন মতাদর্শকে স্বীকৃতি দেয় না—যে মতাদর্শ শাসককে শাসনের বিষয়ে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের অধিকার দেয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের অধিকার দেন নি। বরং, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে বলেন—

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ

'অতএব, আপনি উপদেশ দান করুন। আপনি তো শুধু উপদেশ দানকারী।'[২৮৬]

আল্লাহ তাআলা আইন প্রণয়ন নিজের মাঝে সীমাবদ্ধ করে বলেন,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

'শাসন ক্ষমতা তো শুধু আল্লাহ তাআলার জন্য।'[২৮৭]

আরেকদল বলে—আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট দলের। তারা আইন প্রণয়ন করতে পারবে, উর্ধ্বজাগতিক কোনো আইন তারা মানবে না; যেমনটি আমরা দেখতে পাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। এই দর্শনকেও ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, ইসলাম বলে শাসনক্ষমতার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার। তিনি বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা। জগতের সামষ্টিক এবং একক কল্যাণ সম্পর্কে তিনি অবগত। এক্ষেত্রে অন্য কারও অংশীদারত্ব নেই, আর না কারও হক আছে।

আরেকদল আলিম বলেন—আইন প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার। তবে ইসলামের মূলনীতির আলোকে, মানুষ শুধু সেটা বাস্তবায়ন করতে পারে।

এটাই আসলে সত্য। এর মাধ্যমে ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম হতে পারে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন, আম্বিয়ায়ে কিরাম প্রেরণ করেছেন। ইসলামি আইনের বড়ো একটি মূলনীতি হলো কুরআনের এই আয়াত—

---

[২৮৬] সূরা গাসিয়া, আয়াত: ২১

[২৮৭] সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তোমাদের আদেশ করেন, যাতে তোমরা আমানতকে তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দাও এবং যখন মানুষের মাঝে শাসন করবে, তখন ইনসাফের সাথে শাসন করার।'[২৮৮]

আরেকটি আয়াত—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসুলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বশীলদের।'[২৮৯]

তাছাড়া কোনো মুসলিম এক্ষেত্রে মতবিরোধ করে না যে, শরিয়তের সমস্ত হুকুম-আহকাম তথা আদেশ-নিষেধের ভিত্তি ও উৎস আল্লাহ তাআলা। এক্ষেত্রে যত মূলনীতি বা নীতিমালা এবং শরিয়ত প্রণয়ন করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সাথে কোনো মানুষ শরিক নয়।

এগুলো জানার মাধ্যম আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে, যা নাজিল করেছেন কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যা ওহিরূপে পাঠিয়েছেন। মূলত এই ক্ষেত্রেই রয়েছে মানুষের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি, তার সম্মান ও কল্যাণের সুরক্ষা। এক্ষেত্রে অন্য কারও কোনো কর্তৃত্ব নেই। কিন্তু যদি বলা হয় কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট দল আইন প্রণয়নের অধিকার রাখে, তাহলে সেটা হবে আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে শিরক।

মূলত এটা এমন একটি অধিকার, যা মানুষকে নিয়ে যায় স্বেচ্ছাচারিতা, জুলুম, নির্যাতন, কঠোরতা, মানুষের স্বাধীনতা হরণের দিকে, যা তার যাবতীয় কল্যাণকে বিনষ্ট করার দিকে নিয়ে যায়।

আইন প্রণয়নের অধিকার যে একমাত্র আল্লাহ তাআলার এক্ষেত্রে অনেক 'নস' (কুরআন ও হাদিস) রয়েছে। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

'শাসন-ব্যবস্থা শুধু আল্লাহ তাআলার।'[২৯০]

إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ

'শাসন-ব্যবস্থা পুরোটাই আল্লাহ তাআলার।'[২৯১]

---

[২৮৮] সূরা নিসা, আয়াত: ৫৮

[২৮৯] সূরা নিসা, আয়াত: ৫৯

[২৯০] সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০

[২৯১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৪

তবে মানুষ আল্লাহ তাআলার ওয়াকিল বা প্রতিনিধি। নিজেদের অধীন মানুষের কাছে আল্লাহ তাআলার বিধিবিধান পৌঁছে দেওয়া, সুসাব্যস্ত করা, কার্যকর করা, প্রয়োগ করা, ইজতিহাদ তথা চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে সেগুলো উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে—কোনটা কী কী প্রমাণ করে, অথবা কোন উদ্দেশ্য নেওয়া হচ্ছে, কিংবা কোন সীমারেখা নির্ধারণ করা হচ্ছে, যার মাঝে মানুষকে চলতে হবে, তার জীবনকে পরিচালনা করতে হবে—এগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে দায়িত্বশীল।

মানুষ যে এ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি, সেটা এই আয়াত থেকে বোঝা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

'তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন—আমি জমিনেই একজন খলিফা বানাব।'[২৯২]

কুরআন যখন এত সুন্দর করে স্পষ্ট করে বলেছে যে, রাসুলগণ এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি; তাহলে এখান থেকে এটাও বোঝা যায় যে, রাসুলদের পর মানুষ হবে জমিনে তাঁর প্রতিনিধি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ

'ওই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন আমি তোমাদের নুহের কওমের পরপ্রতিনিধি বানিয়েছি।'[২৯৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

'তারপর আমি তোমাদেরকেজমিনে তাদের ওপর প্রতিনিধি বানিয়েছি, দেখার জন্য যে—তোমরা কেমন আমল করো।'[২৯৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ

'আর তিনিই ওই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের জমিনের প্রতিনিধি বানিয়েছেন।'[২৯৫]

আর প্রতিনিধির কাজ তো এটাই যে, যিনি তাকে প্রতিনিধি বানিয়েছেন তার আদেশ-নিষেধ কার্যকর করা। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

[২৯২] সূরা বাকারা, আয়াত: ৩০

[২৯৩] সূরা আরাফ, আয়াত: ৬৯

[২৯৪] সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৪

[২৯৫] সূরা আনআম, আয়াত: ১৬৫

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তোমাদের আদেশ করেন, যাতে তোমরা আমানতকে তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দাও এবং যখন মানুষের মাঝে শাসন করবে, তখন ইনসাফের সাথে শাসন করার।'[১৯৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসুলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বশীলদের।'[১৯৭]

ইসলামে আইন-কানুনের উৎস

এই শেষ আয়াতটি আইন প্রণয়নের উৎসসমূহকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে যে, উৎসসমূহ শেষ পর্যন্ত এক উৎস থেকেই আহরিত হয়। আর তা হলো, আল্লাহ প্রদত্ত কুরআন।

এই উৎসগুলো চারটি:—

এক. কুরআন কারিমে যে সকল বিধিবিধান এসেছে, আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের জন্য সেগুলো বাস্তবায়ন করা অবশ্য কর্তব্য।

দুই. সুন্নাতে নববি, যা সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যার ভিত্তি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহি। সুন্নাতে নববিতে যে সকল বিধিবিধান এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের জন্য সেগুলো কার্যকর করাও অবশ্য কর্তব্য।

তিন. সামষ্টিক ইজতিহাদ (চিন্তা ও গবেষণা) বা গবেষক সমাজের ইজমা—যারা বিশেষজ্ঞ জনগণের বিভিন্ন বিষয়ে ও কল্যাণ সম্পর্কে, তাদের দ্বীনি অথবা দুনিয়াবি প্রয়োজন উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ শাসক, প্রশাসক, উলামায়ে কিরাম, সেনাপ্রধান, রাজনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ (যেমন: ব্যবসায়ী, কারিগর, কৃষক এবং অন্যান্য শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা)।

চার. মুজতাহিদ আলিমদের একক ইজতিহাদ।

মুজতাহিদ আলিম দ্বারা উদ্দেশ্য, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাসী, শরিয়তের হুকুম-আহকামের উৎস সম্পর্কে অবগত—সেগুলোর প্রকার, সেগুলো সাব্যস্ত করার পদ্ধতি, দলিলগুলোর প্রমাণিত দিক, সেই সাথে অবগত বিভিন্ন নীতিমালা ও হুকুম-আহকাম উদঘাটনের পদ্ধতি সম্পর্কে। যাদের সাথে রয়েছে

---

[১৯৬] সূরা নিসা, আয়াত: ৫৮
[১৯৭] সূরা নিসা, আয়াত: ৫৯

বিভিন্ন উসুল। যেমন—কিয়াস, ইস্তিহসান, ইস্তিসলাহ, সমাজের প্রচলন, রীতি, বিভিন্ন মাধ্যম বা উপকরণ বন্ধ করার পদ্ধতি, সাহাবির বাণী এবং পূর্ববর্তী শরিয়তের জ্ঞান ও ইস্তিসহাব।

তৃতীয় এবং চতুর্থ উৎসটিকে 'কর্তৃত্বশীলদের আনুগত্য করো' এ কথা শামিল করে। আবু বকর জাসসাস রহ. বলেন—'কর্তৃত্বশীল' দ্বারা কী উদ্দেশ্য, এ বিষয়ে অনেকগুলো মত রয়েছে।

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ, ইবনু আব্বাস (এক বর্ণনায়), হাসান বসরি, আতা এবং মুজাহিদ; তারা বলেন—'কর্তৃত্বশীল' দ্বারা উদ্দেশ্য যারা ফকিহ এবং আলিম।

ইবনু আব্বাস (থেকে আরেকটি বর্ণনা) এবং আবু হুরাইরা রা. বলেন—তাদের দ্বারা উদ্দেশ্য জিহাদের অভিযানের আমিরগণ।

তবে এই আয়াতে দুটি মতই গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ, শব্দটি সবাইকে শামিল করে। কেননা, যারা আমির, তারা সৈন্যবাহিনী পরিচালনা, অভিযান পরিচালনা, শত্রুদের মোকাবিলা—এসব কিছুর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন; আর যারা আলিম, তারা শরিয়তের রক্ষণাবেক্ষণ, শরিয়তে কী জায়িজ হবে, কী জায়িজ হবে না—এসব বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতএব, মানুষকে আদেশ করা হয়েছে তাদের আনুগত্য করার, তাদের কথা গ্রহণ করার যতক্ষণ পর্যন্ত শাসক ও আমিররা ইনসাফের পথে থাকেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আলিমরা 'আদিল' থাকেন, সন্তোষভাজন এবং দ্বীন ও আমানতের বিষয়ে বিশ্বস্ত থাকেন।[৯৮]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম—ইসলামি আইন-কানুনের উৎস কী কী এবং যারা এই আইন-কানুন সুবিন্যস্ত বা সংকলন করবেন, তাদের জন্য কী কী শর্ত। যারা উম্মাহর পক্ষ থেকে এই আইন-কানুন সংকলন করেন, তাদের নির্বাচন ওই সকল গুণের ওপর নির্ভরশীল; যে সকল গুণের দিকে কুরআন কারিমের আয়াত ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ ইলম, মাআরিফাত, অগ্রাধিকার দানকারী আকল, আদালত (ধার্মিকতা), তাকওয়া এবং আভিজাত্য।

সালতাতুত তানফিজ (কার্যকরী মন্ত্রণালয়)

সালতাতুত তানফিজ দ্বারা আধুনিক যুগের রাজনীতির পরিভাষায় উদ্দেশ্য নেওয়া হয় শাসক, প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য কর্মজীবী।

এই মন্ত্রণালয়ের কাজ হলো—জীবন-ব্যবস্থার জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশে যে সকল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেগুলো কার্যকর করা। অতএব, এই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব হলো—নির্দেশনা বাস্তবায়িত করে দেশকে পরিচালনা করা।

[৯৮] আহকামুল কুরআন, ২/২৬৪

এই মন্ত্রণালয় নির্দিষ্ট কিছু আকৃতি বা সংখ্যার মাঝে আবদ্ধ নয় যে, এছাড়া অন্য কিছু হতে পারবে না। বরং এটা স্থান, কালভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। অর্থাৎ, দেখা যাবে কোনো দেশে কোনো সময়ে অনেক বৃদ্ধি হবে, আবার কোনো স্থানে অন্য সময়ে সেটা কমে যাবে। বাস্তবে সেটা দেশের একটি ক্ষণস্থায়ী রূপ।

***
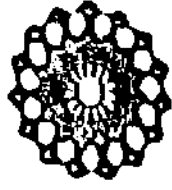
রাষ্ট্র পরিচালনা

খুলাফায়ে রাশিদার যুগে রাষ্ট্র পরিচালনা

ইমাম জুহাইলি বলেন—'খলিফা হলেন বিশাল সাম্রাজ্যের প্রধান, অনেক বড়ো বড়ো দায়িত্বের অধিকারী, যিনি উম্মাহকে নিয়ে সর্বোত্তম লক্ষ্য পানে চলতে থাকেন। সে পথে চলার জন্য সর্বোত্তম, সর্বাধিক নিরাপদ এবং সবচেয়ে সহজ পথ ও কুসুমাস্তীর্ণ পথ নির্বাচন করেন। যেহেতু তিনি একজন খলিফা, তার দায়দায়িত্ব অঢেল; তাই স্বাভাবিকভাবেই তার প্রয়োজন কিছু সাহায্যকারী ও সহযোগী, যাতে তিনি সহজেই দেশ পরিচালনা করতে পারেন।

ইমাম মাওয়ারদি রহ. বলেন—'যে সকল দায়িত্ব শাসকের কাঁধে সোপর্দ করা হয়েছে, অর্থাৎ পুরো জাতি পরিচালনা করা; সেটা তিনি একা পুরোপুরিভাবে আদায় করতে পারবেন না, যদি না অন্য কারও সাহায্য থাকে।'

রাষ্ট্র পরিচালনার সূচনা হয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে দাওয়াত প্রচারের মাধ্যমে, শত্রুদের সাথে জিহাদ করে, জিজিয়া, উশর গ্রহণ করার মাধ্যমে এবং সেগুলো মুজাহিদ, মুহাজির, আনসার ও গরিব মুসলিমদের দেওয়ার মাধ্যমে। প্রশাসকদের মাঝে রাষ্ট্রীয় কাজ বণ্টন করার মাধ্যমে, মুসলিমদের সাথে প্রতিনিধি দল এবং নারীদের সাথে বিভিন্ন মুআমালা করার মাধ্যমে, কাজি এবং মুআল্লিমদেরকে বিভিন্ন দেশে (যেমন : ইয়ামান) পাঠানোর মাধ্যমে।

আবু বকর রা. এর যুগ

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আবু বকর রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করেছেন। নবীজি যাদের প্রশাসক বানিয়েছেন, তাদের প্রশাসক হিসেবে রেখেছেন; যাদের আমির বানিয়েছেন, তাদের আমির হিসেবে রেখেছেন। আবু উবাইদা রা. অর্থনীতির বিষয়ে দেখাশোনা করতেন, উমার রা. বিচার বিষয়ে দেখভাল করতেন।

আবু বকর রা.-এর সামনে যদি কোনো সমস্যা দেখা দিত, তখন তিনি সিপাহসালার ও সমঝদারদের সাথে পরামর্শ করতেন।

তখন আরবকে তিনটি প্রদেশে ভাগ করা হয়, অথবা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—মক্কা-মদিনা, তায়েফ, সানআ।

হিজাজকে তিনটি প্রদেশে ভাগ করা হয়, ইয়ামানকে আটটি প্রদেশে ভাগ করা হয়, আর বাহরাইন ও তার আশেপাশের এলাকাগুলোকে একটি প্রদেশ বানানো হয়।

আবু বকর রা. এর এই ছোট্ট খিলাফতকালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, ইসলামের খুঁটিগুলো মজবুত করা। মুসলিমদের শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে শত্রুদের সামনে রাষ্ট্রের ভিত্তিগুলোর প্রত্যেকটা 'কোণ'কে মজবুত করা, সেই সাথে রাষ্ট্রীয় কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অবস্থাও পর্যবেক্ষণ করতেন।

যারা রাষ্ট্রীয় কাজে (যেমন: গভর্নর, প্রশাসক ইত্যাদি) নিযুক্ত হতেন, তাদেরকে 'আমিল' তথা শ্রমিক বলা হতো, তাদের ক্ষুদ্রতা বোঝানোর জন্য এই কারণে যে, গভর্নরই রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী নয়; (যাতে নিজের ক্ষুদ্রতা স্মরণে থাকে, অহংকারী হয়ে না যান)।

উমার রা.-এর যুগ

রাষ্ট্রব্যবস্থার আকৃতি উমার রা.-এর যুগে আরও স্পষ্ট হয়। কারণ, তখন ইসলামি ভূখণ্ড অনেক বৃদ্ধি পায়। তিনি যোগ্য গভর্নরদের নিযুক্ত করেন এবং তাদের খুব পর্যবেক্ষণে রাখেন। তাদের সম্পদ নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকার শর্ত যুক্ত করে দিলেন। যে সকল কাবিলা ছিল তাদের নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দিতেন এবং বিভিন্ন উপহার-উপঢৌকন দান করতেন। তিনি দিওয়ান রচনা করেন, যা বর্তমান সময়ের মন্ত্রণালয়ের সাথে অনেকটা সাদৃশ্য রাখে। অতএব, তিনিই ইসলামে প্রথম খারাজ ও অন্যান্য সম্পদের জন্য দামেশকে, বসরায়, কুফায় বিভিন্ন দিওয়ানের ব্যবস্থা করেন।

তিনি সর্বপ্রথম কাজিদের বিচার-বিশ্লেষণ করেন, হিজরি সন প্রবর্তন করেন, প্রশাসকদের তাদের প্রয়োজন ও এলাকা অনুযায়ী ভাতা দেন, মুহাজিরদের মধ্য হতে কুরাইশ বংশের যারা বড়ো বড়ো ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তাদেরকে অনুমতি ও মৃত্যু ছাড়া দেশ থেকে বের হতে নিষেধ করেন। এছাড়াও আরও বহু রাষ্ট্রীয় বিন্যাস-ব্যবস্থাপনা তিনি গঠন করেন।

উসমান রা. এর যুগ

উমার রা. যে সকল আইন প্রণয়ন করে গিয়েছিলেন, উসমান রা. সেগুলো বহাল রাখেন। উমার রা. যাদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োজিত করেছিলেন, উসমান রা. তাদের দায়িত্ব বহাল রেখেছেন।

আলি রা. এর যুগ

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আলি রা. তার পূর্ববর্তী খলিফাদের পন্থা অবলম্বন করেছেন।[২৯৯]

পরবর্তী সময়ে যখন নতুন ভূখণ্ড সংযোজন, বিভিন্ন অঞ্চলের প্রচলন এবং অন্যান্য সভ্যতার সাথে যোগাযোগব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত হলো, তখন এ-কারণে রাষ্ট্রের ভেতর ও বাহিরের অবস্থায়ও অনেক পরিবর্তন এলো। আর সেই সাথে যুগোপযোগী নতুন কিছু বিধান প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দিল—যা প্রণয়ন করা হবে শরয়ি উসুলের ভিত্তিতে।

***
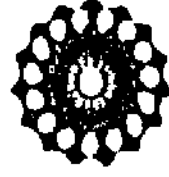
শাসন ক্ষমতার প্রকার

ইমাম মাওয়ারদি শাসন ক্ষমতাকে চার ভাগে ভাগ করেছেন—

এক. প্রথমত যাদের ক্ষমতাও ব্যাপক, কাজের পরিধিও ব্যাপক। তারা হলেন—বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যাপক মন্ত্রী। কারণ, তাদের 'নির্ধারণ হয়' সকল ক্ষেত্রেই, নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে না।

দুই. দ্বিতীয়ত, যাদের ক্ষমতা ব্যাপক, কিন্তু কাজের পরিধি নির্দিষ্ট সীমানায় আবদ্ধ। তারা হলেন বিভিন্ন প্রদেশের শাসকগণ। কারণ, তাদের কাজের পরিধি ওই সকল দেশ বা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ, তবে সেখানে তাদের কর্তৃত্ব ব্যাপক।

তিন. তৃতীয়ত, যাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, কিন্তু কাজের পরিধি ব্যাপক। তারা হলেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ মন্ত্রী। যেমন: কাজিউল কুজাত (প্রধান বিচারপতি), কোনো অভিযানের নাকিব বা আমির, সীমান্ত পাহারাদার, খারাজ উসুলকারী, সাদাকা গ্রহণকারী। কারণ, তাদের প্রত্যেকের কাজ নির্দিষ্ট।

চার. চতুর্থত, যাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, কাজের পরিধিও সীমাবদ্ধ। যেমন: নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলের কাজি, কিংবা নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলের খারাজ উসুলকারী, সেখানকার সাদাকা গ্রহণকারী, কিংবা সেই দেশের সীমান্ত পাহারাদার, অথবা সেই দেশের সৈন্যবাহিনীর প্রধান। কেননা, এগুলোর প্রত্যেকটিই সীমাবদ্ধ।

বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেকটি প্রকারের কিছু শর্ত আছে, যার মাধ্যমে এই ক্ষমতা লাভ করা যায় এবং এগুলোর সাথেই ক্ষমতা পাকাপোক্ত হয়।

প্রথম প্রকার : যাদের ক্ষমতাও ব্যাপক, কাজের পরিধিও ব্যাপক। ইমাম মাওয়ারদি মন্ত্রণালয়কে দুই ভাগে ভাগ করেছেন—

- এক. প্রথম প্রকার, তাফবিজ করার মন্ত্রণালয়।
- দুই. দ্বিতীয় প্রকার, তানফিজ করার মন্ত্রণালয়।

তাফবিজ করার (সোপর্দ করার) মন্ত্রণালয়ের পরিচয়: শাসক একজনকে মন্ত্রী নির্ধারণ করবেন, তার কাছে যাবতীয় বিষয় পরিচালনার দায়িত্ব দেবেন; তিনি

সেগুলো নিজ সিদ্ধান্তেই পরিচালনা করতে পারবেন এবং নিজের চিন্তার আলোকেই কার্যকর করতে পারবেন। আধুনিক রাজনীতির পরিভাষার এটাকে প্রধানমন্ত্রী বলা হয়। এই প্রকার মন্ত্রণালয় বৈধ। কারণ, আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন, মুসা আ. বলছেন—

وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (٢٩) هَارُونَ أَخِي (٣٠) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (٣١) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (٣٢)

'আর আমার পরিবার হতে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী (মন্ত্রী) বানিয়ে দাও। আমার ভাই হারুনকে। তার দ্বারা আমার শক্তি বৃদ্ধি করো। আমার কাজে তাকে শরিক করো।'[৩০০]

সুতরাং, এটা যদি নবুয়তের ক্ষেত্রে জায়িজ হয়, তাহলে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তো আরও আগেই জায়িজ হওয়ার কথা। তাছাড়া একজন শাসকের ওপর যে সকল দায়িত্ব বর্তায়; অর্থাৎ পুরো জাতিকে পরিচালনা করা, তিনি সেটা একা করতে পারবেন না। একজন সাহায্যকারী অবশ্যই প্রয়োজন। তাই, তার পক্ষ থেকে যদি কোনো মন্ত্রী রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নায়েব হন, তাহলে তার একা পরিচালনা করার চেয়ে এটাই উত্তম। এর মাধ্যমে তিনি নিজের ওপর শক্তি লাভ করবেন, ভুল থেকে পদস্খলন থেকে দূরে থাকবেন, ত্রুটি থেকে বিরত থাকবেন।[৩০১]

ইমাম জুহাইলি বলেন—এই পদের অধীনে থাকা মন্ত্রণালয়টি খিলাফতের পর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই মন্ত্রী খলিফা তথা শাসকের প্রত্যেকটি দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখেন। যেমন: বিচারক নির্ধারণ করা, অন্যায়-অবিচারের ক্ষেত্রে পর্যালোচনা করা, সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া, সেনাপ্রধানকে নিযুক্ত করা, যে সকল বিষয় তিনি ভালো মনে করেন, সেগুলো কার্যকর করা।

এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো—একজন শাসক যা যা করতে পারবে এই মন্ত্রীও তাই করতে পারবে, তবে তিনটি জিনিসের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। সেই তিনটি জিনিস হলো—

০১. 'ওলায়াতে আহদ' তথা প্রতিশ্রুতি দানের ক্ষমতা। (এটি একটি পরিভাষা, যার দ্বারা উদ্দেশ্য শাসক যাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তার মৃত্যুর পর সেই শাসক হবে।)

একজন শাসক যাকে ইচ্ছা তাকেই প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন, কিন্তু এই মন্ত্রীর সেটা করার অধিকার নেই।

০২. শাসক চাইলে পুরো একটি দলকে নেতৃত্ব থেকে বরখাস্ত করতে পারেন, যা এই মন্ত্রী করতে পারেন না।

---

[৩০০] সূরা ত্বহা, আয়াত: ২৯-৩২

[৩০১] আল আহকামুস সুলতানিয়া, ২৫

০৩. একজন শাসক তাকেও বরখাস্ত করার অধিকার রাখেন, যাকে স্বয়ং এই মন্ত্রী নিযুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে শাসক যাকে নির্ধারণ করেছেন, তাকে এই মন্ত্রী বরখাস্ত করতে পারেন না।

এই তিনটি ছাড়া যা কিছু আছে, সকল ক্ষেত্রে এই মন্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

এখন যদি তার মাঝে এবং শাসকের মাঝে কোনো ক্ষেত্রে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, তাহলে এক্ষেত্রে করণীয় হলো—

:: প্রথমত, মন্ত্রী কোনো বিষয় কার্যকর করে ফেলেছেন, কিন্তু শাসক সে ক্ষেত্রে বাধা দিচ্ছেন। তাহলে, এক্ষেত্রে মন্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

:: দ্বিতীয়ত, যদি মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ হক অনুযায়ী কোনো সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে হয়, তাহলে তার এই হস্তক্ষেপ ভঙ্গা করা হবে না এবং যে সকল সম্পত্তি বণ্টন করে দিয়েছেন, সেগুলোও ফিরিয়ে আনা হবে না।

:: তৃতীয়ত, তার হস্তক্ষেপ যদি কোনো ব্যাপক বিষয়ে হয়; যেমন: কোনো প্রশাসক নিযুক্ত করা, সেনাবাহিনীকে রণাঙ্গানের জন্য বের করা, যুদ্ধ পরিচালনা করা—এসব ক্ষেত্রে শাসকের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। তিনি প্রশাসককে বরখাস্ত করতে পারবেন, সেনাবাহিনীকে তাদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিতে পারবেন, সর্বোত্তম পন্থায় যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারবেন। কারণ, একজন শাসকের এই অধিকার রয়েছে যে, তিনি নিজের কাজ সংশোধন করতে পারবেন। সুতরাং, মন্ত্রীর কাজ তো আরও আগেই তিনি সংশোধন করতে পারবেন।

শাসক যদি কাউকে কোনো কাজের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হিসেবে নির্ধারণ করেন, আর ওই কাজের ক্ষেত্রেই মন্ত্রী আরেকজনকে নির্ধারণ করেন; তাহলে এক্ষেত্রে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে, যিনি আগে নির্ধারণ করেছেন।

শাসক (খলিফা) এবং প্রধানমন্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক রাখার পদ্ধতি

এক. প্রধানমন্ত্রীকে বলা হবে শাসক যে সকল বিষয় পরিচালনা ও কার্যকর করবেন সেগুলো যেন তিনি খেয়াল করেন, যাতে শাসকের (খলিফার) মতো পুরোপুরি একক ক্ষমতার অধিকারী না হয়ে যান।

দুই. শাসক সবসময় প্রধানমন্ত্রীর কাজ, বিভিন্ন বিষয় পরিচালনা পর্যবেক্ষণে রাখবেন, যাতে তিনি তার সঠিক পদক্ষেপকে স্বীকৃতি দিতে পারেন এবং ভুলকে সংশোধন করতে পারেন। কারণ, মূলত উম্মাহর পরিচালনার দায়িত্ব তার কাঁধেই অর্পিত, তার চিন্তা গবেষণার ওপর ন্যস্ত।[৩০২]

---

[৩০২] আল ফিকহুল ইসলামি, ৮/৬২২০

তাফবিজ করার মন্ত্রণালয়ের শর্তাবলি : যেহেতু এই পদের গুরুত্ব অনেক এবং অনেক ঝুঁকিপূর্ণ, তাই উলামায়ে কিরাম এক্ষেত্রে ওই শর্তগুলোই আরোপ করেছেন যেগুলো স্বয়ং শাসকের ক্ষেত্রেও শর্ত; শুধু কুরাইশ বংশের হওয়ার শর্ত ছাড়া।

ইমাম মাওয়ারদি বলেন—এই মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে খলিফার জন্য নির্ধারিত শর্তগুলোই বিবেচনা করা হবে—শুধু কুরাইশ বংশের হওয়ার শর্ত ছাড়া—কারণ, তিনি নিজের সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করবেন, নিজের চিন্তা-গবেষণা কার্যকর করবেন। তাই, তাকেও গবেষকদের চিন্তাধারায় থাকতে হবে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত আরও একটি শর্ত প্রয়োজন, তা হলো—তাকে আহলুল কিফায়ার (যোগ্য) মধ্যে গণ্য হতে হবে, যে সকল ক্ষেত্রে তাকে বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে—যেমন: যুদ্ধ পরিচালনা, খারাজ উসুল করা—এ সকল বিষয়ে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা ও বিস্তারিত জ্ঞান থাকা জরুরি। কারণ, তিনি কখনো নিজে নিজেই এগুলো পরিচালনা করবেন। আবার, কখনো নায়েবের মাধ্যমে পরিচালনা করবেন। আর তিনি তখনই যোগ্য ব্যক্তিদেরকে নায়েব বানাতে পারবেন, যখন তিনি নিজেই যোগ্য ব্যক্তি হবেন; ঠিক যেমন তিনি নিজে তখনই বিভিন্ন বিষয় পরিচালনা করতে পারবেন, যদি তার সাথে যোগ্য ব্যক্তিরা থাকে। এই শর্তারোপ করার মাঝেই রয়েছে মন্ত্রণালয়ের ভিত্তি এবং এর মাধ্যমেই রাষ্ট্রনীতি সুবিন্যস্ত থাকতে পারে।[৩০৩]

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে কুরাইশ বংশ হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয় নি। কারণ, এই শর্ত যে সকল হাদিসে উল্লেখ আছে, সেটা শুধু শাসক হওয়ার ক্ষেত্রেই উল্লেখ ছিল। কেননা, আবু বকর রা. আনসারিদের বলেছিলেন, আমরা হলাম আমির। তোমরা হলে উজির (সাহায্যকারী বা মন্ত্রী)।

প্রধানমন্ত্রী নিযুক্তকরণ

শুধুমাত্র খলিফার মাধ্যমেই প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হবে, সেখানে দুটো শর্ত উল্লেখ থাকবে।

- প্রথমত, ব্যাপক ক্ষমতা।
- দ্বিতীয়ত, নায়েব হওয়া।

কিন্তু যদি শুধু ব্যাপক ক্ষমতার কথা বলে, নায়েব হওয়ার কথা না বলে, তাহলে এর দ্বারা প্রধানমন্ত্রী হবে না। কারণ, তখন সেটা 'ওয়ালায়তে আহদ' (প্রতিশ্রুতি দান) হবে। আর যদি শুধু নায়েব হওয়ার কথা বলে, তাহলে এখানে অস্পষ্টতা চলে আসে যে—এটা কি ব্যাপক না সীমাবদ্ধ, তানফিজ না তাফবিজ। সুতরাং, কোনো একটি শর্ত উল্লেখ না করলে প্রধানমন্ত্রী নির্ধারিত হবে না। আর যদি দুটোই উল্লেখ করে, তবেই প্রধানমন্ত্রী নির্ধারিত হবে।

---

৩০৩ আল আহকামুস সুলতানিয়া

উজিরে তাফবিজের সংখ্যা

ইমাম মাওয়ারদি বলেন—খলিফার জন্য একই সাথে একাধিক উজিরে তাফবিজ রাখা বৈধ নয়। কারণ, এই উজিরের ক্ষমতা ব্যাপক। এ-জন্যই একই সাথে একাধিক শাসক বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٢٢)
>
> 'যদি আসমান-জমিনে একাধিক ইলাহ থাকত আল্লাহ ছাড়া তাহলে আসমান-জমিন ধ্বংস হয়ে যেত।'[৩০৪]

কিন্তু তিনি যদি একাধিক উজির নির্ধারণ করেনই, তাহলে তিনটি অবস্থার যেকোনো একটি হবে—

এক. একাধিক ব্যক্তিকেই ব্যাপক ক্ষমতা দান করবেন। তবে, এটা কার্যকর হবে না। এর কারণ এবং দলিল পূর্বেই পেশ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে করণীয় হলো—তাদের নির্ধারণ করার অবস্থাটি দেখতে হবে। যদি তাদের একই সময়ে নির্ধারণ করা হয়, তাহলে এই নির্ধারণ পরিত্যাজ্য হবে। আর যদি আগে-পরে হয়, তাহলে যাকে আগে নির্ধারণ করা হয়েছে, সেই নির্ধারিত হবে; আর যাকে পরে নির্ধারণ করা হয়েছে, তার নির্ধারণ প্রত্যাখাত হবে।

নির্ধারণ করা প্রত্যাখ্যাত হওয়া এবং বরখাস্ত করা, এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য হলো—যদি নির্ধারণ করা প্রত্যাখ্যাত হয়, তাহলে পূর্বে এ মন্ত্রী যে সকল বিষয় কার্যকর করেছেন, সেগুলো প্রত্যাখ্যাত হবে। আর যদি বরখাস্ত করা হয়, তাহলে এই মন্ত্রী পূর্বে যা যা করেছে, সেগূলো প্রত্যাখ্যাত হবে না।

দুই. তাদের তিনি একই সাথে নির্ধারণ করবেন, তবে কাজের ক্ষেত্রে শরিক রাখবেন। কাউকে একক ক্ষমতা দান করবেন না।

অতএব, এটা বৈধ। আর মন্ত্রণালয়টি তাদের মাঝে শরিকানা থাকবে, নির্দিষ্ট কারও দায়িত্বে থাকবে না। তারা উভয়ে মিলে যে কাজ কার্যকর করবেন, সেটাই কার্যকর হবে। কিন্তু যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করবেন, সেটা কার্যকর হবে না। বরং সেটা খলিফার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল হবে। তাদের সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে কার্যকর হবে না। তবে এই প্রকারের মন্ত্রণালয় তাফবিজ মন্ত্রণালয় থেকে দুই দিক থেকে নিম্নমানের হবে—

:: প্রথমত, তারা যে বিষয়টি কার্যকর করবেন, সেটার ওপর একমত হতে হবে।

:: দ্বিতীয়ত, তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করবেন, সেক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্ত অকার্যকর হয়ে যাবে।

---

[৩০৪] সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ২২

এখন তারা যদি বিরোধিতা করার পর একমত হয়ে যান, তাহলে এক্ষেত্রে বিশ্লেষণ রয়েছে। যদি তারা উভয়ে সঠিক বিষয়ের ওপর একমত হন সে বিষয়ে মতবিরোধিতা করার পর, তাহলে এক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। কারণ, পূর্বে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, সেটা একমত হওয়া থেকে বাধা দেয় না।

আর যদি একজন অপরজনের কথা শুধু মেনে নেন, বাকি নিজের মতের ওপর অটল থাকেন, তাহলে এক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে না। কারণ, একজন মন্ত্রী থেকে ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় না, যেটাকে তিনি সঠিক মনে করেন না।

তিন. তাদেরকে কোনো বিষয়ে শরিক রাখবেন না। প্রত্যেককে আলাদা আলাদা দায়িত্ব দেবেন।

এটা দুই ভাবে হতে পারে—হয় এমন কাজের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করবেন যেক্ষেত্রে তার ক্ষমতা ব্যাপক হবে, কাজটি সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। যেমন—কাউকে পূর্বাঞ্চলীয় দেশের দায়িত্ব দিলেন, আর কাউকে পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশের দায়িত্ব। অথবা প্রত্যেককে এমন দায়িত্ব দেবেন যেক্ষেত্রে কাজটি ব্যাপক হবে, কিন্তু ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে। যেমন—কাউকে যুদ্ধের বিষয়ে দায়িত্ব দিলেন, আর কাউকে খারাজের বিষয়ে দায়িত্ব। এ দুটো দিকই বৈধ, তবে তখন তারা আর উজিরে তাফবিজ থাকবেন না। বরং ভিন্ন ভিন্ন দুটো বিষয়ের দায়িত্বশীল থাকবেন। কারণ, 'তাফবিজের মন্ত্রণালয়' তখনই বলা হয়, যখন ক্ষমতা ব্যাপক থাকে এবং যেখানে উজিরের আদেশ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কার্যকর হয়, তার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় ।

এই দুই ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের নির্ধারণ করা, যে বিষয়ে তাকে নির্ধারণ করা হয়েছে সেক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে, কারও অন্য কাউকে বিরোধিতা করার অধিকার নেই।

তানফিজ করার (কার্যকর করা) মন্ত্রণালয় : এটা 'তাফবিজ করার মন্ত্রণালয়'-এর নিম্নস্তরের। কারণ, এই মন্ত্রী শুধু শাসকের সিদ্ধান্ত কার্যকর করবেন। তিনি শাসকের মাঝে এবং জনগণ ও প্রশাসকদের মাঝে সেতু বন্ধন। তিনি শাসকের আদেশ পৌঁছে দেবেন, তার সিদ্ধান্ত কার্যকর করবেন, তার আইন-কানুন প্রয়োগ করবেন। তিনি যাদেরকে মন্ত্রী বানিয়েছেন, কিংবা যাদেরকে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার দায়িত্ব দিয়েছেন, সে বিষয়টি তাদের জানিয়ে দেবেন, জনগণের বার্তা তার কাছে পৌঁছে দেবেন, নতুন নতুন সৃষ্ট বিষয় তাকে জানাবেন। তবে কোনো সিদ্ধান্ত বা চিন্তা করার ক্ষেত্রে তার নিজের কোনো কর্তৃত্ব নেই, তার দায়িত্ব শুধু দুটো—

- এক. তিনি খলিফার কাছে সবকিছু উপস্থাপন করবেন।
- দুই. খলিফার পক্ষ থেকে যাবতীয় নির্দেশনা জনগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিদের কাছে উপস্থাপন করবেন।

এই মন্ত্রীর জন্য স্বাধীন হওয়া বা আলিম হওয়া শর্ত নয়। কারণ, তিনি নিজে কাউকে দায়িত্ব দিতে পারেন না, কারও ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন না যে, তার জন্য স্বাধীনতা শর্ত। তদ্রূপ নিজে কোনো কিছুর ফায়সালাও করতে পারবেন না যে, তাকে আলিম হতে হবে।

তানফিজ করার মন্ত্রণালয়ের শর্ত

এ মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে সাতটি শর্তারোপ করা হয়, যা আদব-শিষ্টাচার ও অভিজ্ঞতার সাথে সম্পৃক্ত। শর্তগুলো হলো—

১। আমানতদারিতা, যাতে যে বিষয়ে তাকে বিশ্বাস করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে খিয়ানত না করে এবং ধোঁকা না দেয়।

২। সত্যবাদী হওয়া, যাতে তার কথা দ্বারা বিশ্বাস করা যায় এবং তার নিষেধ দ্বারা কাজ করা যায়।

৩। লোভ কম থাকা, যাতে নিজ দায়িত্বের বিষয়ে ঘুষ না খায়, ধোঁকাগ্রস্ত না হয়। অন্যথায় দায়িত্বের মাঝে শিথিলতা চলে আসবে।

৪। তার মাঝে এবং জনগণের মাঝে যেন কোনো প্রকার শত্রুতা বা বিদ্বেষ না থাকে। কেননা, শত্রুতা মানুষকে ইনসাফ থেকে বাধা দেয়, কোমলতা থেকে বিরত রাখে।

৫। তিনি খলিফার কাছে যে সকল বিষয় পেশ করবেন, কিংবা খলিফার পক্ষ থেকে মানুষের কাছে পেশ করবেন, সে বিষয়ে অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া। কারণ, তিনি এক্ষেত্রে তার সাক্ষী।

৬। বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা, যাতে তার কাছে কোনো বিষয় অস্পষ্ট না হয়ে যায়। ফলে কোনো আকস্মিক ঘটনায় পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যাবে। একটি আরেকটির সাথে মিলে যাবে। কেননা, বিভ্রাটের সাথে কোনো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিষয় ঠিক রাখা যায় না, ঘোলাটে হয়ে থাকা কোনো বিষয়ের সাথে কোনো কিছু দৃঢ় ও শক্তিশালী করা যায় না।

৭। প্রবৃত্তি বা খাহেশাত না থাকা। কারণ, এই প্রবৃত্তিই তাকে সত্য থেকে মিথ্যার দিকে নিয়ে যায়। এই খাহেশাতের কারণেই মিথ্যা থেকে সত্য অস্পষ্ট হয়ে যায়। এই প্রবৃত্তিই বড়ো বড়ো জ্ঞানীকেও ধোঁকা দেয়, তাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

حبك الشيء يعمي ويصم

'কোনো জিনিসের প্রতি ভালোবাসা মানুষকে অন্ধ করে দেয়, বধির করে তোলে।'

আল্লামা জুহাইলি বলেন—এই মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে অথবা তাফবিজ মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে অথবা খিলাফতের ক্ষেত্রে কোনো নারীকে গ্রহণ করা হবে না। কারণ, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'ওই জাতি কখনো সফল হতে পারবে না, যারা নিজেদের যাবতীয় বিষয় একজন নারীর কাছে সোপর্দ করেছে।'

এছাড়া এই সকল দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ রয়েছে, যার জন্য প্রয়োজন সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত, ইস্পাত দৃঢ় মনোবল, যা একজন নারীর মাঝে অনুপস্থিত।

দুই. মন্ত্রণালয়ের মাঝে পার্থক্য। এই পার্থক্য চারদিক থেকে পরিলক্ষিত হয়—

১। তাফবিজের মন্ত্রী নিজে নিজেই হুকুম প্রয়োগ করতে পারেন, অন্যায়-অবিচার প্রতিরোধ করতে পারেন। কিন্তু তানফিজের উজির সেটা করতে পারেন না।

২। তাফবিজের মন্ত্রী প্রশাসকদের নিযুক্ত করতে পারেন, তানফিজের উজির সেটা করতে পারেন না।

৩। তাফবিজের মন্ত্রী সেনাবাহিনীকে একক সিদ্ধান্তে যুদ্ধে নিয়ে যেতে পারেন, যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারেন, যা তানফিজের উজির করতে পারেন না।

৪। তাফবিজের মন্ত্রী বাইতুল মালের সম্পদের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারেন, অর্থাৎ গ্রহণ করতে পারেন এবং যেখানে যা প্রয়োজন সেগুলো করতে পারেন, যা তানফিজের উজির করতে পারেন না।

এই চারটি পার্থক্য থাকার কারণে শর্তগুলোর ভেতরে আরও চারটি পার্থক্য দেখা গিয়েছে—

১। 'তাফবিজ করার মন্ত্রণালয়'-এর ক্ষেত্রে স্বাধীন হওয়া ধর্তব্য, 'তানফিজ করার মন্ত্রণালয়'-এর ক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়।

২। তাফবিজ করার মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্তব্য, তানফিজ করার মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়।

৩। তাফবিজ করার মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে শরিয়তের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান থাকা শর্ত, তানফিজ করার মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে শর্ত নয়।

৪। তাফবিজ করার মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে যুদ্ধ ও খারাজ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা শর্ত, তানফিজ করার মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে শর্ত নয়।

অতএব, এখানে চারদিক থেকে শর্তগুলোতে পার্থক্য দেখা গিয়েছে যেমন অধিকারের ক্ষেত্রে চারদিক থেকে পার্থক্য দেখা গেছে।

এছাড়া অন্য যে সকল অধিকার বা শর্ত রয়েছে সেক্ষেত্রে দুই মন্ত্রণালয়ই সমান।

যাদের ক্ষমতা ব্যাপক, কিন্তু কাজের পরিধি সীমাবদ্ধ

রাষ্ট্রের সীমানা যখন অনেক বৃদ্ধি পায়, তখন রাষ্ট্রকে বিভিন্ন বড়ো বড়ো ভাগে

ভাগ করা হয়, বিভিন্ন অঞ্চল হিসেবে পার্থক্য করা হয়। আর প্রত্যেক অঞ্চলের শাসককে আমির বলা হয়, যার ক্ষমতা ব্যাপক কিন্তু কাজের পরিধি সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, ওই দেশের সকল জিনিসের সাথেই তার কর্তৃত্ব সম্পৃক্ত; নিরাপত্তাব্যবস্থা হোক, প্রতিরক্ষাব্যবস্থা হোক বা বিচার ব্যবস্থা হোক, কিংবা অর্থনৈতিক-ব্যবস্থা হোক—সকল ক্ষেত্রেই। কিন্তু তার কর্তৃত্বের পরিধি শুধু ওই দেশের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। যেমন—উমার রা. এর যুগে ইসলামি রাষ্ট্রের পরিধি অনেক বৃদ্ধি পায়, তখন ইসলামি রাষ্ট্রকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। অর্থাৎ, শামের দেশগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, পারস্যের দেশগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, আফ্রিকার দেশগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। আর এই প্রত্যেকটি অঞ্চলে একজন প্রশাসক থাকেন, যিনি নামাজ পড়াতেন, বিচার করতেন, যুদ্ধে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন, বাইতুল মালের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

ইসলামি রাষ্ট্রের পরিধি আরও অনেক বৃদ্ধি পায়। যার ফলে পাঁচটি বড়ো বড়ো ভাগে ভাগ করা হয়। অর্থাৎ, হিজাজ, ইয়ামান ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, মিসর (অর্থাৎ নিম্নভূমি এবং উচ্চভূমি), দুই ইরাক অর্থাৎ আরব (বাইবেল ও প্রাচীন আশুর শহর), আজম (পারসিক দেশ), জাজিরাতুল আরব, সাথে ছিল আরমানিয়া, আজারবাইজান, উত্তর আফ্রিকা, আন্দালুস এবং কিছু দ্বীপ।

যুগ যুগ ধরে আরবরা তাদের বিজয়ী দেশগুলোতেও এই ধারা অব্যাহত রেখেছে, তবে প্রয়োজনের কারণে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে।

অবশ্য ইসলামি রাষ্ট্র ও তার পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা খণ্ডিত হয়ে যায়, দিওয়ানের (রাষ্ট্রীয় ফাইল) সংখ্যা অনেক হয়ে যায়, বিশেষ করে আব্বাসিদের যুগে—যারা বিচার ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে পারসিকদের দ্বারা খুব প্রভাবিত হয়।[৩০৫]

কোনো অঞ্চলের আমিরের নেতৃত্বকে নির্দিষ্ট কোনো বিভাগে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে। যেমন: সেনাবাহিনী পরিচালনা। আল্লামা জুহাইলি বলেন—ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, ইসলামের সূচনাতে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা অনেক ব্যাপক ছিল। তারপর রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তৃত এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা সীমাবদ্ধ থাকার কারণে ধীরে ধীরে খণ্ডিত এবং সীমাবদ্ধ হতে থাকে। যেমন—আমর ইবনুল আস প্রথমে মিসরের ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তারপর উমার রা. আরেকজনকে খারাজ উসুল করার জন্য নির্ধারণ করেন, যিনি ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু সারাহ। তারপর বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে কাজি হিসেবে নির্ধারণ করা হয় কাব ইবনু সুরকে। এভাবে

সেনাবাহিনী পরিচালনা এবং নামাজ পড়ানোর ক্ষেত্রে অঞ্চলের শাসকের কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

আল্লামা মাওয়ারদি অঞ্চলের প্রশাসকের নেতৃত্বকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন—

- ০১. ব্যাপক, এবং
- ০২. সীমাবদ্ধ।

আবার, ব্যাপককে দুই ভাগে ভাগ করেছেন—

- ০১. ইমারতে ইসতিকফা,
- ০২. ইমারতে ইসতিলা।

তিনি বলেন—খলিফা যখন কাউকে কোনো ভূখণ্ডের বা কোনো অঞ্চলের শাসক নির্ধারণ করবেন, তখন তার নেতৃত্ব দুইভাবে হতে পারে—

- ০১. ব্যাপক, এবং
- ০২. সীমাবদ্ধ।

আর ব্যাপক দুইভাবে হতে পারে—

০১. ইমারতে ইসতিকফা, যা স্বেচ্ছায় এবং

০২. ইমারতে ইসতিলা, যা অনিচ্ছায় অর্জিত হয়।

০১. ইমারতে ইসতিকফা : আল্লামা জুহাইলি বলেন—ইমারতে ইসতিকফা হলো এমন নেতৃত্ব, যা শাসক কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় এবং সন্তুষ্টির সাথে দিয়ে থাকেন। যেমন: খলিফা কাউকে কোনো দেশের বা অঞ্চলের অধিবাসীদের শাসক বানাবেন, খলিফার যাবতীয় কাজ তাকে দেবেন। ফলে তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হলেও (যেহেতু তার ক্ষমতা শুধু ওই দেশের জনগণের ওপর) তিনি ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী (কারণ, তার ক্ষমতা ওই দেশের যাবতীয় সমস্ত বিষয়াদির ওপর)।

মোটকথা, খলিফার ওপর সে অঞ্চলের যে সকল দায়দায়িত্ব ছিল সেগুলো তার ওপর ন্যস্ত করবেন। প্রশাসক নির্ধারণের এই ধারাটি মিসর, ইয়ামান, শাম, ইরাক—এ সকল দেশের অঞ্চলের প্রশাসক নির্ধারণের মাধ্যমে খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগ থেকে উমাইয়া খিলাফত পর্যন্ত এবং আব্বাসিদের স্বর্ণযুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

তারপর হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শুরু হয়ে যায় ইমারতে ইসতিলা (আধিপত্য বিস্তার করে নেতৃত্ব গ্রহণ)। তখন পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোতে ছোটো ছোটো রাজ্য প্রকাশ পেতে শুরু করে। যেমন—পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোতে বুওইহিয়্যা, সামানিয়্যা, গজনি বংশ, সেলজুক সাম্রাজ্য। পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশগুলোতে তুলুনিয়্যা, ইখশিদিয়্যা এবং আগলাবিয়্যা বংশ। এই প্রশাসকদের দায়িত্বে যে সকল

কাজ ছিল, সেগুলো ছিল সাতটি—

১। বাহিনীদের পরিচালনা করা। তাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সুবিন্যস্ত করে রাখা। তাদের ভাতা নির্ধারণ করে দেওয়া। কিন্তু যদি খলিফা নিজে নির্ধারণ করে দেন, তাহলে সেভাবেই দেওয়া হবে।

২। হুকুম-আহকাম পর্যালোচনা করা। কাজি ও বিচারকদের নিয়োগ দেওয়া।

৩। খারাজ উসুল করা, সাদাকা গ্রহণ করা এবং সেজন্য কর্মী নিয়োগ দেওয়া। সকল সম্পদ হকদারদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

৪। দ্বীন রক্ষা করা, নিষিদ্ধ বিষয় থেকে হিফাজতে রাখা, দ্বীনকে পরিবর্তন কিংবা বিকৃতি থেকে রক্ষা করা।

৫। আল্লাহ তাআলার হক এবং বান্দাদের হকের ক্ষেত্রে হদ কায়েম করা।

৬। নিজে কিংবা নায়েবের মাধ্যমে জুমুআর নামাজ এবং অন্যান্য নামাজ পড়ানোর ব্যবস্থা করা।

৭। ফরজ হজ আদায়ের সহজ ব্যবস্থা করা।

শত্রুর পার্শ্ববর্তী দেশের প্রশাসকের ওপর অষ্টম আরেকটি কর্তব্য রয়েছে। আর তা হলো—শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, শরিয়তের আহকাম অনুযায়ী গনিমত বন্টন করা।

এই প্রকারের নেতৃত্বের জন্য ওই শর্তগুলোই ধর্তব্য, যেগুলো তাফবিজের মন্ত্রণালয়ে আলোচিত হয়েছে। কারণ, এ দুয়ের মাঝে খুবই সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থাৎ, অঞ্চলের পার্থক্য। উজিরে তাফবিজ এর ক্ষমতা রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি স্থানেই। কিন্তু অঞ্চলভিত্তিক প্রশাসকের ক্ষমতা শুধু তার অঞ্চলেই। এজন্যই উজিরে তাফবিজ প্রশাসকদের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। বরং তিনি চাইলে ওই প্রশাসকদের বরখাস্তও করতে পারবেন, যদি তিনিই তাদের নির্ধারণ করে থাকেন। আর যদি খলিফা তাদের নির্ধারণ করেন কিংবা খলিফার নির্দেশে তাদের নির্ধারণ করা হয়, তাহলে বরখাস্ত করার বিষয়ে খলিফার একমত হওয়া জরুরি।

অঞ্চলভিত্তিক প্রশাসক যদি চান তাহলে নিজের জন্য একজন 'উজিরে তানফিজ' বাস্তবায়নকারী মন্ত্রী রাখতে পারেন, খলিফার অনুমোদিত হোক বা না হোক, তবে তিনি খলিফার অনুমতি ছাড়া 'উজিরে তাফবিজ' রাখতে পারবেন না। কারণ, 'উজিরে তানফিজ' সাহায্যকারী আর উজিরে তাফবিজ' একক ক্ষমতার অধিকারী।

ইমারতের ইসতিলা (আধিপত্য বিস্তার করে নেতৃত্ব অর্জন)

ইমারতের ইসতিলা দ্বারা উদ্দেশ্য বাধ্য হয়ে কাউকে নেতৃত্ব দেওয়া। অর্থাৎ, কেউ রাষ্ট্রের কোনো অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করল। যেমন: আব্বাসিদের দ্বিতীয় যুগে

হয়েছিল—যাকে আসলে দুওয়াইলাত (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য) বলা হয়। সে সময় খলিফা বাধ্য হয়ে তার নেতৃত্ব স্বীকার করে নেন, ওই অঞ্চলের যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করার দায়িত্ব তাকে দেন, তবে বিধিবিধানের ক্ষেত্রে খলিফাকে অনুসরণ করতে হবে।

সুতরাং, প্রাধান্য বিস্তারকারী শাসক—যেমন মাওয়ারদি বলেন—যদিও জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু দ্বীনি বিধিবিধানের ক্ষেত্রে তাকে খলিফার অনুসরণ করতে হবে, যাতে তার নেতৃত্ব সহিহ, শুদ্ধ হয় এবং অবৈধ অবস্থা থেকে বৈধ অবস্থায় শাসনকার্য পরিচালনা করা যায়।

এটা মূলত প্রয়োজনের কারণে দুনিয়াবি ক্ষেত্রে তার নেতৃত্ব মেনে নেওয়া হচ্ছে। তাই বলে দ্বীনি বিষয়ের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা করা হবে এমনটা বৈধ নয়। ইমাম মাওয়ারদি একটু আগে উল্লেখ করা বাক্যের পর বলেন—এটা যদিও শর্ত শারায়েত, হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে প্রচলিত সাধারণ নিয়োগ করা থেকে ভিন্ন; তবে এক্ষেত্রে শরয়ি আইন-কানুন, দ্বীনি বিধিবিধান রক্ষা করতে হবে; সেগুলো এলেমেলো, অচল করে ফেলে রাখা যাবে না।

মোটকথা, রাষ্ট্র খণ্ডিত হয়ে যাওয়া, নতুন শাসন-ব্যবস্থা শুরু হওয়া দ্বারা ফুকাহায়ে কিরাম চেয়েছেন নতুন শাসন-ব্যবস্থা যেন মূল কেন্দ্রের সাথে জুড়ে থাকে এবং ওই অঞ্চলের বাসিন্দারা যেন অনুভব করে যে, তারা শরয়ি শাসন-ব্যবস্থার ছায়ায় আছেন।

ফলে সবার মাঝে সকল ক্ষেত্রে ঐক্যের চেতনা থাকবে, সাহায্য করার মানসিকতা থাকবে। এ শাসন-ব্যবস্থার স্বীকারোক্তির জন্য সাতটি শর্ত জরুরি, যার অধিকাংশ প্রাধান্য বিস্তারকারী শাসকের জন্য আবশ্যক। আর কিছু খলিফার জন্য লাজিম। সেগুলো হলো—

১। খিলাফতের আলোকে খলিফার পদ রক্ষা করা, যাবতীয় ধর্মীয় বিষয় পরিচালনা করা, যাতে শরিয়তের বিধিবিধান, হদ, কিসাস এবং এ জাতীয় সমস্ত হুকুম-আহকাম রক্ষা করা যায়।

২। দ্বীন ইসলামের আনুগত্য করা, যার মাধ্যমে হঠকারিতা ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার চিন্তা-চেতনা দূর হয়ে যাবে।

৩। সাহায্য-সহযোগিতার ওপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া, যাতে কুফফারদের শক্তির ওপর মুসলিমদের শক্তি দৃঢ় ও মজবুত হয়।

৪। বৈধ পন্থায় দ্বীনি বিষয় পরিচালনা করা এবং বিধিবিধান, বিচার-ফায়সালা কার্যকর হওয়া।

৫। শরয়ি সম্পদ বৈধ পন্থায় এমনভাবে উসুল করা, যাতে সেগুলো আদায়কারীদের হক মুক্ত হয়ে যায়।

৬। হকদারদের জন্য তা গ্রহণ করা হালাল হয়ে যায়। হদ, কিসাস প্রয়োগ করা এবং সেটা হদের সাজা যোগ্য ব্যক্তির ওপরই হয়।

৭। শাসককে দ্বীন হিফাজতের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বিষয় থেকে পরহেজ করা। তার আনুগত্য করা হলে আদেশ করবে, অবাধ্যতা করলে আনুগত্যের দিকে মানুষকে ডাকবে।

এই হচ্ছে খলিফার পক্ষ থেকে স্বীকারোক্তির জন্য কিছু শর্ত, যার মাধ্যমে ইমারত বা নেতৃত্ব রক্ষা পাবে।

ইমারতে ইসতিলা ও ইমারতে ইসতিকফা—এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য

এখানে চারটি পার্থক্য রয়েছে—

০১. ইমারতে ইসতিলা সংঘটিত হয় খলিফা ও শাসকের মাঝে চুক্তি ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে এবং তা স্বেচ্ছায় হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ইমারতে ইসতিকফা সংঘটিত হয় বাধ্যবাধকতার সাথে।

০২. ইমারতে ইসতিলা ওই দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যেগুলোর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করা হয়েছে। আর ইমারতে ইসতিকফা সকল দেশের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, যেগুলোর দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছে।

০৩. ইমারতে ইসতিলা সাধারণ-অসাধারণ যাবতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রেই সাব্যস্ত হয়। আর ইমারতে ইসতিকফা শুধুই খলিফার নির্দিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে।

০৪. প্রাধান্য বিস্তারকারী শাসকের জন্য উজিরে তাফবিজ, উজিরে তানফিজ উভয়কেই নিযুক্ত করা বৈধ। পক্ষান্তরে খলিফার পক্ষ থেকে নিযুক্ত শাসকের জন্য খলিফার অনুমতি ছাড়া উজিরে তাফবিজ নিযুক্ত করা বৈধ নয়, তবে উজিরে তানফিজ নিযুক্ত করতে পারেন।

ব্যাপক নেতৃত্ব

ব্যাপক নেতৃত্ব দ্বারা উদ্দেশ্য যেখানে শাসকের নির্দিষ্ট কয়েকটি দায়িত্ব থাকবে। ওই দায়িত্বকে নিরাপত্তাব্যবস্থা ও প্রতিরোধব্যবস্থার মাঝে সীমাবদ্ধ করে ইমাম মাওয়ারদি বলেন—সীমাবদ্ধ নেতৃত্বের অর্থ হলো, শাসকের নেতৃত্বে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় থাকবে। যেমন: মুজাহিদ বাহিনী পরিচালনা করা, জনগণের নেতৃত্ব দেওয়া, লঙ্ঘনীয় ও লাঞ্ছনাকর বিষয় থেকে দেশকে রক্ষা ও প্রতিহত করা। এছাড়া তিনি অন্যান্য বিষয়; যেমন: বিচারব্যবস্থা, হুকুম-আহকাম, খারাজ ও সাদাকা উসুল করা—এসবের ক্ষেত্রে তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

যাদের ক্ষমতা সীমাবন্ধ, কিন্তু কাজের পরিধি বিস্তৃত

আধুনিক রাজনীতির পরিভাষায় তাদেরকে মন্ত্রী বলা হয়, যাদের ক্ষমতা ব্যাপক কিন্তু কর্মক্ষেত্র সীমাবন্ধ। যেমন: প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ইত্যাদি। এ সমস্ত মন্ত্রণালয় রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কারণ, মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রের মূল। তবে এগুলোর মধ্যে তিনটি মন্ত্রণালয় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ—

- ০১. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
- ০২. অর্থ মন্ত্রণালয়
- ০৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয়

এই তিনটি মন্ত্রণালয় সম্পর্কে আমরা আলাদা আলাদাভাবে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব ইন শা আল্লাহ।

***
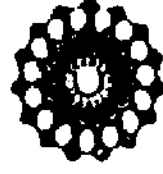
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

এটা দ্বারা উদ্দেশ্য—সেনাবাহিনী পরিচালনা করা, তাদের প্রশিক্ষণের ওপর রাখা।

সেনাবাহিনী পরিচালনা করা

সেনাবাহিনীর কাজ হলো জিহাদ করা। যতক্ষণ পর্যন্ত সেনাবাহিনী তাদের এই মহান কাজে নিয়োজিত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ বলে বিবেচিত হবে। কারণ, তারা মুসলিমদের ইজ্জত-আব্রু, ধনসম্পদ, তাদের দ্বীনি প্রতীক মসজিদ-মাদ্রাসা রক্ষা করেন। সেনাবাহিনী পরিচালনা ও গঠন করা রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি। কারণ, এই সেনাবাহিনীর মাধ্যমেই খলিফা বিজয় অর্জন করেন। তাই, যদি সেনাবাহিনী শক্তিশালী হয়ে ওঠে, যোগ্য হয়ে ওঠে, তাহলে এটা খলিফার নিজেরই শক্তি। আর যদি তারা বিনষ্ট ও অকর্মণ্য হয়ে যায়, তাহলে তার নিজেরই ক্ষতি। কারণ খুবই সম্ভব যে, তিনি তাদের থেকে ভালো কিছু পাবেন না।

সেনাবাহিনীকে প্রথমে ইসলামি শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে গঠন করা হবে। কারণ, এর মাধ্যমে প্রকৃত শক্তি অর্জিত হয়। তারপর যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে গঠন করা হবে।

রবিআ ইবনু ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত, আবু দারদা রা. বলেন—'হে লোকসকল, অভিযানে যাওয়ার আগে নেক আমল করতে হবে। কারণ, তোমরা তো লড়াই করবে কেবল তোমাদের নেক আমলের মাধ্যমেই।'[৩০৬]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

> وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
>
> 'আর তোমরা তাদের জন্য অস্ত্রশক্তি এবং অশ্বিনী দিয়ে যতটুকু পারো প্রস্তুতি গ্রহণ করো, যার মাধ্যমে তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে এবং তাদের ছাড়া অন্যদেরকে, যাদেরকে

তোমরা জানো না, কিন্তু আল্লাহ তাদের জানেন। তোমরা আল্লাহর পথে যা খরচ করো, তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের দেওয়া হবে, আর তোমাদের সাথে কক্ষনো জুলুম করা হবে না।'[৩০৭]

ইমাম রাজি রহ. বলেন—'এই আয়াত প্রমাণ করে যে, তির-অস্ত্র, ঘোড়দৌড় এবং নিক্ষেপের মাধ্যমে জিহাদের প্রস্তুতি নেওয়া ফরজ। তবে সেটা ফরজে কিফায়া।'[৩০৮]

আল্লাহ তাআলা যে বলেছেন—'তোমরা তাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো' এর মধ্যে যুগোপযোগী সব ধরনের অস্ত্র উদ্দেশ্য। আরও উদ্দেশ্য সেনাবাহিনীকে সর্বোচ্চ মানের প্রশিক্ষণ দেওয়া। কারণ, সেনাবাহিনীই জাতির ঢাল এবং দুর্বোধ্য প্রাচীর। অবশ্য প্রস্তুতি গ্রহণ হবে সাধ্য অনুযায়ী। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন—'তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করো সাধ্য অনুযায়ী।'

সেনাবাহিনী গঠন করার শর্তাবলি

আল্লামা মাওয়ারদি বলেন—সেনাবাহিনীকে যেভাবে গঠন করলে (খলিফা ও আমিরের সামনে) তাদের আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য অটুট থাকবে, তাদের বিজয় নিশ্চিত হবে, সেইভাবে গঠন করাটা তখনই সম্ভব, যদি তাদের মধ্যে চারটি শর্ত পাওয়া যায়। যদি সেনাবাহিনী সেই শর্তগুলো পূরণ করে, তাহলে তারা যোগ্য হবে এবং অবিচল থাকতে পারবে। আর যদি সেগুলোর ক্ষেত্রে ত্রুটি করে, তাহলে নিজেরাও বিনষ্ট হবে এবং রাজ্যের জন্য তারা বিপদজনকও হয়ে দাঁড়াবে।

প্রথম শর্ত: তাদের শিষ্টাচার শেখানোর মাধ্যমে বাহিনী গঠন করা, যা তাদের সাহায্য-সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে, তাদের শক্তি বৃদ্ধি করবে, যাতে তিনি তাদের যোগ্য করে তুলতে পারেন নিজেদের জন্য, তারপর খলিফার জন্য, তারপর জনগণের জন্য। নিজেদের জন্য যোগ্য করে তোলার তিনটি পদ্ধতি—

এক. প্রথমত সেনাবাহিনীর যে সকল সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, সেগুলো তাদের দেওয়া। যেমন: গাড়ি চালানোর জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া, যুদ্ধের জন্য অভিজ্ঞতা তৈরি করানো। কারণ, এই দুটো জিনিস জ্ঞান ও কর্ম উভয়টি সমৃদ্ধ করবে।

দুই. দ্বিতীয়ত, তাদের শুধু সেনাবাহিনীর মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখবে। অন্য কোনো কাজে যেন জড়াতে না পারে, অন্যথায় মূল জায়গাতেই ত্রুটি সৃষ্টি হবে।

তিন. তৃতীয়ত, ভারসাম্য রক্ষা করবে। অর্থাৎ আনন্দ উপভোগ করতে দেওয়া, তবে অতিরিক্ত করবে না, তাহলে সেদিকেই ঝুঁকে পড়বে। আবার বাধাও দেবে না, তাহলে তাদের উত্তেজিত করে ফেলবে।

---

[৩০৭] সূরা আনফাল, আয়াত: ৬০

[৩০৮] আত তাফসিরুল কাবির, ১৫/৪৯৯

শাসকের জন্য সেনাবাহিনীকে উত্তম করে গড়ে তোলার তিনটি পদ্ধতি—

এক. প্রথমত, তার মুহাব্বাত যেন তাদের অন্তরে বসে যায়। ফলে তারা হিতাকাঙ্ক্ষী হবে।

দুই. দ্বিতীয়ত, তাদের অন্তরে যেন তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়। ফলে তারা তার আনুগত্য করবে।

তিন. তারা যেন এই বিশ্বাস লালন করতে পারে যে—দেশের কল্যাণ তো নিজেদের কল্যাণ, দেশের অকল্যাণ তো নিজেদের অকল্যাণ।

জনগণের জন্য সেনাবাহিনীকে উত্তম করে গড়ে তোলার তিনটি পদ্ধতি—

এক. প্রথমত, প্রত্যেকে চেষ্টা করবে, যাতে নিজের দ্বারা জনগণের ক্ষতি না হয়।

দুই. দ্বিতীয়ত, জনগণের কোনো ক্ষতি হলে সেটা প্রতিরোধ করা।

তিন. তৃতীয়ত, জনগণের উপকারে সহযোগী হওয়া।

অতএব, এভাবে যদি শাসক সেনাবাহিনীকে গড়ে তুলতে পারেন, আর তারাও এই আদর্শকে ধরে রাখতে পারে, তাহলে তারা হবে একজন শ্রেষ্ঠ খলিফার শ্রেষ্ঠ বাহিনী।[৩০১]

দ্বিতীয় শর্ত : তাদেরকে কয়েকটি শ্রেণিবিন্যাসে ভাগ করতে হবে—

এক. প্রথমত, যুদ্ধে পরিশ্রম করা;

দুই. দ্বিতীয়ত, খলিফার পক্ষে লড়াই করা;

তিন. তৃতীয়ত, দ্রুত আনুগত্যের পথে লাভবান হওয়া।

এই শ্রেণিবিন্যাস করা হবে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে—তাদের মাঝে কাদের কাজগুলো প্রশংসনীয়, কারা হিতাকাঙ্ক্ষী, কারা খলিফার আদেশ মেনে চলে আর কারা তার বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করে।

অতএব, এভাবে শ্রেণিবিন্যাসে ভাগ করলে তিনটি গুণ অর্জিত হবে, যার মাধ্যমে তাদের খারাপ কাজগুলো সংশোধন হয়ে যাবে, তারা তাদের গঠনগত উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে। তিনটি গুণ হলো—

এক. প্রথমত, তাদের মধ্যে যারা উত্তম, তারা আরও বেশি উত্তম কাজ করবে, উপদেশ শুনবে, যাতে পদোন্নতি হয়, বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। পদোন্নতি হবে, মানে বেতনও বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

দুই. দ্বিতীয়ত, যারা নিজেদের দায়িত্ব ভালোভাবে আঞ্জাম দেয় না, অথবা খারাপ কাজ করে বেড়ায়, তারা যখন দেখবে ভালোদের পদোন্নতি হচ্ছে, বেতন বৃদ্ধি

[৩০১] তাসহিলুন নাজর : ১৭১

গাছে, তখন তাদের দেখে সে উৎসাহিত হবে, দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবে।

তিন. তৃতীয়ত, যে অযোগ্য, সে এমন পদ চাওয়া থেকে বিরত থাকবে—যা তার জন্য সাজে না। সে এমন পদ থেকে পিছিয়ে থাকবে—যার উপযুক্ত সে নয়; বরং তার মনোবল যদি ছোটো হয়, তাহলে সে নিস্তেজতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। যদি তার প্রেরণা দুর্বল হয়, তাহলে সে ত্রুটি নিয়েই তুষ্ট থাকবে। পরবর্তী সময়ে যদি কোনো চেতনা তাকে জাগ্রত করতে চায়, যদি সে এর চেয়ে বেশি কিছু না চায়, তারপরও হয়তো সে আগ্রহী হবে না।[৩১০]

সুতরাং, খলিফার কর্তব্য হচ্ছে—প্রত্যেককে তার যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী কদর করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

'নিঃসন্দেহে, আল্লাহ তোমাদের আদেশ করছেন, যাতে তোমরা হকদারদের কাছে তার আমানত পৌঁছে দাও।'[৩১১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

'যখন আমানত নষ্ট করে ফেলা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো। একলোক বলে উঠল—আমানত কীভাবে নষ্ট করা হয়? নবীজি বললেন—যখন কোনো দায়িত্ব অযোগ্যকে দেওয়া হয়, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো।'

তৃতীয় শর্ত: তাদের যথেষ্ট পরিমাণ বেতন দেওয়া, যাতে তাদের আর কোনো প্রয়োজন দেখা না দেয়। কারণ, এই প্রয়োজন তাদের তিনটি কাজ করতে প্ররোচিত করবে, যার কোনোটিই কল্যাণকর নয়—

- ০১. হয় তারা জনগণের সম্পদে হস্তক্ষেপ করবে,
- ০২. অথবা এমন কোনো খলিফার খোঁজে থাকবে, যার কাছে তারা যথেষ্ট পরিমাণ বেতন পাবে।
- ০৩. কিংবা তারা অন্য কোনো কাজে লেগে যাবে। ফলে মূল কাজেই ভাটা পড়বে। আর যখন তাদেরকে যুদ্ধে ডাকা হবে, তখন তারা নিজেদেরকে কষ্টে ফেলতে রাজি হবে না, যদি না খলিফা তাদের প্রয়োজন পূরণ করে দেন।

---

[৩১০] তাসহিলুন নাজর

[৩১১] সূরা নিসা, আয়াত: ৫৮

কেউ কেউ বলেন—'যে তোমার দান-অনুগ্রহে বিশ্বাসী হয়, সে তোমার ক্ষমতার প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। তবে অতিরিক্ত দেওয়ার চেয়ে প্রয়োজন পরিমাণ দেওয়াই ভালো। কারণ, অতিরিক্ত দেওয়া হলে হয় তারা নষ্ট করবে, ফলে অপচয় করা হবে; কিংবা সম্পদ বেশি থাকার কারণে দায়িত্বে অবহেলা করবে।'[৩১২]

চতুর্থ শর্ত: খলিফা সবসময় সেনাবাহিনীকে পর্যবেক্ষণে রাখবেন, তাদের সম্পর্কে বেখবর থাকবেন না। তাদের খবরাখবর যেন গোপন না থাকে, তাদের অবস্থা যেন তার কাছে অজানা না থাকে। কারণ, তারাই রাষ্ট্রের পাহারাদার, জনগণের প্রতিরক্ষাকারী। এখন খলিফার যদি তাদের মন্দ গুণ জানা না থাকে, ভালো গুণ গোপন থাকে; তাহলে মন্দ গুণগুলোই ধীরে ধীরে সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়বে। কারণ, ভালোর চেয়ে মন্দের প্রভাবই বেশি। মোটকথা, তারা নিজেরাও খারাপ থাকবে, অন্যদেরকেও খারাপ বানাবে।

ইসলামি সেনাপ্রধানের বৈশিষ্ট্য

ইসলামি সালতানাতের সেনাপ্রধানকে যেকোনো মূল্যেই উত্তম গুণাবলি অর্জন করতে হবে, ইসলামি আখলাক দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করতে হবে। কারণ, সেনাবাহিনীই হলো রাষ্ট্রের শক্তিশালী বুনিয়াদ, ইলায়ে কালিমাতুল্লাহর (আল্লাহ তাআলার দ্বীন বুলন্দ করা) মূল ভিত্তি। সুতরাং, সেনাপ্রধানকে অবশ্যই সামনে উল্লিখিত গুণাবলি ধারণ করতে হবে—

০১. প্রয়োজনীয় পরিমাণ শরয়ি হুকুম-আহকামের ইলম থাকা;

মানুষকে সংশোধন করার বড়ো একটি মাধ্যম হলো ইলম। কারণ, ইলমের মাধ্যমেই হালাল-হারাম, ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য করা সম্ভব। উমার রা.-ও প্রশাসক নির্বাচনে ইলমের বিবেচনা করতেন, বিশেষ করে মুজাহিদ বাহিনীর আমিরদের ক্ষেত্রে। ইমাম তাবারি রহ. বলেন—

> إن أمير المؤمنين كان إذا اجتمع إليه جيش من أهل الإيمان أمّر عليهم رجلا من أهل الفقه والعلم
>
> 'আমিরুল মুমিনিন উমার রা.-এর কাছে যখন কোনো মুজাহিদবাহিনী আসত, তখন তিনি তাদের জন্য একজন আলিম, ফকিহকে আমির হিসাবে নিযুক্ত করতেন।'[৩১৩]

০২. তাকওয়া অবলম্বন, নেক কাজ করা এবং মন্দ কাজ পরিহার করা। খুলাফায়ে রাশিদিন তাদের প্রশাসকদের তাকওয়ার আদেশ করতেন। কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আবু বকর রা. আমর এবং ওয়ালিদ ইবনু

[৩১২] তাসহিলুন নাজর

[৩১৩] সাল্লাবি, তারিখুল খুলাফা, ২/৪০১

আকাবাকে সাদাকা উসুল করার কাজে পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি তাদের কাছে চিঠি লিখে প্রত্যেককে আলাদাভাবে আদেশ করে বলেন—

'প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করে চলো। কারণ, যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য উপায় বের করে দেন, তাকে এমন জায়গা থেকে রিজিক প্রদান করেন—যা সে কল্পনাও করতে পারে না। আর যে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ মোচন করে দেবেন। তাকে বিরাট প্রতিদান দেবেন। কারণ, মানুষ একে অপরকে যে বিষয়ের আদেশ করে, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে তাকওয়ার আদেশ করা।

তুমি আল্লাহর রাস্তায় আছ, যে বিষয়র ওপর দ্বীনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, ইসলাম হিফাজত থাকবে; সেক্ষেত্রে যেন সামান্য তোষামোদ, শিথিলতা বা গাফিলতি না হয়। অতএব, দায়িত্বে শিথিলতা করো না, অবহেলা করো না।'[৩১৪]

নাফি রহ. থেকে বর্ণিত আছে, উমার রা. তার প্রশাসকদের কাছে চিঠি লিখে বলেন—

> إن أهم أموركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لسواها اضيع
>
> 'আমার নিকট তোমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নামাজ। যে নামাজ হিফাজতে রাখবে, নিয়মিত আদায় করবে, সে দ্বীন হিফাজত রাখতে পারবে। আর যে নামাজ ঠিক রাখল না, সে কোনো কিছুই ঠিক রাখতে পারবে না।'[৩১৫]

০৩. শক্তি;

০৪. আমানতদারিতা। কোনো দায়িত্ব কাউকে সোপর্দ করলে তার মাঝে শক্তি ও আমানতদারিতা থাকতেই হবে। শক্তির মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করবে, আমানতদারিতার মাধ্যমে হিফাজতে রাখবে। এজন্যই শুআইব আলাইহিস সালামের মেয়ে তার বাবাকে (মুসা আ.-কে কাজ দেওয়ার কারণ হিসাবে) বলেছিলেন—

> يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
>
> 'আব্বা, আপনি তাকে (মুসা আ.) শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করেন। কারণ, আপনার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।'[৩১৬]

---

[৩১৪] কানজুল উম্মাল, ৪৪১৮৫

[৩১৫] মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা, ২০৩৮

০৫. বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতা; যে কাজের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ না, সে ওই কাজ উপযোগী পন্থায় পূর্ণ করতে পারবে না; যদিও তার সে বিষয় সম্পর্কে অনেক জ্ঞান থাকে, শক্তি থাকে, আমানতদারিতা থাকে।

সুতরাং, কোনো কাজ করতে হলে অভিজ্ঞতা অবশ্যই জরুরি। এজন্যই উমার রা. কাউকে রাষ্ট্রীয় কাজে নিযুক্ত করতে চাইলে তাকেই নিযুক্ত করতেন, যে অভিজ্ঞ; যদিও অন্যান্য ক্ষেত্রে তার চেয়ে যোগ্য অন্য কেউ থাকত।[৩১৭]

০৬. অধীন ব্যক্তিদের প্রতি স্নেহ ও দয়া; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به..

'হে আল্লাহ, যে আমার উম্মাহর কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তাদের প্রতি কঠোরতার আচরণ করবে, আপনিও তার প্রতি কঠোরতার আচরণ করেন। আর যে আমার উম্মাহর কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তাদের প্রতি নমনীয়তার আচরণ করবে, আপনিও তার প্রতি নমনীয়তার আচরণ করেন।'[৩১৮]

উমার রা. এমন কাউকেই নির্বাচন করতেন না, যে তার অধীনদের প্রতি দয়া করে না। আবু উসমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—একবার উমার রা. বনু আসাদের এক ব্যক্তিকে কোনো কাজে নিযুক্ত করলেন। একদিন লোকটি সালাম-মোলাকাতের উদ্দেশ্যে উমার রা. কাছে আসে, আর তখন উমার রা. এর এক সন্তান এলে তার মুখে চুমু খান।

তখন ওই লোকটি বলে উঠল—'আরে, আপনি এর মুখে চুমু খাচ্ছেন? আল্লাহর কসম! আমি তো কখনোই কোনো সন্তানকে চুমু দিই নি।'

তখন উমার রা. বলেন—'তাহলে তো তুমি মানুষের প্রতিও দয়া করবে না। যাও এখান থেকে! তুমি আর আমার সাথে কোনো কাজ করবে না!'

এভাবে উমার রা. তার দায়িত্ব ফিরিয়ে নিলেন।

আরেকবার উমার রা.-এর একটি বাহিনী পারস্যে যুদ্ধ করতে যায়। একসময় সামনে নদী আসে। উপরে কোনো ব্রিজ ছিল না। তখন ওই বাহিনীর আমির একজনকে কঠিন ঠান্ডার সময় পানিতে নামার আদেশ করে এটা দেখার জন্য যে, কোন দিক দিয়ে বাহিনী অতিক্রম করতে পারবে। তখন লোকটি বলল—আমি যদি পানিতে

[৩১৭] ইউসুফ সাল্লাবি (মৃ ৯০৯ হি.), আস সাওয়াব ফি ফাজায়িলি উমার ইবনুল খাত্তাব রা., খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩১৯

[৩১৮] সহিহ মুসলিম : ১৮২৮

নামি, তাহলে মরে যেতে পারি। তবুও আমির তাকে নামতে বাধ্য করল। তখন লোকটি নেমে চিৎকার করে বলল—'উমার! উমার! আপনি কোথায়?'

একটু পরই লোকটি মারা যায়। উমার রা. এর কাছে যখন ঘটনাটি পৌঁছে তখন তিনি মদিনার বাজারে ছিলেন। তিনি বলে উঠেন—'লাব্বাইক, লাব্বাইক।'

উমার রা. বাহিনীর আমিরের কাছে পত্র লিখে তাকে বরখাস্ত করে দেন। আর বলেন—'যদি না এটা প্রথা হয়ে যাওয়ার ভয় থাকত, তাহলে আমি অবশ্যই তোমার থেকে কিসাস গ্রহণ করতাম। এখন থেকে আর কখনো আমার সাথে কাজ করবেনা।'[৩১৯]

০৭. সাহসিকতা; সেনাপ্রধানকে সাহসী হতে হবে। কারণ, যদি সাহসী পরিচালক না হয় তাহলে সাথিদের ওপর আপদ হয়ে দাঁড়াবে। কেননা, সৈনিক দুর্বল হলেও সাহসী নেতার সাথে শক্তি পায়। পক্ষান্তরে সৈনিক শক্তিশালী হলেও কাপুরুষ নেতার সাথে দুর্বল হয়ে যায়। ইমাম তুরতুশি রহ. বলেন, অনারব দার্শনিকরা বলেন—

أسد يقود ألف ثعلب خير من ثعلب يقود ألف آسد

> 'যে শেয়াল হাজার সিংহের নেতৃত্ব দেয়, তার চেয়ে হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ ওই সিংহ, যে হাজার শেয়ালের নেতৃত্ব দেয়।'

সুতরাং, বাহিনীর প্রধান তাকেই বানাবে—যে নির্ভীক, বীরত্বের অধিকারী, পরম বিক্রমশালী, সাহসী, শুধু সাহসী না, বরং দুঃসাহসী, অবিচল হৃদয়ের অধিকারী, দৃঢ় প্রত্যয়ী এবং ইস্পাত দৃঢ় মনোবলের অধিকারী।[৩২০]

মুসলিম সেনাপ্রধানের কর্তব্য

যে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, তাকে ১৩টি কর্তব্য পালন করতে হবে—

০১. বাহিনীর পর্যবেক্ষণ; সুতরাং, সেনাপ্রধানকে সবসময় বাহিনীকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, যাতে শত্রুর কোনো কৌশলই তাদের ওপর বিজয় ছিনিয়ে নিতে না পারে।

০২. কখনোই নিজেদেরকে শত্রুর চক্রান্ত থেকে নিরাপদ মনে করবে না। শত্রুকে কখনোই দুর্বল ভাববে না, যদিও বাস্তবে তারাই দুর্বল হয়। বরং, শত্রু দুর্বল হলেও তার চেয়েও শক্তিশালী শত্রুদের মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নামতে হবে। ইমাম তুরতুশি রহ. বলেন—বিজয়ের একটি কৌশল হলো, শত্রু দুর্বল হলেও তাকে তুচ্ছ না ভাবা। তুচ্ছ হলেও তার সম্পর্কে বেখবর না থাকা। কারণ, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটও বিশাল হাতিকে অশান্ত করে তোলে। কত ছোটো ছোটো বিষয়ও

---

[৩১৯] ইবনুল জাওজি, মানকিবে আমিরুল মুমিনিন, ১৫০

[৩২০] সিরাজুল মুলুক, পৃষ্ঠা: ১৮৪

বাদশাহর ঘুম হারাম করে দেয়। কবি বড়ো বাস্তব কথা বলেছেন—

ولا تحقرن عدوا رماك/وإن كان في ساعديه قصر

فإن السيوف تحز الرقاب/وتعجز عما تنال الإبر

'যে শত্রু তোমাকে নিক্ষেপ করে তাকে কখনো দুর্বল ভাববে না, যদিও থাকে দুর্বলতা তার হাতে।

কারণ, তরবারি কখনো কখনো সুইয়ের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজও করতে অক্ষম, যদিও বড়ো বড়ো মাথা দেয় ফেলে।'

০৩. যুদ্ধের জন্য একটি যথোপযুক্ত থাকার জায়গা খুঁজে নেবে। জায়গাটি যেন চলাচলে সহজ, ঘাস-পানিতে পরিপূর্ণ এবং চারপাশ শত্রু থেকে নিরাপদ হয়, যাতে থাকতে সুবিধা হয় ও পর্যবেক্ষণ মজবুত হয়।

০৪. শত্রুদের যাবতীয় খবর রাখবে, তাদের চারপাশে গোয়েন্দা ছড়িয়ে দেবে, তাদের সংখ্যা, সেনাপ্রধান, জেনারেল এবং যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে জানবে।

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দকের যুদ্ধে বলেন—

من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب ؟قال الزبير أنا ثم قال من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير..

'কে আমার কাছে শত্রুদের খবরাখবর এনে দেবে?' জুবাইর রা. বললেন—'আমি।'

তারপর আবার বললেন—'কে আমার কাছে শত্রুদের খবরাখবর এনে দেবে?' জুবাইর রা. বললেন—'আমি।'

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—'প্রত্যেক নবীর একজন হাওয়ারি (জানবাজ সাথি) ছিল। আমার হাওয়ারি হলো জুবাইর।'[৩২১]

০৫. বাহিনীর প্রয়োজনীয় বিষয়; যেমন: খাবার ও বাহনের যাবতীয় সরঞ্জাম প্রস্তুত করে রাখা; যাতে প্রয়োজনের সময় বণ্টন করা যায়। তাহলে তারা পেরেশানমুক্ত থাকতে পারবে।

০৬. রণাঙ্গনে বাহিনীকে সুবিন্যস্ত রাখা। কাতারের মাঝে কোনো ত্রুটি আছে কি না খোঁজ নেওয়া, শত্রুদের পার্শ্ববর্তী দলের প্রতি খেয়াল রাখা, যাতে প্রয়োজন হলে সাহায্য পাঠানো যায়।

০৭. বাহিনীকে সবসময় পারস্পরিক বিরোধিতা থেকে রক্ষা করবে। কারণ, এই পারস্পরিক বিরোধিতাই দুর্বলতার মূল কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

'আর তোমরা পরস্পর বিরোধিতা করো না, তাহলে তোমরা ব্যর্থ হবে আর তোমাদের প্রতাপ চলে যাবে।'[৩২২]

তবে যদি কখনো বিরোধিতা হয়েই যায়, তাহলে ইনসাফ মোতাবেক তাদের মাঝে ফায়সালা করবে।

০৮. বিজয়ের অনুভূতি জাগ্রত করে এমন কথা বলে তাদের শক্তিশালী করে তোলা। তাদের সামনে বিজয়ের কারণগুলো তুলে ধরা, যাতে শত্রুরা তাদের চোখে নগণ্য হয়ে যায়। ফলে তারা যুদ্ধ করতে দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। আর দুঃসাহসের মাধ্যমেই বিজয় সহজ হয়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِى مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَٰزَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

'স্মরণ করেন ওই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ আপনাকে স্বপ্নে শত্রুদের সংখ্যা কম করে দেখালেন। আর যদি তিনি তাদের সংখ্যা বেশি দেখাতেন, তাহলে তোমরা ব্যর্থ হতে, আদেশের ক্ষেত্রে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হতে। কিন্তু আল্লাহই তোমাদের রক্ষা করেছিলেন। (তোমাদের) অন্তরে যা আছে, সে সম্পর্কে তিনি খুবই ভালোভাবে অবহিত।'[৩২৩]

এখানে, আল্লাহ তাআলা শত্রুদের সংখ্যা কম দেখানোর মাধ্যমে মুজাহিদদের মনোবল শক্তিশালী করে তুলেছেন। তাই, মুজাহিদরা লড়াই করার সাহস পেয়েছে আর বিজয় তাদেরই অর্জিত হয়েছে। এটা মূলত আল্লাহ তাআলার একটি নিয়ামত, যা তিনি আহলে বদরকে দান করেছিলেন।

ইমাম সামারকান্দি রহ. এই আয়াতের তাফসিরে বলেন—'স্মরণ করেন ওই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ আপনাকে স্বপ্নে শত্রুদের সংখ্যা কম করে দেখালেন' অর্থাৎ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রুদের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই স্বপ্নে তাদের খুবই স্বল্প দেখতে পান। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে স্বপ্নের কথা শোনালেন যে, শত্রুদের সংখ্যা তো খুবই অল্প। সাহাবায়ে কিরাম এ কথা শুনে বললেন—নবীদের স্বপ্ন তো সত্যই হয়। সুতরাং, কুরাইশদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। পরবর্তী সময়ে যখন তারা বদরে মুখোমুখি হলেন,

[৩২২] সূরা আনফাল, আয়াত: ৪৫

[৩২৩] সূরা আনফাল, আয়াত: [illegible]

আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বপ্ন সত্যায়ন করার জন্য মুশরিকদের সংখ্যা মুমিনদের চোখে কমিয়ে দিলেন।

তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন—'আর যদি তিনি তাদের সংখ্যা বেশি দেখাতেন, তাহলে তোমরা ব্যর্থ হতে।' অর্থাৎ, তোমরা ভীতু হয়ে রণাঙ্গান ছেড়ে পালাতে। 'আদেশের ক্ষেত্রে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হতে।' অর্থাৎ, যুদ্ধের বিষয়ে নবীজির আদেশের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধিতায় লিপ্ত হতে। 'কিন্তু আল্লাহই তোমাদের রক্ষা করেছিলেন।' অর্থাৎ, শত্রুদের ওপর মুসলিমদের বিজয় পূর্ণ করেছেন।[৩৪]

০৭. বাহিনীকে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে কষ্টের ওপর সবর করতে বলবে। সাওয়াবের প্রতিদান ও 'নফলের' কথা উল্লেখ করবে।

নফলের মূল অর্থ অতিরিক্ত। পারিভাষিক অর্থে কারও জন্য আলাদাভাবে গনিমতের বিশেষ অংশ শর্তসাপেক্ষে নির্ধারণ করা। যেমন: মুজাহিদদের আমির কাউকে বললেন—তুমি যদি অমুককে হত্যা করতে পারো, অথবা অমুক দুর্গ জয় করতে পারো, তাহলে তোমাকে আলাদাভাবে গনিমত থেকে এই পরিমাণ অঙ্কের টাকা দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ

'হে নবী, আপনি মুমিনদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।'[৩৫]

'উদ্বুদ্ধ করার' বিষয়টি ব্যাপক—সাওয়াব উল্লেখের মাধ্যমে হতে পারে, নফলের মাধ্যমেও হতে পারে। এজন্যই আমাদের হানাফিদের নিকট তানফীল মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. বলেন—উল্লিখিত আয়াতের কারণে 'উদ্বুদ্ধ করা' ওয়াজিব। তবে 'উদ্বুদ্ধ'টা শুধু তানফিলের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় যে, তানফিল ওয়াজিব। বরং, তানফিল ছাড়াও উদ্বুদ্ধ হতে পারে। যেমন: উত্তম উপদেশ দেওয়া, আল্লাহ তাআলার কাছে থাকা প্রতিদানের কথা বলা। তাহলে তানফিল শুধুই 'ওয়াজিব' নয়, বরং 'ইচ্ছাধিকার ওয়াজিব'।

واجب مخير বা 'ইচ্ছাধিকার ওয়াজিব' একটি শরয়ি পরিভাষা। এটা এমন হুকুমকে বলা হয়, যা আদায় করা ইচ্ছাধীন। করলে ওয়াজিব আদায় হবে, অন্যথায় অন্য কিছুর মাধ্যমে ওয়াজিব পালন করতে হবে।

তারপর তানফিলই যদি উদ্বুদ্ধকরণের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে মূল উদ্দেশ্য (বিজয়) অর্জনে সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হয়, তাহলে তানফিলের মাধ্যমেই ওয়াজিব আদায়

---

[৩৪] তাফসিরুস সামারকান্দি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৩

হবে, অন্যগুলোর মাধ্যমে নয়। বরং, অন্যগুলো তখন মুস্তাহাব হবে। এখন শুধু মুস্তাহাবের মাধ্যমে ওয়াজিব আদায় করবে কিনা সেটা ইচ্ছাধিকার।[৩২৬]

১০. কোনো জটিল বিষয়ে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞদের সাথে আলোচনা করা, যাতে ভুল না হয়। এক দার্শনিক বলেন—একজন বুদ্ধিমানের কর্তব্য হলো তার চিন্তার সাথে জ্ঞানীদের চিন্তা যোগ করা। তার বুদ্ধির সাথে দার্শনিকদের বুদ্ধি একত্র করা। কারণ, অনেক সময় একক চিন্তা মানুষকে পদস্খলিত করে। একইভাবে কখনো কখনো নিজের একার বুদ্ধি মানুষকে ভ্রষ্ট করে ফেলে।[৩২৭]

তদ্রূপ কঠিন বিষয়ে অবিচল ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হবে, যাতে পদস্খলন থেকে বেঁচে থাকা যায়।

১১. আল্লাহ তাআলা যে সকল হক আবশ্যক করে দিয়েছেন, সেগুলো আদায় করার জন্য বাহিনীকে আদেশ করবে। বিশেষ করে জামাআতের সাথে নামাজ পড়ার আদেশ করবে। গুনাহ থেকে নিষেধ করবে। কারণ, যে আল্লাহ তাআলার দ্বীনের জন্য জিহাদ করে, তাকেই তো সে দ্বীনের বিধিবিধান মানতে হবে, হালাল-হারামের মাঝে পার্থক্য করতে হবে।

১২. কাউকে জিহাদ ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত থাকতে দেওয়া যাবে না। কারণ, এতে জিহাদের কষ্টে সবর করার স্পৃহা হারিয়ে যাবে।

১৩. দিন-রাত সর্বক্ষণ বাহিনীর খোঁজ নেবে—নিজে কিংবা বিশ্বস্ত ব্যক্তির মাধ্যমে। ব্যস, সেনাপ্রধান যদি এ সকল কাজগুলো আদায় করেন, তাহলে তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন। তাছাড়া বাহিনীকে বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করলেন। নিজ দায়িত্বও আদায় করলেন। অন্যথায় সাহায্যও পাবেন না। নিজের হকও আদায় করলেন না। আল্লাহ আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন।

সেনাবাহিনীর কর্তব্যসমূহ

সেনাপ্রধানের যেমন কিছু দায়দায়িত্ব আছে, একইভাবে সেনাবাহিনীরও কিছু দায়দায়িত্ব আছে। মাওয়ারদি রহ. বলেন—'মুজাহিদদের যে সকল দায় দায়িত্ব আছে, সেগুলো দুই প্রকার। যথা—

- ০১. আল্লাহ তাআলার হকের ক্ষেত্রে দায়দায়িত্ব;
- ০২. আমিরের হকের ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব।

---

[৩২৬] ফাতহুল কাদির, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৪৯

[৩২৭] তাসহিলুন নাজর : ১০০

প্রথম : আল্লাহর তাআলার হকের ক্ষেত্রে চারটি দায়িত্ব আছে—

(ক) প্রথম হক : ধৈর্যের সাথে শত্রুদের মোকাবিলা করা। স্যংখ্যায় দ্বিগুণ বা তার কম হলেও পলায়ন না করা। দুই অবস্থায় শত্রুর দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও রণাঙ্গন থেকে পলায়ন করা জায়িজ। হয় যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে পিছপা হয়ে বিশ্রাম করবে, আরও উদ্যম নিয়ে ফিরে আসবে, বা যেকোনো কৌশল অবলম্বন করে ফিরে যাবে; অথবা অন্য কোনো মুসলিম দলের সাথে যুক্ত হয়ে জিহাদ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

'আর সেদিন যে লড়াইয়ের কৌশল অবলম্বন বা অন্য কোনো দলের সাথে যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, সে আল্লাহর গজব নিয়ে ফিরে এলো।'[৩২৮]

চাই যে দলের সাথে যুক্ত হবে, সে দল কাছে থাকুক বা দূরে—উভয়টিতে যুক্ত হওয়াই জায়িজ। কারণ 'কাদিসিয়া' যুদ্ধের মুজাহিদরা যখন উমার রা.-এর কাছে ফিরে এসেছিলেন, তখন তিনি বললেন—'(এটা পৃষ্ঠপ্রদর্শন নয়। কারণ,) আমি প্রত্যেক মুসলিমের জন্য দল।'

(খ) দ্বিতীয় হক : লড়াইয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে সাহায্য করা। অন্যান্য ধর্মকে ধ্বংস করা—

ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

'যাতে তিনি এই দ্বীনকে সমস্ত ধর্মের ওপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।'

যদি নিজের মাঝে এই নিয়ত ধারণ করে, তাহলে আল্লাহর প্রতিশ্রুত প্রতিদান লাভ করতে পারবে, আদেশ-নিষেধের আনুগত্যকারী হবে, শত্রুর ওপর বিজয় অর্জনে সাহায্য লাভ করবে। ফলে যুদ্ধের কষ্ট লাঘব হবে, রণাঙ্গনে ইস্পাত দৃঢ় মনোবলের অধিকারী হবে। আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে বিজয়ী করা ছাড়া জিহাদের মাধ্যমে অন্য কিছু উদ্দেশ্য করা যাবে না।

(গ) তৃতীয় হক : যে সকল গনিমত লাভ করবে, সেক্ষেত্রে আমানত রক্ষা করবে। জিহাদে অংশগ্রহণ করা মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করার আগে সেখান থেকে কিছু নিয়ে নেবে না। কারণ, সেখানে প্রত্যেকেরই হক আছে।

(ঘ) চতুর্থ হক : কখনো কাছের আত্মীয় শত্রুকেও ছাড় না দেওয়া। আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যের ক্ষেত্রে কোনো কাছের মানুষকেও প্রাধান্য না দেওয়া। কারণ, আল্লাহ তাআলার দ্বীন অবশ্যই বিজয় লাভ করবে। (তাহলে অন্য কাউকে প্রাধান্য দিলে নিজেরই ক্ষতি হবে, আল্লাহর নয়।) তাঁর দ্বীনকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধু বানিয়ো না যে, তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাবে। অথচ তারা অস্বীকার করে ওই হককে, যা তোমাদের কাছে এসেছে।'[৩২৯]

সেনাপ্রধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অধিকার ও কর্তব্য

সাধারণ সেনাদের পক্ষ থেকে একজন বাহিনী-প্রধানের চারটি অধিকার রয়েছে। আমরা এখানে সেগুলো জেনে নেব—

এক. সেনাপ্রধানের আনুগত্য করা

তার ছায়াতলে থাকা। কারণ, তার নেতৃত্বেই তাদের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত। আর তার আনুগত্য নেতৃত্বের মাধ্যমেই ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো রাসুলের এবং তোমাদের নেতৃবর্গের।'[৩৩০]

দুই. প্রতিটি বিষয়ই তার সামনে পেশ করা এবং তার সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া

সাধারণ সেনা ও দায়িত্বশীলদের মধ্যে যাতে পারস্পরিক মতবিরোধ সৃষ্টি না হয়। এমনটি হলে তাদের পারস্পরিক ঐক্য বিনষ্ট হবে, তাদের মাঝে দলাদলি সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ

'যদি তারা সে বিষয়টি পেশ করত রাসুলের সামনে, তাদের মধ্য হতে দায়িত্বশীলদের সামনে, তাহলে তাদের মধ্যে যারা (স্বরূপ) উদঘাটন করতে পারে, তারা তার (স্বরূপ) জানতে পারত।'[৩৩১]

---

[৩২৯] সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ১

[৩৩০] সূরা নিসা, আয়াত: ৫৯

[৩৩১] সূরা নিসা, আয়াত: ৮৩

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা দায়িত্বশীলদের কাছে সমস্যা পেশ করার কথা বলেছেন, যাতে তিনি সমস্যাটি জানতে পারেন, সমস্যারও সমাধান হয়। কিন্তু যদি তারা সঠিকটি বুঝতে পারে, যা তিনি বুঝতে পারেন নি; তাহলে তার সামনে সঠিকটি তুলে ধরবে, স্পষ্ট করবে। এজন্যই মাশওয়ারা করতে বলা হয়েছে, যাতে মাশওয়ারার মাধ্যমে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

তিন. আদেশ-নিষেধ মান্য করা

তিনি যখন কোনো আদেশ করবেন, সাথে সাথে আদেশ পালন করবে। যখন নিষেধ করবেন, সেটা থেকে বিরত থাকবে। কারণ, এ দুটো বিষয়ই আনুগত্যের প্রধান মাধ্যম। কিন্তু যদি তারা আদেশ-নিষেধের তোয়াক্কা না করে তাহলে তিনি তাদের অবস্থা অনুযায়ী শাস্তি দেবেন। তবে গরম এবং কঠোর হবেন না। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন,

> فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔
>
> 'আল্লাহর অনুগ্রহের কারণেই আপনি তাদের জন্য কোমল হতে পেরেছেন। যদি আপনি কঠোর এবং রূঢ় হৃদয়ের অধিকারী হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে সরে পড়ত।'[৩৩২]

চার.

তিনি যখন গনিমত বণ্টন করবেন, তখন তার সাথে আপত্তি করবে না। বরং, তার সমবণ্টনে সন্তুষ্ট থাকবে। কারণ, আল্লাহ তাআলাই গনিমতের ক্ষেত্রে সম্মানিত-অসম্মানিত, দুর্বল-শক্তিশালী সবার ক্ষেত্রে সাম্যের কথা বলেছেন।

* * *

অর্থ মন্ত্রণালয়

বর্তমানে যে সকল মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শাসন-ব্যবস্থা চলে, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয় হলো 'অর্থ মন্ত্রণালয়'।

ইসলামি শরিয়তের আলোকে এর বিশ্লেষণ

ব্যক্তিগত, সামাজিক, বা রাষ্ট্রীয় সম্পদ হোক, সবগুলোর মূল ভিত্তি হালাল ও উত্তম সম্পদ। এ-জন্যই ইসলাম হালাল ও উত্তম সম্পদের প্রশংসা করেছে, হালাল সম্পদ উত্তমভাবে কাজে লাগাতে বলেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

نعم المال الصالح للمرء الصالح

উত্তম মানুষের জন্য উত্তম সম্পদ কতই না উত্তম![৩৩৩]

কুরআনে কারিমে আছে—

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

আল্লাহ তাআলা যে সম্পদকে তোমাদের ভিত্তি বানিয়েছেন, সেগুলো তোমরা নির্বোধদের হাতে দিয়ো না। তবে সেখান থেকে তাদেরকে খাবার দাও এবং পরার কাপড় দাও। আর তাদেরকে উত্তম কথা বলো।'[৩৩৪]

এ-আয়াতের ব্যাখ্যায় 'আত-তাফসিরুল কাবিরে' ইমাম রাজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন— আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমের বহু জায়গায় বান্দাদেরকে সম্পদ সংরক্ষণ করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ (٢٧)

---

[৩৩৩] সহিহ ইবনু হিব্বান : ৩১১০; আল আদাবুল মুফরাদ : ২৯৯

[৩৩৪] সূরা নিসা, আয়াত : ৫

আর আপনি কিছুতেই অপচয় করবেন না। কারণ, নিঃসন্দেহে অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।[৫৩৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

আর তোমার হাত তোমার গলার সাথে বেঁধে দিয়ো না, আবার তা একেবারে প্রসারিত করেও দিয়ো না, তা করলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়েবসেপড়বে।[৫৩৬]

তিনি আরও বলেন—

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا (٦٧)

(আর রহমানের বান্দা) তারাই, যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না। আর তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।[৫৩৭]

আল্লাহ তাআলা 'আয়াতে মুদায়ানাতে'ও সম্পদ হিফাজতে রাখার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি সেখানে অর্থ মুআমালার ক্ষেত্রে লিখে রাখা, সাক্ষী রাখা ও বন্ধক রাখার আদেশ করেন। যুক্তিও সেটা সমর্থন করে। কারণ, মানুষ তখনই দুনিয়া ও আখিরাতে উন্নতি লাভ করে যখন ফারেগ ও কর্মব্যস্ততামুক্ত থাকে। আর অর্থশক্তি ছাড়া কখনোই কর্মব্যস্ততামুক্ত থাকা সম্ভব নয়। কারণ, এই অর্থশক্তির মাধ্যমেই উপকার লাভ করা যায়। ক্ষতি রোধ করা যায়।

যদি কেউ এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দুনিয়ার অর্থশক্তি অর্জন করতে চায়, তার জন্য দুনিয়াই হয় আখিরাতে সৌভাগ্য অর্জনের বড়ো একটি সহায়ক মাধ্যম। কিন্তু কেউ যদি শুধু সম্পদের আশায় অর্থশক্তি লাভ করতে চায়, তাহলে এই সম্পদই তার জন্য আখিরাতে সৌভাগ্য অর্জনের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

أن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর হারাম করেছেন মায়ের অবাধ্যতা, কন্যাসন্তানকে পুঁতে ফেলা, যা আবশ্যক তা দেওয়া থেকে

[৫৩৫] সূরা ইসরা, আয়াত : ২৬-২৭

[৫৩৬] সূরা ইসরা, আয়াত : ২৯

[৫৩৭] সূরা ফুরকান, আয়াত : ৬৭

বিরত থাকা এবং তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন অজ্ঞতাবশত এই সেই বলা, বেশি বেশি প্রশ্ন করা, সম্পদ নষ্ট করা।'[৩৩৮]

এ সম্পর্কে আরও বহু আয়াত ও হাদিস রয়েছে। তবে যেসব জায়গায় সম্পদ, সচ্ছলতা, ধনাঢ্যতার নিন্দা করা হয়েছে, সেখানে উদ্দেশ্য হলো—সম্পদ, ধনাঢ্যতা স্বেচ্ছাচারিতা ও অপচয়ের কারণ হয়। সম্পদ যদি গুনাহ, অবাধ্যতা, পাপাচারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং আল্লাহ তাআলার নিয়ামত অস্বীকার করা হয়, তবেই সেটা নিন্দিত। অর্থশক্তি উন্নতির তিনটি মাধ্যম:

- ০১. চাষাবাদ,
- ০২. ব্যবসা-বাণিজ্য,
- ০৩. কাজ করা ও উপার্জন করা।

০১. চাষাবাদ

চাষাবাদ রাষ্ট্রের একটি মূল ভিত্তি। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র শক্তি লাভ করে, জনগণের অবস্থা সুবিন্যস্ত হয়। চাষাবাদ ভালো হওয়া মানে দেশের সমৃদ্ধি, আর বিনষ্ট হওয়া মানে দেশে দুর্ভিক্ষ। এটা এমন এক সম্পদ, যা গুদামজাত ও সংরক্ষণ করে রাখা যায়। যেকোনো দেশের, ফল ও ফসল যদি অধিক পরিমাণে হয়, সে দেশ স্বনির্ভর হয়ে ওঠে, অন্য দেশের ওপর নির্ভর করতে হয় না। বরং তখন অন্য দেশে 'ঢালতে' হয়। অন্যান্য দেশ অর্থ পাঠাতে থাকে, আর এ দেশ খাবার দিতে থাকে। কিন্তু যদি বিপরীত হয়, অর্থাৎ ফসল কম উৎপন্ন হয় বা বিনষ্ট হয়, তাহলে শাসকের তিনটি করণীয়:

প্রথম কর্তব্য: ব্যাপক পরিমাণে পানির ব্যবস্থা

ব্যাপক পরিমাণে পানির ব্যবস্থা করা, যা সবচেয়ে সহজলভ্য, সবসময় বৃদ্ধি পেতে থাকে, কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। সবার জন্য ব্যাপক, কাউকে বাধা দেওয়া হয় না। মোটকথা, কাছের-দূরের, শক্তিশালী-দুর্বল সবাই পানি লাভের ক্ষেত্রে সমান।

দ্বিতীয় কর্তব্য: নিরাপত্তা-ব্যবস্থা

নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা। নেতা ও ক্ষমতাবানদের হাত থেকে কৃষকদেরকে রক্ষা করা, তাদের সাথে দুর্ব্যবহার রোধ করা। কারণ, ক্ষমতাবানরা এই গরিব কৃষকদের ওপরই জোর খাটায়, তাদের ফসলে ভাগ বসায়। সুতরাং, এই ক্ষমতাবানদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করা শাসকদের দায়িত্ব; যাতে কৃষকরা নিরাপদে চাষাবাদ করতে পারে, তাদেরকে ক্ষমতাবানদের অনিষ্টের জন্য পেরেশান হতে হয় না, এবং কৃষকরা যাতে অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য অন্য কোনো কাজে

---

[৩৩৮] সহিহ বুখারি, ২৪০৮

যোগদান না করে। তাহলে তারা বেশি বেশি জমি আবাদ করবে, কৃষিকাজ বাড়িয়ে দেবে। ফলে নিজেদেরও লাভ হবে, অন্যদেরও কল্যাণ হবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

التمسوا الرزق في خبايا الأرض

'তোমরা জমিনের গুপ্তধন থেকে রিযিক তালাশ করো।'

শাইখ আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন—'এটা দ্বারা উদ্দেশ্য, চাষাবাদের জন্য জমি চাষ করা, প্রস্তুত করা।'[৩৩৯]

তৃতীয় কর্তব্য: ইনসাফ প্রতিষ্ঠা

কৃষকদের থেকে যে খাজনা নেওয়া হয়, সেটা যেন শরিয়ত মোতাবেক ইনসাফের সাথে হয়; যাতে তাদের ওপর জুলুম না হয়, খাজনা দিতে কষ্ট না হয়ে যায়। কারণ, তারা তখনই ন্যায্য শাসন পাবে, যখন শাসক তাদের সাথে ইনসাফের আচরণ করবেন। শাসকরা যেন স্বেচ্ছায় নিজ আগ্রহে কৃষকদের দায়িত্ব আদায় করে, সেই সাথে যাতে তাদের কষ্টও লাঘব করা হয়। কিন্তু যদি তাদের ওপর জুলুম করা হয়, খুব কঠোরতার সাথে তাদের থেকে খাজনা নেওয়া হয়, তাহলে ভালোর পরিবর্তে খারাপটাই আবশ্যক হয়ে যাবে। তখন নেতৃত্ব কঠোর হয়ে যাবে, আদল ও ইনসাফ বের হয়ে যাবে।

আল্লামা ইবনু খালদুন রাহিমাহুল্লাহ বলেন—'রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হচ্ছে, জনগণ থেকে সাধ্যানুযায়ী কম পরিমাণ ট্যাক্স নেওয়া। তাহলেই জনগণ রাষ্ট্রে বসবাস করবে, রাষ্ট্র আবাদ রাখবে। কারণ তারা জানে, এখানেই তাদের লাভ। বাকি আল্লাহই সবকিছুর ক্ষমতা রাখেন।'[৩৪০]

জিয়াদ গ্রাম অঞ্চলে থাকা তার প্রশাসকদের কাছে পত্র লিখে বলেছিলেন—'তোমরা কৃষকদের সাথে ভালো আচরণ করো। কারণ, তারা চাষ করলে তবেই তোমরা খেতে পারবে।'[৩৪১]

'আহমাদ শাহ বাবা' সম্পর্কে বলা হয়, 'নিজ বুদ্ধিমত্তা বলে, সুউচ্চ মনোবলের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করেছিলেন, সমস্ত কবিলাকে তার পাশে একত্র করেছিলেন। কারণ, তিনি কবিলাদের সাথে অত্যন্ত কোমল আচরণ করতেন। ট্যাক্সের প্রতি যতটা না গুরুত্ব দিয়েছেন, তার চেয়ে বেশি যুদ্ধের বিষয়ে গুরুত্ব

---

[৩৩৯] বাইহাকি, বাবুল আদব, ৭৮৪

[৩৪০] বাদায়িয়ুস সালকি ফী তাবাইয়িল মুলকি, ২২২

[৩৪১] তাসহীলুন নাযার ও তা'জীলুয যাফার, ১৬১

দিয়েছেন। এ কারণেই তিনি আফগানিদের হৃদয় জয় করতে পেরেছেন। আফগানিরা তার সম্পর্কে বিশ্বাস করে যে, তিনি আল্লাহর এক নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। তাকে তারা নিজেদের পিতার মতো মনে করে। এজন্য তাকে তারা 'বাবা' উপাধি দিয়েছে।'

০২. ব্যবসা-বাণিজ্য:

ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে একটি দেশ সমৃদ্ধ হয়, জনগণ সচ্ছল হয়। কারণ, একটি দেশ থেকে রপ্তানি করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি অন্য দেশ থেকে এদেশে আমদানি করাও প্রয়োজন হয়ে থাকে; যাতে যে সকল সম্পদ এ দেশে নেই সেগুলো প্রয়োজনের সময় অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় এবং সেগুলোর মাধ্যমে দেশ সমৃদ্ধ থাকে। ফলে জনগণও ব্যাপকভাবে উপকার লাভ করে এবং সমৃদ্ধি অর্জনের পথে যাত্রা করতে পারে।

এক্ষেত্রে খলিফার কাজ চারটি—

(ক) সড়ক নিরাপত্তার ব্যবস্থা: শাসকের কর্তব্য হলো তিনি রাস্তাঘাট উন্নয়ন এবং সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চায়নে সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করবেন, যাতে ব্যবসায়ীরা নিরাপদে ব্যবসার উদ্দেশ্যে চারিদিকে যেতে পারে, নিজেদের জান-মালের বিষয়ে আশ্বস্ত থাকতে পারে।

(খ) যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ করা: খলিফার কর্তব্য হলো দেশের ভেতরে আসার এবং বাহিরে যাওয়ার পথগুলোতে চলাচলের সহজ ব্যবস্থা করা, যাতে দেশের যাবতীয় সম্পদ বেশি বেশি বাহিরে রপ্তানি করা যায় এবং বাহিরের সম্পদ দেশে আমদানি করা যায়।

(গ) ইনসাফপূর্ণ ট্যাক্স নেওয়া: ব্যবসায়ীদের থেকে গ্রহণকৃত ট্যাক্স যেন শরিয়ত মোতাবেক ইনসাফপূর্ণ হয়। অর্থাৎ, এই পরিমাণ ট্যাক্স নিবে না যে, তাদের ওপর জুলুম হয়ে যায়, তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। বরং তারা যেন স্বেচ্ছায়-সাগ্রহে কর্তব্য পালন করতে পারে, এরূপ ট্যাক্স নির্ধারণ করবে।

(ঘ) অধিক রপ্তানি করার চেষ্টা করা: শাসক চেষ্টা করবে যেন দেশের আমদানিকৃত পণ্যের চেয়ে রপ্তানিকৃত পণ্যের পরিমাণ বেশি হয়। আর সেটা সম্ভব ব্যবসার যাবতীয় মাধ্যমগুলো সহজায়ন করার মাধ্যমে। তাহলেই দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে এগিয়ে থাকতে পারবে। ইসলাম মোতাবেক, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থশক্তি উন্নতি করার দুটো মূলনীতি আছে, যা কুরআনে কারিম স্পষ্টভাবে বলেছে।

- প্রথমত: বৈধ পন্থতিতে সম্পদ অর্জন।
- দ্বিতীয়ত: বৈধ খাতে সম্পদ ব্যয়।

কুরআনে কারিমে সম্পদ অর্জনের পন্থতি : কত সুন্দর করে কুরআনে কারিম সম্পদ অর্জনের পন্থতি বলে দিয়েছে, যেখানে দ্বীন-দুনিয়া উভয়টিই পরিলক্ষিত হয়।

০১. আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'অতঃপর যখন নামাজ সমাপ্ত হয়, তখন জমিনে ছড়িয়ে পড়ো, আর আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করতে থাকো, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারো।'[৩৪২]

০২. আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ

'আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে জমিনে বিচরণ করবে।'[৩৪৩]

৩. আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

'এতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই যে, তোমরা (হজ্জ পালন করতে গিয়ে) তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ (রিযিক) সন্ধান করবে।'[৩৪৪]

৪. আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٦٩)

'তোমরা যে হালাল ও উত্তম গনিমত পেয়েছ, তা থেকে খাও।'[৩৪৫]

কুরআনে কারিম সম্পদ ব্যয়ের নির্দেশনা

তদ্রূপ সম্পদ ব্যয়ের কথাও কত হিকমাহর সাথে কুরআন বলে দিয়েছে :

১. আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (٢٩)

'আর তোমার হাতকে তোমার গলার সাথে বেঁধে দিয়ো না, আর তা একেবারে প্রসারিত করেও দিয়ো না, তা করলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়বে।'[৩৪৬]

---

[৩৪২] সূরা জুমুআ, আয়াত : ১০

[৩৪৩] সূরা মুযযাম্মিল, আয়াত : ২০

[৩৪৪] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৯৮

[৩৪৫] সূরা আনফাল, আয়াত : ৬৯

[৩৪৬] সূরা ইসরা, আয়াত : ২৯

২. আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا (٦٧)

'(আর রহমানের বান্দা) তারাই, যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না। আর তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।'[৫৪৭]

৩. আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

'আর তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী খরচ করবে (দান করার জন্য)? আপনি বলুন, অতিরিক্ত (সম্পদ খরচ করবে)।'[৫৪৮]

অতঃপর দেখুন যেখানে ব্যয় করা বৈধ নয়, তার পরিণতি সম্পর্কে কত সুন্দর করে কুরআন বলছে,

فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (٣٦)

'অচিরেই তারা (কাফিররা) সম্পদ ব্যয় করবে। তারপর সেটা তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে। তারপর তাদেরকে পরাস্ত করা হবে।'[৫৪৯]

০৩. কাজ করা ও উপার্জন করা

ইসলাম এক্ষেত্রেও তার অনুসারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে। যারা কাজ করে খায়, তাদের প্রশংসা করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده(رواه البخاري في صحيحه)

'নিজের হাতে অর্জিত খাবারের চেয়ে উত্তম আর কোনো খাবার হতে পারে না। আর আল্লাহর নবী দাউদ আ. নিজের হাতে উপার্জন করে খাবার খেতেন।'[৫৫০]

তিনি আরও বলেন—

---

[৫৪৭] সূরা ফুরকান, আয়াত : ৬৭

[৫৪৮] সূরা বাকারা, আয়াত : ২১৯

[৫৪৯] সূরা আনফাল, আয়াত : ৩৬

[৫৫০] সহিহ বুখারি, ২০৭২

لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه (رواه البخاري)

'নিজের পিঠে লাকড়ি সংগ্রহ করে বিক্রি করা এর চেয়ে উত্তম—কেউ আরেকজনের সামনে হাত পাতবে, অতঃপর হয় সে দিবে কিংবা বিরত থাকবে।'[৩২১]

আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত এক হাদিসে আছে, একলোক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে হাত পাতল। তখন তিনি বললেন—'তোমার বাড়িতে কোনো কিছু আছে কী?'

তিনি (আনাস রা.) বলেন—লোকটি বলল, 'হ্যাঁ, একটি কাপড় আছে। এর কিছু আমরা পরি, আর কিছু বিছিয়ে রাখি। আরেকটি পাত্র আছে, যাতে করে পানি পান করি।' তিনি বললেন, 'যাও, বস্তু দুটো নিয়ে এসো।'

আনাস রা. বলেন—তখন লোকটি ওই দুটো জিনিস নিয়ে এলো।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলো হাতে নিয়ে বললেন—'কে এই দুটি জিনিস কিনবে?'

একলোক বলল—'আমি এক দিরহাম দিয়ে কিনব।'

নবীজি বললেন—'কে আরেক দিরহাম বৃদ্ধি করে দেবে?'

একলোক বলল, 'আমি দুই দিরহাম দিয়ে নেব।'

তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এ দুটো জিনিস দিয়ে দুই দিরহাম নিলেন, আর ওই আনসার লোকটিকে দুই দিরহাম দিয়ে বললেন—'এক দিরহাম দিয়ে খাবার কিনে পরিবারকে দাও, আর আরেক দিরহাম দিয়ে কুড়াল কিনে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

লোকটি তাই করল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুড়ালের সাথে একটি কাঠ লাগিয়ে দিলেন। আর বললেন,—'তুমি এখন কাঠ সংগ্রহ করতে যাও। আর তোমাকে যেন পনের দিনের আগে না দেখি। লোকটি কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করতে লাগল। তারপর লোকটি দশ দিরহাম নিয়ে আবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলে নবীজি বললেন—'এর কিছু দিয়ে খাবার কিনো, আর কিছু দিয়ে কাপড় কিনো। তারপর বললেন—

هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة ، إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو دم موجع (رواه ابن ماجه)

---

[৩২১] সহিহ বুখারি, ২০৭৪

'এটা করা এর চেয়ে উত্তম যে, তুমি কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে, আর তোমার মুখে (হাত পাতার) চিহ্ন থাকবে।'

অপরজনের কাছে সেই চাইতে পারবে, যে নিঃস্ব, দরিদ্র কিংবা প্রচণ্ড ঋণগ্রস্ত, অথবা যার ওপর বড়ো কোনো 'দম' আবশ্যক হয়ে পড়ে।[৩৫২]

উমার রা. বলেন—

لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة

'তোমাদের কেউ যেন রিজিক অন্বেষণ করা থেকে বিরত না থাকে, আর বলে—'আয় আল্লাহ! আমাকে রিজিক দান করেন'। অথচ সে জানে যে, আসমান থেকে কখনো স্বর্ণও ঝরে না, রূপাও পড়ে না।'[৩৫৩]

এই কাজ ও উপার্জন-ব্যবস্থা সমৃদ্ধ করার জন্য খলিফাকে তিনটি কাজ করতে হবে—

- প্রথমত, কর্মজীবীদের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি সহজলভ্য করা।
- দ্বিতীয়ত, তাদের তৈরি জিনিসগুলো বাহিরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা।
- তৃতীয়ত, তাদের থেকে কম পরিমাণে ট্যাক্স নেওয়া।

ফায়দা—ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনীতি

০১। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলাম সর্বপ্রথম বলে, যাবতীয় সম্পদ তথা আসমান ও জমিনে যা আছে, সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। এক্ষেত্রে কারও কোনো অংশীদারত্ব নেই। কুরআনে কারিমে এ সম্পর্কে বহু আয়াত এসেছে। যেমন—

:: আল্লাহ তাআলা বলেন—

له ملك السماوات والأرض

'তাঁরই জন্য আসমান-জমিনের রাজত্ব।'

:: আল্লাহ তাআলা বলেন—

لله ما في السماوات والأرض

'আসমান-জমিনে যা আছে, সবই আল্লাহ তাআলার।'

:: আল্লাহ তাআলা বলেন—

وما بكم من نعمة فمن الله

'তোমাদের মাঝে যে নিয়ামতই আছে, তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে।'

---

[৩৫২] সুনানু ইবনি মাজাহ, ২১৯৮

[৩৫৩] আবু উমার আন্দালুসি, আল ইকদুল ফারিদ।

০২। পৃথিবীতে মানুষ হলো আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট জীবের সেরা জীব। আল্লাহ তাআলা বলেন—

ولقد كرمنا بني آدم

'আর অবশ্যই আমি আদম-সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি।'

তাই, পৃথিবীর সবকিছুকে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য অনুগত এবং নিয়োজিত করে দিয়েছেন। তাদের উপকারগ্রহণের ক্ষেত্রে সমান বানিয়েছেন।

:: আল্লাহ তাআলা বলেন—

و سخر لكم الفلك

'আর তিনি তোমাদের জন্য নৌযানকে অনুগত করে দিয়েছেন।'

:: আল্লাহ তাআলা বলেন—

وسخر لكم الأنهار

'আর তিনি তোমাদের জন্য দিবসকে নিয়োজিত করে রেখেছেন।'

:: আল্লাহ তাআলা বলেন—

وسخر لكم الليل والنهار

'আর তিনি তোমাদের জন্য দিন ও রাতকে নিয়োজিত করে রেখেছেন।'

:: আল্লাহ তাআলা বলেন—

سخر لكم ما في الارض

'তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা আছে অনুগত করে দিয়েছেন।'

:: আল্লাহ তাআলা বলেন—

ض وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه

'আর তিনি তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন, যা কিছু আছে আসমানসমূহে এবং যা আছে জমিনে তার সবকিছুকে।'[৩২৪]

:: আল্লাহ তাআলা বলেন—

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

'তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যা কিছু আছে জমিনে।'

০৩। সম্পদ একটি উসিলা বা মাধ্যম। সম্পদ কোনো মৌলিক জিনিস নয়, পৃথিবীর ভালো ও কল্যাণকর জিনিস অর্জনের উপায় ও মাধ্যম। সুতরাং, সম্পদ তখনই

[৩২৪] সূরা জাসিয়া, আয়াত : ১৩

কল্যাণকর হবে, যদি তা কল্যাণকর ও ভালো ক্ষেত্রে ব্যয় করা হয়। অন্যথায়, সম্পদ কল্যাণকর হওয়ার পরিবর্তে অকল্যাণকর হয়ে উঠবে, যা শুধু মানুষের ক্ষতিই ডেকে আনবে।

সুতরাং, শাসক-শাসিত সবার কর্তব্য হলো শরয়ি পদ্ধতিতে তথা বৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জন করা, যাতে এর মাধ্যমে দুনিয়ায় উপকার লাভ করা যায় এবং আখিরাতেও কল্যাণ হাসিল করা যায়।

মোটকথা, মানুষ চেষ্টা-উপার্জন করে যে সম্পদ লাভ করে, সেটা তার কাছে আমানত; প্রকৃত মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। তিনি এ সম্পদ মানুষকে দান করেছেন, যাতে সে নিজের ও পরিবারের জন্য, গরিব ও দুর্বলদের জন্য, মাজলুম ও মাহবুসের (কারাবন্দী) জন্য, সবার জন্য খরচ করতে পারে। তাই খলিফার জন্য বৈধ যে, তিনি শরিয়ত নির্দেশিত পন্থায় ধনীদের থেকে সম্পদ নিতে পারবেন। যেমন: সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার জন্য, দ্বীন ও শরিয়ত রক্ষা করার জন্য, মাজলুমদের উদ্ধার করার জন্য। তবে এটা তখন, যখন বাইতুল মালে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ থাকবে না। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে আগ্রহীদের জন্য ফিকহের কিতাব দ্রষ্টব্য।

***

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় হলো, অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। যাকে আরবিতে 'সিয়াসাতে দাখিলি' বলা হয়। এই মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা ও বিষয়বস্তু কুরআনে কারিমে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। এ মন্ত্রণালয়ের মূল কাজ হলো—দেশে শান্তি নিশ্চিত করা, অন্যায়-অবিচার রোধ করা, জনগণকে তার প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া। এ মন্ত্রণালয়ের বড়ো বড়ো মৌলিক ৬টি দায়িত্ব রয়েছে:

০১. দ্বীন ও ধর্ম রক্ষা করা

শরিয়ত, দ্বীন ও ধর্ম রক্ষা করার বিষয়ে খুব তাগিদ দিয়েছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

من بدل دينه فاقتلوه

'যে নিজের দ্বীন (ইসলাম) পরিবর্তন করে ফেলে, তাকে তোমরা হত্যা করো।'

এ হাদিসে দ্বীন ইসলাম পরিবর্তন করার বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে।

০২. জনগণের প্রাণ রক্ষা করা

এ কারণে আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে কিসাসের বিধান প্রণয়ন করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ

'কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন (র...) নিহিত রয়েছে।'[৩৫৫]

:: আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

'তোমাদের ওপর নিহতদের জন্য ফরজ করা হয়েছে কিসাস।'[৩৫৬]

---

[৩৫৫] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৭৮

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (٣٣)

'কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি প্রতিশোধগ্রহণের অধিকার দিয়েছি।'[৩৫৭]

০৩. আকল-বুদ্ধি রক্ষা করা

এ ব্যাপারে কুরআনে কারিম বলে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

'হে মুমিনগণ, মদ, জুয়া, মূর্তি, তির—এসব তো কেবল শয়তানের কর্মের নাপাকি। সুতরাং, তোমরা তা থেকে বিরত থাকো, যাতে সফলকাম হতে পারো।'[৩৫৮]

হাদিস শরিফে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

كل مسكر حرام ما آسكر كثيره فقليله حرام

'প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম। যা বেশি খেলে নেশা সৃষ্টি করে, তা অল্প হলেও হারাম।'

মানুষের মস্তিষ্ক, বিবেক-বুদ্ধি যাতে লোপ না পায় এজন্যই 'হদ্দে শারব' তথা হারাম পানের দণ্ডবিধির বিধান জারি করা হয়েছে।

০৪. বংশ রক্ষা করা

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা জিনার হদ জারি করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে তোমরা একশটি করে বেত্রাঘাত করো।'[৩৫৯]

০৫. ইজ্জত-আব্রুর হিফাজত করা

এই ইজ্জত-আব্রুর হিফাজতের জন্যই 'কাযিফকে' (অপবাদ আরোপকারীকে) ৮০টি বেত্রাঘাতের (হদ্দে কযফ) হুকুম আরোপ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

[৩৫৭] সূরা ইসরা, আয়াত : ৩৩

[৩৫৮] সূরা মায়িদা, আয়াত : ৯০

[৩৫৯] সূরা নূর, আয়াত : ২

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

'আর যারা সতী নারীদের অপবাদ দেয়, অতঃপর তারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তাহলে তাদের ৮০টি বেত্রাঘাত করো।'[৫৬০]

০৬. সম্পদ রক্ষা করা

এজন্য আল্লাহ তাআলা হাত কাটার বিধান আরোপ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)

'আর তোমরা পুরুষ ও নারী চোরের হাত কাটো তাদের কৃতকর্মের কারণে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শাস্তিস্বরূপ।'[৫৬১]

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, কুরআনের বিধিবিধান রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত করলে রাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল কল্যাণের ধারা উপচে পড়বে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন প্রশাসক, গভর্নরদের কাছে পাঠানো চিঠিতে অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয়ের বেশ কিছু মূলনীতি তুলে ধরেছেন। যেমন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আলা ইবনু হাজরামিকে বাহরাইনে পাঠিয়েছেন তখন বেশ বড়ো একটি চিঠি লিখেন। নিচে চিঠিটি তুলে ধরা হলো—

"বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

এই চিঠি মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ, যিনি নবী, উম্মি, কুরাইশি, তাঁর পক্ষ থেকে আলা ইবনু হাজরামি ও সাথে থাকা অন্যান্য মুসলিমদের জন্য। এটা মূলত একটি নির্দেশনামা, যা নবীজি তাদের উদ্দেশ্য পাঠিয়েছেন।

হে মুসলিমগণ, তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো। আমি আলা ইবনু হাজরামিকে তোমাদের আমির বানিয়েছি। তাকে আমি আদেশ করেছি, যাতে সে আল্লাহকে ভয় করে—যার কোনো শরিক নেই; এবং যাতে সে তোমাদের সাথে কোমল আচরণ করে, হকের ওপর চলে, তোমাদের মাঝে এবং অন্যান্যদের মাঝে কুরআনকে সামনে রেখে ইনসাফের সাথে ফায়সালা করে। আর আমি তোমাদেরকে আদেশ করছি, যাতে তোমরা তার আনুগত্য করো। যদি সে উল্লিখিত দায়িত্ব আদায় করে—বিচার করলে ইনসাফ করে, তার কাছে দয়া চাইলে দয়া করে, তাহলে তোমরা তার কথা শোনো, তার আনুগত্য করো, তাকে রাষ্ট্রীয় কাজে সাহায্য করো। কারণ, তোমাদের ওপর আমার আনুগত্যের হক আছে। এছাড়া এমন কিছু হক

---

[৫৬০] সূরা নূর, আয়াত : ৪

[৫৬১] সূরা মায়িদা, আয়াত : ৩৮

আছে, যা তোমরা পুরোপুরি কদর করতে পারবে না। আসলে বলে বোঝানো যাবে না যে, আল্লাহর হক ও তাঁর রাসুলের হক কত বড়ো।

শোনো, ব্যাপকভাবে সকল মানুষের ওপর, বিশেষ করে তোমাদের ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য, তাঁদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার হক আছে। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন—যারা আনুগত্যকে আঁকড়ে ধরে, অনুসৃত ব্যক্তির হক, শাসকের হককে গুরুত্বের সাথে দেখে, ঠিক তেমনিভাবে মুসলিমদের ওপর তাদের শাসকদের জন্য আনুগত্যসহ অন্যান্য হক রয়েছে। এই আনুগত্যের মাঝেই নিহিত রয়েছে সকল কল্যাণের উৎস, যা মানুষ পেতে চায়। এই আনুগত্যের মাঝেই রয়েছে সকল অনিষ্টতা থেকে মুক্তির পথ, যা থেকে মানুষ সুরক্ষা পেতে চায়।

আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি—কাউকে আমি মুসলিমদের ছোটো বা কোনো বড়ো দায়িত্ব দেওয়ার পর যদি সে তাদের মাঝে ইনসাফ না করে, তাহলে তার আনুগত্য করা হবে না। সে দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত। সে মুসলিমদের প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার ও দায়িত্ব থেকে মুক্ত।

অতএব, তোমরা (আমির) নির্বাচনের সময় আল্লাহর কাছে কল্যাণ চেয়ে নাও। ইস্তিখারা করো। তারপর নিজেদের মধ্য থেকে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে নিয়োজিত করো।

জেনে রাখো, যদি আলা ইবনু হাজরামি কোনো অন্যায় করে বসে, তাহলে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তোমাদের মাঝে আলা ইবনু হাজরামির জন্য আল্লাহর তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং, তোমরা তার কথা শোনো, আনুগত্য করো; যতক্ষণ না সে হকের ওপর থেকে সরে যায়। তোমরা আল্লাহ তাআলার বরকত, নুসরত, সাহায্য, সুস্থতা, হিদায়াত ও তাউফিকের সাথে থাকো।

যাদের সাথেই তোমাদের দেখা হবে তাদের দাওয়াত দাও—আল্লাহ তাআলার কিতাব, তাঁর বিধান, তাঁর রাসুলের বিধান, আল্লাহ তাআলা যা কুরআনে কারিমে হালাল করেছেন, তা হালাল হিসাবে মেনে নেওয়া এবং যা কিতাবে হারাম করেছেন, তা হারাম বলে মেনে নেওয়া এসবের দিকে। আর তারা যেন আল্লাহ তাআলার জন্য সমকক্ষ সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকে, শিরক ও কুফর থেকে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা করে, তাগুত, লাত, উজ্জার ইবাদাতকে অস্বীকার করে। ঈসা ইবনু মারইয়াম, উজাইর ইবনু হুরওয়া, ফেরেশতা, সূর্য, চাঁদ, আগুন, এছাড়া আরও অন্যান্য যে সকল জিনিসকে আল্লাহর পরিবর্তে গ্রহণ করা হয়—এ-সবের ইবাদাতকে ছেড়ে দেয়। তারা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা থেকে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা করেছেন, তা থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে।

তারা যদি এ সকল কাজ সম্পন্ন করে, স্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বন্ধুত্ব গ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ তাআলার কিতাবে থাকা যে সকল বিষয়গুলোর দিকে তোমরা তাদের ডাকো, সেগুলো তাদের সামনে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করো এবং বলে দাও—'এটা আল্লাহ তাআলার কিতাব, যা রুহুল আমিনের (জিবরাইল আ.) মাধ্যমে নাজিল করা হয়েছে বিশ্বজগতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহর ওপর, যিনি আল্লাহর রাসুল ও নবী, যাকে আল্লাহ বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছেন, সাদা হোক বা কালো, জিন হোক বা মানুষ। এটা এমন এক কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল বিষয়ের সংবাদ রয়েছে।

এ কিতাব নাজিল করা হয়েছে, যাতে সেটা মানুষের পরস্পরের মাঝে প্রতিবন্ধক হতে পারে, যা দ্বারা আল্লাহ তাআলা পরস্পরকে পরস্পরের খারাপ আচরণ থেকে, পরস্পরের ইজ্জত-আব্রু পরস্পরের হাত থেকে বিরত রাখবেন। এটা আল্লাহ তাআলার কিতাব, সকল কিতাবের ওপর ফায়সালাকারী—তাওরাত, ইনজিল ও জাবুরে যা এসেছে, তার সত্যায়নকারী। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তোমাদের সংবাদ দেন, যা তোমাদের হাত ছাড়া হয়ে গেলেও তোমাদের পূর্বপুরুষরা পেয়েছে। যাদের কাছে আল্লাহ তাআলার রাসুলগণ ও আম্বিয়ায়ে কিরাম এসেছেন, তারা কেমন জবাব দিয়েছিল তাদের রাসুলদেরকে, আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহকে তারা কেমন বিশ্বাস করেছিল, আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহ নিয়ে কেমন ছিল তাদের মিথ্যা প্রতিপন্নতা?

আল্লাহ তাআলার তাঁর এ কিতাবে উল্লেখ করেছেন, তাদের বংশ, তাদের কাজকর্ম এবং তাদের রাজা-বাদশাহদের কাজকর্ম, যাতে তোমরা তাদের মতো করা থেকে বিরত থাকতে পারো। আল্লাহ তাআলার কিতাবে বর্ণিত তাদের ওপর আপতিত কোনো শাস্তি, গজব, বা পাকড়াও যেন তোমাদের ওপর এসে না পড়ে, যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে তাদের বদ আমলের কারণে হয়েছিল। কারণ, তারা আল্লাহ তাআলার আদেশের ক্ষেত্রে শিথিলতা করেছিল।

তদ্রূপ আল্লাহ তাআলা তাঁর এ কিতাবে তাদের কথাও বলেছেন, যারা তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে নাজাত পেয়েছে, যাতে তোমরাও তাদের মতো আমল করতে পারো। আল্লাহ তাআলা তাঁর এ কিতাবে সবকিছুই উল্লেখ করেছেন তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহস্বরূপ। তোমাদের প্রতি মায়া ও মমতাস্বরূপ।

এ কিতাব গোমরাহি থেকে হিদায়াত দান করে, অন্ধত্ব থেকে স্পষ্ট করে, পদস্খলন থেকে রক্ষা করে, ফিতনা থেকে মুক্তির উত্তরণ করে, অন্ধকার থেকে আলোর পথ সুগম করে, যাবতীয় রোগ থেকে আরোগ্য দান করে, ধ্বংস থেকে রক্ষা করে, ভ্রষ্ট পথ থেকে সুপথ দেখায়, অস্পষ্টতা থেকে স্পষ্টতা দান করে, দুনিয়া থেকে আখিরাত পর্যন্ত কী কী হবে তা বলে দেয়।

এ কুরআনের মাঝেই রয়েছে তোমাদের দ্বীনের পূর্ণাঙ্গতা। অতএব, তোমরা যখন এসব বিষয় তাদেরকে বলবে, আর তারাও সেগুলো স্বীকার করে নেবে, তাহলে তারা 'ওলা' বা বন্ধুত্বকে পূর্ণাঙ্গ করে নিল।

সুতরাং, এখন তাদের সামনে ইসলাম পেশ করো। ইসলাম হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া, জাকাত আদায় করা, বাইতুল্লাহর জিয়ারত করা, রামাদানের রোজা রাখা, জানাবাত বা নাপাক অবস্থা (গোসল ফরজ হওয়ার অবস্থা) থেকে গোসল করা, নামাজের আগে পবিত্রতা অর্জন করা, মা-বাবার সাথে সদাচার করা, মুসলিমদের আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা, মুশরিক পিতামাতার সাথে সুন্দর আচরণ করা। তারা যদি এসব বিধান পালন করে, তাহলে তারা মুসলিম।

অতঃপর তাদের ঈমানের দিকে দাওয়াত দাও। তাদের সামনে ঈমানের হুকুম-আহকাম, ঈমানের মাআলিমের (নিদর্শন, বৈশিষ্ট্য) কিছু অংশ পেশ করো। ঈমানের মাআলিম দ্বারা উদ্দেশ্য—এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং এ সাক্ষ্য দেওয়া যে—মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল। আর মুহাম্মাদ যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য, এ-ছাড়া সব বাতিল ও মিথ্যা। আর আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতাগণ, কিতাব, রাসুল ও আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা এবং তার সামনে ও পেছনে যা কিছু হবে, তা বিশ্বাস করা। তাওরাত, ইনজিল, জাবুরের প্রতি বিশ্বাস করা। বদ আমল, নেক আমল, জান্নাত-জাহান্নাম, জীবন-মৃত্যু বিশ্বাস করা। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এবং মুমিনদেরদের সত্যায়ন করা। তারা যদি এগুলো করে এবং স্বীকার করে নেয়, তাহলে তারা মুসলিম ও মুমিন দুটোই।

তারপর তোমরা তাদের ইহসানের কথা বলো। তাদের ইহসান শিক্ষা দাও। অর্থাৎ তারা যেন আমানত আদায় করার ক্ষেত্রে, প্রতিশ্রুতি রক্ষার ক্ষেত্রে আন্তরিক হয়। যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তাঁর রাসুলকে দিয়েছেন, আর রাসুল মুমিনদের নেতা ও আমিরদের কাছে সোপর্দ করেছেন। আর খেয়ানতকারী থেকে—চাই হাত হোক বা মুখ—মুসলিমদের নিরাপত্তা দান করার ক্ষেত্রে, তারা যেন অন্যান্য মুসলিমের জন্য সেভাবেই কল্যাণ কামনা করে, যেভাবে মানুষ নিজের জন্য কামনা করে। আর তারা যেন আল্লাহ তাআলার ওয়াদাসমূহ, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর শাস্তি দেওয়াকে বিশ্বাস করে। আর তারা যেন বিশ্বাস করে যে, যেকোনো সময় দুনিয়া থেকে চলে যেতে হতে পারে। প্রতিটি দিন শুরু করার আগে তারা যেন নফসের মুহাসাবা করে (হিসাব নেয়), দিন-রাত (আখিরাতের জন্য) পাথেয় সংগ্রহ করে। আল্লাহ তাআলা যা ফরজ করেছেন, সেগুলো যেন প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে আদায় করে। তারা যদি এগুলোও আমলে নেয়, তাহলে তারা মুসলিম, মুমিন ও মুহসিন।

তারপর তাদের সামনে কবিরা গুনাহগুলো তুলে ধরো। সেগুলো স্পষ্ট করো এবং তাদেরকে কবিরা গুনাহে পড়ে বরবাদ হওয়ার ভয় দেখাও। তাদেরকে বলো, এই কবিরা গুনাহই মানুষকে ধ্বংস করে। এগুলোর মধ্যে মারাত্মক কবিরা গুনাহ হলো—

০১. আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে শিরক করাকে মাফ করবেন না।'[৩৬২]

০২. জাদু। তবে জাদুকর কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না।

০৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা। আল্লাহ তাদের অভিশাপ দেন।

০৪. যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো। এরা তো আল্লাহ তাআলার গজব নিয়ে ফেরে।

০৫. গনিমতের সম্পদ চুরি করা। সে তার চুরিকৃত গনিমত নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে।[৩৬৩] কিন্তু, তাদের থেকে সেটা গ্রহণ করা হবে না।

০৬. মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করা। মুমিনকে হত্যার শাস্তি তো জাহান্নাম।[৩৬৪]

০৭. কোনো সতী নারীকে অপবাদ দেওয়া। এরা (অপবাদদানকারী) তো দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত।[৩৬৫]

০৮. ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা। এরা মূলত নিজেদের পেটে আগুন ভক্ষণ করে।

০৯. সুদ খাওয়া। তাহলে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা নিয়েনাও।[৩৬৬]

অতঃপর এরা যদি কবিরা গুনাহ থেকেও বিরত থাকে, তাহলে তারা হবে মুসলিম, মুমিন, মুহসিন ও মুত্তাকি। এটাই তাকওয়ার পূর্ণাঙ্গতা।

এখন, তোমরা তাদের ইবাদাতের কথা বলো। ইবাদাত মানে রোজা, নামাজে দাঁড়ানো, খুশু-খুজু, রুকু-সিজদা, ইয়াকিন (বিশ্বাস), ইনাবাত (আল্লাহ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন), ইহসান, তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা), তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ বলা), তাহমিদ (আলহামদু লিল্লাহ বলা), তাকবির (আল্লাহু আকবার

---

[৩৬২] সূরা নিসা, আয়াত : ৪৮
[৩৬৩] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬১
[৩৬৪] সূরা নিসা, আয়াত : ৯৩
[৩৬৫] সূরা নূর, আয়াত : ২৩
[৩৬৬] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭৯

করা), জাকাত দেওয়ার পরও সাদাকা করা, বিনয়, ক্লান্তি/পরিশ্রান্তি ও স্থিরতা, দুআ করা, কান্নাকাটি করা, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা, ইবাদাত করা, বেশি বেশি নেক আমল করা। তারা যদি এগুলোও আঞ্জাম দেয়, তাহলে তারা হবে মুসলিম, মুমিন, মুহসিন, মুত্তাকি ও আবিদ। আর এটাই ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা। তখন তোমরা তাদের জিহাদের দাওয়াত দাও এবং সেটা তাদের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরো। আল্লাহ তাআলা জিহাদের ফজিলতের কথা বলে যেভাবে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন, তোমরাও তাদের সেভাবে উদ্বুদ্ধ করো যে—এর প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট। তারা যদি এতেও সম্মত হয়, তাহলে তাদের বাইআত গ্রহণ করো এবং তাদের আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের বিধানের ওপর বাইআত গ্রহণের আহ্বান করো। তাদের বলো যে—তোমাদের ওপর রয়েছে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ও জিম্মাদারি এবং সাতটি দায়িত্ব। (দাউদ ইবনুল মুহাব্বার বলেন, এ কথার অর্থ হলো: আল্লাহ তাআলা সাতবার পূরণ করে দেবেন।)—

০১. তোমরা বাইআত ভাঙবে না;

০২. মুসলিমদের কোনো আমিরের আদেশও লঙ্ঘন করবে না। তারা যদি এ বিষয়ে সম্মতি জানায়, তাহলে তাদের হাতে বাইআত গ্রহণ করো এবং আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ইস্তিগফার করো।

তারা যখন আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর জন্য ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করার লক্ষ্যে জিহাদে বের হবে, তখন তাদের পুনরায় অনুরূপ দাওয়াত দাও; যেমন দাওয়াত তাদের ইতোপূর্বে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান, তাঁর ডাকে সাড়া দান, ইসলাম, ঈমান, ইহসান, তাকওয়া, ইবাদাত ও হিজরতের দাওয়াত।

যে ব্যক্তি তাদের অনুসরণ করবে, সেই হবে সাড়াদানকারী মুমিন, মুহসিন, মুত্তাকি, আবেদ ও মুহাজির। তার জন্য এ সুযোগ সুবিধা থাকবে, যা তোমাদের (মুসলিমদের) জন্য রয়েছে। একইভাবে তার ওপর ওই সকল দায়িত্ব অর্পিত হবে, যা তোমাদের ওপর অর্পিত হয়েছে।

আর যে ব্যক্তি তাদের ডাকে সাড়া দিতে অস্বীকার করবে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই চালিয়ে যেতে থাকো, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর দিকে তথা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের দিকে ফিরে আসে। আর যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করো এবং যাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দাও, তাদের সাথে এই চুক্তি পূর্ণ করো। আর চুক্তিবদ্ধদের মধ্য থেকে যে ইসলাম গ্রহণ করবে এবং তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, সেও তোমাদের মতো মুসলিম গণ্য হবে, তোমরাও তাদের মতোই মুসলিম হবে। কিন্তু এ চুক্তির পরও যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসবে, অথচ তোমরা চুক্তির

মেয়াদ (ও যাবতীয় বিষয়) তাদের স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছ, তাহলে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।

মোটকথা, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। যারা তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো। যারা তোমাদের বিরুদ্ধে বাহিনী একত্র করে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে বাহিনী একত্র করো। যারা তোমাদের ধ্বংস করে দিতে চায়, তোমরাও তাদের ধ্বংস করে দাও। যারা তোমাদের ঘায়েল করতে চায়, তোমরাও তাদের ঘায়েল করো। যারা তোমাদের ধোঁকা দেয়, তোমরাও তাদের ধোঁকা দাও, তবে সীমালঙ্ঘন করা যাবে না। যারা তোমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো, তবে সীমালঙ্ঘন করা যাবে না—প্রকাশ্যে হোক বা অপ্রকাশ্যে। কারণ, কেউ অত্যাচারিত হওয়ার পর যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাহলে তার কোনো দোষ নেই। তবে জেনে রাখো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের সাথে আছেন। তিনি তোমাদের দেখছেন, তোমাদের কৃতকর্ম দেখছেন এবং তোমরা যা করো, তার সবকিছুই তিনি জানেন।

সুতরাং, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সতর্ক থাকো। কারণ, এই দ্বীন আমার কাছে আমানত, যা আমাকে আমার রব দান করেছেন, যাতে আমি এই দ্বীন তাঁর বান্দাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, যাতে এটা আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের সামনে কৈফিয়ত হয়ে যায় এবং প্রমাণ হিসাবে বাকি থাকে; যা তিনি সৃষ্টিকুলের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে পেশ করতে পারবেন, যাদের কাছে এই কিতাবের বার্তা পৌঁছেছে।

যে কেউ এই কিতাব অনুযায়ী আমল করবে, সে নাজাত পাবে। যে এই কিতাব অনুসরণ করবে, সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। যে এই কিতাবের জন্য ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে, সে সফল হবে। যে এই কিতাবের জন্য লড়াই করবে, সে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু যে এই কিতাব ছেড়ে দেবে, সে এই কিতাবের দিকে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট থাকবে।

অতএব, তোমরা ভালো করে জেনে নাও, এই কিতাবে কী কী আছে। অতঃপর তোমাদের কানকে শোনাও, তোমাদের অন্তরে ধারণ করো, তোমাদের হৃদয়ে হিফাজতে রাখো। কারণ, এই কিতাব চোখের জন্য নূর, হৃদয়ের জন্য বসন্ত বাহার, অন্তরের জন্য শিফা। আদেশ-নিষেধ, শিক্ষা ও উপদেশ হিসাবে এবং হারাম থেকে বিরত রাখার জন্য, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পথে দাওয়াত দেওয়ার জন্য এতুটুকই যথেষ্ট। এটাই ওই কল্যাণ যাতে কোনো অকল্যাণ নেই।

এই পত্র মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত—যিনি আল্লাহর রাসুল ও নবী—আলা ইবনু হাজরামির উদ্দেশ্যে, যাকে তিনি বাহরাইনের গভর্নর হিসাবে

এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে দাওয়াত দেবে। অর্থাৎ, হালালের আদেশ এবং হারাম থেকে নিষেধ করবে, মানুষকে কল্যাণের পথ দেখাবে এবং ভ্রষ্টতার পথ থেকে নিষেধ করবে। এই পত্রে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলা ইবনু হাজরামি ও তার খলিফা খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ সাইফুল্লাহর প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন। এই পত্রের নির্দেশাবলি কেবল এই দুজনকে লক্ষ্য করে নয়, বরং তাদের সঙ্গী-সাথি অন্যান্য মুসলিমদের লক্ষ্য করেও বলা হয়েছে। এই পত্রের কোনো কিছু অমান্য করার ক্ষেত্রে তাদের কোনো ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না।

এমনকি স্বয়ং দায়িত্বশীলের ওজরও নয়। অতএব, যে কারও কাছেই এই পত্র পৌঁছবে, তার আর কোনো ওজর বাকি থাকবে না, প্রমাণও থাকবে না। এই পত্রে যা যা বিষয় উল্লেখ রয়েছে, তার কোনো কিছু সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকার ওজরও গ্রহণ করা হবে না।”

এই পত্রটি লেখা হয়েছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (মদিনায়) আবির্ভাবের চার বছর পর পূর্ণ হওয়ার দুই মাস পূর্বে—জিলকদ মাসের তিন তারিখ। পত্রটি লেখার সময় প্রত্যক্ষ করেছেন ইবনু আবি সুফইয়ান। আর উসমান ইবনু আফফান তাকে বলে দিচ্ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসা ছিলেন, (আর সাথেই পাশে আরও ছিলেন) মুখতার ইবনু কাইস কুরাইশি, আবু জর গিফারি, হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান আবসি, কাসি ইবনু আবু উমাইর, হুমাইরি, শাবিব ইবনু আবু মারসাদ গাসসানি, মুসতানির ইবনু আবি সাসা খুজায়ি, আওয়ানা ইবনু শামাখ, জুহানি, সাদ ইবনু মালিক আনসারি, সাদ ইবনু উবাদা আনসারি, জায়িদ ইবনু আমর।

আর বাকি যারা উপস্থিত ছিলেন, তারা হলেন—নকিবগণ (আমিরগণ)—কুরাইশ গোত্রের একজন, জুহাইনা গোত্রের একজন, আর চারজন আনসারি সাহাবি। এরা সবাই উপস্থিত ছিলেন, যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পত্রটি আলা ইবনু হাজরামি ও খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে দিচ্ছিলেন।[৩৬৭]

***

বিচার-ব্যবস্থা

ইসলামি শাসন-ব্যবস্থার তৃতীয় ভিত্তি হলো—বিচার-ব্যবস্থা। আরবিতে বলা হয় 'কাজা'।

কাজা কী?

'কাজা' শব্দের আভিধানিক অর্থ—মানুষের মাঝে ফায়সালা করা। আর কাজি অর্থ হাকিম, বিচারক। আর এর শরয়ি অর্থ হলো—মামলা-মোকদ্দমা বিশ্লেষণ করা, ঝগড়া-বিবাদ নিরসন করা। আর এটাই ইসলামে উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলকে সম্বোধন করে বলেছেন—

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

'আর আপনি তাদের মাঝে ওই বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করেন, যা আল্লাহ নাজিল করেছেন।'[৩৬৮]

তিনি আরও বলেন—

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ

'আর আপনি তাদের মাঝে ইনসাফের সাথে ফায়সালা করেন।'[৩৬৯]

তিনি আরও বলেন—

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّٰهُ

'নিঃসন্দেহে আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি সত্য সহকারে, যাতে আপনি মানুষের মাঝে ওই জ্ঞান অনুযায়ী ফায়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে প্রদর্শন করেছেন।'[৩৭০]

কাজার শরয়ি দৃষ্টিকোণ

সকল মাজহাবেই কাজা ফরজে কিফায়া। সুতরাং, একজন কাজি নির্ধারণ করা খলিফার ওপর কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইনসাফ কায়েমকারী হয়ে যাও।'[৩৭১]

কোনো কোনো উলামায়ে কিরাম বলেন—কাজা দ্বীনেরই একটি অংশ, যা মানুষের অনেকগুলো কল্যাণের উৎসের একটি। সুতরাং, এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া ওয়াজিব। কারণ এটা মানুষের খুব বেশি প্রয়োজন। এই কাজা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায়। এজন্যই আম্বিয়ায়ে কিরাম এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। ইবনু মাসউদ রা. বলেন—

لأن أجلس قاضيا بين اثنين أحب إلي من عبادة سبعين سنة

'সত্তর বছর ইবাদাত করার চাইতে আমার কাছে দুজনের মাঝে বিচার করাটা অধিক প্রিয়।'

অর্থাৎ, তিনি যদি একদিন ইনসাফের সাথে ফায়সালা করতে পারেন, তাহলে সেটা সত্তর বছর ইবাদাত করার চাইতেও শ্রেষ্ঠ হবে। একইভাবে ইনসাফ করা বড়ো বড়ো নেক আমল ও শ্রেষ্ঠতম আমলসমূহের অন্যতম। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤٢)

'আর যদি আপনি ফায়সালা করেন, তাহলে তাদের মাঝে ইনসাফের সাথে ফায়সালা করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।'372

তাহলে কোন জিনিস এমন আছে, যা আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার চাইতে শ্রেষ্ঠ?[৩৭৩]

নবীযুগে আদালত-ব্যবস্থা

যখন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করেন, যাতে তিনি মানুষের মাঝে ফায়সালা করেন ওই বিধান অনুযায়ী, যা আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন, দ্বীনি হোক বা দুনিয়াবি। এক্ষেত্রে বহু আয়াতে কারিমা এসেছে। যেমন মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

'আর আপনি তাদের মাঝে ফায়সালা করেন ওই বিধান অনুযায়ী, যা আল্লাহ নাজিল করেছেন।'[৩৭৪]

---

[৩৭১] সূরা নিসা, আয়াত : ১৩৫

[৩৭২] সূরা মায়িদা, আয়াত : ৪২

[৩৭৩] মুয়িনুল হুককাম।

মহান আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন—

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

'নিঃসন্দেহে আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি সত্য সহকারে, যাতে আপনি মানুষের মাঝে ওই জ্ঞান অনুযায়ী ফায়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে প্রদর্শন করেছেন।'[৩৭৫]

এই আয়াতগুলো থেকেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিচার-ব্যবস্থা উদঘাটন করেন। আর এভাবে ধীরে ধীরে ইসলামি রাষ্ট্রগুলোতে কাজা বা বিচার-ব্যবস্থা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থার রূপ ধারণ করে।

প্রথমে মুসলিমদের মাঝে কোনো নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে, অথবা পরস্পরের মাঝে কোনো বিরোধিতা দেখা দিলে সে বিষয়ে ইসলামি বিধান জানার জন্য সাহাবায়ে কিরাম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরণাপন্ন হতেন। তখন তিনি সে বিষয়ে কথা বলতেন। মূলত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন একজন শারে' (শরিয়ত পরিবর্তনকারী) কাজি, এবং মুনাফ্ফিজ (বাস্তবায়নকারী)। এর মাধ্যমে তিনি মূলত ইসলামি শাসন-ব্যবস্থার তিনটি ভিত্তি তথা, আইন ব্যবস্থা, বাস্তবায়ন ব্যবস্থা এবং বিচার-ব্যবস্থার মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিচার-ব্যবস্থার মূলনীতি ও নীতিমালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলে দিয়েছেন যে—কাজি যখন মামলা-মোকাদ্দমা শুনবে, তখন তার কথাবার্তা ও বেশভূষা কেমন হবে। আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ সুনানু আবি দাউদে আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর রা. থেকে বর্ণনা করেন—

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم ..

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেছেন—বাদী-বিবাদী দুজনই কাজির সামনে বসবে।'[৩৭৬]

সুতরাং, বসার ক্ষেত্রে উভয়কে সমান জায়গায় বসাতে হবে। তাদের কেউ যেন অপরের চেয়ে কাজির বেশি কাছাকাছি বসতে না পারে। তদ্রূপ উঁচু স্থানেও বসতে পারবে না। বরং বসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে, উভয়ে কাজির সামনাসামনি বসা, যেমনটি হাদিসে বলা হয়েছে। তাছাড়া এর মাধ্যমে যেমন শরিয়তের হুকুমের সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও বিনয় প্রকাশ পায়, তেমনি নিজেদের মাঝে সমান অধিকারও সাব্যস্ত করা যায়। তদ্রূপ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাদী-বিবাদীর মাঝে ভাষা-ভঙ্গি ও ইঙ্গিতেও ইনসাফ করার তাগিদ দিয়েছেন। যেমনঃ

[৩৭৫] সূরা নিসা, আয়াত : ১০৫

[৩৭৬] সুনানু আবি দাউদ, ৩৫৮৮

উম্মে সালামা রা. বর্ণনা করেন—

> من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل في لحظه ولفظه وإشارته ومقعده
> وفي رواية من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في المجلس والإشارة والنظر

> 'যে মুসলিমদের মাঝে বিচার করার পরীক্ষায় আপতিত হবে, সে যেন তার ভঙ্গি, উচ্চারণ, ইঙ্গিত ও বসার ক্ষেত্রে ইনসাফ করে। যে মুসলিমদের মাঝে বিচার করার পরীক্ষায় আপতিত হবে, সে যেন তাদের মাঝে বসা, ইঙ্গিত ও দৃষ্টিদানের ক্ষেত্রে ইনসাফ করে।'[৩৭৭]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাজিকে নিষেধ করেছেন, যাতে তিনি একজনের পরিবর্তে অন্যের ক্ষেত্রে আওয়াজ উঁচু না করেন। যেমন: ইমাম দারাকুতনি রাহিমাহুল্লাহর বর্ণনায় রয়েছে—

> من ابتلي بالقضاء بين الناس فلا يرفعن صوته على أحد ما لا يرفع على الآخر

> 'কেউ যদি মানুষের মাঝে বিচার করার পরীক্ষায় আপতিত হয়, তাহলে সে যেন কারও ক্ষেত্রে আওয়াজ উঁচু না করে, যতক্ষণ না সে অপরের ক্ষেত্রে আওয়াজ উঁচু করে।'[৩৭৮]

এই হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, বাদী-বিবাদীর মাঝে যতটুকু সম্ভব সমতা বিধান করা ওয়াজিব। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাদীকে বলতেন—সে যেন নিজের হকের চেয়ে বেশি কিছু না নেয়। যেমন: আবু সায়িদ খুদরি রা.-এর হাদিসে আছে। তিনি বলেন—

> أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك (رواه مسلم :باب استحباب الوضع من الدين)

> 'একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক লোক ফল ব্যবসায় খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে তার ঋণ অনেক হয়ে ওঠে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা এ লোককে সাদাকা দাও। কিন্তু সবাই সাদাকা দেওয়ার পরও তার ঋণের পরিমাণ সম্পদ হলো না। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঋণদাতাকে বললেন, তোমরা যতটুকু পাচ্ছ ততটুকুই নাও। (যেহেতু

[৩৭৭] সুনানে দারাকুতনি, ৪৪৬

[৩৭৮] সুনানু দারাকুতনি, ৪৪৭

> সে দেউলিয়া হয়ে গেছে, তার কাছে আর কিছু নেই, তাই) এছাড়া তোমাদের কিছুই নেওয়ার অধিকার নেই।’[৩৭৯]

এখানে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঋণদাতাদের তাদের হকের চেয়ে বেশি কিছু নিতে নিষেধ করেছেন। তাদের হক ছিল, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে যা পাবে, তা নেওয়া। এ হাদিস থেকে বোঝা যায়—গরিব-নিঃস্ব ব্যক্তিকে ঋণের কারণে আটকে রাখা হবে না। বরং তালবাহানাকারী ধনী ব্যক্তিকে আটক করা হবে। যেমন: নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

مطل الغني ظلم

‘ধনী ব্যক্তির তালবাহানা করা অন্যায়, জুলুম।’[৩৮০]

মদিনাতে তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কোনো কাজি ছিল না। তিনি নিজেই কাজির দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তবে কখনো কখনো নিজের উপস্থিতিতে কোনো কোনো সাহাবিকে বিচারের দায়িত্ব দিয়েছেন, যাতে তাঁর অনুপস্থিতে বা তাঁর মৃত্যুর পর তারা এ মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারেন। আবার, তাদেরকে অন্যান্য শহরে কাজি হিসাবে পাঠানোর আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তিনি এমনটি করতেন।

ইমাম হাকিম রাহিমাহুল্লাহ তার *মুসতাদরাকে* উল্লেখ করেন—

একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দুই বিবাদী এলে নবীজি আমর রা.-কে বলেন—‘তুমি তাদের দুজনের মাঝে ফায়সালা করো।’

তখন আমর রা. বলেন—‘ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার উপস্থিতিতে আমি তাদের মাঝে ফায়সালা করব?’

নবীজি বললেন—‘হ্যাঁ! এ কথা স্মরণ করে ফায়সালা করো যে, যদি সঠিক ফায়সালা করো, তাহলে তোমার দশটি সাওয়াব হবে। আর যদি ইজতিহাদে ভুল করো, তাহলে তোমার একটি সাওয়াব।’

হাকিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন—হাদিসটির সনদ সহিহ। কিন্তু শাইখাইন তা উল্লেখ করেননি।[৩৮১]

ইমাম দারাকুতনি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন—

একবার একদল লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাঁশের তৈরি ঘরের বিষয়ে বিচার নিয়ে আসে, যা তাদের মাঝে শরিকানা ছিল। নবীজি

---

[৩৭৯] সহিহ মুসলিম, ১৫৫৬

[৩৮০] সহিহ বুখারি, ২৪০০ (رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه,باب مطل الغني ظلم)

[৩৮১] মুসতাদরাকে হাকিম, ৭০০৪

তাদেরকে হুজাইফা রা.-এর কাছে পাঠান। তিনি ওই ঘরটা তাদের পক্ষে ফায়সালা করেন, যাদের নিয়ন্ত্রণে বাঁশ বাঁধার রশি ছিল। পরে তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গিয়ে খবর দেন। নবীজি তাকে বলেন—তুমি সঠিক ফায়সালা করেছ বা উত্তম ফায়সালা করেছ।[৩৮২]

যাইহোক, সময় গড়াতে গড়াতে একসময় ইসলামি রাষ্ট্রের পরিধি যখন আরও বৃদ্ধি পেল, প্রশাসকদের রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় পাঠানোর প্রয়োজন দেখা দিল, তখন বিচার-ব্যবস্থাও প্রশাসকদের এলাকা পরিচালনা করার দায়িত্বের একটি অংশ ছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি রা.-কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বললেন—

علمهم الشرائع واقض بينهم

'তাদের শরিয়তের বিধিবিধান শেখাও এবং তাদের মাঝে ফায়সালা করো।'

আলি রা. বললেন—'আমার তো কাজার বিষয়ে কোনো জ্ঞানই নেই।'

তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি রা.-এর বুকে মৃদু আঘাত করে বললেন—

اللهم اهده للقضاء

'আল্লাহ আপনি তাকে কাজার জন্য পথ দেখিয়ে দেন।'[৩৮৩]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি রা.-কে বিচার-ব্যবস্থাও শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আলি রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—

بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء فقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من كما سمعت من الاول فانه أحرى أن يتبين لك القضاء قال فما زلت قاضيا أو ما سكت في

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ইয়ামানে কাজি হিসাবে পাঠানোর কথা বললে আমি বললাম—'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে আপনি (কাজার জন্য) পাঠাচ্ছেন, অথচ আমি এখনো অপ্রাপ্তবয়স্ক? তাছাড়া আমার তো কাজার বিষয়ে জ্ঞানও নেই।'

তখন নবীজি বললেন—'নিঃসন্দেহে, আল্লাহ তোমার অন্তরকে (কাজার) পথ দেখিয়ে দেবেন। তোমার মুখকে জোরালো করে দেবেন। শোনো, যখন তোমার

৩৮২ সুনানে দারাকুতনি, ৪৫৪৫

৩৮৩ মুসতাদরাকে হাকিম, ৭০০৩

সামনে বাদী-বিবাদী বসবে, তখন একজনের কথা শুনে অপরজনের কথা শোনার আগেই ফায়সালা করো না। কারণ, বিচারের ধরনটা কেমন হবে সেটাও তোমার সামনে স্পষ্ট হওয়া খুবই প্রয়োজন।'

আলি রা. বলেন—'এরপর থেকে আমি আজীবন কাজির কাজ করেছি কিংবা (বলেছেন) এরপর আমি আর কখনো কোনো বিচারে সন্দেহগ্রস্ত হই নি।'[৬৮৪]

ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেন—

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.-কে নাজরানে কাজি হিসাবে পাঠান। ঘটনা হচ্ছে—নাজরানের প্রতিনিধিদল একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আবদার করল, তিনি যেন তাঁর পছন্দমতো এক সাহাবিকে তাদের সাথে পাঠান, যে তাদের মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে ফায়সালা করে দেবে। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু উবাইদা রা.-কে ডেকে বললেন—

اخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه

'তুমি তাদের সাথে বের হয়ে পড়ো। তাদের মাঝে কোনো মতবিরোধ দেখা দিলে ইনসাফের সাথে তাদের মাঝে ফায়সালা করো।'

তদ্রূপ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনু উসাইদ রা.-কেও মক্কা বিজয়ের পর মক্কার প্রশাসক ও কাজি নিযুক্ত করেন।

নবীযুগে 'কাজা'র উৎস

নবীযুগে কাজার উৎস ছিল তিনটি। যথা—

- ০১. ওহিয়ে জলি, তথা কুরআন;
- ০২. ওহিয়ে খফি, তথা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে সকল বাণী, কর্ম ও স্বীকারোক্তি প্রকাশিত হয়েছে।
- ০৩. ইজতিহাদ, যা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম রা. থেকে প্রকাশিত হতো। তবে সেটাও ওহি মোতাবেক হতো।

অর্থাৎ, ইজতিহাদ যদি শরিয়ত ও দ্বীন মোতাবেক হতো, তাহলে আল্লাহ তাআলা সম্মতি জানাতেন। অর্থাৎ, ওহির মাধ্যমে সম্মতি পাওয়া যেত। আর ইজতিহাদ ওহি মোতাবেক না হলে ওহিয়ে জলি সেটা নাকচ করত এবং সঠিক ফায়সালাটি স্পষ্ট করে দিত। এই তিনটি উৎসের ক্ষেত্রে সবাই একমত এবং এগুলো বহু দলিল দ্বারা প্রমাণিত।

এরমধ্য থেকে কিছু দলিল পেশ করা হলো:

---

[৬৮৪] সুনানু আবি দাউদ, ৩৫৮৩

:: মুআজ রা.-এর হাদিস
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুআয রা.-কে ইয়ামানে পাঠাবেন, তখন তাকে বললেন—

كيف تقضي إذا عرض لك قضاء

'তোমার সামনে যদি কোনো বিচার পেশ করা হয়, তাহলে কীভাবে ফায়সালা করবে?'

মুআজ রা. বললেন—'আল্লাহ তাআলার কিতাবের মাধ্যমে।'

নবীজি বললেন—

فإن لم تجد في كتاب الله

'যদি আল্লাহ তাআলার কিতাবে না পাও, তাহলে?'

মুআজ রা. বললেন—'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের মাধ্যমে।'

নবীজি বললেন—

فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله

'যদি আল্লাহর কিতাবেও না পাও, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতেও না পাও, তাহলে?'

মুআজ রা. বললেন, 'আমি নিজে ইজতিহাদ (গবেষণা) করব। এক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি করব না।' তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম মুআয রা.-এর বুকে হাত দিয়ে বললেন—

الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله(رواه أبو داود وغيره)

'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আল্লাহর রাসুলের রাসুলকে (প্রতিনিধি) তাউফিক দিয়েছেন এমন চিন্তার, যা রাসুলুল্লাহ পছন্দ করেন।'[৩৮৩]

:: উম্মু সালামা রা.-এর বর্ণনা
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন দুই ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যারা মিরাস ও পুরোনো আসবাব নিয়ে ঝগড়া করছিল। তখন তিনি বলেন—

إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه (رواه أبو داود)

---

[৩৮৩] সুনানু আবি দাউদ, ৩৫৯২

'আমি কেবল ওই বিষয়ে তোমাদের মাঝে নিজের চিন্তা অনুযায়ী ফায়সালা করি, যে বিষয়ে আমার ওপর নাজিল হয় নি।'[৪৮৬]

:: আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.-এর হাদিস

তিনি বলেন—

> من عرض له قضاء فليقض بما في كتاب الله فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله عز وجل فليقض بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله عز وجل ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قاله صالحون فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يخط به نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه فإن لم يحسن فليقر ولا يستحي

'কারও সামনে কোনো বিচার পেশ করা হলে সে যেন আল্লাহ তাআলার কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে। কিন্তু যদি তার কাছে এমন বিষয়ে বিচার নিয়ে আসা হয়, যা আল্লাহ তাআলার কিতাবে নেই, তাহলে সে যেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পন্থায় ফায়সালা করে। কিন্তু যদি বিষয়টি এমনই হয় যে—সেটা কিতাবুল্লাহতেও নেই, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ফায়সালা করেন নি, একইভাবে ভালো কোনো আলিমও ফায়সালা করেন নি, তাহলে সে যেন নিজের চিন্তা অনুযায়ী ইজতিহাদ করে। কিন্তু তার ইজতিহাদ যদি তার কাছে উপযুক্ত মনে না হয়, তাহলে সে যেন মুখে স্বীকার করে নেয়, লজ্জা না পায়।'[৪৮৭]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইজতিহাদ এবং সাহাবায়ে কিরামকে ইজতিহাদ করার অনুমতি দেওয়ার হিকমত হলো, এই দ্বীন ও শরিয়ত সর্বশেষ শরিয়ত তথা মানুষের দ্বীন হিসাবে কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। তাই, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাহকে ইসতিনবাত তথা হুকুম-আহকাম উদঘাটনের পদ্ধতি শেখাতে চেয়েছেন। এর মাধ্যমে যেন তাদের অনুশীলন হয়ে যায়, কীভাবে দলিল-প্রমাণ থেকে হুকুম-আহকাম উদঘাটন করতে হবে। কারণ, ইসলামের মূলনীতি ও নীতিমালা একেবারে সবকিছু—ছোটো থেকে ছোটো, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে নি। কেননা, জীবন-জগতের ঘটনাপ্রবাহ সদা চলমান। এটা নির্দিষ্ট কোনো স্থানে থেমে থাকে না। তাই দেখা যায়, প্রত্যেক যুগেই এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যা পূর্ববর্তী যুগের মানুষ কল্পনাও করতে পারত না।

---

[৪৮৬] সুনানু আবি দাউদ, ৩৫৮৫

[৪৮৭]

এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা কর্তব্য, নবীজির কাজা সম্পর্কিত হাদিসগুলো দেখলে বোঝা যায়, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিচার-ব্যবস্থা পালন করেছেন একজন বিচারকের ভিত্তিতে, তিনি নবী এই ভিত্তিতে নয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন একজন শরিয়ত প্রণেতা, বিচারক এবং বাস্তবায়নকারী। এর মাধ্যমে তিনি আইন প্রবর্তন, বাস্তবায়ন এবং বিচার-ব্যবস্থার মাঝে সমন্বয় করেছেন। নবীজির আইন প্রবর্তন ছিল রাসুল হওয়ার ভিত্তিতে, বিচারক হওয়ার ভিত্তিতে নয়। আর এই আইন প্রণয়নের দায়িত্বটি তার মৃত্যুর মাধ্যমেই শেষ হয়ে গেছে। তবে আইন-কানুন বাস্তবায়ন ও বিচার-ব্যবস্থা এ দুটোর দায়িত্ব ছিল ব্যাপক, যাতে নবীজির মৃত্যুর পর তার খলিফারা সে দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারে। কারণ, এটা এমন একটি কাজ, যার প্রয়োজন ব্যাপক ও সামষ্টিক।

খিলাফতে রাশিদার যুগে বিচার-ব্যবস্থা

১১ হিজরি (৬৩২ খ্রিস্টাব্দে) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু তথা তিনি রফিকে আলার সান্নিধ্যে যাওয়ার পর এবং আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর বাইআতের পর থেকেই খিলাফতে রাশিদার সূচনা। ৪০ হিজরিতে (৬৬১ খ্রি.) আলি ইবনু আবি তালিব রা.-এর শাহাদাত বরণ করা পর্যন্ত এই খিলাফতে রাশিদা অব্যাহত ছিল।

নবীযুগের পর এই খিলাফতে রাশিদাই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ ছিলে, যা মূলত বিচার-ব্যবস্থা, বিধিবিধান বাস্তবায়ন, আল্লাহ তাআলার দ্বীন ও শরিয়তকে আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে নবীযুগের কাছাকাছি ছিল। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, খিলাফতে রাশিদার যুগে জাজিরাতুল আরবের বাহিরেও ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল, বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য বিজয় হয়েছিল, ইসলামে মানুষ দলে দলে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু এই বিজিত দেশগুলোর অবস্থা তো আর হিজাজ ও জাজিরাতুল আরবের মতো ছিল না। নওমুসলিমদের অবস্থা তো মুহাজির-আনসার সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্য আরব কাবিলার মতো ছিল না। ফলে প্রত্যেকের ঈমানের স্তরে ব্যবধান হয়ে গেল, শরিয়ত আঁকড়ে ধরার মানসিকতা বেশ কমে গেল। এজন্য খুলাফায়ে রাশিদিন এই নতুন নতুন পরিবর্তনগুলোকে আমলে আনলেন। তারা নতুন করে কুরআন-হাদিসের আলোকে মূলনীতি, নীতিমালা ও অন্যান্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন, যার মাধ্যমে মানুষের হক রক্ষা পাবে, ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে, জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু হিফাজতে থাকবে, যাতে মুসলিমরা এক সরল দ্বীনের প্রশান্ত ছায়ায় বসবাস করতে পারে এবং তার কল্যাণ উপভোগ করতে পারে। এটা শুধু কথায় নয়, বরং বাস্তবেও তারা করে দেখিয়েছেন।

আবু বকর রা.-এর যুগে বিচার-ব্যবস্থা

আবু বকর রা.-এর যুগ ছিল খিলাফতে রাশিদার প্রথম যুগ। তাই, নবীযুগের সাথে তার সম্পর্ক ও নৈকট্য অত্যন্ত নিবিড় ছিল। তার যুগে বিচার-ব্যবস্থা হুবহু ওই রকম ছিল, ঠিক যেমন ছিল নবীযুগে। যখন কোনো বিচারের প্রয়োজন হতো, তখন তিনি নিজেই বিচার করতেন। তিনি বিচার-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে পৃথক করেন নি। সে সময় বিচার-ব্যবস্থার আলাদা কোনো পদও ছিল না। বরং তা রাষ্ট্র পরিচালনারই একটি অংশ ছিল, ঠিক যেমন ছিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে। তবে তিনি মাঝে মাঝে বিশেষ কোনো বিচারে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করতেন। যেমন: মদিনা মুনাওয়ারাতে বিচারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন উমার রা.-কে, তবে সেই বিচার-ব্যবস্থার আলাদা কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

আবু বকর রা. অধিকাংশ প্রশাসক ও কাজিকে আপন পদেই বহাল রেখেছেন, যাদেরকে স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিযুক্ত করেছেন।

আবু বকর রা.-এর যুগে বিচার-ব্যবস্থার উৎস—

০১. কুরআনে কারিম;

০২. সুন্নাতে নববি, যার মাঝে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচার-ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত;

০৩. ইজমা;

০৪. ইজতিহাদ ও রায়।

তবে এই চতুর্থ প্রকার তখনই, যখন কোনো বিষয় কিতাবুল্লাহ বা সুন্নাতে রাসুল অথবা ইজমায়ে উম্মাহর মাঝে না পাওয়া যায়।[৩৮৮]

উমার রা.-এর যুগে বিচার-ব্যবস্থা

উমার রা.-এর যুগে ইসলাম যখন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে, রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তৃত হয়, খলিফার রাষ্ট্রীয় দায়িত্বও বৃদ্ধি পায়, বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের কাজ বেড়ে যায়, পরস্পরের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ বেশি দেখা দেয়। তখন উমার রা. বিচার-ব্যবস্থাকে আলাদা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চিন্তা করেন, যাতে প্রশাসক প্রশাসনের দায়িত্ব ভালোভাবে আঞ্জাম দিতে পারেন। তাই, উমার রা. বিভিন্ন শহরে কাজিদের নিয়োগ দেন। যেমন: কুফা, বসরা, শাম, মিসর। তিনি শুরাইহ রা.-কে কুফায়, উবাদা ইবনু সামিত রা.-কে শামে কাজি হিসাবে নিযুক্ত করেন (যিনি বাইআতে আকাবায়ে নির্ধারিত ১২ জন নকিবের একজন ছিলেন)।

উমার রা. একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাব ইবনু সুরকে বসরার শাসক হিসাবে প্রেরণ করেন। ঘটনাটি হলো—একবার কাব রা. উমার রা.-এর কাছে বসা ছিলেন।

---

[৩৮৮] ওকাইয়ে নাদওয়াতুল নুযুমিল ইসলামিয়্যা, ১/৩৯০

তখন এক নারী এসে বলল, 'আমি আমার স্বামীর চাইতে শ্রেষ্ঠ আর কোনো পুরুষকে দেখি নি। তিনি রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েন, দিনে রোজা রাখেন।'

তখন উমার রা. তার জন্য ইস্তিগফার করে বললেন—'তোমার মতো নারী ভালোই। তুমি নিজের স্বামীর প্রশংসা করেছ।'

ওই নারী তখন লজ্জা পেয়ে চলে যেতে লাগল। এটা দেখে কাব রা. বলে উঠলেন—'আমিরুল মুমিনিন, যদি তাকে তার স্বামীকে নিয়ে আসতে বলতেন!'

উমার রা. বললেন—'কেন সেটাই কি তার ইচ্ছা ছিল?'

কাব বললেন—'হ্যাঁ।'

তিনি বললেন—'নারীটিকে ফিরিয়ে আনো।'

তাকে ফিরিয়ে আনা হলে উমার রা. বললেন—'তুমি যা বলতে চাচ্ছিলে তা সত্য সত্য বলো, কোনো অসুবিধা নেই। সে (কাব) বলছে যে, তুমি অভিযোগ করতে এসেছ।'

তখন ওই নারী বলল—'হ্যাঁ, আমি একজন যুবতী নারী। অন্যান্য নারীদের মতো আমারো কিছু কামনা থাকা স্বাভাবিক।'

(এ কথা শুনে) উমার রা. তার স্বামীকে আসতে বললেন, আর কাবকে বললেন—'তুমিই তাদের মাঝে ফায়সালা করো'।

তিনি বললেন—'আমার মতে, নারীকে প্রত্যেক চারদিনে একদিন সুযোগ দেওয়া হবে। অর্থাৎ, ধরা হবে তার চারজন স্ত্রী আছে। কিন্তু যেহেতু এই নারী ছাড়া তার আর কোনো স্ত্রী নেই, তাই বাকি তিনদিন তার জন্য। সে এই তিনদিন ইবাদাত-বন্দেগি করবে, আর নারীর জন্য একদিন থাকবে। তখন উমার রা. বলে উঠলেন—

> والله ما رأيك الأول بأعجب الي من الآخر اذهب فأنت غاضب على البصرة..
>
> 'আল্লাহর কসম! (বুঝতে পারছি না) তোমার কোন মতটা বেশি মুগ্ধকর! যাও, (এখন থেকে) তুমি বসরার কাজি।'[৩৮১]

উমার রা.-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি বিচার-ব্যবস্থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থার রূপ দান করেছেন, যা রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে আলাদা। একইভাবে তিনিই সর্বপ্রথম কাজিদেরকে বাইতুল মাল থেকে ভাতা দেওয়ার প্রথা চালু করেন।

উসমান রা.-এর যুগে বিচার-ব্যবস্থা

উমার রা.-এর যুগে বিচার-ব্যবস্থা যেমন ছিল, উসমান রা.-এর যুগেও তাই ছিল। উমার রা. আল্লাহ তাআলার তাউফিকে, নিজের মেধা ও প্রতিভা কাজে লাগিয়ে বিচার-ব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নিয়েছেন। ফলে তার কিছু মূলনীতি ও নীতিমালা

[৩৮১] তারিখু কুজাতিল আন্দালুস. ৪১

উসমান রা.-এর আগেই তৈরি হয়েছিল, যা থেকে উসমান রা. কাজি নিয়োগ করা, তাদের ভাতা দেওয়া, তাদের শুধু বিচারের দায়িত্ব প্রদান করা, কাজির গুণাবলি ও করণীয়, কাজা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধানের উৎস এবং ওই সমস্ত দলিল-প্রমাণাদি যার ওপর কাজার ভিত্তি ছিল—এ সকল বিষয়ে উমার রা.-এর বিচার-ব্যবস্থার মূলনীতি থেকে উসমান রা. বেশ উপকৃত হয়েছেন।[৩৯০]

নববি যুগ এবং আবু বকর ও উমার রা.-এর যুগে কাজিদের আলাদা কোনো বসার স্থান ছিল না। কাজি সাহেব মামলা-মোকদ্দমা দেখতেন। এরপর প্রায় সময় মসজিদে কিংবা নিজের ঘরে অথবা সাধারণ কোনো জায়গায় বিচারের ফায়সালা করতেন। কারণ, তখন এত বেশি মামলা-মোকদ্দমা ছিল না। কিন্তু উসমান রা.-এর যুগে তিনি কাজির জন্য আলাদা একটি ঘর তৈরি করলেন, যা কাজার জন্য নির্দিষ্ট ছিল; যাতে মসজিদ শোরগোল থেকে দূরে থাকে, বেহুদা কাজ ও কথা থেকে মসজিদকে পবিত্র রাখা সম্ভব হয়।

অতএব, উসমান রা.-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি মদিনায় কাজার জন্য আলাদা একটি ঘর নির্মাণ করেন। এরপর বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। তবে এটা দ্বারা এরূপ বোঝায় না যে, সাধারণ মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি মসজিদে বা নিজের ঘরে করা নিষেধ। এটা শুধু একটি নিয়ম হয়ে গিয়েছে যে, বিচার-ব্যবস্থা হবে তার নির্দিষ্ট স্থানে বা আদালতে।[৩৯১]

আলি রা.-এর যুগে বিচার-ব্যবস্থা

আলি রা.-এর যুগে বিচার-ব্যবস্থা পূর্ববর্তী খলিফাদের পদ্ধতিতেই ছিল। তবে আলি রা. বিচারালয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলাদা কিছু সময় ব্যয় করতেন; যদিও তখন মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল ধরে। তার আলাদা সময় দেওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার একটি পত্র থেকে, যা তিনি মিসরের প্রশাসক আশতার ইবনু নাখায়ির কাছে পাঠিয়েছেন, সেখানে তিনি বলেছেন—

> ‘অতঃপর তুমি তোমার জনগণের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে বিচারের জন্য নির্বাচন করো। এমন ব্যক্তি—

- ০১. যাকে মামলা-মোকদ্দমা কাবু করতে পারবে না।
- ০২. যার সাথে বাদী-বিবাদীরা কথা কাটাকাটি করার সাহস পাবে না।
- ০৩. যে বারবার ভুল করে বসে না।
- ০৪. যে ভুল ফায়সালা করার পর সত্য জানলে সেটা প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করে না।

---

[৩৯০] মাওসুআতুস সিয়ার, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৩৩

[৩৯১] তারিখুল কুজাতি ফিল ইসলাম, ১০৬

- ০৫. যে কোনো প্রলোভনের আশা করে না।
- ০৬. যে সামান্য কথা শুনেই বিচার শুরু করে দেয় না, বরং শেষ পর্যন্ত সবকিছু শোনে।
- ০৭. অস্পষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে যার জ্ঞান বেশি।
- ০৮. যে সব ক্ষেত্রে দলিল-প্রমাণাদি জানতে ইচ্ছুক।
- ০৯. যে দ্বিতীয়বার বিচার-নিরীক্ষণ করতে বিতৃষ্ণা হয় না।
- ১০. যে ঘটনার খুঁটিনাটি বের করার বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করতে পারে।
- ১১. যে বিচার করার সময় কঠোর থাকে, তবে অহংকারের সাথে নয়।
- ১২. যাকে কোনো প্ররোচনা টলাতে পারে না।

এরকম মানুষ অবশ্য খুবই কম। তারপরও তুমি তার বিচারকার্য বেশি বেশি পর্যবেক্ষণ করো। আর তাকে এ পরিমাণ ভাতা দাও, যাতে তার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়, একই সাথে মানুষের কাছে যাওয়ার প্রয়োজনও কমে যায়। আর তাকে এমন মর্যাদা দাও, যা তোমার বিশিষ্টজনেরাও আশা করে না, যাতে সে এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারে যে, তোমার কাছ থেকে তার এই পদ কেউ কেড়ে নেবে না।'[৩৯২]

এই পত্র থেকে বোঝা যায়—একজন কাজির কী কী গুণ থাকবে, তার ওপর কী কী অপরিহার্য, বিচারের সময় তাকে কীভাবে কথা বলতে হবে (সংক্ষিপ্ত কথা তবে বিরক্তিকর নয়)। চিঠিটি মূলত বিচার-ব্যবস্থার বিষয়ে আলি রা.-এর সর্বোচ্চ গুরুত্ব তুলে ধরে এবং তার সুচিন্তা ও জ্ঞানের পূর্ণতা প্রমাণিত করে, বিশেষ করে বিচার-ব্যবস্থার বিষয়ে। এজন্যই আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে—

> كنا نتحدث أن اقوى أهل المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواه الحاكم في المستدرك
>
> 'আমরা আলোচনা করতাম যে, আলি রা. মদিনাবাসীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজি।'[৩৯৩]

আলি রা.-ই সর্বপ্রথম সাক্ষীদের আলাদা করেন। অর্থাৎ, সাক্ষীদের থেকে আলাদা আলাদা সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।

*মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা*তে আছে—'আলি রা.-ই সর্বপ্রথম সাক্ষীদের আলাদা করেন।'

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন—'আমি আলি রা.-এর বিচার অধ্যায়ে সনদ ছাড়া একটি ঘটনা পড়েছি। ঘটনাটি হলো—একবার এক নারীকে আলি রা.-এর সামনে পেশ করা হলো, যার বিরুদ্ধে জিনার অভিযোগ করা হয়েছে। সেই নারী

---

[৩৯২] শারহুন নাহজিল বালাগা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১০৩

[৩৯৩] মুসতাদরাকে হাকিম

ছিল ইয়াতিম, তাই সে এক লোকের কাছে থাকত। ইয়াতিম মেয়েটি যুবতী হয়ে গেল। লোকটির স্ত্রী ভয় পেয়ে গেল, না-জানি তার স্বামী আবার ওই যুবতীকে বিয়ে করে ফেলে। তাই, সে কয়েকজন নারীকে নিয়ে ওই ইয়াতিম যুবতীকে এক জায়গায় আটকে রাখল। আর সেই স্ত্রী নিজের আঙুল দিয়ে ওই যুবতীর কুমারিত্ব নষ্ট করে ফেলল। পরে যখন তার স্বামী আসে, তখন সেই স্ত্রী ওই যুবতীর বিরুদ্ধে জিনার অপবাদ দেয়। প্রমাণ হিসাবে ওই সব নারীকে উপস্থিত করে, যারা তাকে এই কাজে সাহায্য করেছিল।

সব শুনে আলি রা. স্ত্রী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি কোনো সাক্ষী আছে?' স্ত্রী লোকটি বলল, 'হ্যাঁ, এই নারীরাই আমার দাবির সাক্ষী।'

তখন আলি রা. তাদের উপস্থিত করলেন, সাথে তরবারিও সামনে এনে রাখলেন। তাদের আলাদা করলেন। এরপর প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ঘরে রাখলেন। তারপর লোকটির স্ত্রীকে ডেকে সব ধরনের চেষ্টা করলেন, কিন্তু স্ত্রী তার কথার ওপর অবিচল। তখন তাকে তার ঘরে ফিরিয়ে দিলেন, যেখানে তাকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল।

এবার একজন সাক্ষীকে ডাকলেন। আলি রা. হাঁটু গেড়ে বসে তাকে বললেন, 'দেখো, ওই নারী (স্ত্রী) যা বলার বলেছে, শেষে সত্য স্বীকার করেছে। আর তাকে আমি নিরাপত্তাও দিয়েছি। এখন তুমি সত্য কথা বলে ফেলো, না-হয় আমি কিছু একটা ব্যবস্থা নেবই নেব।' তখন নারীটি ভয়ে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমার কোনো দোষ নেই। ওই স্ত্রী লোকটি ইয়াতিম যুবতীর রূপ-সৌন্দর্য দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল, না-জানি তার স্বামী অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে যায়। তাই, সে আমাদের ডেকে আনে। আমরা ওই যুবতীকে আটকে রাখি। তখন ওই স্ত্রী লোকটি যুবতীর কুমারিত্ব নিজের হাতে নষ্ট করে ফেলে।'

তখন আলি রা. বলে ওঠেন, 'আল্লাহু আকবার। আমিই প্রথম, যে সাক্ষীদের আলাদা আলাদা করে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে।' পরে তিনি ওই নারীকে হুদ্দুল কাজফ (অপবাদ দেওয়ার হদ) লাগালেন। আর অন্যান্য নারীদের ওপর জরিমানা আরোপ করলেন। এরপর স্ত্রী লোকটির স্বামীকে তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার আদেশ করলেন। আর তার সাথে ওই যুবতীর বিবাহ দিলেন। তার মোহরও তিনি নিজ থেকে আদায় করলেন।'[৩১৪]

যদি কোনো অপবাদ বা মিথ্যার আশঙ্কা থাকত, আলি রা. (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু) বিবাদীদেরও আলাদা আলাদা করে তাদের কথা শুনতেন। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম

[৩১৪] আত তুরুকুল হিকমিয়্যা ফিস সিয়াসতিশ শারইয়্যা, ৫৬

রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একবার এক যুবক আলি রা.-এর কাছে কয়েকজনের ব্যাপারে অভিযোগ নিয়ে এলো যে, এরা সফরে আমার আব্বার সাথে বের হয়েছিল। কিন্তু তারা ফিরে এলেও আমার আব্বা আর ফিরেননি। তখন তিনি তাদেরকে তার আব্বা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে, তিনি না-কি মারা গেছেন। এবার আমি তাদেরকে আব্বার সাথে থাকা সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তারা বলে, তিনি না-কি কিছুই রেখে যাননি। অথচ তার সাথে অঢেল সম্পদ ছিল। পরে আমরা কাজি শুরাইহকে বললে তিনি তাদের থেকে কসম নেন। (তারা কসম খেলে) তিনি তাদেরকে ছেড়ে দেন। তখন আলি রা. তার নিরাপত্তা বাহিনীকে ডেকে বিবাদীদের প্রত্যেকের সাথে দুজন করে নিরাপত্তাকর্মীকে দায়িত্ব দেন। আর তাদেরকে কড়াভাবে বলেন, এদের কেউ যেন আরেকজনের কাছে যেতেও না পারে, কোনোভাবে কথা বলতেও না পারে। আলি রা. একজন কাতিবকে (লেখক) ডেকে বিবাদীদের একজনকে ডাকলেন। তারপর বললেন, তুমি আমাকে এই ছেলের বাবার সম্পর্কে যা জানো বলো। কোন দিন তিনি তোমাদের সাথে বের হয়েছিলেন? কোন কোন মানজিলে তোমরা সফরের বিরতি ঘোষণা করেছ? তোমাদের যাত্রা কেমন ছিল? কোন কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন? তার সম্পদ কীভাবেই বা নষ্ট হলো?

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, কে তাকে গোসল দিয়েছে? দাফন করেছে? কে তার জানাজার নামাজ পড়িয়েছে? কোথায় তাকে দাফন করা হয়েছে? ইত্যাদি ইত্যাদি। কাতিব লিখছিল। আলি (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু) তাকবির বলে উঠলে উপস্থিত লোকেরাও তার সাথে তাকবির দিয়ে ওঠে। আর বাকি যারা বিবাদী ছিল, তাদের কারোই এ সম্পর্কে কিছুই জানা নেই। তারা শুধু মনে করেছে, তাদের এ সাথি সবকিছু স্বীকার করে ফেলেছে। তারপর এই বিবাদীকে মজলিস থেকে বের করে আরেকজনকে নিয়ে আসা হয়। তাকেও এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। তারপর আলি রা. আরেকজনকেও অনরূপ জিজ্ঞাসা করেন। এভাবে তিনি সবার কথাই শুনলেন। কিন্তু প্রত্যেকের কথা ছিল অপরজনের কথার বিপরীত। তখন তিনি প্রথমজনকে আবার ডেকে এনে বললেন, আল্লাহর দুশমন! এখন তো আমি তোমার সাথিদের কথা শুনে তোমার বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাবাদিতা ধরে ফেলেছি। এখন শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় সত্য কথা। তারপর তিনি তাকে জেলখানায় নিয়ে যান। আলি রা. আল্লাহ আকবার বলে উঠলে উপস্থিত সকলেও তাকবির বলে ওঠে।

বিবাদীরা যখন এ অবস্থা দেখল, তখন তারা নিশ্চিত হয়ে গেল যে, তাদের (প্রথম) সাথি এবার সব সত্যিই সত্যিই বলে দিয়েছে। তখন তিনি আরেকজনকে ডাকলেন, তাকেও ধমক দিলেন। তখন সে বলল, আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহর

কসম করে বলছি, আমি (আগে থেকেই) তাদেরকে অসমর্থন করেছি। তারপর তিনি সবাইকে ডাকলেন। সবাই পুরো ঘটনা খুলে বলল। যে কারাগারে ছিল, তিনি তাকে ডেকে বলেন, দেখো, তোমার সাথীরা সবাই নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে। এখন তুমি মুক্তি চাইলে তোমাকেও সত্য কথা বলতে হবে। তখন সেও সবার মতো স্বীকার করল। আলি রা. তাদের ওপর সম্পদের জরিমানা আরোপ করলেন, একই সাথে তার বাবাকে হত্যার কিসাসও আবশ্যক করলেন।[৫১৫]

উমাইয়া খিলাফতকালে বিচার-ব্যবস্থা

উমাইয়া খিলাফতের সূচনা হয় আবু সুফইয়ান রা.-এর খিলাফত থেকে, যখন ৪০ হিজরিতে শামে মানুষরা তার হাতে বাইআত গ্রহণ করে। অর্থাৎ, চতুর্থ খলিফা আলি রা.-এর শাহাদাতের পর। যখন হাসান ইবনু আলি রা. মুআবিয়া রা.-এর জন্য খিলাফত ছেড়ে দেন, তখন সবাই ৪১ হিজরিতে মুআবিয়া রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করে, মুসলিমরা ঐক্যবন্ধ হয়। তাই এ বছরকে আমুল জামাআত বলা হয়। আমুল জামাআত অর্থ একত্র বা ঐক্যবন্ধ হওয়ার বছর। বনু আব্বাস আসার আগ পর্যন্ত উমাইয়া খিলাফত অব্যাহত থাকে। যখন উমাইয়াদের সর্বশেষ খলিফা মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান ইবনু হাকামকে ১৩২ হিজরিতে হত্যা করা হয়।[৫১৬]

বিচার-ব্যবস্থায় সংযোজন

উমাইয়া খিলাফতের সময় বহু নতুন বিষয়ের উদ্ভব ঘটে, যা খিলাফত ও রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে যুক্ত, যেমনটি ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। তখন ইসলামি ভূখণ্ড অনেক বিস্তৃতি লাভ করে। পূর্বদিকে সিন্ধু ও হিন্দুস্তান পর্যন্ত, পশ্চিমে আন্দালুস ও ফ্রান্স, উত্তরে রূম, আরমানিয়া এবং মা ওয়ারাউন নাহর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। তবে এই প্রশস্ততা সত্ত্বেও বিচার-ব্যবস্থায় তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি। তাদের রাষ্ট্র পরিচালনা ছিল খুব শক্তিশালী। তখন ইনসাফ রক্ষিত হতো, বিশেষ করে উমার ইবনু আবদিল আজিজ রহ. এর যুগে ইনসাফ সর্বোচ্চ চূড়ায় উপনীত হয়েছিল। তবে উমাইয়া খিলাফতে বিচার-ব্যবস্থায় নতুন নতুন কিছু বিষয় সংযোজিত হয়। যেমন:

০১। খুলাফায়ে রাশিদা নিজেরাই বিচার কার্য পরিচালনা করতেন, মামলা-মোকদ্দমা, ঝগড়া-বিবাদ নিরসন করতেন। তখন বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকও এমন ছিলেন (তারা নিজেরাই সবকিছু করতেন), যদি না তাদেরকে প্রশাসনের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হতো। অর্থাৎ যদি না তাদেরকে বিচার কার্য থেকে নিষেধ করা হতো, তারা

---

[৫১৫] আত তুরুকুল হিকমিয়্যা, ৪৭

[৫১৬] জাহিলি, তারিখুল কুজাত ফিল ইসলাম, ১৬২

ছাড়া অন্য কাউকে বিচারের জন্য নির্ধারণ করা হতো। কিন্তু মুআবিয়া রা. যখন খিলাফত গ্রহণ করেন, তখন তিনি বিচার কার্য থেকে একেবারেই সরে যান। তিনি দামেশকের কাছাকাছি অঞ্চলগুলোয় কাজি নির্ধারণ করে দেন। তাদের কাছে বিচার-ব্যবস্থার যাবতীয় বিষয়াদি সোপর্দ করেন, মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ অধিকার দেন। বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকরাও এই নীতি অবলম্বন করেন।

মোটকথা, প্রশাসন ব্যবস্থা বিচার-ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। এজন্যই দেখা যায় যে, উমাইয়া খিলাফতের সময় বিচার-ব্যবস্থা পুরো স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। অন্য কারও অধীনে ছিল না। এমনকি শাসক বা প্রশাসকের অধীনেও ছিল না। তাদের দায়িত্ব ছিল শুধু কাজি নিযুক্ত করা বা বরখাস্ত করা। কিন্তু কাজির কোনো কাজে বা হুকুমের ক্ষেত্রে শাসক বা প্রশাসকের হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ ছিল না। তারা শুধু কাজিদের হুকুমগুলো বাস্তবায়ন করতেন। মুআবিয়া রা.-ই সর্বপ্রথম খলিফা যিনি পুরোপুরি বিচার-ব্যবস্থা থেকে আলাদা হয়ে যান, বিচারের দায়িত্ব অন্যজনের হাতে ছেড়ে দেন।

রাষ্ট্রের মৌলিক জায়গাগুলোয় তার কিছু কাজি ছিল। পুরো খিলাফত জুড়ে বনু উমাইয়ার খলিফারা এ পদ্ধতিই অবলম্বন করেছে। বিচার-ব্যবস্থা থেকে খলিফাদের সম্পর্ক পুরোপুরিই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তিনটি বিষয় ছাড়া।

এক. খিলাফতের রাজধানী দামেশকের কাজি সরাসরি খলিফার হাতে নিযুক্ত হতো। আর অন্যান্য জায়গার কাজিরা প্রশাসন কর্তৃক নিযুক্ত হতো।

দুই. কাজিদের কাজকর্ম, তাদের বিচার কার্য পর্যবেক্ষণে রাখা। তারা যে সকল বিচার করে, সেগুলো বিশ্লেষণ করা।

তিন. অন্যায়ভাবে কেড়ে নেওয়া সম্পত্তির বিচার করা। 'হাসাবা' গঠন করা।

উমাইয়া খলিফারা অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেওয়া সম্পত্তির বিচারে আলাদা গুরুত্ব দিত। একসময় সেজন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবস্থাপনাও কায়েম করা হয়। উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানই প্রথম, যিনি অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেওয়া সম্পত্তির বিষয়ে দেখাশোনা করেন। তারপর বিষয়টি আরও ব্যাপক হয়ে যায়।

খলিফা আব্দুল মালিক অন্যায় সম্পত্তির জন্য আলাদা একদিন নির্ধারণ করেন। সেদিন তিনি মাজলুমদের সব কথা শুনতেন, তখন যদি কোনো সমস্যা দেখা দিত, বা কোনো হুকুম কার্যকর করার প্রয়োজন হতো, তাহলে তার কাজি আবু ইদরিস আজদির কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তখন আবু ইদরিস সে হুকুম বাস্তবায়ন করত। অর্থাৎ, আবু ইদরিস বিচার সম্পন্ন করতেন, আর আব্দুল মালিক আদেশ করতেন। তারপর মহান ন্যায়পরায়ণ শাসক ও খলিফা উমার ইবনু আবদিল আজিজ এই গুরুদায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রথমে নিজেকে দিয়েই শুরু করেছিলেন। তার

নিজের সম্পদ, স্ত্রীর সম্পদ, সব বাইতুল মালে ফিরিয়ে দেন। তারপর তিনি বনু উমাইয়ার মধ্য হতে তার আত্মীয়স্বজনদের সম্পদের হিসাব করেন। তারপর প্রশাসক ও গভর্নরদের বিষয়ে মনোযোগ দেন। তিনি এক ধাপেই বারো জন গভর্নরের ধনসম্পদ বাইতুল মালে ফেরত দেন।

তিনি তার দরজা খুলে দেন, যাতে রাষ্ট্রের যেকোনো প্রান্ত থেকে জনগণ অভিযোগ ও লুণ্ঠিত সম্পদের বিচারের জন্য আসতে পারে। এক্ষেত্রে তার অনেক বিস্ময়কর ঘটনা, আশ্চর্যকর কাহিনী ও ইনসাফপূর্ণ বিচার রয়েছে, যার মাধ্যমে উদাহরণ পেশ করা হয়।[৩৯৭]

০২। উমাইয়া খিলাফতের সময় বিচারের বেশ কয়েকটি উৎস সৃষ্টি হয়েছে, যা নববি যুগ বা খিলাফতে রাশিদার যুগে ছিল না। তা হলো—

- সাহাবির উক্তি;
- ইজমা;
- পূর্ববর্তী কাজা বা বিচার।

০৩। উমাইয়া খিলাফতেই প্রথম বিভিন্ন বিচার লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। কাজি নিজের কৃত বিচারগুলো ফাইলে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন, যাতে প্রয়োজনের সময় আবার দেখা যায়, অথবা যাতে ভুলে না যান, বা কেউ অস্বীকার করতে না পারে। সর্বপ্রথম যিনি লিপিবদ্ধ করা শুরু করেন, তিনি হলেন মুআবিয়া রা.-এর সময়কালের মিসরের কাজি সুলাইম ইবনু আতর তাজিবি। একবার কিছু লোক তার কাছে মিরাস বণ্টনের বিষয়ে বিচার নিয়ে আসলে তিনি তাদের মাঝে ফায়সালা করে দেন। এরপর কিছুকাল তাদের দেখা পাওয়া যায় না। পরে তারা আবার নিজেদের মাঝে ইখতিলাফ ও মতবিরোধ শুরু করে, পূর্বের করা ফায়সালাকে অস্বীকার করে বসে। এরপর তারা দ্বিতীয়বারের জন্য কাজি সুলাইমের কাছে আসে, তখন তার এ লোকগুলোর ঘটনা মনে পড়ে যায়। তিনি তাদেরকেও ওই ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিলে তারা স্বীকার করে, তখন তিনি আবার সেই আগের হুকুমই প্রয়োগ করেন। আর কাতিবকে বলেন, এসব হুকুম লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য। তিনি তাদের বিচারের একটি ফাইল তৈরি করে ফেলেন, সাথে সাক্ষীও রেখে দেন।[৩৯৮]

ইমাম কিনদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—'মিসরের প্রথম শাসক সুলাইম-ই সর্বপ্রথম নিজের বিচার নিয়ে একটি ফাইল তৈরি করেন। আমাদের জানামতে, সুলাইম-ই সর্বপ্রথম বিচারের বিষয়ে সাক্ষী রাখতেন, যাতে তা সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং কেউ অস্বীকার করতে না পারে। তারপর বনু আব্বাসের মাঝেও সেটা স্থান পায়।'

---

[৩৯৭] তারিখুল কাজা ফিল ইসলাম

[৩৯৮] তারিখুল কাজা ফিল ইসলাম

০৪। মামলা-মোকদ্দমা বিন্যাস করা।

বাদী-বিবাদীরা যেন একজনের পর একজন পর্যায়ক্রমে আসতে পারে এজন্য চিরকুট ব্যবহার করা শুরু হয়।

০৫। কাজিদের সহযোগী নিযুক্তকরণ। তারা হলো বিচারালয়ে বসে থাকা সাহায্যকারী, এবং নিরাপত্তা বাহিনী।

মাওসুআতুস সিয়ারে (খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৭০) আছে—উমার ইবনু আবদিল আজিজ কাজিদের নির্বাচনে খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন, যাতে জনগণের ওপর এমন কাজি চেপে না বসে, যে তাদের মাঝে অন্যায়ভাবে ফায়সালা করবে। এজন্য উমার ইবনু আবদিল আজিজ কাজির জন্য পাঁচটি শর্ত নির্ধারণ করেছেন। এই পাঁচটি শর্ত পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত বিচারক হওয়া যাবে না। সেগুলো হলো—

- এক. ইলম;
- দুই. হিলম (সহনশীলতা);
- তিন. চারিত্রিক পবিত্রতা;
- চার. পরামর্শ করা
- পাঁচ. সত্য প্রকাশে সাহসিকতা

আব্বাসি খিলাফতকালে বিচার-ব্যবস্থা

আব্বাসি খিলাফতের সূচনা হয় ১৩২ হিজরিতে, যখন বনু আব্বাস উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, আবু আব্বাস সাফফাহর হাতে খিলাফতের বাইআত করা হয়। এর সমাপ্তি হয় ৬৫৯ হিজরিতে তাতারিদের হাতে বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার মাধ্যমে, যখন বনু আব্বাসের সর্বশেষ খলিফা মুতাসিম বিল্লাহকে হত্যা করা হয়। আব্বাসিদের খিলাফতকাল বহু দীর্ঘ ছিল। ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে বৃহৎ শাসন-ব্যবস্থা ছিল আব্বাসি খিলাফত। এই খিলাফত পাঁচ শতাব্দীরও বেশি (৫২৪ বছর) অব্যাহত ছিল, যা উমাইয়া খিলাফতের ৬ গুণ এবং খিলাফতে রাশিদার ১৮ গুণ।

মানচিত্রে আব্বাসি খিলাফত ছিল ইসলামি সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বিস্তৃত সাম্রাজ্য। তাদের ভূমির বিস্তৃতি ছিল অনেক দীর্ঘ। দক্ষিণে জাযিরাতুল আরব, উত্তরে মা ওয়ারাউন নাহর, আজারবাইজান, আরমানিয়া, আফগানিস্তান, বুখারা, তাশকন্দ, বাঙ্গাল, সিন্ধু, তুর্কিস্তান, পশ্চিমে আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আব্বাসি খিলাফতের দুইটি যুগ ছিল—

প্রথম যুগ : এই যুগ ছিল স্বর্ণযুগ (১৩২ হিজরি থেকে ২৪৬ হিজরি পর্যন্ত), যখন তুর্কিরা মুতাওয়াকিকল আলাল্লাহকে হত্যা করে, তখন তারা তার ছেলে মুনতাসির বিল্লাহকে পিতার স্থানে বসায়। রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিল তখন খলিফাদের হাতে। রাষ্ট্র

পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের কথাই গ্রহণযোগ্য ছিল। সে যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-প্রযুক্তি, সভ্যতা-সংস্কৃতির বসন্ত বাহার ছিল। নেতৃত্ব, বাস্তবায়ন, শক্তি, প্রতাপ—সব ক্ষেত্রেই এই প্রথম যুগ অন্যান্য যুগের চেয়ে ভিন্ন এবং অনন্য ছিল, চাই তা বাহিরে বা ভেতরে, অথবা হোক রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় যুগ : এই যুগটি ছিল দুর্বলতা ও অস্থিরতার যুগ, যখন মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল দেখা দেয়, যার সূচনা ২৪৭ হিজরি থেকে ৬৫৬ হিজরি পর্যন্ত। তখন রাষ্ট্র ক্ষমতা হয় উজিরে আলির (প্রধানমন্ত্রী) হাতে ছিল, অথবা সেনাপ্রধানের নেতৃত্বে ছিল, কিংবা অন্যান্য অনেক বিষয়াদি তত্ত্বাবধায়কের হাতে ছিল। খলিফাদের বিভিন্ন দুর্বলতার চিত্র প্রকাশ পাচ্ছিল। একই সাথে রাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ বিভক্তি বাড়ছিল, দুর্বলতা ও ফাটল ধরার উপক্রম হচ্ছিল। সবাই নিজের মনমতো হুকুম বাস্তবায়ন করত। অনেক এলাকার প্রশাসকগণ তো পুরোপুরি স্বাধীনতা ঘোষণা করে স্বয়ংসম্পূর্ণও হয়ে যায়। অবশ্য কেউ কেউ বাগদাদের খিলাফতকে স্বীকার করত, কিন্তু হুকুমের ক্ষেত্রে কোনো তোয়াক্কাই করত না। আব্বাসিদের দ্বিতীয় যুগের এই প্রভাব প্রথম যুগের বিচার-ব্যবস্থার ওপরও পড়ে। প্রথম যুগে বিচার-ব্যবস্থা পুরো খিলাফত জুড়ে এক ছিল (সবকিছু ছিল খলিফার কর্তৃত্বে)। কিন্তু দ্বিতীয় যুগে যখন প্রশাসকরা স্বাধীন হয়ে যায়, তখন তারা নিজেরাই বিচার-ব্যবস্থা পরিচালনা করত। একসময় দেখা গেল অধিকাংশ এলাকাগুলোতেই প্রশাসকরা প্রধান বিচারপ্রতি হিসাবে থাকত।[৩৯৯]

রাজনৈতিক দিক থেকে আব্বাসি খিলাফত উমাইয়া খিলাফতের জন্য একটি ইনকিলাব বা বিদ্রোহের নামান্তর ছিল। তাই, আব্বাসি খলিফারা উমাইয়া খিলাফতের নিদর্শন, চিহ্ন পরিবর্তন করে ফেলে, তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি মুছে ফেলে। খিলাফতের রাজধানী শাম, দামেশক থেকে ইরাক ও বাগদাদে রূপান্তরিত হয়। এজন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আরবি ভাষার প্রাণ হারিয়ে যায়, প্রথমে ফারসি ভাষা পরবর্তী সময়ে তুর্কি ভাষার প্রকাশ ঘটে।

এটা ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে। কিন্তু শিক্ষা, বিচার-ব্যবস্থার দিক থেকে এমনটি ছিল না বরং আগের মতোই ছিল, তবে কিছুটা উন্নত হয়েছিল। এই ইনকিলাবের কারণে এ দুটো বিষয়ে তেমন পার্থক্য সৃষ্টি হয় নি। বরং উমাইয়া খিলাফতের শিক্ষা ও বিচার-ব্যবস্থাকে আব্বাসি খলিফারা আরও উন্নত করেছে। খিলাফতে রাশিদায় বিচার-ব্যবস্থার যে সকল মূলনীতি ছিল, সেগুলোও আপন জায়গায় বহাল ছিল। এমনকি খিলাফতে উমাইয়ার বহু কাজি আব্বাসি খিলাফতের পরও নিজ নিজ পদে বহাল ছিলেন। বহু ইমাম উলামা ও ফুকাহায়ে কিরাম দুই খিলাফতের সময়ই

---

[৩৯৯] তারিখুল কাজা ফিল ইসলাম, ২১৮

ছিলেন। তারা দুই খিলাফতই প্রত্যক্ষ করেছেন। যেমন: ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম আওযায়ি রহ., মদিনার কাজি ইয়াহইয়া ইবনু সায়িদ আনসারি দুই খিলাফতেই কাজি হিসাবে ছিলেন—আবু জাফর মানসুরি তাকে ইরাকের হাশিমি এলাকার কাজি বানিয়েছেন। অধিকাংশ এলাকায় উমাইয়া খিলাফতের কাজি, আব্বাসি খিলাফতেরও কাজি ছিলেন। যেমন: মুহাম্মাদ ইবনু ইমরান, উমাইয়া খিলাফতে মদিনার সর্বশেষ কাজি ছিলেন। খলিফা মানসুর এসে তাকে মদিনার কাজি হিসাবেই বহাল রাখেন। রাষ্ট্র পরিচালনা ও বিচার-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আব্বাসি খলিফাগণ উমাইয়া খিলাফত থেকে বেশ ফায়দা গ্রহণ করেন। একই সাথে যুগোপযোগী বেশ কিছু নতুন বিষয়ও যুক্ত করেন। এভাবে বিচারালয় খুব বিস্তৃতি ও প্রশস্ততা লাভ করে। এর প্রমাণ হচ্ছে (ইমাম মালিকের বর্ণনায়) উমার ইবনু আবদিল আজিজ বলেন—

يحدث للناس من الأقضية بقدر ما يحدث لهم من الفجور

'মানুষের মাঝে যে পরিমাণ পাপাচার ও অশ্লীলতা অনুপ্রবেশ করবে, সে পরিমাণ বিচার ফায়সালাও বৃদ্ধি পাবে।'

সুতরাং, যখন জীবনব্যবস্থা অগ্রগতি লাভ করল, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষ করে 'ফিকহ' শাস্ত্র উন্নীত হলো, তখন বিচার-ব্যবস্থারও অগ্রগতি ঘটল। উমাইয়া খিলাফতের যে সকল দুর্বলতা ও ত্রুটি ছিল, আব্বাসি খলিফাগণ সেগুলো সংশোধন করেন। তারা শাসন-ব্যবস্থার পাশাপাশি বিচার-ব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজান। বিচার-ব্যবস্থাকে আলাদা গুরুত্ব প্রদান করেন। আবু জাফর মানসুর এসে কাজিদের নিয়োগ করার অধিকার বাগদাদের খলিফার হাতে সোপর্দ করেন।

আব্বাসি খলিফারা লুণ্ঠিত সম্পদ বিচারের বিষয়ে খুব গুরুত্ব দেন। 'হাসাবা'র জন্য তারা আলাদা বিচার-ব্যবস্থা খোলেন। আব্বাসি খিলাফতেই সর্বপ্রথম লুণ্ঠিত সম্পদ বিচারের জন্য আলাদা ঘর বানানো হয়। সেটাকে দারুল আদল (ইনসাফের ঘর) বলা হতো। প্রায় অধিকাংশ খলিফাগণই মাজালিমের বিচারের জন্য বসেন। অন্যান্য বিচার-ব্যবস্থা শাসক ও প্রশাসকদের দায়িত্বমুক্ত থাকত। তাদের দায়িত্ব ছিল শুধু কাজি নিয়োগ ও বরখাস্ত করা। বিচার কার্যে তাদের অনুপ্রবেশের অধিকার ছিল না। তবে কোনো কোনো খলিফা অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে যাতে নিজেদের মত খাটানো যায়, কিন্তু তখন উলামায়ে কিরাম বিচার পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাতে শুরু করেন।[৪০০]

আব্বাসি খিলাফতকালে বিচার-ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন

আব্বাসিদের যুগে বিচার-ব্যবস্থায় বিভিন্ন আইন-কানুন সম্পর্কিত অনেক নতুন নতুন বিষয় যুক্ত হয়। যেগুলো সামনে আলোচনা করা হবে।

উমাইয়াদের যুগে বিচার-ব্যবস্থায় যা যা ত্রুটি ছিল, সেগুলো আব্বাসিদের যুগে সংশোধন করা যায়। ইমাম নাবাহি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—উমাইয়া খলিফা মুআবিয়া ইবনু সখর যখন শাসনক্ষমতা লাভ করেন, তখন তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন পূর্বের বিচার-নীতি বহাল রাখতে। এভাবে কিছুকাল অব্যাহত ছিল, কিন্তু ইয়াজিদ ইবনু আবদিল মালিক ও তার ছেলে ওয়ালিদের যুগে সেটা আর ধরে রাখা সম্ভব হয় না।

এরপর যখন বনু আব্বাস খিলাফত লাভ করে, তখন তারা বিচার-ব্যবস্থায় খুব গুরুত্ব প্রদান করে, শরয়ি কাজের জন্য বড়ো বড়ো উলামায়ে কিরামকে নিযুক্ত করে।[৪০১]

০১। **বিচার-ব্যবস্থায় পরিবর্তন :** আব্বাসি খিলাফতকালে বিচার-ব্যবস্থা ছিল রাষ্ট্র পরিচালনারই একটি অংশ। তাই, কাজি নিযুক্তকরণ ছিল খলিফা, কিংবা খলিফা যাকে 'নিযুক্তকরণের' দায়িত্ব দিয়েছেন তার হাতে। এজন্যই খলিফা বিচার-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করতে পারতেন। কিন্তু উমাইয়া খিলাফতকালে রাজধানী দামেশকের কাজি নিযুক্ত করতেন খলিফা নিজে। আর অন্যান্য প্রদেশের কাজি নিযুক্ত করত সেসব প্রদেশের গভর্নররা। পরে যখন আব্বাসি খলিফা আবু জাফর মানসুর খিলাফত গ্রহণ করেন, তখন তিনি নিজেই অন্যান্য প্রদেশের কাজি নিযুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে এটা বেশি ব্যাপকও ছিল না, অব্যাহতও ছিল না। বরং পরবর্তী সময়ে অন্যান্য খলিফারা কাজি নিযুক্ত করার দায়িত্ব কখনো প্রশাসকদের হাতে ছেড়ে দিতেন, কখনো তারা নিজেদের প্রদেশে নিজেরাই কাজি নিযুক্ত করতেন; এমনকি খলিফা মানসুরের যুগেও এমনটি ছিল।

০২। **'কাজিউল কুজাত'-এর (প্রধান বিচারপতির) পদ সৃষ্টি :** ইসলামি বিচার-ব্যবস্থায় সর্বপ্রথম সংযোজনকৃত নতুন বিষয়টি ছিল 'কাযিল কুযাত' তথা প্রধান বিচারপতির পদ, যা ১৭০ হিজরি সনে আব্বাসি খলিফা আমিরুল মুমিনিন হারুনুর রশিদ যুক্ত করেন। এই পদ যুক্ত করার কারণ, তখন দাওলাতে ইসলামিয়া অনেক বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে খলিফার দায়দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। তখন প্রয়োজন দেখা দিল এমন একজনের যে খলিফার নায়েব হয়ে এ দায়দায়িত্বগুলো আদায় করবে। ফলে খলিফা হারুনুর রশিদই প্রথম এই পদ ও এই নাম আবিষ্কার করেন। তিনি এই পদের জন্য ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনু ইবরাহিম আনসারি রহ.-কে নিযুক্ত করেন, যিনি ছিলেন ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর খাস শাগরেদ। ইমাম আবু ইউসুফ ইরাক ও অন্যান্য প্রদেশের কাজিদের নির্বাচন করে তাদের নামগুলো হারুনুর

---

[৪০১] তারিখ কজাতিল আন্দালস ১৪

রশিদের সামনে জমা দেন। আর খলিফা সেগুলো দেখে দেখে কাজি নিযুক্ত করেন। তখন কাজিউল কুজাতের দায়িত্ব ছিল—আহলে ইলমের মধ্যে যাকে কাজার জন্য কল্যাণকর মনে হয়, তাকে খলিফার সামনে পেশ করা। তখন খলিফা তাকে কাজি হিসাবে নিযুক্ত করতেন। কাজিল কুজাত বা প্রধান বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর নির্বাচন ব্যতীত খলিফা হারুনুর রশিদ কাউকে কাজি বানাতেন না। ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত (১৮২ হিজরি) এ পদে বহাল থাকেন। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. আব্বাসি তিন খলিফার সময়কাল পর্যন্ত বাগদাদের কাজি ছিলেন। সেই তিন খলিফা হলেন—

- এক. খলিফা হাদি;
- দুই. খলিফা মাহাদি
- তিন. খলিফা হারুনুর রশিদ

খলিফা হারুনুর রশিদ তাকে খুব সম্মান করতেন, মর্যাদা দিতেন। তিনি তাকে পূর্ব-পশ্চিম সব অঞ্চলের কাজি নির্ধারণ করার দায়িত্ব দেন। ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-কে বলা হয় 'কাজি কুজাতিদ দুনিয়া' (দুনিয়ার প্রধান বিচারপতি)।

'কাজিল কুজাত' এর পদকে বর্তমান রাষ্ট্রনীতির পরিভাষায় 'আইনমন্ত্রী'-এর সমমান মনে করা হয়।[৪০২]

আব্বাসি খিলাফতকালে বিচার-ব্যবস্থার উৎস

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে কাজি সাহেব নিজের ইজতিহাদ অনুযায়ী ফায়সালা করতেন, পাশাপাশি শরয়ি হুকুম-আহকামের মূল উৎসগুলোর ওপর নির্ভর করতেন—অর্থাৎ, কুরআন, সুন্নাহ, পূর্ববর্তী কাজা বা বিচার-ফায়সালা, সাহাবির উক্তি বা প্রচলন, ইজমা ও কিয়াস।

চতুর্থ শতাব্দীতে অধিকাংশ ফকিহ ও কাজিরা নিজেদের মাজহাবের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করতেন। নির্দিষ্ট কোনো মাজহাব অনুযায়ী ফায়সালা করতেন না। বরং তাদের মাঝে সে যোগ্যতা ছিল বিধায় নিজেরা বিভিন্ন মাসআলায় ইজতিহাদ করতেন।

পঞ্চম শতাব্দীতে এসে ফিকহি মাজহাবগুলো পূর্ণতা লাভ করে, মজবুত হয়। তখন প্রায় সমস্ত উলামা, ফুকাহায়ে কিরাম, কাজি এবং সাধারণ জনগণ নির্দিষ্ট একজন ইমামকে আঁকড়ে ধরে। সব ক্ষেত্রেই—দারস হোক, ফতোয়া হোক, বা বিচার-ব্যবস্থা হোক—সবাই কোনো না কোনো মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। কাজিকেও পূর্ববর্তী কাজিদের ফায়সালা অনুযায়ী বিচার করতে হতো, যাতে সাধারন জনগণ তার বিচারে সন্দেহ না করে।

তাই, ইমাম মাওয়ারদি বলেন—যে সকল ফুকাহায়ে কিরাম নির্দিষ্ট কোনো মাজহাব

গ্রহণ করেছেন, তারা ফতোয়া দিতেন যে, অন্য মাজহাবের মত দিয়ে বিচার করা যাবে না। এ কারণে শাফিয়ি মাজহাবের অনুসারীরা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মত দিয়ে ফায়সালা করতে নিষেধ করেন। আর হানাফি মাজহাবের অনুসারীগণ ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মাজহাব দিয়ে বিচার করতে নিষেধ করেন। যদিও কাজির ইজতিহাদ শাফিয়ি রহ.-এর মতকেই প্রাধান্য দেয়, তবুও তাকে নিজের মাজহাব অনুযায়ীই বিচার করতে হতো। অন্যথায় তখন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বা অপবাদের আশঙ্কা থাকে। পক্ষান্তরে, তিনি যদি নির্দিষ্ট এক মাজহাব দিয়েই বিচার করেন, তাহলে সে অপবাদ আর থাকে না।[৪০৩]

মুহাদ্দিস দেহলভি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—কোনো কোনো কাজি যখন হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে জুলুম শুরু করে দেয়, তখন প্রশাসকরা কাজিদের আদেশ করে—তারা যেন নির্দিষ্ট কোনো মাজহাব অনুযায়ী ফায়সালা করে। এছাড়া অন্য কোনো মাজহাব অনুযায়ী ফায়সালা না করে। তবে অন্য মাজহাব অনুযায়ী ফায়সালা করতে হলে এমন মাসআলার ক্ষেত্রেই করা যাবে, যে মাসআলায় সাধারণ জনগণ সন্দেহ করবে না এবং সেটা এমন মতই হতে হবে, যা পূর্ব থেকেই গ্রহণযোগ্য। তখন ফুকাহায়ে কিরাম ও কাজিগণ ওই সমস্ত উক্তি ও মতের ওপর নির্ভর করতেন, যেগুলো নিজেদের মাজহাবের কিতাবগুলোতে বিদ্যমান আছে। তবে মূলনীতি ছিল এই যে—কাজা হোক বা ফতোয়া কোনোটাই জায়িজ নয়, যদি না এমন উক্তি বা মতের মাধ্যমে হয়; যে মত তার কাছে এমন আদিল (ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি) থেকে সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যিনি আরেক আদিল থেকে বর্ণনা করেছেন। সেই আদিল ওই মুজতাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, কাজি বা মুফতি যার তাকলিদ করে। এভাবে হাদিসের মতো সহিহ সূত্রে বর্ণিত হতে হবে। কারণ, উভয় (হাদিস এবং কাজা বা ফতোয়া) ক্ষেত্রেই আল্লাহ তাআলার দ্বীনই বর্ণনা করা হচ্ছে। তবে যেহেতু মাজহাবের মতগুলো বেশি প্রসিদ্ধ এবং প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে বিকৃতি সাধন বা পরিবর্তন করা অসম্ভব, তাই সবাই কিতাবের ওপরই নির্ভর করত। (সূত্র ধরে বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না।)

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, তখন বিচার-ব্যবস্থার উৎসগুলো ফিকহি কিতাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। মোটকথা, প্রত্যেক মাজহাবের কিছু নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কিতাব আছে, যার ওপর নির্ভর করা যায়, আলাদা সনদের প্রয়োজন হয় না। অতএব, কাজি যখন বিচার করবেন, তখন তার মাজহাবের নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কিতাব দেখেই বিচার করবেন।

আব্বাসি যুগে মাজালিমের বিচার-ব্যবস্থা

বনু উমাইয়ার খলিফারা জনগণের মাজালিম তথা লুণ্ঠিত সম্পদের বিচারকার্যের জন্য মাত্র একদিন নির্ধারণ করেন। তারপরও কোনো কোনো খলিফা এক্ষেত্রে শিথিলতা শুরু করে দেন। পরবর্তী সময়ে যখন আব্বাসি খিলাফত আসে, তখন আবার খলিফারা নিজেরাই মাজালিমের বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, কিংবা কখনো কখনো কোনো মন্ত্রী বা কাজির হাতে দায়িত্ব দেন।

খলিফা মানসুর তার গভর্নরদের কাজ বেশি বেশি পর্যবেক্ষণ করতেন। তাদের থেকে হিসাব নিতেন। তারপর খলিফা মাহদি আসেন। তিনি মাজালিমের বিচারকার্যের জন্য আলাদাভাবে সময় দেন এবং নিজে বিচারের জন্য বসেন। বনু আব্বাসের খলিফাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মাজালিমের জন্য বসেন, যাতে জালিম-মাজলুমের মাঝে ইনসাফ কায়েম করতে পারেন, হকদারদেরকে তাদের হক পৌঁছিয়ে দিতে পারেন। তিনি মাজালিমের জন্য একজন মন্ত্রীও নিযুক্ত করেন, একই সাথে একটি ফাইলও তৈরি করেন। এই ফাইলটিকে 'দিওয়ানুল মাজালিম' (লুণ্ঠিত সম্পদের ফাইল) বলা হতো।

অতঃপর মাজালিমের জন্য খলিফা হাদি বসেন। তারপর খলিফা হারুনুর রশিদ এ বিষয়ে খুব গুরুত্ব দেন। ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর নসিহতের কারণে তিনি প্রায় সময়ই এজন্য বসতেন, যেমনটি কিতাবুল খারাজে উল্লেখ আছে। খলিফা হারুনুর রশিদই জনগণের যাবতীয় বিষয়াদি সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য রাখতেন এবং সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। আর আমিরুল মুমিনিন মামুন মাজালিমের জন্য সপ্তাহের রবিবারে বসতেন। খলিফা ওয়াসিক বনু উমাইয়ার লুণ্ঠিত সম্পদ ফেরত দিতেন।

আর যখন খলিফা মুহতাদি বিল্লাহ খিলাফত লাভ করেন, তখন তিনি একটি তাঁবু তৈরি করেন, যার দরজা ছিল চারটি। তিনি সেখানে মাজালিমের বিচারের জন্য বসতেন। সেই তাঁবুর নাম ছিল 'কুব্বাতুল মাজালিম' (মাজালিমের তাঁবু)। তিনিই বনু আব্বাসের সর্বশেষ খলিফা, যিনি মাজালিমের জন্য বসতেন। তার পর থেকে মন্ত্রী কিংবা কাজিরাই বসা শুরু করেন।[৪০৪]

আব্বাসি খিলাফতকালে সাক্ষীদের যাচাই-বাছাই

যেহেতু বিচার-ব্যবস্থা পূর্বের চেয়ে অনেক অগ্রগতি লাভ করেছে, অনেক দায়দায়িত্ব বেড়ে গেছে, একই সাথে মিথ্যা সাক্ষ্যও প্রকাশ পেতে শুরু করেছে; তাই কাজিরা সাক্ষীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন, যাচাই-বাছাই করতেন। কাজেই, সাক্ষী যদি আদিল (ন্যায়-নীতিবান) হয়, যদি তার সম্পর্কে এমন কিছু জানা না যায়, যা

তার 'আদালত'কে[৪০৫] ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহলে কাজি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। আর তার মাঝে যদি এমন কোনো দোষ পাওয়া যায়, যা তার আদালতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহলে কাজি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন না। আর যদি তার অবস্থা সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই জানা না যায়, তাহলে তার সম্পর্কে আশেপাশের প্রতিবেশিকে জিজ্ঞাসা করেন, যারা তার সাথে কোনো কিছুতে শরিক থাকে, কিংবা আসা-যাওয়া করে, অথবা লেনদেন করে।

খরশা ইবনু হুর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—এক ব্যক্তি উমার রা.-এর কাছে সাক্ষ্য দিলে তিনি বলেন, আমি তো তোমার সম্পর্কে জানি না। অবশ্য তোমাকে আমার না জানা তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু এখন তুমি এমন কাউকে নিয়ে আসো, যে তোমার সম্পর্কে জানে। তখন একলোক বলে উঠল, আমি তার সম্পর্কে জানি। উমার রা. বললেন—তার সম্পর্কে কী জানো? লোকটি বলল, সে আদিল এবং একজন ভালো মানুষ।

তিনি এবার প্রশ্ন করলেন—সে কি তোমার পাশের কোনো প্রতিবেশী যে, তুমি তার সম্পর্কে জানো? তার দিন-রাত কেমন অতিবাহিত হয়? তার আসা-যাওয়া কেমন হয়?

সে বলল—না!

উমার রা. বললেন—তাহলে সে কি তোমার সাথে দিনার-দিরহাম দিয়ে লেনদেন করে, যার মাধ্যমে বোঝা যায়—সে মুত্তাকি, ভালো মানুষ?

লোকটি বলল—তাও না।

উমার রা. বললেন—তাহলে সে কি তোমার সফরের সঙ্গী, যার মাধ্যমে বোঝা যায়—সে সুন্দর আখলাকের অধিকারী?

সে বলল—তাও না।

উমার রা. বললেন—তাহলে তো তুমি তার সম্পর্কে কিছুই জানো না। তারপর ওই সাক্ষীকে বললেন, যাও! এমন কাউকে নিয়ে আসো, যে তোমাকে চেনে।[৪০৬]

খিলাফতে রাশিদার যুগেও এমনই ছিল। পরবর্তী সময়ে আব্বাসিদের যুগেও সাক্ষীদের যাচাই-বাছাইয়ের চিন্তা পাওয়া যায়। তখন একদল সাক্ষী ছিল। যাদের বলা হতো الشهود الداءمون (সার্বক্ষণিক সাক্ষী), বা الشهود المعدلين (আদিল

---

[৪০৫] আদালত: এটি একটি ইলমে হাদিসের পরিভাষা। যার দ্বারা উদ্দেশ্য যাবতীয় পাপাচার, অনাচার ও গুনাহ থেকে বিরত থাকা।

[৪০৬] মুসনাদু উমার, ইবনু কাসিরের বর্ণনা।

[illegible]তকারী) অথবা الشهود المزكون (যাচাই-বাছাইকারী), কিংবা أصحاب المسائل (জিজ্ঞাসাবাদকারী)।

তাদের দায়িত্ব ছিল, তারা সাক্ষীদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন। খলিফা মানসুরের খিলাফতকালে মিসরের কাজি গাউস ইবনু সুলাইমান সর্বপ্রথম সাক্ষীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। ইমাম কিনদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সায়িদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—মিসরে সর্বপ্রথম যিনি সাক্ষীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি হলেন খলিফা মানসুরের সময়কালের কাজি গাউস ইবনু সুলাইমান। এর আগে মানুষ সাক্ষ্য দিত, যার থেকে ভালো কিছু পাওয়া যেত, গ্রহণ করা হতো; আর যদি ভালো কিছু না পাওয়া যেত, তাহলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে গ্রহণ করা হতো না। এভাবে ধীরে ধীরে মিথ্যা সাক্ষ্য অনেক বেড়ে যায়। সেটা আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে কাজি গাউসের যুগে এসে। তখন তিনি গোপনে সাক্ষীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তখন থেকে এভাবেই চলে আসছে।[৪০৭]

আব্বাসিদের যুগে নথি ও ফাইলের ব্যবস্থা

উমাইয়া খিলাফতকালেও বিভিন্ন বিচার-ফায়সালা নথিভুক্ত করে রাখা হতো, কিন্তু সেটা খুব কম ছিল। সেটাও সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আব্বাসিদের যুগে কাজিরা হুকুম-আহকাম সংরক্ষণ ও নথিভুক্ত করার প্রতি বেশ গুরুত্ব দেন, যাতে জনগণের হক সংরক্ষিত থাকে, হুকুম-আহকাম মজবুত থাকে।

আব্বাসি খিলাফতকালে বিচার-ব্যবস্থায় দিওয়ান

আব্বাসি খিলাফতকালে বিচার-ব্যবস্থার দিওয়ান পাওয়া যায়। দিওয়ান বলা হয়, যেখানে বিচার-ব্যবস্থার সবকিছু রেকর্ড করা থাকে। যেমন: ফাইল বা চেক—মূল হোক বা মূল থেকে লিপিবদ্ধ করা হোক। একইভাবে এই দিওয়ানে বিভিন্ন পদের ব্যক্তিদের নামও লিপিবদ্ধ থাকে, যেমন: কাতিব, তত্ত্বাবধায়ক, কাজির সহযোগী। প্রথমে এ দিওয়ান বাগদাদে ছিল। খলিফা হারুনুর রশিদের যুগে এই দিওয়ান পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন জাফর বারমাকি। তারপর এ দিওয়ান প্রত্যেক এলাকা ও শহরে ছড়িয়ে পড়ে।[৪০৮]

উসমানি খিলাফতকালে বিচার-ব্যবস্থা

উসমানি খিলাফত দু-ভাবে বিভক্ত—

প্রথম ভাগ : যখন থেকে দাওলাতে উসমানিয়ার সূচনা হয়, তখন থেকে খ্রিস্টীয় ১৯ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। অর্থাৎ, সুলতান আব্দুল মাজিদের শাসনামল (১২৫৫

---

[৪০৭] কিতাবুল উলাতি ওয়াল কুজাত, ২৬১

[৪০৮] তারিখুল কাযা ফিল ইসলাম

হিজরি বা ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত; মানে প্রায় সাড়ে তিন শতাব্দী। তখন আইন-কানুন ছিল পুরোপুরি ইসলামভিত্তিক, বিচার-ব্যবস্থা ছিল দ্বীন ও শরিয়তের আলোয় আলোকিত।

দ্বিতীয় ভাগ : ১৯ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত যুদ্ধের ফলস্বরূপ আরব দেশগুলো দাওলাতে উসমানিয়া থেকে পৃথক হয়ে যায়।

এই দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্রের আইন-কানুনের উৎস অনেকগুলো হয়ে যায়, বিচার-ব্যবস্থায় অনেক কিছু যুক্ত হয়, বৈদেশিক অনেক আইন-কানুন অনুপ্রবেশ করে, বিজাতিদের আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটা তখন শুরু হয়, যখন বিভিন্ন অধিকার, বিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো দেশের বাইরের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং দেশের ভেতরে থাকা বৈদেশিক নাগরিকদের দেওয়া হয়। প্রথমে এই স্বাতন্ত্র্যগুলো ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থের উদ্দেশ্যে কোনো কোনো সুলতান অন্যান্য দেশকে দেয়। যার ফল খুবই খারাপ হয়, যা খিলাফতের প্রতি শ্রদ্ধা ও গাম্ভীর্যও কমিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে নেতৃত্বাধীন ভূখণ্ডগুলো কমতে থাকে। বিজাতিরা শাসন কার্যে অনুপ্রবেশ করে এবং বিভিন্ন ভূখণ্ড থেকে সুবিধা ভোগ করতে থাকে।

এই সমস্যাগুলো আরও বড়ো আকার ধারণ করে, যখন ফ্রান্সের সাথে উসমানি খিলাফতের চুক্তি হয়, যা সুলতান সুলাইমান আল-কানুনির তত্ত্বাবধানে হয়েছিল। এটাই ছিল প্রথম চুক্তি, যার মাধ্যমে উসমানি খিলাফতের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। অথচ এই দাওলাতে উসমানিয়া এক সময় কী শক্তি ও দাপটের সাথে ছিল! মূলত, এই চুক্তিটিই ফ্রান্সের সরকারের সামনে উসমানিদের দুর্বলতা, লাঞ্ছনা ও নত হওয়া প্রমাণ করে। এই চুক্তিতে উল্লেখ ছিল—

০১। ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত তার যে সকল দায়িত্ব আছে, অর্থাৎ ফ্রান্সের নাগরিকদের মামলা-মোকদ্দমা, অপরাধমূলক সমস্যা; সেগুলো তিনি শুনতে পারবেন, বিচার করতে পারবেন এবং ফায়সালা করতে পারবেন। এক্ষেত্রে কোনো প্রশাসক বা শরয়ি কাজি কিংবা অন্য কোনো পদের কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না।

০২। ফ্রান্সের ব্যবসায়ী বা অন্যান্য নাগরিকদের মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই শরয়ি কাজির হস্তক্ষেপ চলবে না। এমনকি যদি তারা নিজেরাও এসে বিচার করার আবদার করে, তবুও না। এ অবস্থায় তিনি যদি কোনো ফায়সালা করেনও, তাহলেও সেটা অকার্যকর হবে, সেটা কোনোভাবেই আমলে নেওয়া হবে না। সেটা কার্যকরও হবে না, যদি না ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত সম্মতি জানায়।

০৩। কোনো তুর্কি বা খারাজ উশুলকারী, অথবা অন্য কোনো প্রভাবশালী রাষ্ট্রের নাগরিকদের অভিযোগের ভিত্তিতে কোনো শরয়ি কাজির এই অধিকার নেই যে, তিনি ফ্রান্সের ব্যবসায়ী বা সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা-মোকদ্দমা

শুনবেন বা ফায়সালা করবেন। বরং কাজির কর্তব্য হলো, অপরাধীদেরকে সদরে আজমের বাসভবনের প্রদান ফটকে উপস্থিত করা।

০৪। কোনো বিদেশি নাগরিককে আটক করা যাবে না। তার ঘরে প্রবেশ করা যাবে না, তার কাছে বিচারের কোনো চিরকুট পাঠানো যাবে না। তাকে আদালতে উপস্থিত করা যাবে না। মোটকথা, তার বিরুদ্ধে কোনো হুকুমই আরোপ করা যাবে না। হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে তার রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে এসব বিষয়ের সমাধান করতে পারবে।

এ সকল লাঞ্ছনাকর চুক্তির মূল কারণ ছিল একটাই। সেটা হলো, দাওলাতে উসমানিয়ার দুর্বলতা।[৫০৯]

দাওলাতে উসমানিয়ার বিচার-ব্যবস্থা

কাজি নিযুক্তকরণের দায়িত্ব : উসমানি সালতানাতের সূচনাতে সুলতান নিজেই কাজিদের নিয়োগ দিতেন। পরবর্তী সময়ে কাজি নিযুক্ত করাটা শাইখুল ইসলামের[৫১০] সাথে খাস হয়ে যায়। তবে নিযুক্তকরণ তখনই চূড়ান্ত হতো, যখন সুলতানের ইচ্ছা মোতাবেক হতো।

৯৫১ হিজরি সনে যখন আবু সায়িদ মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ মুস্তফা ফতোয়া দেওয়ার মর্যাদা লাভ করেন, তখন তিনি সুলতানের সামনে কাজিদের নিযুক্তকরণের নিজের চিন্তা পেশ করেন। তিনি বলেন—'যেহেতু আমাদের যুগে কাজিদের সবার সমান মর্যাদা হয়ে গেছে, ধার্মিকতাও প্রায় সবার সমান; তাই ইলম, ধার্মিকতা ও আদালতের ক্ষেত্রে যে শ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতর তাকে অগ্রগামী করা উচিত।'

তার এ কথা থেকে বোঝা যায়—তিনি কাজিদের নির্বাচনের জন্য আলাদা একটি পর্ষদ প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিলেন।[৫১১]

পরবর্তী সময়ে কাজি নিযুক্তকরণ কয়েকটি ধাপে কার্যকর হতো।

প্রথমত, অন্যান্য কাজিদের আবেদনের মাধ্যমে আরমানিয়া কিংবা আনাতুলে একজন কাজির পদে দাঁড়াত। পরে তার বিষয়টি শাইখুল ইসলামের সামনে পেশ করা হতো। শাইখুল ইসলাম রাজি হলে সুলতানের সামনে পেশ করা হতো। এরপর তার মাধ্যমেই কাজি নিযুক্তকরণ পূর্ণতা লাভ করত। আার কাজির নায়েব নিযুক্ত করার দায়িত্ব ছিল স্বয়ং কাজিরই।

---

[৫০৯] তারিখুল কাজা ফিল ইসলাম

[৫১০] শাইখুল ইসলাম তাকে বলা হতো, যিনি দাওলাতে উসমানিয়ার প্রধান মুফতি হতেন। এই পদের সূচনা হয় সুলতান সুলাইমান আল-কানুনির যুগ থেকে—লেখক।

[৫১১] তারিখুল কাজা, ২১২

প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের কাজিদের নির্ধারণ করা হতো ইস্তাম্বুলের বাবে আলি থেকে। পরে যখন আরও উন্নতি হলো, তখন অন্যান্য কাজিদের নির্ধারণের মাধ্যমেই প্রদেশের শাসকরা নির্ধারিত হতো। যেমন: ১২৩২ হিজরিতে সায়িদ পাশা মিসরের শাসক নিযুক্ত হন মিসরের প্রদেশসমূহের কাজিদের নিযুক্তকরণের মাধ্যমে। যদিও তা ইস্তাম্বুলের হুকুমাতের আদেশ ছিল। (কিন্তু সেটা যথেষ্ট ছিল না। বরং অন্যান্য কাজিদের সমর্থন প্রয়োজন হয়েছিল।)

আবার, মিসরের প্রধান কাজি নিযুক্ত হতো সরাসরি ইস্তাম্বুল থেকে। সেজন্য তুর্কি হওয়া শর্ত ছিল। প্রধান কাজি আবার মিসরের বিভিন্ন অঞ্চলের কাজিদের নিযুক্ত করতেন। পরবর্তী সময়ে কাজিদের নির্বাচনের জন্য মিসরে একটি পর্ষদ গঠন করা হয়। যারা কাজিদের নিযুক্ত করত, তাদের আদালতের কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত শর্তাবলি রক্ষ করতে হতো। যেমন: ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে আদালতের কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত ছিল—শরয়ি কাজিদের নির্ধারণ পরিপূর্ণ হবে 'খাদইউই' (মিসরের শাসক) এর আদেশের মাধ্যমে। তবে এর আগে বিচারমন্ত্রী বা তার নায়েবের উপস্থিতিতে, মিসরের প্রধান আদালতের কাজি, জামিয়া আজহারের শাইখ, হানাফি মাজহাবের বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের (সাথে অন্যান্য উলামায়ে কিরামও থাকতে পারেন) নির্বাচন প্রয়োজন ছিল।

১৮৯৭ সালে হাক্কানিয়া (বিচার মন্ত্রণালয়) সংগঠনের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ ছিল, কাজির নির্বাচন হবে বিচারমন্ত্রী বা তার নায়েবের উপস্থিতিতে, জামিয়া আযহারের শাইখ, মিসরের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরাম, হাক্কানিয়া সংগঠনের উলামায়ে কিরাম, শরয়ি আদালতগুলোর বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে দুইজন—এদের সবার সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে।

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী ইস্তাম্বুলে একটি প্রতিষ্ঠান খোলা হয় কাজিদের নির্বাচনের জন্য। তখন থেকে কাজিদের নির্ধারণ করা হয় ওই প্রতিষ্ঠানের সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের থেকে। তারপর ১৯০৯ সালে মিসরে ২৫ ধারায় একটি আইন জারি করা হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয়, কীভাবে কাজি, আদালতের কর্মী-সদস্য ও মুফতিদের নির্বাচন করা হবে। (..ধারাবাহিক সংখ্যা নাম্বার ছিল ১০-১৪ পর্যন্ত..) তারপর সে অনুযায়ী কীভাবে কাজ করা হবে।

১৯১৪ সালে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, তখন মিসর তুরস্কের শাসন-ব্যবস্থা থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ফলে সাংবিধানিকভাবে সমস্ত কাজি নিযুক্ত করার দায়িত্ব অর্পিত হয় মিসরের শাসকের হাতে।[৪১২]

---

[৪১২] তারিখুল কাজা ফিল ইসলাম, ৪৩৮-৪৩৯

উসমানি যুগে কাজির শর্তাবলি: উসমানি খিলাফতকালে কাজি নির্বাচনের জন্য বেশ কয়েকটি শর্ত জারি করা হয়—

০১। কাজির বয়স (অন্তত) ২৫ বছর হতে হবে।

০২। আইনে সাব্যস্ত করা ওজর থেকে মুক্ত থাকতে হবে। অর্থাৎ, বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো আইন যেন বাধার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

০৩। এমন ব্যক্তি হতে হবে, যাকে অপরাধের কারণে এক সপ্তাহের বেশি কারাদণ্ড গ্রহণ করতে হয় নি।

০৪। বোধশক্তিসম্পন্ন, সরল, বিশ্বস্ত, মর্যাদাবান, ইলম ও আমলে মজবুত হতে হবে।

০৫। 'কাজিয়্যা', 'মুদাল' ও 'মুশকাল'—এগুলোর প্রত্যেকটির মাঝে পুরোপুরি পার্থক্য করার যোগ্যতা থাকতে হবে।

০৬। 'বিচার-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠান' থেকে সনদপ্রাপ্ত হতে হবে, কিংবা ইন্টারভিউ দিতে হবে এবং বিচার-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানে যে দারসগুলো দেওয়া হয়, সেগুলোতে পুরোপুরি সফল হতে হবে।

০৭। কাজিকে হানাফি মাজহাবের অনুসারী হতে হবে। তবে নায়েবের ক্ষেত্রে এটা শর্ত নয়। অর্থাৎ, কাজিকে হানাফি মাজহাবের হতে হবে। আর এই কাজি চার মাজহাবের চারজনকে নায়েব বানাবেন।

০৮। যেকোনো প্রদেশের প্রধান কাজিকে তুর্কি বংশোদ্ভূত হতে হবে। আর অন্যান্য কাজি বা তাদের নায়েবগণের ক্ষেত্রে এটা শর্ত নয়। তারা মিসরীয় হতে পারেন, আবার অন্যান্য দেশেরও হতে পারেন।[৬১৩]

বিচারের কয়েকটি স্তর

উসমানি খিলাফতে বিচার-ব্যবস্থায় অনেক কিছু নতুন করে সংযোজিত হয়, অনেক কানুন জারি করা হয়। যার ফলস্বরূপ আরেকটি আইন সংযোজন করা হয়। অর্থাৎ, পূর্বের করা বিচার নতুন করে ফায়সালা করার জন্য কিছু বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়, যাতে বিচারালয় থেকে কোনো বিচার বের হওয়ার পর সে মামলা-মোকদ্দমা নতুন আঙ্গিকে দেখা যায়।

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে মিসরের একটি কার্যবিবরণীতে বলা হয়, যেকোনো মামলা-মোকদ্দমা তিন মজলিসে (বৈঠকে) তিনবার দেখা হবে। প্রথমে দেখা হবে শরয়ি বিচারালয়ে। কিন্তু বাদী-বিবাদী দুজনই কিংবা একজনও যদি সন্তুষ্ট না হয়, বরং

[৬১৩] তারিখুল কুজাত, ২১২

অভিযোগ করে তাহলে সেটা মিসরের প্রধান বিচারালয়ের তত্ত্বাবধানে সাধারণ বিচারালয়ে আবার দেখা হবে।

এরপরও যদি বিচারের ক্ষেত্রে তাদের কোনো অস্পষ্টতা বা সন্দেহ থাকে, তাহলে জামিয়া আযহারের শাইখ এবং হানাফি মাজহাবের উলামায়ে কিরামের তত্ত্বাবধানে আবার দেখা হবে।[৫১৪]

উসমানি খিলাফতকালে হানাফি মাজহাবে বিচার-ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা

উসমানি খলিফারা সবাই ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। তারা শাইখুল ইসলামকে (প্রধান মুফতি) হানাফি আলিমদের থেকেই নির্বাচন করতেন। শাইখুল ইসলামও নিজ মাজহাব অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন। পরে যখন সুলতান সুলাইমান সালতানাতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি একটি ফরমান জারি করেন। সেখানে তিনি ঘোষণা করেন যে, এখন থেকে সকল ক্ষেত্রে হানাফি মাজহাবই দাওলাতে উসমানিয়ার আবশ্যকীয় মাজহাব—বিচার হোক বা ফতোয়া।

তখন থেকে শাইখুল ইসলাম, সমস্ত কাজি ও মুফতি হানাফি মাজহাবের ভিত্তিতেই বিচার করতেন এবং ফতোয়া দিতেন। আলি হায়দার প্রণীত *দুরারুল আহকাম* কিতাবে (খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৯১) আছে, 'দাওলাতে উসমানিয়া প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিচারালয়ে থাকার সময় কাজিদের হানাফি মাজহাব অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়ার জন্য আদেশ করা হয়, যদিও তারা অন্য কোনো মাজহাবের মুকাল্লিদ (অনুসারী) হতেন।'

পরবর্তী সময়ে দাওলাতে উসমানিয়ার তত্ত্বাবধানে মুআমালাতের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে হানাফি মাজহাব সংকলন করা হয়, যাতে খিলাফতে উসমানিয়ার আদালতে সেগুলো আবশ্যকীয়ভাবে প্রয়োগ করা যায়। যে সকল হুকুম-আহকামগুলো আদালতে বার বার প্রয়োগ করতে হয়, সেগুলো সংকলনের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে একটি পর্ষদ গঠন করা হয়।

১২৮৬ হিজরি সনে এই পর্ষদ মুআমালাতের হুকুম-আহকামের একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যেখানে হানাফি মাজহাবের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতটি পেশ করা হয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনের কারণে এবং সময়ের দাবি রক্ষা করে, কম গ্রহণযোগ্য মতটিও আনা হয়। এই সংকলনে বিধানগুলো ধারাবাহিক সংখ্যা আকারে বিষয়ভিত্তিক তুলে ধরা হয়েছে, যেমনটি বৈদেশিক আইন-কানুনের ক্ষেত্রে করা হয় যাতে করে প্রয়োজনের সময় সহজেই দেখা সম্ভব হয়। এভাবে ১৮৫১টি সংখ্যা হয়েছে।

---

[৫১৪] তারিখুল কাজা ফিল ইসলাম, ৪৪৭

এই সংকলনের নামকরণ করা হয় 'মাজাল্লাসাতুল আহকামিল আদালিয়্যা'। সংকলনটিতে কখনো কখনো বিভিন্ন হুকুমের সাথে উদাহরণও পেশ করা হয়েছে। এছাড়া আরও দুটো মুকাদ্দিমা ৯৯টি সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়—একটি ফিকহ ও তার প্রকার সম্পর্কে, আরেকটি ফিকহের মূলনীতি সম্পর্কে।

সুলতান আব্দুল আজিজ খান ইবনু সুলতান মাহমুদ সানির পক্ষ থেকে ১২৯৩ হিজরি সনের শাবান মাসে শাহি ফরমান জারি করা হয়, যেন রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি আদালতে এই 'মাজাল্লা' অনুযায়ী আমল করা হয় এবং সকল বিধান প্রয়োগ করা হয়।

মোটকথা, হানাফি মাজহাব থেকে সংকলন করা এই মাজাল্লাটি একটি রাষ্ট্রীয় আইন হিসাবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়ে যায়।[৪১৫]

এই হলো ইসলামের বিচার-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। বিস্তারিত জানতে চাইলে বান্দার আরেকটি কিতাব দেখা যেতে পারে 'তাতিম্মাতুল নিজাম ফি তারিখিল কাজা ফিল ইসলাম'।

***

শুরা-ব্যবস্থা

শুরার অর্থ

শুরা, মুশাওয়ারা, মাশওয়ারা এবং মিশওয়ার—এগুলো একই ক্রিয়ার ধাতু। ইমাম রাজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—'বলা হয় شاورهم (সে তাদের সাথে পরামর্শ করেছে),' যারা পরামর্শক তাদেরকেও শুরা বলা হয়। যেমন, আয়াতে আছে—

إذ هم نجوى

(আর যখন তারা সলাপরামর্শ করে)[৪১৬]।

কেউ কেউ বলেন—(মুশাওয়ারা) আরবদের কথা—

شرت العسل أشوره

থেকে নেওয়া হয়েছে, যখন মধু নিজ স্থান থেকে বের করে।

আবার কেউ বলেন, এটি شرت الدابة شورا إذا عرضتها থেকে এসেছে, যার অর্থ—পেশ করা। আর যে স্থানে পশুকে পেশ করা হয়, সেটাকে مشوار (মিশওয়ার) বলে।

মুশাওয়ারাকে শেষ অর্থে (পেশ করা) মাশওয়ারা (পরামর্শ করা) বলা হয়। কারণ, একটি জিনিস পেশ করার মাধ্যমে যেমন তার ভালো-মন্দ সম্পর্কে জানা যায়, তেমনি পরামর্শ করার মাধ্যমেও কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ জানা যায়।[৪১৭]

মুশাওয়ারা অর্থ সবার চিন্তা ও মত একত্র করে বাহ্যিক দৃষ্টিতে সর্বোত্তম পন্থা বের করা। বাস্তবে কোনটা উত্তম সেটা তো আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।[৪১৮]

শুরার বৈধতা

একজন শাসকের কর্তব্য হলো, নিছক ধারণার ওপর ভিত্তি করে অস্পষ্ট বিষয়গুলো কখনোই কার্যকর না করা। এছাড়াও গোপন সিদ্ধান্ত প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং

অন্যের থেকে সাহায্য নিয়ে ছোটো হতে হবে এই ভয়েও শুধু নিজের চিন্তার ওপর নির্ভর করে বড়ো সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করা উচিত নয়। বরং একজন শাসক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করবে, আমানতদার ও মুত্তাকিদের চিন্তা জানতে চাইবে—যারা বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ, প্রত্যেকটি জিনিসের মূল ও বাস্তবতা জানে।

কারণ, কখনো কখনো একা একা নিজের মত প্রয়োগ করাটা গোপন জিনিস ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কার চেয়েও ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। সব জিনিসকেই গোপন রহস্য মনে করা সঠিক নয়। আবার, সব রহস্যও হিতাকাঙ্ক্ষীদের সাথে পরামর্শ করার মাধ্যমে ছড়িয়ে যায় না। এজন্যই বলা হয়ে থাকে, 'পরামর্শ চাওয়াটাই হিদায়াত'। তাছাড়া যে নিজের মত নিয়ে পড়ে থাকে, সে খুব ঝুঁকিতে থাকে।

কোনো কোনো দার্শনিক বলেছেন—'জ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য হলো, নিজের চিন্তার সাথে জ্ঞানীদের চিন্তা সংযোজন করা, নিজের বুদ্ধির সাথে বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি মিশ্রণ করা। কারণ, অনেক সময় নিজের একার চিন্তা পদস্খলনের স্বীকার হয়, তদ্রূপ কখনো নিজের বুদ্ধি ভুলের স্বীকার হয়।'[৪১৯]

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার বড়ো একটি মূলনীতি হলো—শুরা বা পরামর্শ করা। এটা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে সাব্যস্ত। ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—'শুরা ব্যবস্থা শরিয়তের একটি মূলনীতি ও বিধিবিধানের একটি ভিত্তি। এক্ষেত্রে কারও কোনো খিলাফ বা মতবিরোধ নেই।'

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রশংসা করে বলেন—

وأمرهم شورة بينهم

'আর তাদের বিষয় পরস্পরের মাঝে পরামর্শপূর্ণ।'[৪২০]

এক বেদুইন বলে—আমি কখনোই ঠকি নি, যদি না আমার জাতি ঠকেছে। তাকে বলা হলো, সেটা আবার কীভাবে? তিনি বললেন—আমি তাদের সাথে পরামর্শ ছাড়া কিছুই করি না।

ইবনু খুওয়াইজ মিনদান বলেন—'শাসকদের কর্তব্য হলো, দ্বীনের অজানা বা অস্পষ্ট বিষয়ে উলামায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করা, যুদ্ধের বিষয়ে সেনাবাহিনীর সাথে পরামর্শ করা, বিভিন্ন কল্যাণকর বিষয়ে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করা, দেশের কল্যাণকর ও দেশ বিনির্মাণের বিষয়ে রাজ্যের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গ, মন্ত্রী ও গভর্নরদের সাথে পরামর্শ করা। মোট কথা, প্রত্যেকের কর্তব্য নিজ নিজ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা।'

---

[৪১৯] তাসহিলুন নাজার, ৯৯

একটি প্রবাদ আছে—

ما ندم من استشار

'যে পরামর্শ করে কাজ করে, সে কখনো লজ্জিত হয় না, আফসোস করে না।'

আরেকটি প্রবাদ আছে—

من أعجب برأيه ضل

'যে নিজের মত নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগে, সে ভুলের স্বীকার হয়।'[৪২১]

শুরা ব্যবস্থার বৈধতার দলিল

কুরআন থেকে : মহান আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

'আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণেই আপনি তাদের জন্য কোমল হতে পেরেছেন, আর যদি আপনি কঠিন ও কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হতেন, তাহলে তারা আপনার পাশ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ত। সুতরাং, আপনি তাদের মাফ করে দেন, তাদের জন্য ইস্তিগফার করেন, তাদের সাথে (প্রয়োজনীয়) বিষয়ে পরামর্শ করেন। আপনি যদি কোনো কিছু প্রতিজ্ঞা করেন, তাহলে আল্লাহর ওপর নির্ভর করেন। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ তাআলা ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।'[৪২২]

এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনু জারির সালাফে সালিহিনের কিছু আসার উল্লেখ করার পর বলেন—'এক্ষেত্রে সবচেয়ে সঠিক কথা হলো, আল্লাহ তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহাবায়ে কিরামের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে পরামর্শ করার আদেশ করেছেন। যেমন: শত্রুদের বিষয়ে যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে। (আল্লাহ তাআলার এরূপ আদেশ করার কারণ,) ইসলাম সম্পর্কে যাদের অন্তর্দৃষ্টি নেই তারা যেন এমন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে, যার ফলে শয়তানের ফিতনা থেকে মুক্তি পওয়া যাবে এবং যার মাধ্যমে উম্মাহকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শেখানো যাবে। তাহলে তারা নবীজির মৃত্যুর পর বিভিন্ন সমস্যার সময় নবীজির পন্থা স্মরণ করে পরস্পরের মাঝে পরামর্শ করবে, যেমন জীবদ্দশায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরামর্শ করতেন।

---

[৪২১] তাফসিরে কুরতুবি, খণ্ড : ১৮, পৃষ্ঠা : ২৫০

কিন্তু একটু পার্থক্য হবে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরামর্শ করতেন ঠিকই, তবে আল্লাহ তাআলাই তাঁকে ওহি বা ইলহামের মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন কোনটা সঠিক, আর কোনটা ভুল। পক্ষান্তরে, উম্মাহ শুধু তাঁর সুন্নাহ হিসাবে পরামর্শ করতে পারে সত্য যাচাই-বাছাই করার জন্য, সঠিক বিষয় জানার উদ্দেশ্যে, যাতে প্রবৃত্তির অনুসরণ না হয়ে যায়, হিদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুতি না ঘটে। আল্লাহই তাদের সঠিক পথ দেখাবেন এবং তাউফিক দেবেন।[৪২৩]

ইমাম বাগাভি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা জানেন যে, নবীজির পরামর্শ করার কোনো প্রয়োজন নেই (তবুও আল্লাহ তাআলা নবীজিকে পরামর্শ করার আদেশ করেছেন)। কারণ আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন, তাঁর পর যারা আসবে তারা যেন এটাকে সুন্নাহ হিসাবে গ্রহণ করে।[৪২৪]

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রশংসা করে বলেন—

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

'আর যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয় এবং নামাজ কায়েম করে এবং যাদের বিষয়াদি পরামর্শপূর্ণ।'[৪২৫]

ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—'আনসার সাহাবিগণ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের পূর্বে যখন কোনো কাজ করতে চাইতেন, তারা পরস্পর পরামর্শ করতেন। তারপর সে অনুযায়ী কাজ করতেন। তাই, আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের মাধ্যমে তাদের প্রশংসা করেছেন।'[৪২৬]

সুন্নাহ থেকে দলিল: আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

المستشار مؤتمن

'যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়, সে এ বিষয়ে আমানতদার।'[৪২৭]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন—

مارأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বেশি আর কাউকে তাঁর সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করতে দেখি নি।'[৪২৮]

---

[৪২৩] তাফসিরে তাবারি, খণ্ড : ৫৭, পৃষ্ঠা : ৩৪৫

[৪২৪] তাফসিরে বাগাভি, ১/৫২৬

[৪২৫] সূরা শুরা, আয়াত : ৩৮

[৪২৬] তাফসিরে কুরতুবি, খণ্ড : ১৬, পৃষ্ঠা : ৩৬

[৪২৭] সুনানু আবি দাউদ, ৫১২

[৪২৮] সুনানে তিরমিজি

শূরা-ব্যবস্থা অনুমোদনের হিকমাহ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিক থেকে—

(১) যাতে তাঁর পরবর্তী উম্মাহ সে অনুযায়ী আমল করে।

(২) সাহাবয়ে কিরামের মতোতুষ্টির/মনতুষ্টির জন্য।

(৩) যাতে নবীজির সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কারা সঠিক চিন্তার অধিকারী এবং তাদের জ্ঞান-বুঝ কী পরিমাণ।

আর নবী ছাড়া অন্য কারও দিক থেকে—

(১) সঠিক পন্থা বের করার চেষ্টা করা

একটি বিষয় যখন সবার সামনে পরামর্শের জন্য পেশ করা হবে, তখন প্রত্যেকেই চেষ্টা করবে, সে যেন সর্বোত্তম পন্থা বের করতে পারে। এভাবে সবার চিন্তা একত্র করলে সবচেয়ে সুন্দর পন্থাটি বের হয়ে যাবে। ফলে প্রায় সময় সঠিক পন্থাটি বের হয়ে আসবে। জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহিমাহুল্লাহ একটি হাসান সনদে ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন—

شاورهم في الأمر

'আর আপনি তাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করেন'—যখন এই আয়াত নাজিল হলো, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—'শোনো আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল (পরামর্শ) এর মুখাপেক্ষী নয়। তবে আল্লাহ তাআলা পরামর্শকে আমার উম্মাহর জন্য রহমতস্বরূপ অনুমোদন করেছেন। অতএব, আমার উম্মাহর যে ব্যক্তি পরামর্শ চাইবে, সে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হবে না। আর যে পরামর্শ থেকে বিরত থাকবে, সে বিপথ মুক্ত হবে না।'[৪২৯]

(২) কোনো বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া থেকে নিরাপদ থাকা

আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عالم اقتصد

> 'যে ইস্তিখারার নামাজ পড়ে সে কখনো ব্যর্থ হবে না, যে পরামর্শ চায় সে কখনো লজ্জিত হবে না, আর যে (ব্যয় করার ক্ষেত্রে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে সে কখনো নিঃস্ব হবে না।'[৪৩০]

---

[৪২৯] ফাতহুল বায়ান, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৬৪

(৩) বুদ্ধি বৃদ্ধি পাবে

ইমাম তুরতুশি বলেন—পরামর্শকারী যদিও সে বাস্তবে পরামর্শদাতার চেয়ে ভালো চিন্তার অধিকারী হয়, কিন্তু (পরামর্শ করা দ্বারা) তার আরেকটি চিন্তা বৃদ্ধি পায়, যেমন পলিমার মাধ্যমে আগুনের আলো বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং, কখনো নিজের মনে এ কথার স্থান দিয়ো না যে, মানুষের কাছে পরামর্শ চাইলে মানুষের সামনে প্রকাশ পাবে যে, তুমি তাদের মুখাপেক্ষী। এমন চিন্তা করা যাবে না, যা তোমাকে পরামর্শ করা থেকে বিরত রাখে। কারণ, তুমি তো গর্ব করার জন্য চিন্তা বা মত চাচ্ছো না। বরং উপকৃত হওয়ার জন্যই চাচ্ছ।[৪০১]

(৪) ভুলের সময় অন্যের তিরস্কার থেকে বাঁচা যাবে

ইবনু মুতাজ বলেন—বেশি বেশি পরামর্শ করলে কাজটি সঠিক হলে যেমন প্রশংসা পাবে, তেমনি ভুল করলেও কৈফিয়ত করতে পারবে।

(৫) প্রবৃত্তি থেকে মুক্তি

একজন দার্শনিক বলেন—একজন অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও পরামর্শের দারস্ত হতে হয়, যাতে তার চিন্তাটা খাহেশাত বা প্রবৃত্তি-মুক্ত হয়। একবার হারমাজকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কেন পরামর্শদাতার চিন্তাকে পরামর্শকারীর চেয়েও উত্তম গণ্য করা হয়?' তখন তিনি বলেন, 'কারণ, পরামর্শদাতার চিন্তা প্রবৃত্তি-মুক্ত থাকে।'[৪০২]

(৬) রহমত ও বরকত প্রার্থনা করা

উমার ইবনু আবদিল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

> المشورة والمناظر بابا رحمة ومفتاحا بركة لا يضل معهما رأي ولا يفقد معهما حزم
>
> 'পরামর্শ আর সমকক্ষ এ দুটো রহমত ও বরকতের দুই দরজা। এই দুটো এক সাথে থাকলে চিন্তা (সাধারণত) ভুল হয় না। মনোবলও হারিয়ে যায় না।'[৪০৩]

(৭) মানুষের বুদ্ধির মান-নির্ণয়

যখন আপনি কাউকে কোনো কাজের জন্য নির্বাচন করতে চাইবেন, তখন তার সাথে কোনো একটি বিষয়ে পরামর্শ করবেন, তাহলে তার বিচার-বুদ্ধি কী পরিমাণ আছে, তার ভালো-মন্দ আপনার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

---

[৪০১] সিরাজুল মুলুক, ৭৮

[৪০২] বাদাইয়ুস সুলুক, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩০৫

[৪০৩] বাদাইয়ুস সুলুক

শূরার ক্ষেত্র

শূরা বা পরামর্শ সেখানেই করা হবে, যেখানে কোনো 'নস' (কুরআন বা হাদিস) নেই—যুদ্ধের বিষয়ে হোক বা অন্যান্য বিষয়ে।

আলি ইবনু আবি তালিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম—ইয়া রাসুলাল্লাহ, কখনো কখনো আমাদের সামনে এমন পরিস্থিতি চলে আসে, যে বিষয়ে কুরআনের কোনো আয়াতও বর্ণিত হয় নি, আপনার থেকে কোনো সুন্নাহও গত হয় নি (তখন আমরা কী করব?)।

তিনি বললেন—

> اجمعوا له العالمين أو قال العابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد
>
> 'তখন তোমরা সেজন্য আলিমদের (কিংবা তিনি বলেছেন) অথবা মুমিনদের মধ্যে যারা আলিম, তাদের একত্র করো। শুধু একজনের রায়ের মাধ্যমেই ফায়সালা করে দিয়ো না।'[৪৩৪]

শূরার হুকুম

এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলমায়ে কিরামের অনেকের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। যেমন—

(১) কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম বলেন—খলিফা, শাসক ও প্রশাসকের জন্য মাশওয়ারা করা ওয়াজিব। এ মত যাদের, তাদের মধ্যে ইবনু খুওয়াইজ মিনদাদ মালিকি রহ. আছেন। ইমাম কুরতুবি রহ. তার মত উল্লেখ করে বলেন—'ইবনু খুওয়াইজ মিনদাদ বলেন, শাসক-প্রশাসকদের ওপর ওয়াজিব হলো, দ্বীনের যে সকল বিষয়ে তারা জানেন না, বা তাদের কাছে অস্পষ্ট, সে বিষয়ে আলিমদের সাথে পরামর্শ করা। যুদ্ধের বিষয়ে সেনাপ্রধানদের সাথে, জনগণের বিষয়ে তাদের মুখ্য ব্যক্তিদের সাথে, দেশের কল্যাণ ও দেশ বিনির্মাণের উন্নতির বিষয়ে বিজ্ঞ, মন্ত্রী ও গভর্নরদের সাথে পরামর্শ করা ওয়াজিব।'[৪৩৫]

এই মতে প্রবক্তাদের মধ্যে ইবনু আতিয়্যা মালিকিও আছেন। তার মতও কুরতুবি রহ. উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন—'ইবনু আতিয়্যা বলেন, শুরা-ব্যবস্থা হলো, শরিয়তের মূলনীতিগুলোর একটি এবং বিধিবিধানের একটি ভিত্তি। যে আহলে ইলমের কাছে পরামর্শ চায় না, তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে কোনোই খিলাফ নেই।'[৪৩৬]

---

[৪৩৪] জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহি, ৬১১

[৪৩৫] তাফসিরে কুরতুবি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৫০

(২) কেউ কেউ বলে মুস্তাহাব। ইবনু কুদামা রহ. বলেন—‘এটা (মাশওয়ারা) কতই না উত্তম! যদি শাসকরা সবসময় এটা করত, তাহলে কতই না ভালো হতো! তারা পরামর্শ করবে, অপেক্ষা করবে। তাছাড়া কখনো কখনো এই মাশওয়ারার মাধ্যমেই অনেক কিছু মনে আসে। একইভাবে ভুলে যাওয়া জিনিসগুলোও পরস্পরের আলোচনার মাধ্যমে স্মরণে আসে।’[৪৩৭]

ইবনু হাজার রহ. এই মতকেই মুস্তাহাব অগ্রাধিকার দিয়ে বলেন—ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইখতিলাফ আছে।

ইমাম বাইহাকি রহ. মাআরিফাত নামক কিতাবে ‘নস’ থেকে মুস্তাহাবের কথাই উল্লেখ করেন। এই মত আবু নাসর কুশাইরিও তার তাফসিরে গ্রহণ করেছেন। আর এটাই অগ্রাধিকার যোগ্য।[৪৩৮]

(৩) আবার কেউ কেউ বলেন—নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে ওয়াজিব আর উম্মাহর ক্ষেত্রে মুস্তাহাব।

ইমাম নববি রহ. বলেন—‘আমাদের মাজহাবের উলামায়ে কিরামের মাঝে ইখতিলাফ আছে—এটা কি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে ক্ষেত্রে ওয়াজিব ছিল, না সুন্নাহ ছিল, যেমন আমাদের ক্ষেত্রে সুন্নাহ? সহিহ মত হলো—তার কাছে এটা ওয়াজিব এবং এটাই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وشاورهم في الأمر

‘আর আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে’—এখানে ওয়াজিবের জন্য আদেশসূচক বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। এটাই গ্রহণযোগ্য এবং জুমহুর ফুকাহা ও মুহাক্কিক উসুলবিদদের মত।

উক্ত আয়াত থেকে এখানে আরেকটি বিষয় বোঝা যায়, পরামর্শদাতারা সবাই নিজেদের মত পেশ করবে, তারপর পরামর্শকারীর কাছে যেটা ভালো মনে হয়, সেটা গ্রহণ করবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

(৪) সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে—নবীজি এবং উম্মাহ) সবার ক্ষেত্রেই পরামর্শ করা মুস্তাহাব। তবে বিষয়টি যদি ঘোলাটে হয়ে যায়, তাহলে মাশওয়ারা করা ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

‘তোমরা যদি না জানো, তাহলে আহলে ইলমকে জিজ্ঞাসা করো।’[৪৩৯]

---

[৪৩৭] আল মুগনি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৪৬

[৪৩৮] ফাতহুল বারি, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩৪১

[৪৩৯] সূরা নাহল, আয়াত : ৪৩

মাশওয়ারা করা মুস্তাহাব বলা হয়েছে। কারণ—

وشاورهم في الأمر

'তাদের সাথে যাবতীয় বিষয়ে পরামর্শ করেন'—এখানে আদেশসূচক ক্রিয়াটি 'মুস্তাহাবের' জন্য, ওয়াজিবের জন্য নয়। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাশওয়ারা করার প্রয়োজনই ছিল না। কেননা, আল্লাহ তাআলা তো সঠিক বিষয়ে তাউফিক দেওয়ার মাধ্যমে, ওহির মাধ্যমে তাকে মাশওয়ারা থেকে অমুখাপেক্ষী করেছেন।

এজন্যই বড়ো বড়ো তাবিয়ি থেকে বেশ কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় যে, উক্ত আয়াতে আদেশসূচক ক্রিয়ার আসল অর্থ কী? এটা ব্যবহারের হিকমাহ কী? ওই বর্ণনাগুলোর প্রত্যেকটি থেকে এ কথাই বোঝা যায় যে, আদেশসূচক ক্রিয়াটি মুস্তাহাবের জন্য, ওয়াজিবের জন্য নয়। এসব বর্ণনাসমূহ হলো :

(ক) কাতাদা রহ. বলেন—

> وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)
>
> 'আর আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করেন যাবতীয় বিষয়ে। অতঃপর যখন আপনি (কোনো বিষয়ে) প্রতিজ্ঞা করেন, তখন আপনি আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করেন। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ তাআলা ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।'[৪৪০]

আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন বিষয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহাবায়ে কিরামের সাথে মাশওয়ারা করার আদেশ করেছেন। অথচ তার কাছে তো আসমান থেকেই ওহি আসত। কারণ, মাশওয়ারা করলে সবাই আনন্দ পাবে। তাছাড়া যখন কোনো জামাআত আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরের সাথে পরামর্শ করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সবচেয়ে উত্তম পথটি দেখান।

(খ) হাসান রহ. বলেন—'আল্লাহ তাআলা জানেন, নবীজির মাশওয়ারা করার কোনোই প্রয়োজন নেই। তবুও (আদেশ করেছেন) যাতে পরবর্তী সময়ে এটা উম্মাহর জন্য অনুসৃত হয়ে যায়।'

(গ) ইমাম রাজি রহ. বলেন—'ইমাম শাফিয়ি রহ. এই আদেশকে মুস্তাহাব অর্থে ধরেছেন। তিনি বলেন, এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথার মত—

البكر تستأمر في نفسها

'কুমারী নারীর কাছে (বিবাহের বিষয়ে) পরামর্শ চাওয়া হবে।'

---

[৪৪০] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৯

এখন যদি বাবা তাকে জোর করে বিয়ে করান, তবুও বিয়ে জায়িজ হবে। তবে উত্তম হচ্ছে, তার মনোতৃপ্তির জন্য তার সাথে পরামর্শ করা। ঠিক এখানেও এমন বলা হয়েছে।

এখন যদি বলা হয়, কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম তো বলেছেন—শাসক-প্রশাসকদের ওপর যদি মাশওয়ারা ওয়াজিব না হয়, তাহলে তারা নিজেদের আদেশ-নিষেধ জনগণের ওপর চাপিয়ে জুলুম-অত্যাচার শুরু করে দেবে। তাই, তাদের জন্য পরামর্শ করা ওয়াজিব, যা তাদেরকে জুলুম বা একনায়কতন্ত্র থেকে রক্ষা করবে।

এ কথার উত্তরে আমরা বলব, এটা তাদেরকে জুলুম থেকে বিরত রাখার সঠিক পদ্ধতি নয়। কারণ, (মাশওয়ারা ওয়াজিব হলে) এই জালিম শাসকরা তাদের সাথেই পরামর্শ করবে, যারা তাদের মতাদর্শে আদর্শিত। সুতরাং এতে কোনো ফায়দা নেই, যদি পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।

দুনিয়ার যত রকম অসুস্থতা আছে, যদি বাস্তবেই তার সঠিক চিকিৎসা করতে হয়, তাহলে খিলাফতে ইসলামিয়া কায়েম করার চেষ্টা করা ছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তা নেই, যা ইসলামকে বাস্তবেই পরিপূর্ণরূপে তুলে ধরতে পারে। কিন্তু যতদিন ইসলাম ও ইসলামের দর্শন কেবল কিতাবের পাতায় থাকবে, ততদিন জুলুম, অত্যাচার, অবিচার, একনায়কতন্ত্র এসব অবশিষ্ট থাকবেই থাকবে; যদিও 'মজলিসে শুরা' করে ভরে ফেলা হয়, যেমনটি অনেক মুসলিম দেশগুলোতে আছে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

শুরা ব্যবস্থা 'মুলজিম' না-কি 'মুলিম'

শুরা ব্যবস্থা মুলজিম (আবশ্যককারী) না-কি মুলিম (অবগতকারী) এক্ষেত্রে ইখতিলাফ রয়েছে। কোনো কোনো আলিম এবং সামসময়িক লেখকগণ বলেন—'মাশওয়ারা খলিফার জন্য আবশ্যককারী। তার কর্তব্য হলো, অধিকাংশ লোক যে মতের ওপর আছে, সেটা বাস্তবায়ন করা।'

তাদের দলিল—

> وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)
>
> 'আর আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করেন যাবতীয় বিষয়ে। অতঃপর যখন আপনি (কোনো বিষয়ে) প্রতিজ্ঞা করেন, তখন আপনি আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করেন। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ তাআলা ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।'[৪৪১]

এখানে, আজম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ অধিকাংশ ব্যক্তিদের মত গ্রহণ করা, অথবা আযম শব্দটি অধিকাংশদের মত গ্রহণ করার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। এ দাবির পক্ষে আমিরুল মুমিনিন আলি রা.-এর হাদিস আছে। তিনি বলেন—

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে عزم (আজম) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন—

مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم

'(আযম হলো) 'আহলে রায়' বা সিদ্ধান্ত দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করা। এরপর তাদের মত অনুসরণ করা।'[৪৪২]

অনুরূপভাবে খালিদ ইবনু মাদানের সূত্রেও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন—

قَالَ : رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْحَزْمُ ؟ قَالَ : أَنْ تُشَاوِرَ ذَا رَأْيٍ ثُمَّ تُطِيعُهُ

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল—'ইয়া রাসুলাল্লাহ, হাজম কাকে বলে?' তিনি বললেন, 'হাজম হলো সিদ্ধান্ত দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা। তারপর তাদের আনুগত্য করা।'[৪৪৩]

তবে অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম বলেন—খলিফা বা শাসকের জন্য মাশওয়ারা আবশ্যক নয়, বরং শুধু অবগতকারী। এর মাধ্যমে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। খলিফা যখন আহলে রায়-এর পরামর্শ করবেন, তখন তিনি তাদের মতগুলো দেখবেন। তার কাছে যে মতকে ভালো মনে হয় সেটা গ্রহণ করবেন—চাই সে মত অধিকাংশের হোক, বা কম সংখ্যকের, কিংবা তার নিজের মতও হোক।

তাদের দলিলও উপরোল্লিখিত আয়াত।

আল্লামা তাবারি বলেন—

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ

এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—আপনাকে আমার সমর্থন ও সঠিক মত দেওয়ার মাধ্যমে যখন আপনার প্রতিজ্ঞা সাব্যস্ত হবে, তখন যে বিষয়ে আপনাকে আদেশ করেছি, আপনি সেটা বাস্তবায়ন করেন আমার আদেশ দানের কারণে—চাই আপনার সাথীদের মত বা পরামর্শের অনুকূলে হোক বা বিপরীতে। আর আপনি নির্ভর করেন আল্লাহ তাআলার ওপর। (وتوكل) আপনি আল্লাহ তাআলার ওপর নির্ভর করেন ওই সকল ক্ষেত্রে, যা আপনি করবেন বা বর্জন করবেন, চেষ্টা

---

[৪৪২] তাফসিরে ইবনু কাসির, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩১

[৪৪৩] সুনানু আবি দাউদ. ৪৮২

করবেন বা বিরত থাকবেন। সকল ক্ষেত্রে আপনি তাঁরই ওপর নির্ভর করেন। সব ক্ষেত্রে তাঁর ফায়সালা ও সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট থাকুন। আপনার মাখলুকের সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট থাকার প্রয়োজন নেই।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

নিঃসন্দেহে, আল্লাহ তাআলা ভরসাকারীদের ভালোবাসেন। আর তারা হলো, যারা আল্লাহ তাআলার ফায়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকে, তাঁর হুকুমের কাছে আত্মসমর্পণ করে—চাই তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী হোক বা বিপরীতে হোক।[৪৪৪]

এরকম আরও অনেক মুফাসসিরিনে কিরামই তাফসির করেন। এই তাফসির থেকে বোঝা যায় যে, মাশওয়ারা আবশ্যককারী নয়। তাছাড়া আয়াতে فإذا عزمت একবচনের ক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রমাণ করে প্রতিজ্ঞা করবে কেবল পরামর্শকারীই। কিন্তু যদি পরামর্শকারীকে আহলে শুরার (পরামর্শদাতা) কথাই মানতে হতো, তাহলে তো আয়াতে বলা হতো— فإذا عزمتم বহুবচনের ক্রিয়া ব্যবহার করে।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, জুমহুরিয়্যাত বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা কখনোই সঠিকতা বা নির্ভুলতার মানদণ্ড নয়, অকাট্য দলিল তো নয়ই। একই সাথে অগ্রাধিকার যোগ্যও নয়। কেননা, কোনো মত বা চিন্তা সঠিক বা ভুল হওয়ার কারণ ওই চিন্তাশীল ব্যক্তি, কোনো কম বা বেশি সংখ্যক হওয়া এর কারণ নয়। তাই, ইসলাম কখনো সংখ্যাধিক্যকে সত্য- মিথ্যা, হক-বাতিল নির্ণয়ের মাপকাঠি বানায় নি। যেমন দেখা যায় বর্তমান গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে। অতএব, আধিক্যকে মূলনীতি বানানো অইসলামি পন্থা।[৪৪৫]

ইমাম জুহাইলি রহ. বলেন—'শরিয়তের 'মজলিসে শুরা' আর মানবরচিত আইন-কানুন ভিত্তিক দেশগুলোর 'মজলিসে শুরা'র মাঝে বড়ো একটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের মজলিসে শুরা মুলজিম তথা আবশ্যককারী নয়; বরং মজলিসে শুরা শুধু আল্লাহ তাআলার হুকুম সম্পর্কে গবেষণা ও অন্বেষণ করে, যার ফলে কম-বেশির কোনো ধর্তব্য নেই, সব সমান! আর মানবরচিত আইন-কানুন ভিত্তিক দেশগুলোর ক্ষেত্রে মজলিসে শুরা আবশ্যককারী। তাই, শাসককে অধিকাংশের মত গ্রহণ করতে হয়।[৪৪৬]

অনেক ক্ষেত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অধিকাংশের মত গ্রহণ

[৪৪৪] তাফসিরুত তাবারি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৪৬

[৪৪৫] আল ইমামাতুল উজমা, ৪৬০

[৪৪৬] আল ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৬২০৫

করেন নি। বরং নিজের মতের ওপর অটল ছিলেন। যেমন: হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়। একইভাবে আবু বকর রা.ও যখন ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে চেয়েছিলেন, তখন এ বিষয়ে সবার সাথে মাশওয়ারা করলে তিনি দেখতে পান যে, অধিকাংশের মত—যাদের মধ্যে স্বয়ং উমার রা. ছিলেন—জিহাদ না করার পক্ষে। তবুও আবু বকর রা. নিজের মতের ওপর অটল ছিলেন যে, নামাজ এবং জাকাত এ দুয়ের মাঝে কখনো পার্থক্য করা যাবে না। তিনি বলেন—

والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربتهم عليه

'আল্লাহর কসম! (জাকাতের পশুর সাথে) যে রশি তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিত, সেটাও যদি তারা আমাকে দেওয়া থেকে বিরত থাকে, তবুও আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।'[৪৪৭]

অনুরূপ উসামা রা.-এর বাহিনী প্রেরণের ক্ষেত্রেও তিনি নিজের সিদ্ধান্তের ওপর অটল ছিলেন। সুতরাং, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত ও খুলাফায়ে রাশিদার জীবনী অনুসন্ধান করে বোঝা যায়—খলিফা বা শাসকের জন্য আবশ্যক নয়, মাশওয়ারা অনুযায়ী কাজ করা। শুরার ফায়দা এখানেই যে, সবার মত জানার মাধ্যমে একটি সমস্যার সবদিক স্পষ্ট হয়ে যায়। ফলে পরামর্শকারীর সামনে সবচেয়ে উত্তম পন্থা এবং উপকারী পদ্ধতিটি স্পষ্ট হয়।

শুরা-ব্যবস্থার ফায়দা জানলে সামসময়িক আপত্তিকারীদের আপত্তি এমনিতেই দূর হয়ে যাবে। অনেক সময় শুরার মতমত নেওয়ার পর সেটি গ্রহণ না করলে তারা আপত্তি করে বলে—শুরা ব্যবস্থা যদি আবশ্যককারীই না হয়, তাহলে তো শুরা ব্যবস্থার কোনোই ফায়দা-ই থাকল না। অথচ তারা এটা ভুলে যায় যে—ইসলামি ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ এটি! আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এখানে, শুরা বা মাশওয়ারা দ্বারা উদ্দেশ্য খলিফার মাশওয়ারা। অর্থাৎ, খলিফা থাকাকালীন কোনো বিষয়ে মাশওয়ারা। পক্ষান্তরে, 'আহলুল হিল্লি ওয়াল আকদ' খলিফা নির্ধারণে তাদের মাশওয়ারাকে 'শুরাল ইনতিখাব' বা 'নির্বাচনের মাশওয়ারা' বলে। আর এই শুরা জনগণের জন্য মুলজিম তথা আবশ্যককারী, যদি আহলুল হিল্লি ওয়াল আকদ কোনো খলিফাকে নির্বাচন করে তার হাতে বাইআত গ্রহণ করে, যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

---

[৪৪৭] আল ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৬২৩

মজলিসে শুরার সদস্য নির্বাচন

নববি যুগ বা খিলাফতে রাশিদার যুগে মজলিসে শুরার সদস্য নির্ধারণের নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি ছিল না; বরং পরামর্শদাতার গুণাবলিই মূল ছিল। আবু হুরাইরা রা.-এর হাদিস থেকে যেমনটি বোঝা যায়। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

المستشار مؤتمن।

'পরামর্শদাতা আমানতদার।'[৪৪৮]

খুলাফায়ে রাশিদা জ্ঞানী সমাজের সাথে পরামর্শ করতেন, যেমনটি মাইমুন ইবনু মাহরান থেকে বাইহাকি রহ. তার *কুবরাতে* ২০৩৪১ নম্বর হাদিসে বর্ণনা করেন। অধ্যায়—'কাজি যে বিষয়ে ফায়সালা দেবেন এবং মুফতি যে বিষয়ে ফতোয়া দেবেন'

ইসলামি শুরা-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো, ভালো ভালো গুণ থাকা, যুবক হোক বা বৃদ্ধ। *আহকামুল কুরআন* কিতাবে ইবনুল আরাবি রহ. বলেন—'কারিরাই[৪৪৯] উমার রা.-এর মজলিস ও মাশওয়ারার সাথি ছিলেন, বৃদ্ধ হোক বা যুবক।'

ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—উমার রা. আমাকে বদরে অংশগ্রহণ করা প্রবীণ সাহাবিদের সাথে রাখতেন। এতে কেউ কেউ আপত্তি করে বলে, আপনি কেন এই তরুণকে আমাদের সাথে বসান? অথচ আমরা তার (এত বড়ো যে) তার সমবয়সী আমাদের সন্তান আছে। তখন উমার রা. বলেন—সে কেমন তরুণ সেটা তো আপনাদের জানার কথা। পরে একদিন তিনি তাদেরও ডাকলেন, সাথে আমাকেও ডাকলেন। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলছেন, আমার মনে হয় সেদিন তিনি আমাকে ডেকেছেন তাদের সামনে আমার মর্যাদা প্রকাশ করার জন্যই। প্রবীণদের লক্ষ করে উমার রা. বলেন—

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢)
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

এই সূরার তাফসিরের ক্ষেত্রে তোমরা কী বলো? তখন কেউ বলল—আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করার, তার কাছে ইস্তিগফার করার আদেশ করা হয়েছে, যখন আমাদের সাহায্য করা হবে এবং বিজয় দান করা হবে।

---

[৪৪৮] সুনানু আবি দাউদ

[৪৪৯] অর্থাৎ আলিমরা, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের যুগে আলিমদের কারি বলা হতো। কেননা, যারা কুরআন পড়তে পারতেন তারা কুরআনের হুকুম আহকাম সম্পর্কেও জ্ঞানী ছিলেন যা বর্তমান যুগে নেই।

আর কেউ বলল—আমরা জানি না। তাদের কেউ কেউ কিছুই বলেন নি। পরে তিনি আমাকে বললেন, ইবনু আব্বাস, তুমি কী বলবে?

আমি বললাম, এটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'আজাল' (মৃত্যুর নির্ধারিত সময়), যা আল্লাহ তাআলা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ, (إذا جاء نصر الله والفتح) 'যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়'—অর্থাৎ মক্কা বিজয় তো সেটাই, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আজালের আলামত। (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) 'সুতরাং, আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করেন, আর ইস্তিগফার করেন। নিঃসন্দেহে, তিনি অতিশয় তাওবা কবুলকারী।'

উমার রা. বললেন—'তুমি যা জানো, আমিও তাই জানি।'[৪৫০]

সমস্ত নস (কুরআন ও হাদিস) প্রমাণ করে যে, পরামর্শদাতাদের নির্ধারণের দায়িত্ব পরামর্শকারীর, যেমন উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। এখানে, উমার রা. ইবনু আব্বাস রা.-কে মাশওয়ারার জন্য নির্ধারন করেছেন।

ইসলামি শুরা-ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক শুরা-ব্যবস্থার মাঝে পার্থক্য

ইসলামি শুরা ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক শুরা ব্যবস্থার মাঝে বড়ো একটি পার্থক্য হলো, ইসলামি শুরা ব্যবস্থার ভিত্তি হলো—বিশেষ কিছু গুণাবলি, যা শরিয়তের কাছে বিবেচ্য; আর গণতান্ত্রিক শুরা ব্যবস্থার ভিত্তি হলো—সাধারণ জনগণের নির্বাচন, চাই নির্বাচনকারীদের শরিয়ত বিবেচিত গুণ থাকুক, বা না থাকুক। এমনকি মুসলিম হওয়ার শর্তও নেই।

যে শুরা-ব্যবস্থার প্রতি আল্লাহ তাআলা উদ্বুদ্ধ করেছেন, যেখানে এটা স্পষ্ট নয় যে, এই শুরা-ব্যবস্থা (শাসক বা সরকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে) সবার জন্য প্রযোজ্য, কিংবা কোনো বাছ-বিচার ছাড়াই অধিকাংশের জন্য প্রযোজ্য; বরং এই শুরা ব্যবস্থা শুধু 'আহলুল হিল্লি ওয়াল আকদের' জন্য—যারা জাতির উচ্চ মর্যাদা ও উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী, বিশেষজ্ঞ এবং যোগ্য। আর তারাই হলেন জাতির নেতৃস্থনীয় ব্যক্তিবর্গ, মুখপাত্র। অর্থাৎ, উলামায়ে কিরাম—যারা শরিয়ত, সামাজিকতা, বিচার-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী। পক্ষান্তরে, নিম্নশ্রেণির অধিকারী হলো যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, রাজনৈতিক কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী। যেমন: বর্তমান পার্লামেন্টে ও জন-বৈঠকগুলোতে দেখা যায়।

[৪৫০] সহিহ বুখারি, ৪২৯৪

শুরা-ব্যবস্থার সদস্যগণ

শুরা-ব্যবস্থার সদস্যগণের গুণাবলি দুই প্রকার—

০১। এমন কিছু গুণাবলি, যা যেকোনো বিষয়ের পরামর্শের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। সেগুলো হলো:

- শরিয়তের ইলম;
- আমানত;
- তাকওয়া;

কারণ, যে সকল বিষয় হালাল-হারামের সাথে সম্পৃক্ত, সেখানে শরিয়তের ইলম থাকলে হালালটা গ্রহণ করা যাবে এবং আমানাত ও তাকওয়ার মাধ্যমে খিয়ানত থেকে বিরত থাকবে। ক্ষতিকর হলে, তা বলে দেবে।

ইমাম বুখারি রহ. বলেন—নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর শাসকরা জায়িজ বিষয়গুলোতে আহলে ইলমের মধ্যে যারা আমানতদার, তাদের কাছে পরামর্শ চাইতেন, যাতে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়।

সুফইয়ান সাওরি রহ. বলেন—'তুমি যার সাথে পরামর্শ করবে, সে যেন মুত্তাকি ও আমানতদার হয়, আল্লাহকে ভয় করে।'[৪৫১]

০২। দ্বিতীয় প্রকার, কিছু বিশেষ গুণাবলি।

যদি পরামর্শ করার বিষয়টি যুদ্ধের বিষয়ে হয়, তাহলে সেনাপ্রধানদের সাথে পরামর্শ করবে। আর যদি অর্থনৈতিক বিষয়ে হয়, তাহলে অর্থনীতিবিদদের সাথে পরামর্শ করবে। এভাবে প্রত্যেক বিষয়ের ক্ষেত্রে সে বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করবে। তবে বিশেষ গুণাবলির সাথে ব্যাপক গুণাবলি (তাকওয়া, আমানতদারিতা) থাকা আবশ্যক। (المستشار مؤتمن।) 'পরামর্শদাতা আমানতদার' এই হাদিসের ব্যাখ্যায় মুনাওয়ী রহ. বলেন—

কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বলেন—উপদেশ দানকারী, পরামর্শ দানকারীকে অনেক বড়ো বড়ো ইলম অর্জন করতে হয়। কারণ, তাকে প্রথমে শরিয়তের ইলম অর্জন করতে হয়। আর এই ইলম ব্যাপক, যা অনেক ইলমকে শামিল করে। একই সাথে মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, স্থান ও কাল সম্পর্কে, কোনো বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়ার জ্ঞান থাকতে হয়। যদি পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি আরেকটির সাথে সাংঘর্ষিক হয়; অর্থাৎ এমন বিষয় সামনে আসে, যা সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে যুগোপযোগী হলেও নির্দিষ্ট 'স্থান' বা 'অবস্থা'র বিরোধী, তাহলে একটিকে আরেকটির ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার চেষ্টা করা—যেটা তার কাছে অগ্রাধিকার যোগ্য মনে হয়, সেটাকে অগ্রাধিকার দেবে। এর উদাহরণ হলো, একটি বিষয়ের দুটো দিক আছে,

৪৫১ তাফসিরে কুরতুবি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৫১

যা যুগোপযোগী নয়; অথচ অবস্থা দাবি করে। তাহলে সে এ দুটোর মধ্যে যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটার পরামর্শ দেবে। একইভাবে যদি কোনো মানুষের অবস্থা সাংঘর্ষিক হয়—তাকে যখন কোনো বিষয়ের পরামর্শ দেওয়া হয়, তখন সে উল্টোটা করে—তাহলে তাকে অনুচিত বিষয়ের পরামর্শ দেবে, যাতে সে উচিত বিষয়টি করে। একেই বলে علم السياسة বা রাজনৈতিক কূটনীতি।

কারণ, এর মাধ্যমেই অবাধ্য ও একগুঁয়ে লোককে কল্যাণের পথে পরিচালনা করতে হবে। এজন্যই বিশেষজ্ঞরা বলেন—যে পরামর্শ বা উপদেশ দেবে তাকে ইলম, আমল, সহিহ ফিকির, সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি, ভারসাম্যপূর্ণ মেজাজ, স্থীরতা ও নীরবতা—এসব কিছু অর্জন করতে হয়। কিন্তু যদি এসব বিষয় অর্জন করতে না পারে, তাহলে তার ভুল নির্ভুলের চেয়ে বেশি হবে। সুতরাং, সে পরামর্শও দিতে পারবে না, উপদেশও দিতে পারবে না।[৫৫২]

ইমাম মাওয়ারদি রহ. বলেন—'কেউ যখন কারও সাথে পরামর্শ করার ইচ্ছা করবে, তখন তাকে এর যোগ্য কাউকে খুঁজতে হবে। অর্থাৎ, যার মাঝে পাঁচটি গুণ পাওয়া যাবে—

০১। **পূর্ণ বোধ-বুদ্ধির সাথে পূর্বের অভিজ্ঞতা :** কারণ, যখন পূর্বের অভিজ্ঞতা থাকবে, তখন যেকোনো বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা যাবে।

০২। **দ্বীনদার ও মুত্তাকি হওয়া :** কারণ, এটাই সৎ হওয়ার ভিত্তি, সফলতার দ্বার। যার মাঝে দ্বীনদারি যত বেশি, তার কাছে গোপন বিষয় তত নিরাপদ। সে দৃঢ় মনোবলের ক্ষেত্রে অধিক তাউফিকপ্রাপ্ত।

০৩। **হিতাকাঙ্ক্ষী ও আন্তরিক হওয়া :** কারণ, হিতাকাঙ্ক্ষা ও আন্তরিকতা বাস্তব চিন্তা করতে সাহায্য করে, সুন্দর সিদ্ধান্ত প্রদানে সহায়তা করে। কোনো কোনো উলামায়ে কিরাম তো বলেন—পরামর্শ করতে হবে দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ব্যক্তির সাথে, হিংসুকের সাথে নয়। বুদ্ধিমানের সাথে, বিদ্বেষীর সাথে নয়।

০৪। **ক্ষতিমুক্ত চিন্তার অধিকারী হওয়া :** তার চিন্তা-ফিকির ক্ষতিকর দুশ্চিন্তা ও ব্যতিব্যস্তকারী উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত থাকবে। কারণ, যার চিন্তার সাথে বিভিন্ন দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা জড়িয়ে থাকে, তার মত সঠিক হয় না। তার চিন্তা সাধারণত নির্ভুল হয় না। 'মানসুরুল হুকুম' কিতাবে আছে, প্রত্যেকটি জিনিসের ক্ষেত্রে বোধ-বুদ্ধি প্রয়োজন। আর বোধ-বুদ্ধির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

০৫। **স্বার্থহীন হওয়া :** যে বিষয়ে পরামর্শ করা হবে, সে বিষয়ে পরামর্শদাতার কোনো স্বার্থ থাকা যাবে না, যা তাকে অনুগামী করে ফেলবে; কোনো প্রবৃত্তি থাকা যাবে না, যা তাকে সাহায্য করবে। কারণ, স্বার্থ টেনে নেয় আর প্রবৃত্তি বাধা হয়ে

---

[৫৫২] ফাইজুল কাদির, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৬৮

...ধারণায়। যখন সিদ্ধান্ত প্রদানে কোনো প্রবৃত্তি কাজ করে, সেই সাথে বিভিন্ন স্বার্থও জড়িত থাকে, তাহলে সে মত আর নিরাপদ থাকে না।

যখন কারও মাঝে এ পাঁচটি গুণ পূর্নাঙ্গারূপে পাওয়া যাবে, তখন সে পরামর্শ দেওয়ার যোগ্য হবে এবং মত প্রদানে ক্ষমতা রাখবে। সুতরাং, নিছক ধারনার ভিত্তিতে তোমার মতকে উত্তম ভেবে, তোমার দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিক ভেবে, তুমি এমন ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া থেকে বিরত থেকো না। কারণ, যার কোনো প্রয়োজন থাকে না, তার মত খুবই নিরাপদ। সে নির্ভুলতার বেশি কাছাকাছি থাকে। কারণ, তার চিন্তা-ভাবনা একনিষ্ঠ ও স্বার্থমুক্ত থাকে। তার অন্তরে নিজের খাহেশাত মেটানোর ইচ্ছা কাজ করে না।[৪৫৩]

শূরা ব্যবস্থার সদস্যদের আরেকটি গুণ, পুরুষ হওয়া। কারণ, আল্লাহ তাআলা নারীকে সৃষ্টিগত, গঠনগত এবং সক্ষমতার বিচারে পুরুষের সমমান করেন নি। এজন্যই আল্লাহ তাআলা পুরুষের জন্য এমন কাজ নির্বাচন করেছেন, যা তার সৃষ্টি ও সক্ষমতার উপযোগী। যেমন: জিহাদ ও নেতৃত্ব।

আবার, নারীকে এমন কিছু কাজ ও দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, যা তার অবকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন: ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ, সন্তানের প্রতিপালন। এজন্যই নবুওয়াত পুরুষদের সাথেই খাস, তেমনিভাবে রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

'আর পুরুষদের জন্য নারীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।'

উমার রা. বলেন—

كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلها في شيء من أمورنا

'জাহিলিয়াতের যুগে নারীদেকে আমরা কিছুই মনে করতাম না। কিন্তু যখন ইসলাম এলো এবং আল্লাহ তাআলা তাদের বিষয় উল্লেখ করলেন, তখন দেখলাম যে, আমাদের ওপর তাদের হক আছে। তবে আমাদের পুরুষদের কোনো বিষয়ে তাদের অনুপ্রবেশ চলবে না।'[৪৫৪]

ইসলামের শত্রুরা, কাফির-মুনাফিকরা ভালো করেই জানে যে, পরিবার ধ্বংস করার, সন্তান নস্ট করার, সমাজ কলুষিত করার বড়ো একটি মাধ্যম নারীকে বিকৃত

[৪৫৩] আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবনু হাবিব মাওয়ারদি, আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন, ২৬০-২৬৩, ঈষৎ পরিবর্তিত।

[৪৫৪] সহিহ বুখারি, ৫৮৪৩

করে ফেলা। এজন্যই তারা নারীকে ঘর থেকে বের করার জন্য, লজ্জা ও পর্দা থেকে মুক্ত করার জন্য বার বার চেষ্টা করছে, যা আজ প্রায় সব দেশেই দেখা যায়।

এতক্ষণ ইসলামি সিয়াসাত ও রাজনীতির শুরা-ব্যবস্থার কথা আলোচনা করলাম। পক্ষান্তরে, গণতন্ত্রের শুরা ব্যবস্থা বিভিন্ন দল-উপদল, কাফির, মুসলিমদের দ্বারা এমনভাবে মিশ্রিত যে—তাদের কারও কোনো নিজস্বতা, স্বকীয়তা, বা বৈশিষ্ট্য থাকে না, যার মাধ্যমে তাদের অন্যদের থেকে পৃথক করা যায়; বরং সবাই সমান, হয় সবগুলো ধর্ম এক করে নতুন কোনো ধর্ম বের করে, কিংবা অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দ্বীন ধর্মের কোনো প্রভাব না রেখে প্রকাশ্যে এক জাতির মতোই থাকে। সবাইকে এক নামে ডাকা হয়। কারণ, সবার শাসক ও মাটি এক। তাদের কোনো জাতির বিশেষ আইন-কানুন থাকে না; বরং সব আইন-কানুন অধিকাংশের ভিত্তিতে হয়, যা বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ থেকে নেওয়া হয়। এ সকল আইন-কানুন নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাই অধিকাংশ যা চায়, সে অনুযায়ী ফায়সালা করা হয়। আর যেটা ফিরিয়ে দেয়, সেটা বাতিল করা হয়। কোনোভাবেই সেটা আর আমলে নেওয়া হয় না—চাই শরিয়ত মোতাবেক হোক, বা না হোক।

কোনো সন্দেহ নেই, এ রকম শুরা-ব্যবস্থা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত। কারণ, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> ان الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بني ادم وادم من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها أن نتنا
>
> 'আল্লাহ তাআলা তোমাদের থেকে জাহিলিয়াতের মিথ্যা অহংকার এবং পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে গর্ব করা বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। মুমিন হয় মুত্তাকি, পাপী হয় হতভাগা। তোমরা আদম-সন্তান, আর আদম আ. মাটি থেকে সৃষ্ট। লোকেরা যেন বিশেষ কোনো গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে কেন্দ্র করে অহংকার করে না বেড়ায়। তারা তো এখন হয় জাহান্নামের কয়লায় পরিণত হয়েছে, কিংবা তারা আল্লাহ তাআলার কাছে ওই কীটের চেয়েও নিকৃষ্ট—যে নিজের নাক দিয়ে ময়লা দূর করে।'[৪৫৫]

এছাড়া ইসলাম কখনোই কুফুরির সামান্য কিছুও নিজের মাঝে অনুপ্রবেশ মেনে নিতে পারে না। কারণ, যেটা ইসলাম ও কুফুর মিশ্রিত ধর্ম, সেটাও যে কুফুরি—এতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং, ইসলামি দেশগুলোর মুসলিমদের ওপর কর্তব্য—

বিশেষ করে আফগানিস্তানের মুসলিম—তারা ইসলামি জীবনব্যবস্থায় পরিচালিত হবে, যাতে তাদের কালিমা এক হয়, তারা সকলে যেন সিসাঢালা প্রাচীরের মতো সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারে। নিশ্চিত তখনই তাদের বিজয় হবে, শত্রুদের সংখ্যা যতই বেশি হোক না কেন—এমনকি এই পরিমাণও যদি হয় যে, অন্য কাফিরদের শক্তি বা সাহায্য নেওয়ারও প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, তাদের শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি হবে জুমহুরিয়াত বা অধিকাংশের ওপর। তাহলে কোনো সন্দেহ নেই যে, পরাজয় তাদেরই হবে। তাদের দ্বীনি বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা, ইসলামি তামাদ্দুন ও প্রকৃত স্বাধীনতা—এসব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে! কারণ, যে শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তিই 'অধিকাংশ' নীতির ওপর, সেই শাসন-ব্যবস্থা শুধু তাদেরকে স্বাধীনতা দেয়—যারা সংখ্যায় ও লোকবলে বেশি। পক্ষান্তরে যারা সংখ্যায় কম, তাদের স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই।

তবে এটাও সত্য যে, আজকের যুগে পাপাচারীদের সংখ্যাই বেশি। বিশেষ করে এখন যেহেতু নেক লোকদের আধিপত্য নেই, মুজাহিদদের কোনো চিহ্ন নেই। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

***
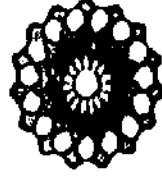
উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন

খলিফার কর্তব্য হলো—দাওলাতে ইসলামিয়াতে দ্বীনি শিক্ষাকে সামসময়িক শিক্ষার ওপর প্রাধান্য দেওয়া। তবে এর দ্বারা এটা বলা উদ্দেশ্য নয় যে, সামসময়িক শিক্ষা একেবারেই বাদ দেওয়া হবে। বরং উদ্দেশ্য হলো—সামসময়িক শিক্ষা দ্বীনি শিক্ষার আওতায় থাকবে। কারণ, এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, বান্দার দ্বীনের ভিত্তি ও কামালিয়্যাত হলো—উপকারী ইলম ও নেক আমল। আর উপকারী ইলম ও নেক আমল এই দুটো নির্ভরশীল আল্লাহ তাআলার কিতাবের ওপর—যার সাথে না সম্মুখ দিক থেকে, আর না পশ্চাৎ দিক থেকে কোনো মিথ্যা মিশ্রিত হতে পারে। আরও নির্ভরশীল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর ওপর, যাকে আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও দ্বীনে হক সহকারে, যাতে তিনি এই দ্বীনে হককে সমস্ত ধর্মের ওপর বিজয়ী করেন। এখন, আমরা যদি এই দ্বীনে হকের ওপর অটল থাকতে চাই, তাহলে আমাদের যেকোনো মূল্যে এই কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। কারণ, এই উম্মাহর প্রথম জামাআত কিতাব ও সুন্নাহর হিফাজতের মাধ্যমেই দ্বীনের ওপর স্থির থাকতে পেরেছেন। আর যারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তারা এই কিতাব ও সুন্নাহ তরক করার মাধ্যমেই বিচ্যুত হয়েছে। সুতরাং, এই উম্মাহর শেষ ভাগও তখনই সফল হবে, যখন তারা কিতাব ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসবে।

দাওলাতে ইসলামিয়াতে তখনই দুর্বলতা প্রকাশ পায়, যখন ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থার আধিপত্য চেপে বসে। হাফিজ শামসুদ্দিন জাহাবি তাজকিরাতুল হুফফাজ (খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪০) গ্রন্থে বলেন—'দ্বিতীয় শতাব্দীতে আব্বাসি খলিফা আমিনকে হত্যা করা হলে মামুন যখন তার স্থলবর্তী হন, তখন তিনি জ্যোতির্বিদ্যা চালু করেন, ইলমুল কালামের সূচনা করেন, বিভিন্ন দর্শন ও ইউনানি শাস্ত্র আরবিতে রূপান্তরিত করেন। তিনি 'রাসদুল কাওয়াকিব' নিয়ে কাজ করেন। শেষ পর্যন্ত এর ফল কী দাঁড়িয়েছিল? সবার সামনে একটি ধ্বংসকর নতুন শাস্ত্র রচিত হয়, যার সাথে

ক্ষেত্রে নবুয়তের কোনো সম্পর্ক নেই। মুমিনদের তাওহিদের সাথেও এর কোনো সামঞ্জস্য নেই। বরং উম্মাহ এই শাস্ত্র থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল।'

এছাড়া এটা পরীক্ষিত যে, নতুন সামসময়িক কোনো শাস্ত্র নিয়ে অতিরিক্ত গবেষণা করা আকিদা ও আমলের জন্য বিধ্বংসী।

সাধারণত দেখা যায়—যারা এগুলো শেখায় এবং শেখে, তারা কুরআন-সুন্নাহ, সালাফে সালিহিনন ও ইমামদের কথা বর্জন করে। তারা শুধু দর্শনের ওপর নির্ভর করে, শরিয়তের দিকে ফিরেও তাকায় না; যেমনটি আফগানিস্তানের হুকুমাতের ওপর 'দাহরিয়া' সম্প্রদায়ের বিদ্রোহের সময় দেখা গিয়েছিল! কারণ ছিল একটাই, তখন সামসময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আফগানিস্তানের দ্বীনি মকতব ও স্কুল-কলেজের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল।

হাফিজ জাহাবি তাজকিরাতুল হুফফাজে (খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৬) আলি ইবনুল হাসান জাইলি রহ.-এর জীবনী সম্পর্কে বলেন—'এক মজলিসেই এক সাথে তার সামনে দশ হাজারেরও বেশি ছাত্র দোয়াত-কালি নিয়ে বসে থাকতে। তারা খুবই গুরুত্বের সাথে নবীজির হাদিস লিখত। এছাড়া তাদের মাঝে আরও ২০০জন এমন ইমামদের উপস্থিতি থাকত, যারা ফতোয়া প্রদানে পুরোপুরি প্রস্তুত এবং যোগ্য।'

আজ মুহাদ্দিসিনে কিরাম চলে গেছেন, যুগের পরিবর্তন হয়েছে, মানুষ তাদের ছাত্র হয়ে আছে, অথচ হাদিস ও সুন্নাহর শত্রুরা তাদের নিয়ে উপহাস ও বিদ্রূপ করে। বর্তমানে দেখা যায়, সামসময়িক শিক্ষায় শিক্ষিতরা শুধু দ্বীনের শাখাগত বিষয় অনুসরণ করে। তাও যাচাই-বাছাই, গবেষণা, পূর্ববর্তীদের দর্শন ও মুতাকাল্লিমিনের মতগুলো উপলব্ধি না করেই সেগুলোর ওপর নিবেদিত থাকে। এভাবে সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করে, নফসের চাহিদা শক্তিশালী হয়ে ওঠে, (হাদিসে বলা) ইলম উঠে যায়, মানুষের অন্তর কবজা করে ফেলা এসব বিষয়ের প্রাথমিক অবস্থাগুলো প্রকাশ পেতে শুরু করে।

তাই বলি, আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির ওপর রহম করেন, যে নিজের সংশোধনের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়, নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখে, কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন থাকে। যদি ইমাম জাহাবির যুগে (৭৪৮ হি. মৃত্যু) এমন হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের এ যুগ সম্পর্কে আর কী বলব?

অতএব, মুসলিমদের দায়িত্বশীল সমাজ ও উলামায়ে দ্বীনের ওপর কর্তব্য হলো—তারা মুসলিমদের নতুন প্রজন্মকে এসব আধুনিক ধর্মবিরোধী মতবাদ থেকে বিরত রাখা। কারণ, এসব কিছুই কাফিরদের চিন্তা-চেতনা মিশ্রিত। যাদের সারা জীবনের লক্ষ্য মুসলিমদের আখলাক বিনষ্ট করা, দ্বীনে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

'আর কাফিররা বলে—'তোমরা এ কুরআনের নির্দেশ শোনো না এবং তা আবৃত্তির সময় শোরগোল সৃষ্টি করো, যাতে তোমরা জয়ী হতে পারো।''[৪২৬]

কুরাইশদের যখন কুরআনের বিরোধিতা করার আর কোনো সুযোগই থাকল না, বরং তারা সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হয়ে গেল, তখন তারা কুরআন তিলাওয়াত শোনার সময় হট্টগোল, শোরগোল, হাত তালি ও শিস বাজানো শুরু করল।

প্রকৃতপক্ষে, এটাই সব যুগে জাহিল ও নিম্নশ্রেণির মানুষের কাজ। যখন সত্যের বাণী প্রস্ফুটিত হয়, তখন ইসলামের হুকুম-আহকাম জারি করা হয়। এর বাস্তবতাকে মুছে দেওয়ার জন্য (ইসলামের শত্রুরা) বেহায়াপনা জাতীয় পদার্থগুলোই ব্যবহার করে। কুরআনের শিক্ষা ও মুসলিমদের মাঝে বিভিন্ন প্রকারের বাধা সৃষ্টি করে রাখে। যার নমুনা হলো—বর্তমান সময়ের স্কুল-কলেজ, যেখানে আছে অশ্লীলতার সাথে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। সেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পোশাক পাশ্চাত্য ও ইউরোপীয়দের অনুকরণে তৈরি! অথচ এ সবই ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য সবচেয়ে বড়ো ঈমান বিধ্বংসী বিষয়গুলোর অন্যতম। এ-সবই কুরআনের শিক্ষা, শরিয়তের হুকুম-আহকাম ও ইসলামি আখলাক থেকে সবচেয়ে কঠিন বাধা।

আল্লামা মুহাম্মাদ শফি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন—'কুরআন থেকে আহরিত দ্বীনি শিক্ষা থেকে বাধা দেওয়াটাও কুরআন থেকে বাধা দেওয়ার নামান্তর। কারণ, কুরআনের বাণী শোনার অর্থ হলো, কুরআনের ভেতরে থাকা জ্ঞানের কথা শোনা।

সুতরাং, কাফিররা যখন হট্টগোল ও শোরগোলের মাধ্যমে কুরআন থেকে বিরত রাখতে চাইত; তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল—কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে বিরত রাখা। সুতরাং, যারা মুসলিম উম্মাহর সন্তানদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ দ্বীনি ইলম শেখার আগেই নতুন নতুন শাস্ত্রের লোভ দেখিয়ে স্কুল-কলেজে যেতে উদ্বুদ্ধ করে, তারা যেন বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। কারণ, সাধারণত অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়, এটাই (অর্থাৎ দ্বীনি ইলম না শিখে এ জাতীয় শিক্ষা) দ্বীন এবং উলুমে দ্বীন বর্জন করার দিকে নিয়ে যায়। এটাই সবচেয়ে বিধ্বংসী অস্ত্র, যা মানুষকে কুরআন পরিত্যাগ করার দিকে নিয়ে গিয়েছে, মুসলিমদের আল্লাহ তাআলার রঙের পরিবর্তে বিজাতীয় রঙে রাঙিয়েছে। এভাবেই মুসলিমরা ধ্বংসযজ্ঞ সম্প্রদায়ের অনুসরণ শুরু করে।'[৪২৭]

---

[৪২৬] সূরা হা-মিম সিজদাহ, আয়াত : ২৬

[৪২৭] মাওলানা মুহাম্মাদ শফি, আহকামুল কুরআন, সূরা হা-মিম সাজাদাহ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১২৭.

কিছু কিছু মূর্খদের বলতে শোনা যায়, সামসময়িক জ্ঞান অর্জন করলে নাকি 'পেট' বাঁচানো যায়, রিজিকের সন্ধান পাওয়া যায়, যা দ্বীনি ইলমের ক্ষেত্রে অসম্ভব। এটা যে স্রেফ মূর্খতা ও অজ্ঞতা, দরিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যার নামান্তর এতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا
>
> 'আর তোমরা নিজেদের সন্তানদের দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না। আমি তাদের রিজিক দান করব এবং তোমাদেরকেও। নিঃসন্দেহে, তাদের হত্যা করা বড়ো অন্যায়।'[৪৫৮]

মুফতি জামিল আহমাদ থানভি বলেন—'দরিদ্রতার কারণে হত্যা করা হারাম' কথাটি প্রমাণ করে যে, যে জিনিসই দারিদ্র্যের কারণে করা হবে, সেটাও হারাম।[৪৫৯]

তবে এই সামসময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখার বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে সেটা কিন্তু আমরা অস্বীকার করি না। কারণ, অনেক সময় যুগের কারণে মানুষের জীবন ধারণ, জীবিকা উপার্জন এসবের ওপরও নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

এছাড়া সামরিক শক্তি অর্জন ও শত্রুদের প্রতিহত করার জন্য এ সকল মাধ্যমগুলোও জানা থাকা প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَـٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(٣٢)قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ
>
> 'হে নবী, আপনি বলেন—'আল্লাহ নিজের বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে হারাম করেছে?'
>
> বলেন, 'পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এসব তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে।' এভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি।
>
> বলেন, 'আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতাকে, পাপাচার ও অসংগত বিদ্রোহকে।''[৪৬০]

এখন প্রশ্ন হলো—যখন সামসময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখা জায়িজ, তাহলে কি মুসলিম উম্মাহর সন্তানরা কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহের ইলম থেকে সম্পূর্ণরূপে

---

[৪৫৮] সূরা ইসরা, আয়াত : ৩১

[৪৫৯] মুফতি জামিল আহমাদ, আহকামুল কুরআন, সূরা ইসরা, ৯০

[৪৬০] সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৩২-৩৩

মুক্ত? তখন প্রশ্ন ওঠে, কীভাবে তারা এমন বিষয় থেকে মুক্ত হবে, যে বিষয়ের ওপর তাদের দ্বীন-দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা নির্ভর করে? উপরের আলোচনা থেকে সুসাব্যস্ত হয় যে, কুরআন-সুন্নাহর ইলমকে সামসময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে।

এখন এই প্রশ্ন আসে যে, যখন কুরআন-সুন্নাহর ইলম অন্যান্য সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের আগে অর্জন করা ওয়াজিব, তাহলে সামসময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কী পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া হবে?

এ প্রশ্নের জবাব তখনই স্পষ্ট হবে, যদি দুনিয়ার জীবনকে মৃত্যু পরবর্তী আমাদের চির প্রতীক্ষিত জীবনের সাথে তুলনা করি।

সামসময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান শুধুই পার্থিব জীবনের সাথে আবদ্ধ। পক্ষান্তরে, কুরআন-সুন্নাহর ইলম এমন নয়। কারণ, কুরআন-সুন্নাহর ইলম দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই আমাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে যাবে।

তাছাড়া সামসময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিভিন্ন শিল্পকর্ম শেখা ও চর্চা করার ক্ষেত্রে কাফির মুসলিম সবাই সমান। কাফির শুধু তার দুনিয়ার স্বার্থেই এই জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কাজে লাগায়, আর মুসলিম এগুলোকে অন্যান্য জিনিসের মতো দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার উসিলা বানায়।

কুরআন ও সুন্নাহর ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য হলো—আল্লাহ তাআলার মাআরিফাত লাভ করা, তার তাওহিদ ও ইবাদাত সম্পর্কে জানা। এটাই সেই লক্ষ্য, যার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে, যার জন্য জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে সামসময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো—একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার কিছু বস্তুবাদী জিনিস অর্জন করা, যা একটু পরই শেষ হয়ে যাবে।

তাহলে বোঝা গেল, দুই উদ্দেশ্যের মাঝে পার্থক্য হলো—আল্লাহর জিকির ও মুহাব্বাতের মাঝে এবং পানাহার ও পরিধানের মাঝের পার্থক্যের মতো। কারণ, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সবার—চাই আল্লাহকে মুহাব্বাত করুক বা না করুক। আর প্রথম উদ্দেশ্য শুধু তাদের জন্য, যারা আল্লাহকে মুহাব্বাত করে।

এই পার্থক্যটাই স্পষ্ট করে দেয় যে, এ দুয়ের মাঝে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানই প্রাধান্য পাবে। যখন একজন মুসলিমকে দ্বীনি ইলম অর্জনের আবশ্যকীয়তার পরও সামসময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করতে হয়, তাহলে তাকে এ দুটোর প্রতিই গুরুত্ব দিতে হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, এ দুয়ের মাঝে পার্থক্যটি লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি সে গণিত, কৃষিকাজ বা রসায়ন শাস্ত্রে এক ঘণ্টা সময় ব্যয় করে, তাহলে দ্বীনি ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে তাকে কমপক্ষে দুই ঘণ্টা ব্যয় করতেই হবে—এর বিপরীত নয়।

ধর্মবিমুখ শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতি

শিক্ষার্থী যদি দ্বীনি ইলম পরিহার করে শুধু জাগতিক শিক্ষায় মনোনিবেশ করে, তাহলে সেটা তার শিক্ষাজীবনের কোনো এক সময়ে অবশ্যই অনেক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে; যেমনটি ধর্মবিমুখ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কালচারে প্রায় দেখা যায়, যা আমাদের মুসলিম দেশগুলোতে পাশ্চাত্যের অনুকরণে, ইউরোপ-আমেরিকার অনুসরণে অহরহ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। যার ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে সামান্য যে ইলমে নাফে ও আমলে সালিহ থাকে, সেটাও ধূলিসাৎ হয়ে যায়। কারণ, মানুষ শুধু বাহ্যিকটার দিকেই ছুটে; বিশেষ করে সেটা যদি 'আজিলা'[৪৬১] শ্রেণির হয়। আর মানুষ যা দেখতে পায় না (অভ্যন্তরীণ বিষয়), সেটার দিকে ফিরেও তাকায় না। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন—

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ٢٠ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ٢١

'না, প্রকৃতপক্ষে তোমরা ইহজীবনকেই (আজিলা) ভালোবাসো, আর আখিরাতকে উপেক্ষা করো।'[৪৬২]

আবু দাউদ এই আয়াতের তাফসিরে বলেন—'বরং তোমরা হে বনি আদম, যেহেতু তোমাদেরকে ত্বরান্বিত থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং এই ত্বরান্বিতের ওপরই তোমাদের অভ্যস্ত করা হয়েছে; তাই তোমরা সবকিছুতেই তাড়াতাড়ি করতে চাও। আর এজন্যই তোমরা 'আজিলা' অর্থাৎ দুনিয়া ভালোবাসে, আর আখিরাত এড়িয়ে যাও।

কেউ কেউ বলেন—এখানে এই 'না' সূচক শব্দটি আনা হয়েছে মানুষকে ধিক্কার দেওয়ার জন্য। তখন দুই ক্রিয়ার ক্ষেত্রেই বহুবচন দ্বারা জাতিসত্তা উদ্দেশ্য হবে।[৪৬৩]

হ্যাঁ, এরকম ধর্মবিমুখ জাগতিক শিক্ষা তাদের কাছেই চাকচিক্য মনে হয়, আখিরাতে যাদের কোনো (সাওয়াবের) অংশ নেই এবং যারা আল্লাহ তাআলার সাক্ষাতের আশা করে না; বরং যারা পার্থিব জীবন নিয়েই তুষ্ট, এতেই আশ্বস্ত।

পক্ষান্তরে, প্রকৃত মুমিন—যে দুনিয়াতেও কল্যাণ চায়, আখিরাতেও কল্যাণ চায়—তার এমন করার কোনোই সুযোগ নেই। কারণ, সে তো (কুরআনে বর্ণিত) ওই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যারা এমন ব্যবসার আশা করে, যা কখনো মন্দা যায় না। সুতরাং, মুমিনের কর্তব্য হলো—এমনভাবে জাগতিক শিক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে না পড়া, যা তার দ্বীনি ইলম, সহিহ আকিদা, আমলে সালেহের ক্ষতি করে। কারণ, জাগতিক শিক্ষা শুধু প্রয়োজনের কারণেই বৈধ। অপরদিকে, দ্বীনি ইলম ও আমলে

---

[৪৬১] 'আজিলা' অর্থ দ্রুত আগমনকারী। উদ্দেশ্য হলো সেটাই মানুষ চায়, যা তাড়াতাড়ি আসে।

[৪৬২] সূরা কিয়ামত, আয়াত : ২০-২১

[৪৬৩] ইরশাদুল আকলিস সালিম ইলা মাযায়াল কিতাবিল কারিম, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৬৭

সালেহ এ দুটো পুরোপুরি মুখ্য বিষয়। আর প্রয়োজন ও মুখ্য বিষয় এ দুয়ের মধ্যকার প্রার্থক্য সবার কাছেই দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : জাগতিক শিক্ষার বড়ো একটি ক্ষতি হলো শিক্ষার্থীদের পরিবেশ। কারণ, স্কুল-কলেজই তাদের স্থান। আর জানা বিষয় যে, প্রত্যেক স্থান ও মজলিসের কিছু প্রভাব আছে। স্বাভাবিকভাবেই একজন সহপাঠীর চিন্তা-চেতনা অপরের চিন্তা-চেতনায় প্রভাব ফেলে। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُم مَنْ يُخَالِل

'মানুষকে চেনা যায় তার বন্ধুর আচার-আচরণের মাধ্যমে। সুতরাং, তোমাদের কেউ যখন কাউকে বন্ধু বানাবে, তখন যেন তার চরিত্র দেখে নেয়।'[৪৬৪]

কবি কতই না সুন্দর করে বলেন—

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه

فكل قرين بالمقتدي يقتدي۔

إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم

ولا تصحب الأردي فتردي مع الردي۔

'ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না, বরং তার সাথি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো,

কারণ প্রত্যেক সাথিই তার বন্ধুকে অনুসরণ করে।

যখন তুমি কয়েকজনের মাঝে থাকো, তখন তাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তিদের সাহচর্য গ্রহণ করো;

ভুলেও ইতর শ্রেণির মানুষের সাথে মেলামেশা করো না, তাহলে তুমিও ইতর হয়ে যাবে।'

আবু সায়িদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—

لا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلا يَأْكُلْ طعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ

'মুমিন ছাড়া কারও সাহচর্য গ্রহণ করো না। আর মুত্তাকি ছাড়া তোমার খাবার যেন কেউগ্রহণ না করে।'[৪৬৫]

---

[৪৬৪] তিরমিজি, ২৩৭৮

[৪৬৫] সুনানু আবি দাউদ, ৪৮৩২

অভিজ্ঞতাও এই কথা বলে যে, মানুষের স্বভাব আরেক স্বভাব থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করে, অথচ সে টেরও পায় না।

সুতরাং, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজ হতে নিষেধ করে স্কুল-কলেজে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সংশোধন করতে হবে। শিক্ষকদের অবশ্যই সহিহ আকিদার অধিকারী হতে হবে, আমলের পাবন্দি করতে হবে। সেই সাথে দ্বীনি ইলমের ক্ষেত্রেও যোগ্য হতে হবে, স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচি গুনাহের উপকরণ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। একইভাবে এ সকল স্কুল-কলেজের তত্ত্বাবধান হতে হবে দক্ষ, যোগ্য এবং অভিজ্ঞ আলিমদের হাতে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

***

নারীশিক্ষা-নীতি এবং নারীশিক্ষার পদ্ধতি

এ বিষয়ে আলোচনা করতে হলে সবার আগে নারীশিক্ষা এবং নারীশিক্ষার পদ্ধতি—এ দুয়ের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে হবে।

প্রথম বিষয়—নারীর শিক্ষার হুকুম : নারী শিক্ষা যে জায়িজ, বৈধ এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই; বরং যে সকল আমল তাদের জন্য করা ওয়াজিব, সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান রাখাও ওয়াজিব। যেগুলো তাদের জন্য করা মুস্তাহাব, সেগুলোর ইলম রাখাও মুস্তাহাব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

طلب العلم فريضة على كل مسلم

'ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।'

এখানে, মুসলিম দ্বারা নারী-পুরুষ উভয়েই উদ্দেশ্য। যেমন: আরেক হাদিসে আছে—

من سلم المسلمون من لسانه ويده

'সেই প্রকৃত মুসলিম, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলিমরা নিরাপদে থাকে।'[৪৬৬] (এখানেও মুসলিম দ্বারা উদ্দেশ্য নারী-পুরুষ সবাই)

বলাবাহুল্য যে, নারী শিক্ষা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেও ছিল। নবীজি তাদের দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতেন। আবু সায়িদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

قالتِ النِّسَاءُ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِن نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وأَمَرَهُنَّ، فَكانَ فِيما قَالَ لهنَّ: ما مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِن ولَدِهَا، إلَّا كانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقالتِ امْرَأَةٌ: واثْنَتَيْنِ؟ فَقَالَ: واثْنَتَيْنِ

'একবার নারীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, পুরুষরা তো আপনার ক্ষেত্রে আমাদের ছাড়িয়ে গেছে। তাই, আপনার থেকে আমাদের একদিন সময় দিন। তখন নবীজি তাদের একদিনের ওয়াদা দিলেন। পরে তিনি তাদের সাথে দেখা করলেন। অতঃপর তাদের নসিহত করলেন এবং (কিছু) আদেশ করলেন। তিনি তাদের যে কথাগুলো বলেছেন, তার মধ্যে এটাও ছিল যে, তোমাদের মধ্য থেকে যে নারীর তিনটি সন্তান আগে মারা যাবে, তার জন্য সেই সন্তানগুলো জাহান্নাম থেকে আড়াল হয়ে থাকবে।'[৪২৭]

ইমাম বদরুদ্দিন আইনি রহ. বলেন—'পুরুষরা আমাদের ছাড়িয়ে গেছে' এর অর্থ হলো—পুরুষরা আপনার সাথে সর্বদা লেগে থাকে, ইলম ও দ্বীনের বিষয়াদি শ্রবণ করে, আর আমরা দুর্বল তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারি না। তাই, আপনি আমাদের জন্য একদিন নির্ধারণ করে দিন, যেদিন আমরা ইলম শ্রবণ করব, দ্বীনের যাবতীয় বিষয় শিখব। এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, নারীরা তাদের সম্পর্কিত দ্বীনের যাবতীয় বিষয় জিজ্ঞাসা করতে পারবে। সেক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে কথা বলা বৈধ হবে, এবং যে সকল বিষয় তাদের প্রয়োজনীয় সেসব ক্ষেত্রেও কথা বলা যাবে।[৪২৮]

এছাড়া কেন-ই-বা দ্বীন শেখা ও শেখানো তাদের জন্য বৈধ হবে না; অথচ দ্বীন অনুযায়ী চলতে তাদেরও আদেশ করা হয়েছে? মূলত, এই ইলম জানার মধ্যেই রয়েছে মানুষের স্বার্থকতা ও সম্মান। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

'আপনি বলেন, যারা জ্ঞান রাখে, আর যারা জ্ঞান রাখে না—তারা কি সমান হতে পারে? উপদেশ গ্রহণ করে কেবল বুদ্ধিমানরা!'

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

'আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করে বললেন—'এগুলোর নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।''[৪২৯]

---

[৪২৭] সহিহ বুখারি, ১০১

[৪২৮] উমদাতুল কারি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩৪

এখানে, আল্লাহ তাআলা আদম আ. এর শ্রেষ্ঠত্ব ও খলিফা হওয়ার যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন শুধু ইলমের মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তালিমকে (শিক্ষা দেওয়া) ই'লাম ও ইনবা'র (জানানো) ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, হিসারে আবু দাউদ বলেন—তালিম (শিক্ষা দেওয়া) এমন একটি কাজ, যা এমনিতেই চলে আসে। এতে কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। আর এই তালিম (শিক্ষা দেওয়া) শুধু মুআল্লিম বা শিক্ষকের মাধ্যমে সম্ভব নয়। বরং সেজন্য শিক্ষার্থীর ইসতিদাদ ও যোগ্যতা থাকাও আবশ্যক, যাতে সে মুআল্লিমের কাছ থেকে ফয়েজ ও বরকত গ্রহণ করতে পারে। তালিমকে ই'লাম বা ইনবা'র ওপর প্রাধান্য দেওয়ার এটাই হিকমত বা রহস্য। কারণ, ই'লাম বা ইনবা' (জানানো) কোনো কিছু শোনার মাধ্যমেই করা যায়। এক্ষেত্রে মানুষ ও ফেরেশতা সবাই সমান।

সুতরাং, এর মাধ্যমে তেমন কোনো শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। পক্ষান্তরে, তালিমের মাধ্যমেই ফেরেশতাদের চেয়ে আদম আ.-এর যোগ্যতা প্রতীয়মান হয়। কারণ, ফেরেশতাদের সৃষ্টিই এমন যে, তারা প্রত্যেকটি জিনিসের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় বিশ্লেষণের সাথে ইলম অর্জন করতে অপ্রস্তুত।

সুতরাং, আদম আ.-কে আল্লাহ তাআলার তালিম দেওয়ার অর্থ হলো—আল্লাহ তাআলা তার ইসতেদাদ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে তার মাঝে সমস্ত বস্তুর নাম, অবস্থা, সেগুলোর প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য, এসব প্রয়োজনীয় ইলম বিশদভাবে সৃষ্টি করে দিয়েছেন।[৪৭০]

নারীদের হস্তলিপি শেখা : হস্তলিপি শেখার বিষয়ে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মত হলো, এটা বৈধ। এখন যদি আয়িশা রা. এর হাদিস এর বিপক্ষে পেশ করা হয়—

لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن المغزلو..

> 'তোমরা নারীদের বিভিন্ন কামরাতে নামিয়ে এনো না, নারীদের হস্তলিপি শিখিয়ো না। বরং তাদেরকে গীত-গজল শিক্ষা দাও।'[৪৭১]

এ হাদিসের উত্তর হলো, উলামায়ে কিরাম এ হাদিসকে জায়িফ (দুর্বল) বলেছেন। কারণ, তাবারানির সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহিম নামক একজন রাবি আছে, যে বানোয়াট হাদিস বর্ণনা করত। আর হাকিমের সনদে আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু জাহহাক আছে। ইবনু হাজার রহ. বলেন—আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু জাহহাক ইবনি আবান উরজি অর্থাৎ, আবুল হারিস হুমসি—যে সালমিয়া নামক স্থানে এসে

[৪৭০] তাফসিরে আবু সাউদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৪

[৪৭১] আল মুজামুল আওসাত, তাবারনি, ৫৭১৩; মসতাদরাকে হাকিম, ৩৪৯৪

বসবাস শুরু করে, সে মাতরুক (তার হাদিস পরিত্যাজ্য)। আবু হাতিম তাকে চরম মিথ্যাবাদী বলেছেন।[৪৭২]

আল্লামা ইবনুল জাউজি রহ. মাউজুআত নামক কিতাবে বলেন—'এই হাদিস সহিহ নয়। অথচ আবু আবদুল্লাহ হাকিম নিসাবুরি তার *সহিহ* নামক কিতাবে এ হাদিস উল্লেখ করেছেন। বড়োই আশ্চর্যকর ব্যাপার যে, কীভাবে তার মত ব্যক্তির সামনে এটা অস্পষ্ট থাকলো?'

আবু হাতিম ইবনু হিব্বান বলেন—'মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহিম শামি শামবাসীদের উদ্দেশ্যে জাল হাদিস বানাত। তার থেকে কোনো রেওয়ায়তই গ্রহণযোগ্য নয়, যদি না অন্য কোনো বিবেচ্য বিষয় থাকে। (যেমন: তার কোনো হাদিস নির্ভরযোগ্য রাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে।)[৪৭৩]

আল্লামা ইবনুল কায়সারারি তাজকিরাতুল হুফফাজ কিতাবে বলেন—'এই হাদিসটি মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহিম শামি বর্ণনা করে শুআইব ইবনু ইসহাক থেকে, তিনি হিশাম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আয়িশা রা. থেকে। আর এই মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহিম ইরাকে অবস্থান করত, আর শামবাসীর কাছে জাল হাদিস বর্ণনা করত।[৪৭৪] বিপরীত দিকে, অর্থাৎ আমাদের পক্ষে আবু বকর ইবনু আবু হাসমা থেকে একটি সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে—শিফা নামক এক নারী উমার রা.-এর চাচাতো বোন ছিলেন। তিনি বলেন—আমি হাফসা রা.-এর কাছে ছিলাম, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে প্রবেশ করে বললেন—

'ألا تعلمين هذه رقية النملة، كما علمتها الكتابة'

> '(হাফসাকে) যেভাবে হস্তলিপি শিখিয়েছ, সেভাবে 'নামলার' ঝাড়ফুঁক কেন শিখিয়ে দাও না?' (নামলার মূল অর্থ পিপীলিকা। উদ্দেশ্য হলো পাঁজরের খুঁজলি।)[৪৭৫]

আল্লামা আইনি রহ. বলেন—'এই হাদিসটি দলিল যে, নারীদের হস্তলিপি শেখা জায়িজ, মাকরুহ নয়।'[৪৭৬]

দ্বিতীয় বিষয়—নারীদের শিক্ষা ও শেখানোর প্রন্ধতি : নারীদের শিক্ষা নিয়ে দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল তাদের শিক্ষা এবং শেখানোর ধরন ও পদ্ধতি। এটাই আলোচনার মূল বিষয়। তবে এই আলোচনায় আসার পূর্বে একটি ভূমিকা অবশ্যই পেশ করা

---

[৪৭২] তাকরীবুত তাহযীব, ৩৬৮

[৪৭৩] ইবনুল জাওযি, আল মাওযুআত, ২/২৬৯

[৪৭৪] তাযকিরাতুল হুফফাজ, ৩৮২

[৪৭৫] ইমাম তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, ৭১৮২; আবু দাউদ, ৩৮৮৭

[৪৭৬] [illegible] আফকার

প্রয়োজন। ইসলামি শরিয়ত নারীকে শরয়ি প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

'আর তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করো, প্রথম জাহিলিয়াতের যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না।'[৪৭৭]

রুহুল মাআনির মুসান্নিফ বলেন—এই আয়াতের অর্থ—হে নবী পত্নীগণ, তোমরা নিজেদের ঘরের সাথে লেগে থাকো, নিজেদের ঘরে স্থির থাকো। এখানে, সম্বোধন যদিও নবী পত্নীগণকে করা হয়েছে, তবে অন্যান্য সাধারণ নারীরাও এর অন্তর্ভুক্ত।

নবী পত্নীগণের মধ্যে সাওদা বিনতু জামআ রা. নামাজ, হজ, বা উমারাহর জন্যও তার ঘরের দরজা থেকে পা ফেলেন নি, যতদিন না তার জানাজা উমার রা.-এর যুগে ঘর থেকে বের হয়। তাকে বলা হয়, আপনি কেন হজ বা উমারাহ করেন না? তিনি বলেন, আমাদের বলা হয়েছে—'আর তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করো'।[৪৭৮]

ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন—কীভাবেই বা বৈধ হতে পারে অথচ শরিয়ত কঠিনভাবে তাগিদ করেছে নারীদের ঘরে অবস্থান করতে এবং প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের না হতে?

আল্লাহ তাআলা নবী পত্নীদের আদেশ করেছেন ঘরে অবস্থান করার। কিন্তু শুধু তাদেরকেই সম্বোধন করেছেন তাদের সম্মানার্থে।[৪৭৯]

এখান থেকে বোঝা যায়, ঘরে অবস্থান করাতেই নারীদের সম্মান ও মর্যাদা।

আয়াতে কারিমাতে প্রথম জাহিলিয়াত দ্বারা কী উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে মুফাসসিরিনে কিরামের অনেক মত আছে, যেমনটি কুরতুবি রহ. উল্লেখ করেছেন। ইবনু আতিয়্যা রহ. যে মত ব্যক্ত করেছেন, সেটাই সহিহ বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন—'প্রথম জাহিলিয়াত দ্বারা ইশারা করা হয়েছে ওই জাহিলিয়াতের দিকে, যা ইসলামের পূর্বে তারা পেয়েছে। তাদের আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন সেই জাহিলিয়াতের চালচলন পরিহার করে। কারণ, তখন তাদের কোনো আত্মমর্যাদাবোধ ছিল না। তখন নারীরা পর্দা করত না।

এই জাহিলিয়াতকে প্রথম বলা হয়েছে এদিক থেকে যে, তারা পূর্বে সেই অবস্থায় ছিল। তার মানে এই নয় যে, ওখানে আরেকটি জাহিলিয়াত ছিল।'

---

[৪৭৭] সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৩

[৪৭৮] রুহুল বয়ান, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৭০

[৪৭৯] তাফসিরে কুরতুবি, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১০১

জাসসাস রহ. বলেন—'দ্বিতীয় জাহিলিয়াত হলো ওই ব্যক্তির অবস্থা, যে ইসলামের যুগেও পূর্বের জাহিলিয়াতের মতো কাজ করে।'[৪৮০]

আমি বলি—(জাসসাস রহ. এর মত অনুযায়ী, এই যুগটাই দ্বিতীয় জাহিলিয়াত! আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> المرأةُ عورةٌ، وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطانُ، و إنها لا تكون أقربَ إلى اللهِ منها في قَعْرِ بيتِها
>
> 'নারী হলো আবরণীয় সত্তা। আর সে যখন বের হয়, তখন শয়তান তার দিকে উকিঁ দেয়। আর সে ঘরের ভেতরে আল্লাহ তাআলার অধিকতর নৈকট্যেথাকে।'[৪৮১]

মোল্লা আলি কারি রহ. বলেন, 'উঁকি দেওয়ার অর্থ হলো—শয়তান তাকে পুরুষদের চোখে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে তাদেরকে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং, ঘরের ভেতরেই নারীকে সংশোধন করতে হবে।'

স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের মসজিদে জামাআতে নামাজ পড়ার চেয়ে ঘরে নামাজ পড়াকে উত্তম বলেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها
>
> 'নারীদের জন্য ঘরে নামাজ পড়ার চেয়ে ছোটো ঘরে নামাজ পড়া উত্তম। আর ছোটো ঘরে—গোপন প্রকোষ্ঠে—নামাজ পড়ার চেয়ে আলাদা ছোটো ঘরেনামাজপড়াউত্তম।'[৪৮২]

আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহ. বলেন, 'المخدع। অর্থ ছোটো ঘর, যা বড়ো ঘরের মাঝে থাকে। ঘরে নামায পড়া বা আঙ্গিনায় নামাজ পড়ার চেয়ে আলাদা ছোটো ঘরে নামাজ পড়া উত্তম এ কারণে যে, এটা তার জন্য অধিক আবৃতকারক, বেগানা পুরুষের দৃষ্টি থেকে অধিক নিবৃত্তকারক। কারণ, তাদের সাধারণ অবস্থাই হলো যতটুকু সম্ভব আবৃত থাকা।[৪৮৩]

---

[৪৮০] জাসসাস রহ., আহকামুল কুরআন, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৭১

[৪৮১] সহিহ ইবনু হিব্বান, ৫৫৯৮

[৪৮২] সুনানু আবি দাউদ, ৫৭০

[৪৮৩] আইনি রহ., শারহু আবি দাউদ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৬

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل

'(আজকাল) নারীরা যা করেছে, এগুলো যদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে পেতেন, তাহলে তিনি অবশ্যই তাদের নিষেধ করতেন; যেমন নিষেধ করা হয়েছিল বনি ইসরাইলের নারীদের।'[৪৮৪]

হাফিজ বদরুদ্দিন আইনি রহ. বলেন—'নারীরা যা করেছে' দ্বারা উদ্দেশ্য সৌন্দর্য, চাকচিক্য, আতর, সুগন্ধি, সুন্দর সুন্দর কাপড় ইত্যাদি ব্যবহার করা।'

আমি (বদরুদ্দিন আইনি) বলি—'আয়িশা রা. যদি দেখতেন এই যুগের নারীরা কত কী আবিষ্কার করেছে, কত অশ্লীল জিনিস নিয়ে এসেছে, তাহলে তিনি আরও কঠিনভাবে এসবের নিন্দা করতেন, বিশেষ করে মিসরের নারীদের ক্ষেত্রে। কারণ, তাদের মাঝে এত এত কুসংস্কার ও পাপাচার আছে, যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।'

সুতরাং, একটু চিন্তা করেন আয়িশা রা. কী বলছেন, যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ যুগের নারীদের দেখতে পেতেন..অথচ তার এ কথা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর মাঝে সামান্য সময়ের ব্যবধান!

তাছাড়া এ যুগের নারীরা যা যা করছে, তার হাজার ভাগের এক ভাগও ওই সময়ের নারীরা করেনি।[৪৮৫]

আমি (আব্দুল হাকিম হককানি) বলি, যদি আল্লামা বদরুদ্দিন আইনির যুগেই (মৃত্যু ৮৫৫ হিজরি) নারীদের এ অবস্থা হয়, তাহলে আমাদের বর্তমান যুগের নারীদের অবস্থা তার যুগের নারীদের চেয়ে কতটা জঘন্য ও ভয়ংকর! বরং তার হাজার হাজার গুণের চেয়েও বেশি! আমাদের পরবর্তী উলামায়ে কিরাম জামাআতে নারীদের উপস্থিতি হওয়াকে সরাসরি মাকরুহ বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

আল্লামা হাসকাফি রহ. বলেন—'নারীদের জামাআতে উপস্থিত হওয়া মাকরুহ—চাই জুমুআ হোক বা ঈদের নামাজ বা ওয়াজের জন্য হোক। এটা মুতলাক (শর্তহীন) কথা। অর্থাৎ, বৃদ্ধা হোক বা রাত্রে হোক—এটাই এই যুগের মুফতাবিহী (ফতোয়াযোগ্য) মত।'

আল্লামা ইবনু আবিদিন বলেন—'হাসকাফি রহ. যে বললেন, এটা মুফতাবিহি মত[৪৮৬], এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পরবর্তী উলামায়ে কিরামের মত, 'আল বাহরুর

[৪৮৪] সহিহ বুখারি, ৮৬৯

[৪৮৫] উমদাতুল কারি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৫৯

[৪৮৬] মুফতাবিহি বলতে বোঝায়, এর ওপরই ফাতওয়া।

রায়েক'-এর মুসান্নিফ বলেন, পরবর্তী উলামায়ে কিরাম এই মতই গ্রহণ করেছেন, যা ইমাম আবু হানিফা ও তার দুই শাগরেদ আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. এর মতের বিপরীত।

কারণ সাহিবাইন (শাগরেদদ্বয়) বলেছেন, যুবতী নারীকে (জামাআতে নামাজ পড়া থেকে) সবার মতেই নিষেধ করা হবে। পক্ষান্তরে বৃদ্ধা নারীর ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, 'জুহর, আসর ও জুমুআ ছাড়া অন্যান্য নামাজে উপস্থিত হতে পারবে।' আর সাহিবাইন বলেন—'বৃদ্ধারা সব নামাজেই বের হতে পারবে।' এভাবেই 'হিদায়া,' 'মাজমা' ও অন্যান্য কিতাবে আছে।'

সুতরাং, বৃদ্ধাদের সব নামাজে নিষেধ করার ফতোয়া ইমাম আজম আবু হানিফা ও সাহিবাইনের মতের বিপরীত। তাই, আবু হানিফা রহ.-এর মতই গ্রহণ করতে হবে।'

'আন-নাহরুল ফায়িক' নামক কিতাবের মুসান্নিফ বলেন—'বাহরুর রায়িকের মুসান্নিফের এ কথায় চিন্তা করার অবকাশ আছে। কারণ, মুফতাবিহি মতটা তো আবু হানিফা রহ.-এর মত বলেই নেওয়া হয়েছিল। কেননা, ইমাম আজম (তিন ওয়াক্ত নামাজে) নিষেধ করেছেন শাহওয়াত ও প্রবৃত্তি থাকার কারণে। কারণ, ওই তিন সময় ছাড়া অন্যান্য সময়ে পাপাচারীরা ঘুরে বেড়ায়। তারা মাগরিবের সময় ঘুরে বেড়ায় না। কারণ, তারা তখন খাবার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আর তারা ফজর ও ইশার সময় ঘুমায়। কিন্তু এখন যেহেতু এই সময়গুলোতেও আমাদের যুগে পাপাচারীরা ঘুরে বেড়ায়, বরং নারীদের পেছনে পেছনে ছুটে; তাই এই সময়গুলোতেও নিষেধ করা আরও বেশি প্রয়োজন।[৪৮৭]

ইবনু নাজিম বলেন—*কাফি* কিতাবের মুসান্নিফ বলেন, বর্তমানে সব নামাজেই নারীদের জামাআতে উপস্থিত হওয়া মাকরুহ—যুগের পাপাচারের অবস্থা বিবেচনা করে এটার ওপরই ফতোয়া।

নামাজের জন্যই যখন মসজিদে উপস্থিত হওয়া মাকরুহ, তাহলে ওয়াজের মজলিসে উপস্থিত হওয়া তো আরও আগে মাকরুহ; বিশেষ করে ওই সমস্ত জাহিল বক্তাদের ক্ষেত্রে, যারা আলিমদের বেশভূষা দিয়ে সেজে থাকে। (আর ভেতরে ভেতরে...)

আল্লামা ফখরুল ইসলাম এমনই উল্লেখ করেছেন।

এই ভূমিকা পেশ করার পর এ কথা স্পষ্ট হয় যে, ঘরে মাহরামদের কাছে থেকেই নারীদের শিক্ষা গ্রহণ করা উত্তম। কারণ, নারীদের শিক্ষা দেওয়ার মূল দায়িত্ব মাহরামদেরই। আল্লাহ তাআলা বলেন—

[৪৮৭] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১৮

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর। যার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে কঠোর, রূঢ় ফেরেশতাগণ—যারা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যা আদেশ করেন, তার আবধ্যতা করে না; বরং তাদের যা আদেশ করা হয়, তারা সেটাই করে।'[৪৮৮]

তাফসিরুল খাজিনে আছে—'নিজেদের রক্ষা করো' এর তাফসিরে ইবনু আব্বাস রা. বলেন—'নিজেদের রক্ষা করো' মানে ওই সমস্ত জিনিস থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে, যা থেকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের নিষেধ করেছেন এবং তাঁর আনুগত্য অনুযায়ী কাজ করার মাধ্যমে। আর 'নিজেদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করো' মানে তাদের কল্যাণের আদেশ করো, অকল্যাণ হতে নিষেধ করো, তাদেরকে ইলম শিক্ষা দান করো এবং আদব-কায়দার ওপর গড়ে তোলো। এর মাধ্যমেই তোমরা তাদের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবে, যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর।'

আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা.-এর এক হাদিসে আছে, তিনি বলেন—

كلكم رَاعٍ، وكلكم مسؤول عن رَعِيَّتِهِ: الإمام رَاعٍ ومسؤول عن رَعِيَّتِهِ، والرجل رَاعٍ في أهله ومسؤول عن رَعِيَّتِهِ، والمرأة رَاعِيَةٌ في بيت زوجها ومسؤولة عن رَعِيَّتِهَا، والخادم رَاعٍ في مال سيده ومسؤول عن رَعِيَّتِهِ

'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্বাধীন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসক একজন দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্বধীন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, স্বামী তার পরিবারের ওপর দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্বাধীন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, স্ত্রী নিজের স্বামীর ঘরের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্বাধীন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, খাদেম তার মনিবের সম্পদের বিষয়ে দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্বধীন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে।'[৪৮৯]

ইবনুল হাজ্জ বলেন—'কোনো নারীর যদি স্বামী থাকে, আর সেই নারী যদি বিধিবিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তাহলে তার স্বামীর ওপর তাকে শিক্ষা দেওয়া ওয়াজিব। যদি সে তা না করে, তাহলে স্ত্রী স্বামীর কাছে দ্বীন শেখার জন্য বাহিরে

[৪৮৮] সূরা তাহরিম, আয়াত : ৬

[৪৮৯] সহিহ বুখারি [illegible]

...ওয়ার অনুমতি চাইবে। কিন্তু যদি অনুমতিও না দেয়, তাহলে তার অনুমিত ছাড়াই বের হয়ে যাবে।'[৪১০]

আল্লামা খতিব বাগদাদি রহ. বলেন—খলিফা স্ত্রীদের স্বামীদের, দাসীদের মনিবদের বাধ্য করবেন তাদের যেন দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেয়।[৪১১]

আর যদি নারীকে ঘর থেকে বের হতেই হয়, তাহলে উত্তম হচ্ছে তার শিক্ষক যেন একজন নারী থাকে। আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. বলেন—'কোনো মেয়ের জন্য একজন অন্ধ পুরুষের কাছ থেকে (দ্বীন) শেখার চাইতে একজন নারীর কাছে শেখাইউত্তম।'[৪১২]

কিন্তু নারীকে যদি মাহরাম ছাড়া, বা নারী ছাড়া অন্য কারও কাছে পড়তেই হয়, তাহলে উভয়ের মাঝে একটা পর্দা থাকতেই হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
>
> 'আর যখন তোমরা তাদের (নবীপত্নীদের) কাছে কিছু চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটাই তোমাদের এবং তাদের অন্তরের জন্যপবিত্রদায়ক।'[৪১৩]

আল্লামা কুরতুবি রহ. বলেন—'এই আয়াতে এ বিষয়ের দলিল রয়েছে যে, পর্দার আড়াল থেকে কোনো প্রয়োজনে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা বা তাদের কাছে ফতোয়া জানতে চাওয়া জায়িজ। এই হুকুমের ক্ষেত্রে (নবীপত্নীগণ যেমন শামিল তেমনি) অন্যান্য নারীরাও অন্তর্ভুক্ত।'[৪১৪]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা এমন একটি আদব শিখিয়েছেন, যা নারীর পবিত্রতা রক্ষা করবে, তার সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবে।

এই বিধানের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলিম নারীগণ অন্তর্ভুক্ত, যদিও এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের কথা বলা হয়েছে, তবুও অন্যান্যরা এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আল্লাহ তাআলা একটু পরেই পর্দার আড়াল থেকে জিজ্ঞাসা করার হিকমত, কারণ ও ফলাফল উল্লেখ করে বলেন—

---

[৪১০] আল মাদখাল, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭৬

[৪১১] আল ফিকহুল মুতাফাক্কিহ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭৪

[৪১২] ফাতহুল কাদির বাবুল ইমামার কিছুটা পূর্বে, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪৩

[৪১৩] সূরা আহজাব, আয়াত : ৫৩

[৪১৪] তাফসিরে কুরতুবি, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২২৭

ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن

'সেটাই তোমাদের এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিক পবিত্রদায়ক'।

অর্থাৎ, এর হিকমত হলো—নারী-পুরুষ প্রত্যেক শ্রেণির অন্তর ভালোভাবে পবিত্র থাকবে। আর এই পবিত্র রাখাটাই শরিয়তের উদ্দেশ্য, যা কিয়ামত পর্যন্ত সকল নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বাহিরে বের হওয়ার আদব ও শিষ্টাচার

একজন নারী যখন বাহিরে শিক্ষা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বের হবে, তখন তাকে লিবাস ও পরিধানের ক্ষেত্রে শরয়ি আদব রক্ষা করতে হবে। শরয়ি লিবাস কেমন হবে, তার বিশদ বিবরণ ফিকহ ও আদব-আখলাকের বড়ো বড়ো কিতাবে আছে। সুতরাং, সেখানে থেকেই দেখে নেওয়া যেতে পারে। এখানে, আমরা বাহিরে বের হওয়ার সময় একজন নারীর লিবাসের কিছু প্রয়োজনীয় শর্ত-শারায়েত উল্লেখ করব।

একজন নারী যখন ঘর থেকে বের হবে, তখন তাকে পরিধেয় বস্তুর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তগুলো রক্ষা করতে হবে।

বি. দ্র. : নিম্নলিখিত সবগুলো শর্তই বাহিরে বের হওয়ার সাথে খাস নয়; বরং কিছু আছে ঘরে-বাইরে উভয় স্থানেই প্রয়োজন। আর কিছু শর্ত তো এমনও আছে, যা পুরুষদের জন্যও আবশ্যক।

প্রথম শর্ত : পুরো শরীর আবৃত করে রাখা, তবে যা বাদ দেওয়া হয়েছে তার কথা ভিন্ন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

'আর মুমিন নারীদের বলেন—তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তবে যা সাধারণত প্রকাশ হয়ে থাকে। আর তারা তাদের গলা ও বুক যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীরা, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন-কামনামুক্ত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ

বালক ছাড়া কারও কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে আসো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।'[৪৯৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

'হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মুমিনদের নারীদের বলেন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৪৯৬]

এই আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, তাদের পুরো সৌন্দর্য ঢেকে রাখতে হবে; তবে যতটুকু বাদ দেওয়া হয়েছে তার কথা ভিন্ন। এখন কতটুকু বাদ দেওয়া হয়েছে—এ নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। 'আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তবে যা সাধারণত প্রকাশ হয়ে থাকে' এর ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারি রহ. বলেন—সৌন্দর্য দুই প্রকার। এক প্রকার সৌন্দর্য এমন, যা গোপন থাকে। যেমন: পায়ের নূপুর, চুড়ি, কানের দুল, হার। আরেক প্রকার সৌন্দর্য এমন, যা প্রকাশ পেয়েই যায়।

এই প্রকার সৌন্দর্য দ্বারা আয়াতে কী উদ্দেশ্য এ নিয়েও অনেক মত আছে। কেউ কেউ বলেন—বাহ্যিক কাপড়ের সৌন্দর্য। ইবনু মাসউদ রা. থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, সৌন্দর্য দুই প্রকার—প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত। প্রকাশিত দ্বারা উদ্দেশ্য কাপড়।

আর অপ্রকাশিত দ্বারা উদ্দেশ্যে নূপুর, কানের দুল ও বালা। ইবরাহিম ও হাসান বসরি রহ. থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আর অন্যরা বলেন—প্রকাশিত সৌন্দর্য মানে ওই সব সৌন্দর্য যা প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, সুরমা, আংটি, বালা ও মুখ। ইবনু আব্বাস রা., সায়িদ ইবনু জুবাইর রহ. এবং আতা রহ. থেকেও এমন বর্ণিত হয়েছে।

অন্য আরেক দল বলেন—এটা দ্বারা উদ্দেশ্যে মুখ এবং কাপড়। তবে সবচেয়ে সঠিক মত হচ্ছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য মুখ ও দুই হাত। এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবে সুরমা লাগানো, চোখ, আংটি, বালা, খিজাব—এ মতটিই সবচেয়ে সঠিক। কারণ, সবাই

---

[৪৯৫] সূরা নূর, আয়াত : ৩১

এক্ষেত্রে একমত যে, প্রত্যেক মুসলিমকে নামাজে তার সতর ঢেকে রাখতে হবে; শুধু মুখ ও হাত খুলে রাখতে পারবে। সবার মতে, একজন নারীকে এছাড়া সবকিছু ঢেকে রাখতে হবে।

যেহেতু এটা সবার মত, তাহলে এটাও জানা হয়ে গেল যে—একজন নারী ওই অংশও প্রকাশ করতে পারবে, যা তার সতর নয়। যেমন: পুরুষরা করে থাকে। কারণ, যেটা সতর নয়, সেটা প্রকাশ করা হারাম নয়। আর যখন তার জন্য ওই অংশ প্রকাশ করা জায়িজ, তাহলে বোঝা যায়—কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যা সাধারণত প্রকাশ হয়ে থাকে'। এর দ্বারা এটাই (অর্থাৎ, যেটা সতর নয়) উদ্দেশ্য। কারণ, এগুলোর প্রত্যেকটিই তো স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায়।

ইমাম মাতুরিদি বলেন—এই আয়াত সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, (এটা দ্বারা উদ্দেশ্য) চাদর ও কাপড়।

ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—'এটা দ্বারা উদ্দেশ্য সুরমা লাগানো, চোখ ও আংটি।'

আরেক বর্ণনায় আছে—'হাত ও মুখ।' আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—'এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হৃদয় ও আংটি।'

যদি ইবনু মাসউদ রা.-এর বর্ণনা গ্রহণ করা হয় (চাদর ও কাপড়), তাহলে এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে—বেগানা নারীর মুখের দিকে তাকানো জায়িজ নয়।

আর যদি ইবনু আব্বাস রা.-এর ব্যাখ্যা ধরা হয়, তাহলে প্রমাণিত হয় যে—নারীর চেহারা দেখা জায়িজ, তবে কাম-প্রবৃত্তির দৃষ্টিতে নয়।

আর যদি আয়িশা রা.-এর কথা নেওয়া হয় (হৃদয় ও আংটি), তাহলে এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে—দুই হাত ও দুই পা দেখা যাবে। কারণ, এ দুটো স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাছাড়া ওজুর ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রেও এ দুটো অঙ্গ জাহিরির অন্তর্ভুক্ত। যদি এমনই হয়, তাহলে এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে—পা প্রকাশ করেও নারীরা নামাজ পড়তে পারবে।[৪১৭]

অতএব বোঝা গেল—নারীর মুখ, পা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। বেগানা পুরুষ এসব অঙ্গের দিকে তাকাতে পারবে (প্রবৃত্তির সাথে নয়)। আবু বকর জাসসাস রহ. এরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।[৪১৮]

সুতরাং, পা সতর নয় এটাই সহিহ মত, যেমন *হিদায়ায়* আছে। *হিদায়ার* ব্যাখ্যাগ্রন্থ *ইনায়াতে* এর কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে—যখন জুতা পরে বা খালি পায়ে হাঁটে, তখন তাকে পা দুটো প্রকাশ করেই রাখতে হয়। কারণ, সবসময় তো আর মোজা

---

[৪১৭] তাফসিরুল মাতুরিদি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৫-৪৪

[৪১৮] শারহু মুখতাসারুত তাহাবি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭০০

পাওয়া যায় না। তাছাড়া পায়ের দিকে তাকালে এতটা কামভাব জাগে না, যতটা জাগে মুখের দিকে তাকালে। এরপরও যখন মুখ সতরের অন্তর্ভুক্ত হলো না প্রবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও, তাহলে তো পা আরও আগেই সতরের অন্তর্ভুক্ত হবে না।[৪৯৯]

কানযুল উম্মালে আছে—একজন স্বাধীন নারী নারীর সতর তার পুরো শরীরই—মুখ, হাত ও পা ছাড়া।

এখন হাতের পৃষ্ঠভাগ সতর কি না, এক্ষেত্রেও বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। *মারাকিল ফালাহ* কিতাবে আছে—সহিহ মত হচ্ছে, হাতের তালু ও পৃষ্ঠভাগ কোনোটাই সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। এর কারণ হলো, প্রয়োজনের আধিক্য।[৫০০]

দ্বিতীয় শর্ত : যে পোশাক নিয়ে বের হবে, সেটাতে যেন সৌন্দর্যের চাকচিক্য না থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ

> 'আর তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করো, প্রথম জাহিলিয়াতের যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না।'[৫০১]

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের সৌন্দর্য ও চাকচিক্য পুরুষদের সামনে প্রকাশ করো না। প্রথম জাহিলি যুগে নারীরা যেমন তাদের সৌন্দর্য ও চাকচিক্য পুরুষদের সামনে প্রকাশ করত, তোমরা এমনটা করো না।

ফুজালা ইবনু উবাইদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة، وعصى إمامه، ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها، قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم

তিন শ্রেণির ব্যক্তি, তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না—

০১. এমন ব্যক্তি, যে (মুসলিমদের) জামাআত থেকে পৃথক হয়, শাসকের অবাধ্যতা করে, আবধ্য হয়েই মারা যায়।

০২. এমন দাস-দাসী, যে তার মনিব থেকে পালিয়ে (এভাবেই) মারা যায়।

০৩. এমন স্ত্রী যার স্বামী প্রবাসে থাকে, সেই স্ত্রী দূরে অবস্থান করে তার দুনিয়াবি প্রয়োজন পূরণ করে, তারপরও অন্যের সামনে তার সৌন্দর্য প্রকাশ করে বেড়ায়। সুতরাং, তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না।[৫০২]

---

[৪৯৯] আল-ইনায়া শারহুল হিদায়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৫৯

[৫০০] মারাকিল ফালাহ, ৯১

[৫০১] সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৩

একজন নারীর পোশাকে যে পরিমাণ সৌন্দর্য ও বিভিন্ন ডিজাইন থাকে, সেই পোশাকে সজ্জিত অবস্থায় যদি কোনো নারী বের হয়, তাহলে অবশ্যই সেটা ফিতনার কারণ হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই, বিশেষ করে এই ফিতনা-ফ্যাসাদের যুগে।

তৃতীয় শর্ত : নারীর পরনের কাপড় ঘন ও পুরু হতে হবে, পাতলা হবে না। কারণ, এছাড়া পুরোপুরি আবৃত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া কাপড় পাতলা হলে তো সৌন্দর্য বরং বৃদ্ধি পায়, ফিতনার ভয় বেশি থাকে। এ সম্পর্কেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات.

'আমার উম্মাহর শেষ যুগে কিছু নারীর উদ্ভব ঘটবে, যারা পোশাক পরবে কিন্তু উলঙ্গ থাকবে—এদের মাথার ওপর থাকবে উটের (হেলে পড়া) কুঁজের মতো। এদেরকে তোমরা অভিশাপ দাও, কারণ, এরা অভিশপ্ত।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

قال رسول الله ﷺ: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا

'দুই শ্রেণির জাহান্নামি আছে, যাদের আমি দেখতে পাই নি। একদলের সাথে গরুর কানের মতো চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা মানুষকে মারে। আরেক শ্রেণির নারী আছে, যারা পোশাক পরিহিত তবে উলঙ্গা—যারা অন্যদের আকর্ষণ ও আকৃষ্ট করে, তাদের মাথার চুল উটের (হেলে পড়া) কুঁজের মতো। এরা জান্নাতে প্রবেশে করবে না, এমনকি এর সুঘ্রাণও পাবে না; অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ তো বহু দূর থেকেও পাওয়া যায়।'[৫০৩]

'কাপড় পরিহিত উলঙ্গা' দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

এখানে, অনেকগুলো মত আছে। একটি মত হলো—এরা এমন পাতলা কাপড় পরে, যার ফলে (বাহির থেকে) তাদের শরীর দেখা যায়। যদিও তারা পোশাক পরিহিত, কিন্তু বাস্তবে তারা উলঙ্গা, বিবস্ত্র। মোল্লা আলি কারী রহ. এমনই তার *মিরকাতে* বলেছেন।

[৫০৩] মুসলিম, ২১২৮

আলকামা ইবনু আবু আলকামা থেকে, তিনি তার মায়ের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তার মা বলেছেন—একবার হাফসা বিনতু আবদির রহমান উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা.-এর কাছে আসেন। হাফসার পরনে ছিল পাতলা ওড়না। তখন আয়িশা রা. ওই পাতলা ওড়না ছিঁড়ে মোটা ওড়না বানিয়ে তাকে পরিয়ে দিলেন।[৫০৪]

চতুর্থ শর্ত : কাপড় প্রশস্ত ও ঢিলেঢালা হতে হবে, সংকীর্ণ বা আঁটসাঁট (টাইট) হওয়া যাবে না। না হলে শরীরের আকৃতি ফুটে উঠবে। কারণ, কাপড় পড়ার উদ্দেশ্যই ফিতনা উৎপাটন করা। আর এটা ঢিলেঢালা কাপড় ছাড়া সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে কাপড় আঁটসাঁট হলে যদিওবা শরীর ঢেকে যাচ্ছে, কিন্তু শরীরের আকৃতি ফুটে উঠছে। আর এ থেকেই ফিতনা সৃষ্টি হবে, অশ্লীলতার দিকে নিয়ে যাবে।

আবু ইয়াজিদ মুযানি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার রা. নারীদের কিবতি পোশাক পরতে নিষেধ করতেন। তখন তারা আপত্তি করে বলে উঠল, এতে তো শরীর দেখা যায় না? জবাবে তিনি বললেন—শরীর দেখা না গেলেও আকৃতি তো দেখা যায়।[৫০৫]

পঞ্চম শর্ত : কাপড় উসফুর রং মিশ্রিত হবে না, সুগন্ধিযুক্ত হবে না। কারণ, বহু হাদিসে নারীদের বাহিরে বের হওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। আমি সেগুলো থেকে কয়েকটি হাদিস তুলে ধরছি:

(১) আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية

'যেকোনো নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে কারও পাশ দিয়ে যায়, যাতে তারা তার ঘ্রাণ পায়, তাহলে সে নারী জিনাকারী।'[৫০৬]

(২) আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.-এর স্ত্রী জাইনাব সাকিফিয়া থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إذا خرجت إحداكن إلى العشاء، فلا تمس طيبا

'যখন তোমাদের কোনো নারী রাতে বের হয়, সে যেন সুগন্ধি স্পর্শও না করে।'[৫০৭]

---

[৫০৪] বাইহাকি ফিল কুবরা, ৩২৬৫

[৫০৫] মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা, ২৪৭৯২

[৫০৬] সুনানুন নাসায়ি, ৫১২৬

(৩) আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, একবার এক নারী তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করল, যার ঘ্রাণ চারপাশে ছড়াচ্ছিল। তখন তিনি ডেকে বললেন—এই অহংকারী দাসী, তুমি কি মসজিদেই যাচ্ছ?

সে বলল, হ্যাঁ।

তিনি বললেন—যাও, ফিরে যাও এবং গোসল করো। কারণ, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

> ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاتها حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل
>
> যেকোনো নারী মসজিদে গমন করবে, যার ঘ্রাণ চারপাশে ছড়িয়ে যায়; তার বাড়িতে ফিরে গোসল করার আগ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তার নামাজ কবুল করবেন না।[৫০৮]

(৪) আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله وليخرجن تفلات

'তোমরা আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর মসজিদে যেতে বাধা দিয়ো না। আর এরা অবশ্যই দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে বের হবে।'[৫০৯]

(৫) আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة، والتبختر في المسجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة، وتبخترن في المساجد»
>
> একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাজলিসে বসা ছিলেন। এমন সময় 'মুজাইনা' গোত্রের এক নারী মসজিদে সৌন্দর্যকর এক পোশাক পরে অহংকার প্রদর্শন করছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—
>
> 'হে লোকসকল, তোমাদের নারীদের সাজসজ্জাকর কাপড় পরতে, মসজিদে অহংকার প্রদর্শন করতে নিষেধ করো। কারণ, বনি ইসরাইলকে তখনই লানত ও অভিশাপ দেওয়া হয়েছে, যখন তাদের নারীরা সাজসজ্জাকর কাপড় পরেছে এবং মসজিদে অহংকার প্রদর্শন করতে শুরু করেছে।'[৫১০]

---

[৫০৮] বাইহাকি, ৫৯৭৩

[৫০৯] মুসনাদু আহমাদ, ৯৬৪৫

[৫১০] সুনানু ইবনি মাজাহ, ৪০০১

সুগন্ধি মেখে বাহিরে বের হওয়ার নিষেধাজ্ঞা সেখানে প্রযোজ্য, যেখানে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কিছু থেকে থাকে। যেমন: চাকচিক্যপূর্ণ পোশাক, বাহির থেকে দেখা যায় এমন অলংকার, চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা।'[৫১১]

আমি (মুসান্নিফ) বলি—যে নারী নামাজের উদ্দেশ্যে বের হয়, তার জন্যই যদি এটা হারাম হয়, তাহলে ওই নারীর কী হুকুম হবে, যে বাজার-মার্কেট-অফিসের উদ্দেশ্যে বের হয়?

কোনো সন্দেহ নেই, এটা আরও বড়ো গুনাহ। আল্লামা হাইসামি রহ. তো এটাও উল্লেখ করেছেন যে—সুগন্ধি মেখে সাজগোজ করে কোনো নারীর বাহিরে বের হওয়াও কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, যদিওবা স্বামীর অনুমতি থাকে।

ষষ্ঠ শর্ত : নারীদের পোশাক পুরুষদের পোশাকের মতো হবে না। কারণ, বহু হাদিসে বর্ণিত হয়েছে ওই সমস্ত নারীদের প্রতি লানত ও অভিশাপ দেওয়ার ব্যাপারে, যারা পোশাক ও অন্য কিছুতে পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে। যেমন:

(ক) আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই পুরুষকে লানত করেছেন যে নারীর মতো পোশাক পরে এবং (লানত করেছেন) ওই নারীকে যে পুরুষের মতো পোষাক পরে।'[৫১২]

(খ) ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত—

عن النبي ﷺ أنه لعن المتشبهات من النساء والمتشبهين من الرجال بالنساء

তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবীজি নারীদের মধ্য থেকে পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণীদের লানত করেছেন এবং লানত করেছেন পুরুষদের মধ্য থেকে নারীদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বনকারীদের।[৫১৩]

(গ) ইবনু আবি মুলাইকা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

لعن رسول الله ﷺ الرجلة من النساء

---

[৫১১] ফাতহুল বারি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৪৯

[৫১২] সুনানু আবি দাউদ, ৪০৯৮

[৫১৩] সুনানু আবি দাউদ, ৪০৯৭

আয়িশা রা.-কে বলা হলো, এক নারী তো (পুরুষদের) জুতা পরে। তখন তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের মধ্য হতে পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণীদের অভিশাপ দিয়েছেন।[৫১৪]

(ঘ) হুজাইল গোত্রের এক লোক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা.-কে দেখেছি। তার বাড়ি ছিল 'হিল্লে', আর মসজিদ ছিল হারামে। একদিন আমি তার কাছে ছিলাম। হঠাৎ তিনি আবু জাহেলের মেয়ে উম্মে সায়িদকে দেখতে পেলেন। সে গলায় ধনুক ঝুলিয়ে পুরুষের মতো হাঁটছিল।

তখন আবদুল্লাহ বললেন, এটা কে?

হুজালি বলেন, আমি বললাম—আবু জাহেলের মেয়ে উম্মু সায়িদ।

তিনি বললেন—আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

> ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال
>
> 'যে নারী পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে আমার উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত নয়, একইভাবে যে পুরুষ নারীদের সাথে সাদৃশ্য রাখে (সেও আমার উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত নয়)।'[৫১৫]

(ঙ) ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> لَعَنَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، و المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ،وقَالَ: أخْرِجُوهُمْ مِن بُيُوتِكُمْ قَالَ: فأخْرَجَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فُلَانًا، وأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا.
>
> 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের লানত করেছেন, যারা নারীদের মধ্য হতে পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য রাখে এবং যারা পুরুষদের মধ্য হতে নারীদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। আর বলেছেন, ওদেরকে তোমরা নিজেদের ঘর থেকে বের করে দাও। তিনি বলেন—পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুককে বের করে দেন, আর উমার রা. অমুককে বের করে দেন।'[৫১৬]

ইমাম জাহাবি রহ. তো নারী-পুরুষ একে অপরের সাদৃশ্য অবলম্বন করাকে কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। উপরের কিছু হাদিস উল্লেখ করে তিনি বলেন—যদি নারীরা পুরুষদের বেশভূষা; যেমন: চাষাবাদ, পুরুষদের মতো খোলাখুলিভাবে নিজেদের অঙ্গ প্রকাশ করে রাখে, টাইট হাতাযুক্ত কাপড় পরে; তাহলেই সে

---

[৫১৪] সুনানু আবি দাউদ, ৪০৯৯

[৫১৫] মুসনাদু আহমাদ, ৬৮৭৫

[৫১৬] মুসনাদু আহমাদ, ১০০৬

পরিধানের ক্ষেত্রে পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন করেছে বলা হবে। একই সাথে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ক্রোধের পাত্র হবে, যদিও তার স্বামী তাকে সাদৃশ্য অবলম্বনের সুযোগ দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তাকে নিষেধ না করে। কারণ, স্বামীকে তো আদেশ করা হয়েছে স্ত্রীকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের ওপর রাখার, অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করার। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর। যার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে কঠোর, রূঢ় ফেরেশতাগণ—যারা আল্লাহ তাআলা তাদের যা আদেশ করেন, তার আবধ্যতা করে না; বরং তাদের যা আদেশ করা হয়, তারা সেটাই করে।'[৫১৭]

অর্থাৎ, তাদেরকে তোমরা আদব ও ইলম শেখাও, আল্লাহর আনুগত্যের আদেশ করো, অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করো। এটা তাদের ওপর যেমন ওয়াজিব, তেমনি তোমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও ওয়াজিব।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

كلكم راع ومسؤول عن رعيته الرجل راع في أهله ومسؤول عنهم يوم القيامة

'তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্বাধীন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্বামী তার পরিবারের বিষয়ে দায়িত্বশীল এবং তাকে তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

ألا هلكت الرجال حين أطاعت النساء

'শুনে রাখো, পুরুষরা যখন নারীদের আনুগত্য শুরু করবে, তখন তাদের ধ্বংস অপরিহার্য।'

হাসান বসরি রহ. বলেন—'আল্লাহর কসম! আজ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামে উপড়ে ফেলবেন।'[৫১৮]

একইভাবে ইমাম হাইসামি রহ.-ও একে কবিরা গুনাহ বলে ব্যক্ত করেছেন।[৫১৯]

---

[৫১৭] সূরা তাহরিম, আয়াত : ৬

[৫১৮] জাহাবি, আল কাবায়ির, ১৩৪

[৫১৯] আজ-ঝাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাইর, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৫৬

সপ্তম শর্ত : নারীদের পোশাক কাফিরদের পোশাকের মতো হবে না। কারণ, ইসলামি শরিয়ত বলে, নারী-পুরুষ কারও জন্যই কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য রাখা বৈধ নয়—চাই পোশাক-আশাকে বা খাবার-দাবারে অথবা অন্য কিছুতে। এটা ইসলামের বড়ো একটি মূলনীতি, যা পালন করা থেকে আজ মুসলিমরা বিরত থাকছে। এমনকি যারা নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দেয়, তারাও হয় দ্বীন সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার কারণে কিংবা নিজেদের খাহেশাতের অনুসরণ করতে গিয়ে কিংবা ইউরোপ-আমেরিকার গোলামি করার জন্য (কাফির পোশাক পরিধান করছে)। অথচ এক্ষেত্রে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে—

(ক) ইবনু উমার রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

من تشبه بقوم فهو منهم

'যে কোনো জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখে, সে তাদের মধ্য হতে গণ্য।'[৫২০]

(খ) আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الصغار والذلة على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم

'আমার রিজিক রাখা হয়েছে আমার বর্শার ছায়ায়। আর লানত ও অপদস্থতা রাখা হয়েছে ওই ব্যক্তির ওপর, যে আমার আদেশের বিরোধিতা করে। আর যে কোনো দলের সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের মধ্য হতেই গণ্য।'[৫২১]

অষ্টম শর্ত : কাপড় যেন খ্যাতির কাপড় না হয়। ইবনু উমার রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم ألهب فيه نارا

'যে খ্যাতির কাপড় পরবে, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন অপদস্থতার কাপড় পরিয়ে দেবেন। তারপর তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেবেন।'[৫২২]

আবু জর রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন— من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حي يضعه متى وضعه

---

[৫২০] সুনানু আবি দাউদ, ৪০৩১

[৫২১] মুসনাদুল বাযযার, ৮৬০৬

[৫২২] সুনানে ইবনু মাজাহ, ৩৬০৭

'যে খ্যাতির কাপড় পরবে, আল্লাহ তাআলা তাকে এড়িয়ে যাবেন যতক্ষণ না তাকে যেখানে রাখার সেখানে রাখবেন। (অর্থাৎ, জাহান্নাম)'[৫২৩]

এইভাবে, নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে পোশাক-পরিচ্ছদের আদব রক্ষার পাশাপাশি ওই সকল আদবও লক্ষ্য রাখতে হবে, যেগুলো পালন করার জন্য শরিয়ত আদেশ করেছে; যাতে নারীর ইজ্জত-আব্রু, সম্মান-মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষা করা সম্ভব হয়। যেমন: সহশিক্ষা ব্যবস্থা না হওয়া, কোনো পুরুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে নরম স্বরে কথা না বলা।

বাহিরে বের হওয়ার ক্ষেত্রে যে সকল আদবের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোও প্রযোজ্য। যেমন: দ্বীনি শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর উপযোগী প্রতিষ্ঠান। দুনিয়াবি যেকোনো শিক্ষার ক্ষেত্রেও; যেমন: সেলাইয়ের কাজ, চিকিৎসা বিজ্ঞান। পক্ষান্তরে যে সকল কাজ নারীর উপযোগী নয়, (সেগুলো থেকে বিরত থাকা)। যেমন: রাসায়নিক বিজ্ঞান, প্রকৌশলীর কাজ। এসব ক্ষেত্রে নারীদের বের হওয়ার প্রয়োজন নেই, যদিও ওই সকল শাস্ত্র ফরজে কিফায়া বলা হয়। কারণ, ওই সমস্ত ইলমই ফরজে কিফায়া, দ্বীন-দুনিয়ার মূল বিষয়ের ক্ষেত্রে যার কোনো বিকল্প নেই।

রদ্দুল মুহতারের ভূমিকায় আল্লামা ইবনু আবিদিন বলেন—*তাবয়িনের* মুসান্নিফ বলেন, ওই সকল ইলম ফরজে কিফায়া, দুনিয়াবি বিষয়ের ক্ষেত্রে যার কোনো বিকল্প নেই। যেমন: চিকিৎসা-বিজ্ঞান, গণিত, ব্যাকরণ, আকিদা, কিরাত, হাদিসের সনদ, মিরাস বণ্টন, হস্তলিপি, মাআনি, বাদী, বায়ান, উসুল, নাসেখ-মানসুখ, আম-খাস, নাস-জাহির সম্পর্কিত জ্ঞান। এ সমস্ত শাস্ত্র কুরআন-হাদিসের সহযোগী।

তদ্রূপ আসার, ইতিহাস, রিজাল শাস্ত্র, রাবিদের আদালত, তাদের জীবন-মৃত্যু সম্পর্কিত জ্ঞান—যাতে দুর্বল রাবিকে শক্তিশালী রাবী থেকে পৃথক করা যায়, একই সাথে বিভিন্ন কৃষিকাজ ও শিল্পের মূলনীতি; যেমন: রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বুনন শিল্প ও হিজামা। কিন্তু এ সকল শাস্ত্র যেহেতু পুরুষদের শেখার মাধ্যমেই অর্জন হয়ে যাচ্ছে, তখন নারীদের বের হওয়ার কী-ই-বা প্রয়োজন?

***
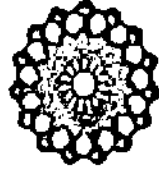
সহশিক্ষা-ব্যবস্থা

সহশিক্ষা কি জায়িজ?

বর্তমানে আমরা স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে যে সহশিক্ষা-ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছি, শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে তা নিঃসন্দেহে হারাম। অথচ বড়োই আশ্চর্য ও অদ্ভুত ব্যাপার হলো, বহু মুসলিমরাষ্ট্রের স্কুল-কলেজ, এমনকি কিছু মাদরাসাতেও এই সহশিক্ষা-ব্যবস্থা খুব দাপটের সাথেই এগিয়ে চলছে! অথচ ইসলাম একে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখান করে, যা আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ এবং তাঁর প্রেরিত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানে জারি হয়েছে।

আফগানিস্তানের নাগরিকদের আত্মসম্মান ও স্বভাবগত আত্মমর্যাদা অত্যন্ত ঘৃণার সাথে এই শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে পানাহ চায়। তদ্রুপ পৃথিবীতে এই ধরনের আরও যা আছে, তারা সেগুলো পরিহার করে। এখন আমি আপনাদের সামনে কুরআন-সুন্নাহর কিছু দলিল পেশ করব, তারপর আফগানিস্তানের নাগরিকদের—যদিও তারা অমুসলিম হয়—আত্মমর্যাদাও যে ওই সকল পদার্থ থেকে দূরে থাকতে চায়, সে দিকেও ইংগিত করব।[২৪]

কুরআন কারিমের দলিল

কুরআন কারিমে কিছু এমন বড়ো বড়ো দলিল আছে, যা থেকে কোনো অবস্থাতেই মুখ ফেরানো সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে এমন এক উর্ধ্বজাগতিক আদবের কথা বলেছেন, যার মাধ্যমে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নারীদের[২৫] আদব শিখিয়েছেন। সেখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা সকল পুরুষকে আদেশ করেছেন, তারা যেন পর্দার আড়াল ছাড়া নবীপত্নীদের কাছে কোনো কিছু না চায়। তারপর এ আদবের হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—এতে নারী-পুরুষ উভয়ের মাঝে সন্দেহের বীজ সৃষ্টি হওয়া থেকে উভয়ের অন্তর অত্যন্ত নির্মল থাকে।

ইসলামের যেসকল মূলনীতি আছে, তার বড়ো একটি হলো—কোনো জিনিসের

'কারণ' কখনো শুধু ওই জিনিসের মধ্যেই আটকে থাকে, আবার কখনো হয় তা ব্যাপক। এই আয়াতে যে 'কারণ' বলা হয়েছে, তা কিয়ামত পর্যন্ত সকল নারীর ক্ষেত্রে ব্যাপক; যদিও এর 'কারণ'টি যে-শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, তা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। উর্ধ্বজাগতিক আদবটি যে আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো—

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ

আর যদি তোমরা তাদের কাছে কোনো কিছু চাও, তাহলে তাদের কাছে পর্দার আড়াল থেকে চাও।

তারপর আল্লাহ তাআলা এই আদবের হিকমত, কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করে বলেন—

ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ

এটা তোমাদের অন্তরের জন্যও, তাদের অন্তরের জন্যও উত্তম।[৫২৬]

তো, এ অংশটুকু ইঙ্গিত করে যে, পর্দার আড়াল থেকে কোনো কিছু চাইতে বলার কারণ হলো—এর মাধ্যমে নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণির প্রত্যেকের অন্তর অধিক পবিত্র থাকে। অধিক পবিত্র বললাম; কারণ, আল্লাহ তাআলা (পবিত্র) এর পরিবর্তে— ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُم. (অধিক পবিত্র) বলেছেন। 'উভয় শ্রেণির অন্তর পবিত্র থাকা'র এ-কারণটি এটা প্রমাণ করে যে, এ আয়াতের হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত নারীর ক্ষেত্রে ব্যাপক। কারণ, সন্দেহের বীজ থেকে নারী-পুরুষ সবার অন্তরই পবিত্র থাকাটা প্রয়োজন, এক্ষেত্রে সবাই একমত।

সুতরাং কারও এ কথা বলার সুযোগ নেই যে—'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের অন্তরের পবিত্রতাই কাম্য, এর সাথে সাথে পুরুষদের অন্তরও পবিত্র হবে।' বরং কিয়ামত পর্যন্ত সকল নারীদের ক্ষেত্রেই কাম্য, যা কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী ব্যক্তির সামনে অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। সুতরাং আয়াতের এই শব্দ দ্বারা যে কারণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেটা সর্বজনীন, সবার ক্ষেত্রে ব্যাপক; যার মাধ্যমে নিজের পবিত্রতাও রক্ষা করা যায়, সংশয়ের বীজ থেকে দূরে থেকে উত্তম আখলাকে নিজেকে গড়ে তোলা যায়। কতই না মহান ওই সত্তা, যিনি এ আদব বান্দাদের শিখিয়েছেন, বান্দাদের কল্যাণ ও উত্তম আখলাক শেখানোর ক্ষেত্রে তিনি কতই না জ্ঞানী। যদি আমরা ধরেও নিই বিতর্কের খাতিরে—

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ

---

[৫২৬] [illegible]

এই আয়াতটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সাথেই নির্দিষ্ট করে ফেলার চেষ্টা করি, যেমনটা কেউ কেউ করে থাকে, তবুও একথা স্বীকার করতে হবে যে—নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ সর্বোত্তম আদর্শ ও আইডল; যাদেরকে মুসলিম নারীগণ আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। বিশেষ করে উর্ধ্বজাগতিক আদবের ক্ষেত্রে, যার মাধ্যমে সম্মান-মর্যাদা, ইজ্জত-আবরু ও পবিত্রতা রক্ষা করা যায়। সুতরাং ইউরোপীয় নারীদের অনুসরণ করার চেয়ে তাদেরকে অনুসরণ করাই হাজার গুণ উত্তম; কেননা, ইউরোপীয় নারীদের অনুসরণ করাটা মুসলিম নারীদের আখলাক ও মর্যাদা একেবারে ধুলিসাৎ করে ফেলে।

ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখলে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ-কথায় দ্বিমত পোষণ করতে পারবে না যে—উর্ধ্বজাগতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নবীজির স্ত্রীগণের অনুসরণই সম্মান-মর্যাদা, ইজ্জত-আবরু, পবিত্রতা ও নির্মলতা রক্ষা করতে পারে, অন্তর থেকে সন্দেহের খারাবি দূর করার নিশ্চয়তা দিতে পারে। আর এটাই উত্তম ও কল্যাণকর। কেননা, ইউরোপীয় নারীদের অনুসরণ মুসলিম নারীদের ইজ্জত-আবরু কালিমাযুক্ত করে, সম্মান-মর্যাদার ওপর আঘাত হানে। অতএব, যে-ব্যক্তি মুসলিম নারীদের উর্ধ্বজাগতিক আদবের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের অনুসরণ- অনুকরণ করা থেকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, বুঝতে হবে—তার অন্তর অসুস্থ ও অপবিত্র, মূলত সে ধোঁকাবাজ; উম্মতের সাথে খুব বরর্তার সাথে সে ধোঁকাবাজি করছে। আর (হাদিসে আছে)—

من غشنا فليس منا

যে আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কুরআনের কারিমের আরেকটি দলিল হলো—আল্লাহ তাআলা নারী পুরুষ উভয়কে একে অপর হতে দৃষ্টি সরিয়ে রাখার আদেশ করেন, তারপর স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, এই উর্ধ্বজাগতিক আদবই তাদের জন্য অধিক পবিত্রকারী। এরপর আল্লাহ তাআলা উভয় শ্রেণির যেই এ-আদেশ পালন করবে না, তাকে হুঁশিয়ার করে বলেন যে, তিনি তাদের কৃতকার্য সম্পর্কে পূর্ণ অবগত, তাঁর সামনে কোনো কিছুই গোপন থাকে না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

আপনি মুমিন পুরুষদের বলে দেন—তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি আনত রাখে; সেটা তাদের জন্য অধিক পবিত্রদায়ক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত।[৫২৭]

[৫২৭] সূরা নূর, আয়াত : ৩০

আপনি একটু লক্ষ্য করেন, আল্লাহ তাআলা এখানে কী বলছেন; এখানে এমন এটা ঊর্ধ্বজাগতিক আদবের কথা বলা হচ্ছে, যা সন্দেহ সংশয়ের নাপাকি থেকে পবিত্র রাখবে। তারপর দেখেন, তিনি বলছেন—إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ এখানে আল্লাহ তাআলা মূলত তাকে কঠিন হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন যে, দৃষ্টি আনত না করে বরং হারাম জিনিস ভোগ করতে থাকা লোকদের জানা উচিত : 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত।'

তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন—

> وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ
>
> আর আপনি মুমিন নারীদের বলে দেন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে; লজ্জাস্থানের হিফাজত করে, নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, আর যেন নিজেদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশের ওপর আবৃত করে রাখে।[২৮]

এখানে আল্লাহ তা আলা সুস্পষ্টভাবে নারী-পুরুষ উভয়কে একে অপর থেকে দৃষ্টি অবনত রাখার আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা এরপরে বলেছেন—'আর যেন লজ্জাস্থানের হিফাজত করে।'

প্রথমে দৃষ্টি অবনত রাখার আদেশ করেছেন। কারণ, এই দৃষ্টিই লজ্জাস্থানের জিনার দিকে মানুষকে ধাবিত করে। কখনো কখনো এমন হয় যে, পুরুষ একজন সুন্দর নারীর দিকে তাকিয়ে থেকে তাকে উপভোগ করতে থাকে, তারপর নারীর ভালোবাসাটা তার অন্তরে বাসা বাধে। আর এভাবেই মূলত একসময় তাদের উভয়কে অশ্লীল কাজে নিক্ষেপ করে। বিশেষ করে এই যুগে এটা বেশি হয়; কারণ, আজ মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই, ফিতনা ফাসাদের ছড়াছড়ি; তাই এমন মানুষ খুব কমই পাবেন—যারা আল্লাহর ভয়ে, আল্লাহ থেকে লজ্জা পেয়ে তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে।

আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া থেকে, দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়া থেকে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাই!

মুসলিম ইবনুল ওয়ালিদ আনসারি তার একটি কবিতায় হারাম দিকে দৃষ্টিপাতের খারাপ পরিণতি সম্পর্কে বলেন—

كسبت لقلبي نظرة لتسره . عيني فكانت شقوة ووبالا .

ما مر بي شيء أشد من الهواء . سبحان من خلق الهواء و تعالي .

> আপনি আমার অন্তরের দৃষ্টি দেওয়ার যে সুব্যবস্থা করে দিয়েছেন,
> যাতে তা আমার অন্তরের জন্য আনন্দের কারণ হয়; কিন্তু তা হয়ে গেল
> (আনন্দের পরিবর্তে) দুর্ভাগ্য ও বিপদ।
>
> প্রবৃত্তি ও খাহেশাতের চেয়ে কঠিন আর কিছু আমার কাছে মনে হয় না;
> যিনি প্রবৃত্তি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কতইনা মহান, চিরপবিত্র।

এই আয়াতে উল্লেখিত আদবগুলো নিয়ে যদি চিন্তা করা হয় তাহলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে—যারা সহশিক্ষার কথা বলে, তারা শয়তানের বিভিন্ন যুক্তি পেশ করে, কুরআন কারিমের আয়াতের বিরোধিতা করে। নারীর স্বার্থরক্ষা, নারীর অধিকারের কথা বলে মূলত তারাই নারীদের সম্মান-মর্যাদা নষ্ট করছে। এদের কারণেই আজ ইজ্জত-আবরু-সম্পন্ন নারীরা কলংকিত হচ্ছে, শয়নক্ষেত্রে কালিমা লেপন হচ্ছে, বংশীয় সম্পর্ক অনিরাপদ হয়ে যাচ্ছে, সহমিশ্রণের নাপাকির কারণে নির্মল সম্পর্কগুলো অনির্মল হয়ে যাচ্ছে।

আরও স্পষ্ট করে বললে—যারা ছাত্র-ছাত্রীদের একসাথে থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, সহশিক্ষার কথা বলছে, তারা মূলত তাদের যৌবনের সূচনাতে, সতেজ লাবণ্যে তাদের একত্র রাখতে চাচ্ছে। এই বয়েসে এইসব ছাত্রছাত্রীদের তারা ইউরোপীয় সাজে সজ্জিত রাখতে চাচ্ছে, যা মানুষের সহজাত বাসনাকে উত্তেজিত করে তোলে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ অর্থাৎ—চুল, মাথা, চেহারা, গলা, এগুলো অনাবৃত থাকার কারণে, সেই সাথে বিভিন্ন কৃত্রিম উপায়ে সুন্দর করে সেজে আসার কারণে, এরা যখন যুবকদের সাথে বসে, তাদের মাঝে যৌবনের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী নারীভোগের প্রবৃত্তির আগুন টগবগ করতে থাকে; অপরদিকে তখন থাকে না কোনো ধর্মীয় বাধা, আর এমন কোনো পরিবেশও থাকে না—যা ছেলেদেরকে মেয়েদের থেকে, মেয়েদেরকে ছেলেদের থেকে দূরে রাখবে। কারণ, নিয়মটাই এমন হয়ে গেছে যে, সকল অবস্থায় সবাই এক জায়গাতেই বসতে পারে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের সৌন্দর্যের বিমোহিত হয়ে তাকিয়ে থাকতে পারে, যা পরবর্তী সময়ে ফিতনার কারণ হয়ে পড়ে।

তো, যারা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সহশিক্ষার প্রতি 'উদাত্ত' আহ্বান করে, তারা যেন ছাত্রছাত্রীদের বলছে—শোনো আমরা তোমাদের জন্য সুন্দর একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ফেলেছি, যাতে তোমরা খারাপ কাজ সহজেই করতে পার, একে-অপরকে শরিয়ত-নিষিদ্ধ পথে তৃপ্ত করাতে পার, যা ইজ্জত-আবরু কলংকিত করে, শয়নক্ষেত্রকে দাগযুক্ত করে, বংশমর্যাদাকে কালিমা লেপন করে!

আর শয়তান যেন তাদের বলছে—তোমরা মুমিনদের বলে দাও, তারা যেন দৃষ্টি অবনত না করে, লজ্জাস্থান হিফাজত না করে। মুমিন নারীদেরও অনুরূপ বলে দাও।

এটা যদিও তারা মুখ খুলে বলে না, তবে সচরাচর তারা যা করে থাকে, তার 'অর্থই' হলো এই কথাগুলো! চোখ 'খুলে' দেখলে কারও সামনে এসব অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। হে আমার সম্মানিত মুমিন ভাই, আফগান পিতা, কোন্ যুক্তিতে বা কোন্ বুদ্ধিতে কিংবা কোন্ সভ্যতার দাবিতে অপনি আপনার কলিজার টুকরো মেয়েকে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন? ভোগের বস্তু বানিয়ে দিয়েছেন? যার সৌন্দর্য ও লাবণ্য প্রত্যেক পাপাচারীর চোখ ভোগ করতে থাকবে! কখনো খেয়ানত করে, কখনো কৌশলে আর কখনো বা জুলুম-অত্যাচার করে! তারা ফ্রিতে আপনার সন্তানের সৌন্দর্য উপভোগ করবে, যাতে শয়তানকে তারা খুশি করাতে পারে, ইউরোপীয়দের পা চাটতে পারে, সম্মান-মর্যাদা, ইজ্জত-আবরু ও পবিত্রতা ধূলিস্মাৎ করে তাদের অন্ধ গোলামি করতে পারে!

অথচ আপনার কলিজার টুকরা মেয়েকে যদি আপনি ইসলামি দীক্ষায় দীক্ষিত করে তুলতে পারতেন, আদর-যত্নে, সম্মান-ইজ্জত রক্ষা করে চালাতে পারতেন, তাহলে সে শুধু আর আপনার 'মেয়ে' থাকত না, বরং সে হতো দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস। সে একটি হীরকখণ্ডে রূপান্তরিত হতো; দেখেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة

দুনিয়া হলো ভোগের বস্তু, আর সবচেয়ে উত্তমবস্তু হলো—সতী নারী।

প্রশ্ন হলো—দ্বীন-হীন এই দুনিয়াবি শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা একজন মেয়ে কীভাবে সতী নারী হওয়া শিখতে পারে?

হাদিসে নববির দলিল

উকবা ইবনু আমের জুহানি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লা বলেছেন—

إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت..

তোমরা নারীদের সামনে যাওয়া থেকে সাবধান হও!

তখন একলোক দাঁড়িয়ে বলল—ইয়া রাসুলাল্লাহ্, যদি দেবর হয়, তবুও?

তখন নবীজি বললেন—আরে! দেবর তো মৃত্যু(র মত ভয়ঙ্কর!)।[১২৯]

---

[১২৯] সূত্র : সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম ও অন্যান্য। ইমাম বুখারি রহ. এই হাদিস 'বিয়ে' অধ্যায়ে এনছেন; যার পরিচ্ছেদের শিরোনাম ছিল : 'মাহরাম ছাড়া কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে থাকতে পারবে না'। আর ইমাম মুসলিম রহ. এই হাদিস 'সালাম' অধ্যায়ে এনেছেন, যার পরিচ্ছেদের শিরোনাম : 'কোনো গাইরে মাহরাম নারীর সাথে থাকা ও তার কাছে আসা হারাম'।

হাদিসে 'حمو' দ্বারা উদ্দেশ্য—স্বামীর নিকটাত্মীয়, যে স্ত্রীর মাহরাম নয়; যেমন—দেবর, দেবরের ছেলে, চাচাশ্বশুর এবং এ-রকম আরও যারা আছে তো, হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহজিরের শব্দ (সতর্কীকরণ বাচক) দ্বারা কথা শুরু করে বলেন—

إياكم والدخول على النساء

এখানে নারীদের সাথে (নির্জনে) মিলিত হওয়া থেকে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব কঠিনভাবে সতর্ক করেছেন। পরে যখন আনসার সাহাবি স্বামীর নিকটাত্মীয় সম্পর্কে প্রশ্ন করল যে—সে ভাবির সামনে যেতে পারবে কি না, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সামনে যাওয়াকেই 'মৃত্যু' বলে ব্যক্ত করেছেন।

মূলত 'মৃত্যু' হলো দুনিয়াতে মানুষের জীবনে ঘটা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয়। সুতরাং স্ত্রীর সামনে স্বামীর নিকটাত্মীয়র প্রবেশ করা সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মন্তব্য—দেবর তো মৃত্যু—নিয়ে আপনারা একটু চিন্তা করে দেখেন, যাতে বুঝতে পারেন যে, গাইরে মাহরাম নারীদের সাথে মেলামেশা করাই 'মৃত্যু'সদৃশ।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাকে 'মৃত্যু' বলেছেন; কারণ হলো, এই প্রবেশ করাই জিনার দিকে নিয়ে যায়; যা মানুষের সম্মান-মর্যাদা ধূলিস্মাৎ করে দেয়, ধার্মিকতা নিঃশেষ ফেলে। এটা ধার্মিকতা ও আদবের মৃত্যু—যা শরীর থেকে রুহ বের হওয়ার স্বাভাবিক মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর; কারণ, স্বাভাবিক মৃত্যু যদি কোনো নেককার বান্দার হয় তাহলে সে আরও ভালো অবস্থা ও নেয়ামত এর সান্নিধ্যে গমন করে পক্ষান্তরে...।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, যারা সহশিক্ষার দিকে আহ্বান করে, তারা মূলত মৃত্যুর দিকেই টেনে নেয়! স্পষ্ট যে এই ক্ষতি ও খতরনাকের দিকে তাকিয়েই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাকে 'মৃত্যু' বলেছেন!

ইমাম মুসলিম রহ. এই হাদিস লাইস ইবনু সাদের বর্ণনায় উল্লেখ করে বলেন, الحمو। মানে দেবর এবং স্বামীর আত্মীয়দের মধ্য তার মতো আরও যারা আছে; যেমন—চাচার ছেলে।

ইমাম নববি রহ. *সহিহ মুসলিমের* ব্যাখ্যাগ্রন্থে এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, الحمو الموت। দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—দেবর ও স্বামীর অন্যান্য আত্মীয়দের থেকে যে পরিমাণ গুনাহের আশঙ্কা থাকে, সেটা অন্য কারও থেকে থাকে না। খারাপ যা ঘটতে পারে, তার ওদিক থেকেই ঘটার শঙ্কা বেশি, ফিতনাও সেদিক থেকে বেশি হয়। কারণ, এই ধরনের মানুষগুলো কোনো বাধা-বিপত্তি ছাড়াই নারীর কাছে সহজে যেতে পারে, মিলিত হতে পারে। পক্ষান্তরে অন্যান্য দূরবর্তী মানুষ যারা, তারা সেটা পারে না।...

এই হাদিস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—যে স্বভাবটা দেবর থেকে পাওয়া যায়, ঠিক সেটাই সহপাঠীর মধ্যে পাওয়া যায়। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই সহপাঠীরা সহপাঠিনীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে। বিভিন্ন কথাবার্তা বলে। আর এভাবে একসময় কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই তার সাথে একান্তে মিলিত হয়ে যায়। এদিকে সবাই ভাবতে থাকে—সে তো তার সহপাঠী, শ্রেণিকক্ষে একসাথে বসবে, এটাই স্বাভাবিক; অতএব, এই সহপাঠীও ওই দেবর নামক 'মৃত্যু'র মতোই ভয়ংকর!

ফাতহুল বারিতে এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার রহ. বলেন, (إياكم والدخول) দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তিকে সতর্কিত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য; যাতে সে বিষয়টা পরিহার করে; যেমন বলা হয় (إياكم والأسد - সিংহ থেকে সাবধান!)

এখানে (إياكم)-এর আগে একটি ক্রিয়া উহ্য আছে; অর্থাৎ, (اتقوا - ভয় করো; সাবধান!) পূর্ণ কথা হলো—

اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء والنساء أن يدخلن عليكم

তোমরা নারীদের কাছে যাওয়া ও নারীরা তোমাদের কাছে আসা থেকে নিজেদের ভয় করো/সাবধান হয়ে যাও।

ইবনু ওয়াহবের বর্ণনায় আছে—

لا تدخلوا على النساء

নারীদের সামনে যেয়ো না।

এই হাদিসে নারীদের সামনে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। যা থেকে একান্তে মিলিত হওয়ার নিষিদ্ধতাকে আরও সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

এছাড়া ইবনু হাজার রহ. (الحمو الموت)-এর অনেকগুলো ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। একবইভাবে ইমাম নববি রহ.-ও তার ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। তবে এখানে আমরা যে ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছি, উদ্দিষ্ট অর্থ হওয়ায় ক্ষেত্রে এটাই বেশি স্পষ্ট। তো, এই সহিহ হাদিস, যা শাইখাইন-ই উল্লেখ করেছেন, তা স্পষ্টভাবে নারীপুরুষের সহ অবস্থানকে কঠিনভাবে নিষেধ করছে। আর যদি সেই সহ-অবস্থানের পদ্ধতিটা অনেক সহজ হয়, যেমন স্বামীর নিকটাত্মীয়দের ক্ষেত্রে, তাহলে তো সেটা মৃত্যুর মতোই ভয়ঙ্কর। সুতরাং, মুসলিম উম্মাহর জন্য শোভনীয় নয় যে, তারা নারী পুরুষ মেলামেশার ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সতর্ক বাণী এড়িয়ে যাবে, অজ্ঞ সেজে বসে থাকবে।

একথা কারও সামনে অস্পষ্ট নয় যে একই স্থানে নারী পুরুষের একত্র হওয়া, একজন আরেকজনের পাশে থাকার মাধ্যমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের সতর্কীকরণের বিরোধিতা করা হচ্ছে! সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হলো—শয়তানকে খুশি করার জন্য, ইউরোপীয়দের অন্ধ অনুসরণ করার জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সতর্কবাণী নিয়ে হাসি-তামাশা করা হচ্ছে।

কখনো কখনো সম্মিলিতভাবেও জিনা হয়ে যায়। যদিও তারা শিক্ষকের সামনে মিলিত হয়ে বসে থাকে। তবে এই জিনা মূল জিনার চেয়ে নিম্নস্তরের। ইমাম মুসলিম রহ. আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু হুরাইরা রা. যা বর্ণনা করেছেন, এর চেয়ে 'লামামের' (ছোটো গুনাহ) সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আর কোনো কিছুই আমি দেখে নি, (তিনি বর্ণনা করেন) যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا أدرك ذلك على محاله فارسل العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك او يكذبه
>
> নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা আদম-সন্তানের বিষয়ে জিনার একটা অংশ ফায়সালা করে রেখেছেন; যা সে করবেই, দুই চোখের জিনা (হারামা জিনিস) দেখা, জিহ্বার জিনা (মন্দ) কথা বলা, মানুষের নফস (হারাম জিনিসের) আকাঙ্ক্ষা করে, খুব কামনা করে, তখন লজ্জস্থান সেটাকে বাস্তবে পরিণত করে অথবা অপূর্ণ রেখে দেয়।

আর *সহিহ মুসলিমে* এই শব্দে এসেছে—

> كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج او يكذبه
>
> আদম সন্তানের ভাগ্যে জিনার অংশ লিখে দেওয়া হয়েছে যা সে করবেই, কোনো সন্দেহ নেই। তো চোখের জিনা দৃষ্টি দেওয়া, কানের জিনা শোনা, জিহ্বার জিনা বলা, হাতের জিনা ধরা, পায়ের জিনা হাঁটা, (কখনো কখনো মানুষের) অন্তর (খারাপ কিছুর) বাসনা করে, আকাঙ্ক্ষা করে, তখন সে বাসনা লজ্জাস্থান পূরণ করে অথবা অপূরণ করেই রেখে দেয়। এই হাদিসটি ইমাম বুখারি রহ.-ও উল্লেখ করেছেন। এ হাদিসে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে—চোখ, কান জিহ্বা হাত-পা সবকিছুরই জিনা রয়েছে।

একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, যখন ছাত্র-ছাত্রীরা একসাথে থাকে, শ্রেণিকক্ষে, দুই ক্লাসের মাঝে বিরতিতে, স্কুলের পার্কে, সুইমিংপুলে পানিতে, ক্লাসের পড়া পরস্পর আলোচনা করার সময়ে তখন তাদের চোখ, জিহ্বা, হাত এ-সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জিনা করতে থাকে, আর সুযোগ পেলে তাদের লজ্জাস্থানও সেগুলো অপূরণ রাখে না;

...র পূরণ করেই ছাড়ে! কারণ, ধর্মীয় দিক থেকে কোনো বাধা তো নেই, সেই সাথে কোনো সামান্য শাস্তির ব্যবস্থাও নেই। সে-সকল ইউরোপীয় নারীদের তারা অনুসরণ করে। জানা কথা—তাদের লজ্জাস্থানও তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেই ছাড়ে, এটা কারও অজানা নয়।

এ-রকম আরও বহু হাদিসই আছে, তবে এই হাদিসগুলোই যথেষ্ট। কারণ, যে সত্য জানতে চায়, সত্যের ওপর আমল করতে চায়, তার জন্য এতুটুকুই যথেষ্ট।

আফগানিস্তানের মুসলিম অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন, আপনারা তো জেনেছেন, নারী-পুরুষের সহ-অবস্থান কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে শরিয়তে হারাম করা হয়েছে। বিশেষ করে এই যুগে, যখন মানুষের অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় উঠে গেছে, সকল খারাপ বিষয়কে বৈধ মনে করার মিছিল শুরু হয়ে গেছে, চারিত্রিক অধঃপতন ও মারাত্মত সব অপরাধের ক্ষেত্রে যখন ইউরোপীয়দের অনুসরণ করা হচ্ছে, এমন সময়ে এই সহশিক্ষা ও সহাবস্থান তো অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। সাথে সাথে যা-কিছু এই সহাবস্থানের জিনার দিকে ধাবিত করে, সে-সব মাধ্যমও বন্ধ করতে হবে। এখন আমাদের জন্য এটা ওয়াজিব। আলিমদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে যার প্রমাণ কুরআন ও সুন্নাহয় স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। কুরআন কারিমে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন—

> وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
>
> আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কাউকে ডাকে, তোমরা তাদের গালি দিয়ো না। (তাদের গালি দিলে দেখা যাবে) তাহলে তারাও না-জেনে সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহকে গালি দেবে।[১৩০]

তো আল্লাহ তাআলা মূর্তিকে গালি দেওয়া হারাম করেছেন, কারণ, সেটা আল্লাহকে গালি দেওয়ার কারণ ও মাধ্যম। এক সহিহ হাদিসে আছে, যা শাইখাইন[১৩১] বর্ণনা করেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> إن من العقوق شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه
>
> পিতাকে পুত্রের গালি দেওয়াও অবাধ্যতা বলে গণ্য হবে। তখন উপস্থিত সাহাবিরা বললেন—কেউ কি তার পিতাকে গালি দেয়?,

---

[১৩০] সূরা আনআম, আয়াত : ১০৮

[১৩১] ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম রাহিমাহুমাল্লাহ

নবীজি বললেন—হ্যাঁ, ছেলে অন্য একজনের পিতাকে গালি দেয়, তখন সেও তার পিতাকে গালি দেয়, সন্তান অপরজনের মাকে গালি দেয়, তখন সেও তার মাকে গালি দেয়।

এখানে নবীজি পিতামাতার গালি দেওয়ার মাধ্যমকেই তাদের গালি দেওয়া বলে ব্যক্ত করেছেন। হে আফগানবাসী, কোথায় আপনাদের যুগ যুগ ধরে আসা আফগানি চিন্তা-চেতনা ও আত্মমর্যাদা? কীভাবে আপনারা নিজেদের সন্তানদের বাহিরে বেপর্দা অবস্থায় ভোগ্যপণ্য বানিয়ে ছেড়ে দেন? যাতে যে চায়, তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ফ্রি উপভোগ করবে। এটা অবুঝ মেয়ে ও অসহায় বোনদের ওপর জুলুম ও অবিচার, তাদের ইজ্জত-আবরুর ওপর আঘাত। সুতরাং নিজেদের আপন পরিবারের সাথে এই অন্যায় অবিচার করা আপনারা সাবধান হন, তাছাড়া আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকেই তো নিজেদের পরিবারবর্গকে এই জুলুম থেকে রক্ষা করার আদেশ করেছেন আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে আগুন থেকে রক্ষা করো।

সহশিক্ষা হারামের ফতোয়া

বহু উলামায়ে মুতাআখখিরিন সহশিক্ষা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ফতোয়া দেন এবং কঠিনভাবে নিষেধ করেন। আমরা প্রশ্ন সহ কিছু ফতোয়া উল্লেখ করব।

ফাতোয়া নম্বর - ০১ : মাওলানা কিফায়াতুল্লাহ এ বিষয়ে ফতোয়া দেন, যখন (জুমাদাল উলা, ১৩৪৩ হিজরি) আফগানিস্তানের শিক্ষামন্ত্রণালয় তার কাছে ফতোয়া জানতে চায়। ফতোয়াটি তলে ধরা হলো—

আজকাল আলোচনার বড়ো একটি কেন্দ্রবিন্দু নারী-শিক্ষা। এখানে দুটো বিষয়—

- ০১. প্রথমত নারীদের শিক্ষা দেওয়া হবে কি না?
- ০২. দ্বিতীয়ত তাদের শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি কী হবে?

প্রথম বিষয় : নারীদের শিক্ষা দেওয়া হবে কি না?

এই বিষয়ে তো দ্বিমত করার কোনো প্রশ্নই আসে না! কেননা, জ্ঞানার্জন করা ইসলামের ফরজ কাজসমূহের একটি। পবিত্র কুরআন কারিমের যেসব জায়গায় পৃথক ও সমষ্টিগতভাবে চিন্তা-ভাবনার করার নির্দেশ এবং জ্ঞান অর্জনের বাধ্যবাধকতার সম্বোধন করা হয়েছে, তা কিন্তু শুধু পুরুষদের জন্যই নয়; জ্ঞানের আলো অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা কেবল পুরুষ বা কোনো এক শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়! কেননা, জ্ঞান অর্জন করা মানব-জীবনের অন্যতম অপরিহার্য বিষয়। যে কোনো

মানুষ, পুরুষ বা নারী, যার জ্ঞান নেই, সে সত্যিকার অর্থেই মানবজীবন থেকে বঞ্চিত। আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা আলিমকে জীবিত এবং অজ্ঞকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন—

وما يستوي الاحياء ولا الاموات

সমান হতে পারে না জীবিতরা এবং মৃতরা।

সুতরাং যে সকল ইলম অর্জন করা ফরজ কিংবা মুস্তাহাব অথবা মুবাহ সে সকল ইলম নারীদের জন্য অর্জন করা যে বৈধ, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এই ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য করার না কোনো সুযোগ আছে আর না কোনো দলিল আছে।

দ্বিতীয় বিষয় : নারীদের শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি কী হবে?

এ-বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করা অতি অবশ্যই জরুরি, তা হলো—আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিভিন্ন প্রয়োজনমুখী করে সৃষ্টি করেছেন; যেমন : খাদ্য, পানীয়, বিবাহ ইত্যাদি মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা। তবে প্রতিটি প্রয়োজন পূরণের জন্য নির্দিষ্ট কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন : কারও জন্য ক্ষুধার্ত অবস্থায় অন্যের সম্পদ বা কোনো হারাম জিনিস খাওয়া, অথবা তৃষ্ণার্ত অবস্থায় অপবিত্র বা হারাম পানীয় পান করা জায়িজ নয়, তদ্রুপ বৈধ নারী ব্যতীত অন্য কোনো নারীর কাছ থেকে তৃপ্তি লাভ করাও তার জন্য জায়িজ নয়। জীবিকা অর্জনের যেমন বৈধ উপায় আছে, তেমনি স্ত্রী পাওয়ারও কিছু বৈধ পদ্ধতি আছে। যেভাবে খাদ্য-দ্রব্য ও পোশাক-আশাকের নির্ধারিত পদ্ধতি লঙ্ঘন করা অপরাধ এবং নিষ্ঠুরতা, আগ্রাসন, দখল, চুরি ও ঘুষের দিকে ধাবিত করে, যা আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ। একইভাবে নারী-পুরুষের সম্পর্কের সীমানা লঙ্ঘন করা অনৈতিকতা, অশ্লীলতা এবং অবৈধ মেলামেশার দিকে ধাবিত করে, যা আল্লাহ তাআলার শাস্তির উপযুক্ত বানিয়ে দেয়।

এই নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফিতনা যেহেতু বড়ো ফিতনা, এবং এর পরিণতি অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক, তাই ইসলামি শরিয়াহ এই ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। নারী-পুরুষকে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। আল্লাহ তাআলা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন—

وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

এবং আরও বলেছেন—

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين

زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن
الا لبعولتهن او ابائهن.

এবং নবী (ﷺ) নারীদেরকে পুরুষদের মজলিসে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এমনকি তিনি এও বলেছেন, নারীদের অন্দর মহলে নামাজ বড়ো ঘরে নামাজ আদায় করার চাইতে উত্তম এবং বড়ো ঘরে নামাজ বাড়ির আঙিনায় নামাজ আদায় করার চাইতে উত্তম এবং বাড়ির আঙিনায় নামাজ মহল্লার মসজিদে নামাজ আদায় করার চাইতে উত্তম এবং মহল্লার মসজিদে নামাজ জুমার মাসজিদে নামাজ আদায় করার চাইতে উত্তম। এবং তিনি নারীদের জানাজার সাথে যেতে নিষেধ করেছিলেন, এমনকি নারীদের জন্য প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়াকে তিনি অপছন্দ করতেন। নবী (ﷺ) বলেন—

المرأة عورة وإنها إذا خرجت استشر فيها الشيطان وانها اقرب ما تكون إلى
الله وهي في قعر بيتها (رواه الطبراني في الكبير مجمع الزوائد)

এবং আরও বলেন—

ما من امرأة تخرج في شهرة من الطيب فينظر الرجال اليها الا لم تنزل في
سخط الله

এই সমস্ত নস থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইসলামি শরিয়তে পুরুষদের যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, তা নারীদেরকে দেওয়া হয় নি। এবং নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সীমালঙ্ঘনের উপায়-উপকরণ এবং তার পরিণাম সমূলে উৎপাটন করার জন্য অবিরাম চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং নবীজির (ﷺ)-এর বাণী মেনে চলার বরকতের কারণে বিশ্বের অন্যান্য জাতির তুলনায় মুসলিমদের সমাজ অশ্লীলতা ও অনৈতিকতা থেকে মুক্ত ও নিরাপদ।

পর্দা, যা মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত তা সেই সভ্যতার ই একটি অংশ বিশেষ। নারী-পুরুষের অবাধ মেলমেশা, যা এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকা এবং আমরিকাসহ বিভিন্ন অমুসলিম সমাজে দেখা যায়, সভ্য মুসলিমদের মাঝে এর ন্যূনতম প্রভাবও দেখা যায় না। বিশেষভাবে এই ক্ষেত্রে মুসলিমজাতি যদি পৃথিবীর সকল জাতির ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গর্ব করে, তাহলে এটা তাদের ক্ষেত্রে মানায়।

আধুনিক যুগের নারীদের সর্বগ্রাসী মনোভাব ইউরোপের দেশগুলোতে সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞ সারা বিশ্বে জ্বলজ্বল করছে, এই সময়ে ইসলামের নেতৃবর্গদের দায়িত্ব হলো—মুসলিমদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং তাদের অধঃপতনের অবস্থা থেকে উন্নতির সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে আসার চেষ্টা করা। বর্তমান সময়ে যুগের চাহিদা নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের তীব্র প্রয়োজন তৈরি করেছে যে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাগুলো তাদের শিক্ষা-পদ্ধতির মাধ্যমে অর্জিত হতে পারত, তা শুধু তাদের অজ্ঞতার কারণেই

হারিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাআলার সীমাবদ্ধতা রক্ষা করা এবং ইসলামি কৃষ্টিকালচার বজায় রাখা এবং রাসুল (ﷺ)-এর সুন্নাহকে অনুসরণ করা এবং জাতীয় সংস্কৃতি ও সমাজ রক্ষা করা অন্যান্য সকল বিষয়ের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। কেননা, ইসলামের শাসকগণ হলেন আল্লাহ তাআলার ছায়া—(السلطان ظل الله في الأرض) এবং নবীগণের উত্তরসূরি। আর কোনো কিছুর ছায়া সেই জিনিস অনুযায়ী হওয়া উচিত।

এ-সকল বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের নেতৃবর্গদের ওপর সর্বপ্রথম ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং ইসলামি সভ্যতার পন্থাকে অবলম্বন করা এবং সালাফদের শিষ্টাচার রক্ষা করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আর নারীদের এতটা স্বাধীনতা দেবেন না যে, তারা ইউরোপীয় নারীদের অসভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলামি সমাজ ও সালফদের পথ ও পন্থা পরিহার করে বসে। অন্যথা এই স্বাধীনতার ভয়াবহ পরিণতি তাদের বয়ে বেড়াতে হবে।[৫৩২]

হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. *ইজালাতুল খাফা* নামক কিতাবে বলেছেন—

খলিফা হওয়ার চতুর্থ পদ্ধতিটা হলো—জবরদখল। যেমন, কোনো খলিফা যদি মারা যায় এবং খলিফা তাকে বাইয়াত ও প্রতিনিধি বানানো ছাড়াই সে খিলাফাতের দায়িত্ব নিয়ে নেয় এবং সবাইকে নিজের বাইআতের ওপর একত্র করে নেয়, তাদের সন্তুষ্টি বা বলপ্রয়োগ অথবা কোনো লড়াইয়ের মাধ্যমে এটা সে করে, তখন সে খলিফা হয়ে যাবে; আর মানুষের ওপর আবশ্যক হয়ে যাবে তার আদর্শ অনুসরণ করা, যদি তার আদেশ শরিয়তের বিধান অনুযায়ী হয়। আর এমন জবর-দখলকারী খলিফা দুই প্রকার—

০১. প্রথম প্রকার হলো: এমন জবর দখলকারী খলিফা, যার মধ্যে খলিফা হওয়ার সকল শর্ত বিদ্যমান এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বদের সাথে কোনো প্রকার হারামে জড়িত হওয়া ছাড়াই কোনো ব্যবস্থাপনা বা সন্ধির মাধ্যমে মিটমাট করে নেয়। আর এ প্রকারটা জায়িজ। ইসলামে এর সুযোগও আছে।

হজরত আলি রা.-এর পর হজরত ইমাম হাসান রা.-এর সাথে হজরত মুআবিয়া রা. সন্ধি স্থাপনের পর মুআবিয়া রা.-এর খিলাফাত সংগঠিত হওয়াটা এই প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

০২. আর দ্বিতীয় প্রকার হলো: তার মধ্যে সকল শর্ত বিদ্যমান নেই এবং সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে যুদ্ধবিগ্রহ ও হারামে জড়িত হওয়ার মাধ্যমে সমঝোতা করেছে, তাহলে এই প্রকারটা জায়িজ হবে না। সে গুনাগার হবে; কিন্তু তার

---

[৫৩২] কিফায়াতুল মুফতি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫২-৬২

হুকুম মেনে নেওয়া মানুষের ওপর ওয়াজিব বা আবশ্যক হবে। যদি তার আদেশ-নিষেধ শরিয়ত অনুযায়ী হয়। এবং তার জাকাত উসুলকারীরা যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকদের থেকে জাকাত উসুল করে, তাহলে জাকাত আদায় হয়ে যাবে, তার নিযুক্ত করা কাজী কোনো হুকুম দিলে তার হুকুম কার্যকর হবে। এবং সে (খলিফা) জিহাদের ডাক দিলে তার সঙ্গী হয়ে জিহাদ করা যাবে। আর এই প্রকারের খিলাফাতও সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন। এর কারণ হলো, অন্যথা হলে তার অপসারণে সাধারণ মুসলিমদের প্রাণনাশ এবং বিশৃঙ্খলার উদ্ভব ঘটবে। আর যেহেতু এ বিষয়টা নিশ্চিত নয় যে, আদৌ এই বিশৃঙ্খলার কোনো মীমাংসা হবে কি না। হতে পারে—অন্য যাকে উপযুক্ত মনে করা হচ্ছে, সে প্রথমজন থেকে আরও বেশি খারাপ। ফলত যার অন্ধত্ব নিশ্চিত, এমন ফিতনায় জড়িত হওয়া তার জন্য উচিত নয়। খলিফা আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ান এবং বনু আব্বাসের প্রথম দিকের খলিফাদের খিলাফাত সংগঠিত হওয়াটা এই প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ফাতোয়া নম্বর - ০২ : আল লাজনাতুদ দাইমা'র ফতোয়াতে আছে, কোনো তরুণীর জন্য সহশিক্ষা-ব্যবস্থা জায়িজ নয়, তদ্রুপ এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও পড়া জায়িজ নেই, যার দায়িত্ব পুরুষরা গ্রহণ করে, কারণ, তখন সেটা বড়ো কোনো ফিতনার রূপ নেবে, অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে থাকবে। আল্লাহই তাউফিক দানকারী।[৫৩৩]

ফাতোয়া নম্বর - ০৩ : শাইখ আল্লামা মুহাম্মাদ আমিন শানকিতিও নারীদের জন্য সহশিক্ষা-ব্যবস্থা হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন।[৫৩৪]

ফাতোয়া নম্বর - ০৪ : আব্দুল্লাহ ইবনু কাউদ, আব্দুল্লাহ ইবনু গাদইয়ান, আব্দুর রাজ্জাক আফিফি ও আব্দুল আজিজ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি বাজ প্রমুখও এই শিক্ষাব্যবস্থা হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন। উক্ত ফতোয়াটি তুলে ধরা হলো—

প্রশ্ন : চিকিৎসাশাস্ত্র শেখা ওয়াজিব হোক বা জায়িজ হোক, এর জন্য কি কোনো নারী বাহিরে বের হতে পারবে? অথচ তাকে সে-জন্য সামনের কাজগুলো করতেই হবে, সে যতই চেষ্টা করুক না কেন, তাকে এগুলোর সম্মুখীন হতেই হবে? (সামনের কাজগুলো হলো)—

ক. পুরুষদের সাথে মিশতে হবে। দুই ক্ষেত্রে, যেমন :

- ০১. অসুস্থ ব্যক্তির সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে, চিকিৎসা-শাস্ত্রের শিক্ষকের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে।
- ০২. সাধারণ যানবাহনে তাকে আরোহণ করতে হবে।

---

[৫৩৩] আল-লাজনাতুত দাইমা ফতোয়া বিভাগ, ফতোয়া নম্বর : ১৩৮১৪

[৫৩৪] ফতোয়া নাম্বার ৩৫ [illegible]

ঘ. এক দেশ থেকে অন্য দেশে সফর করতে হবে, যেমন সুদান থেকে মিসরে সফর করতে হবে, যদিও সেই সফর হোক বিমানযোগে, অর্থাৎ সামান্য সময়ের জন্য, তিনদিনের কম সময়ের জন্য।

জবাব : এখানে দুটো বিষয়—

প্রথমত, সে যদি চিকিৎসা-বিজ্ঞান শেখার উদ্দেশ্যে বের হয়, আর সে কারণে শিক্ষা বা যানবাহনের ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে মিশতে হয়, আর এর ফলে ফিতনারও আশঙ্কা থাকে, তাহলে বের হওয়া বৈধ নয়। কারণ, নিজের আবরু হিফাজত করা ফরজে আইন, অন্যদিকে চিকিৎসা-বিজ্ঞান শেখা ফরজে কিফায়া। আর ফরজে আইন ফরজে কিফায়র ওপর প্রাধান্য পায়; কিন্তু যদি শুধু অসুস্থ ব্যক্তি বা শিক্ষকের সাথে কথা বলতে হয়, তাহলে সেটা হারাম নয়, বরং হারাম তখনই হবে, যদি সে খুব নমনীয় হয়ে নরম করে কথা বলে, যার ফলে খারাপ লোকেরা তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, এটা হারাম শুধু চিকিৎসা-শাস্ত্রের ক্ষেত্রে নয়, বরং সব ক্ষেত্রেই।

দ্বিতীয়ত, চিকিৎসা-শাস্ত্র শেখা বা শেখানোর উদ্দেশ্যে সফরে বা অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা করার সময় যদি তার মাহরাম থাকে, তাহলে জায়িজ হবে। আর যদি তার সাথে সফরে স্বামী বা মাহরাম না থাকে, তাহলে হারাম। যদিও বিমান-যোগে সফর হয়। কারণ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

لا تسافر المرأة إلا مع في محرم (متفق على صحته)

মাহরাম ছাড়া কোনো নারী সফর করতে পারবে না। (মুত্তাফাক আলাইহি)

তাছাড়া এখানে নিজের ইজ্জত-আবরুর হিফাজতকে চিকিৎসা-শাস্ত্র শেখা বা শেখানোর ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। আল্লাহই তাউফিকদাতা।[৩৩৫]

ফতোয়াদাতা : আবদুল্লাহ ইবনু কাউদ, আব্দুল্লাহ ইবনু গাদইয়ান, আব্দুর রাজ্জাক আফিফি, আব্দুল আজিজ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি বাজ।

প্রাপ্তবয়স্কা অর্থাৎ, বালিগা মেয়ের ক্ষেত্রে এটাই বিধান, আর অপ্রাপ্তবয়স্কার ক্ষেত্রে যদি তাকে দেখলে প্রবৃত্ত ও খাহেশাত জাগে তাহলে সে প্রাপ্তবয়স্কার হুকুমে আর যদি তার মাঝে প্রবৃত্তি না জাগে, তাহলে সে গাইরে মাহরাম থেকেও শিখতে পারে।

হিদায়া কিতাবে আছে—

> অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে দেখলে যদি প্রবৃত্তি না জাগে তাহলে তাকে স্পর্শ যাবে, তার দিকে তাকানো যাবে; কারণ, ফিতনার ভয় নেই।

[৩৩৫] লাজনাতুত দায়িমা, ফতোয়া নম্বর : ৩২২৯

হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ *বিনায়ায়* এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে—

কারণ, এমন মেয়ের শরীর সতরের হুকুমে আসে না, তাছাড়া খাহেশাত বা প্রবৃত্তির বয়সে উপনীত হওয়া ছাড়া সাধারণত পুরো শরীর ঢাকা হয় না। এমনটা *মাবসুত* কিতাবেওআছে।[৫৩৬]

আল-বাহরুর রায়িক-এ আছে—

> কোনো মেয়েকে দেখলে যে প্রবৃত্তি জাগে, এর মানদন্ড কী? এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। ব্যাখ্যাকার ও অন্যান্যরা বলেন—'সহিহ মত হলো, সাত বা নয় বছর, এ সবের কোনো বিবেচনা নেই, বরং মূল বিবেচ্য হলো—সহবাসের উপযোগী হওয়া; অর্থাৎ, পূর্ণাঙ্গ আকৃতির হওয়া, হৃষ্টপুষ্ট হওয়া।'[৫৩৭]

এমনটা *হিদায়ার* ব্যাখ্যাগ্রন্থ *ইনায়াতে*ও বলা হয়েছে। *তাবয়িন* কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনু ফজল বলেন—

> নয় বছরের মেয়ে কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই প্রবৃত্তির বয়সে উপনীত, পাঁচ বয়সের মেয়ে কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই প্রবৃত্তির বয়সে উপননীত নয়; আর ছয়, সাত, এবং আট বয়সের মেয়ে যদি হৃষ্টপুষ্ট, পূর্ণ আকৃতির হয়, তাহলে প্রবৃত্তির বয়সে উপনীত, অন্যথায় নয়।[৫৩৮]

আল-মুহিতুল বুরহানি কিতাবের মুসান্নিফও বলেন, ফকিহ আবুল লাইস *আইমানুল ফতোয়া* কিতাবে বলেছেন—

> মাশাইখে কিরাম সাত ও আট বছরের বয়সের ক্ষেত্রে কিছু বলেন নি; তবে সাধারণত নয় বছরের আগে খাহেশাত বা প্রবৃত্তির বয়সে উপনীত হয় না।

সদরে শহিদ রহ. *কিতাবুন নাফাকাতের* ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন—

> এর ওপরই ফতোয়া দেওয়া হবে। শাইখ ইমাম আবু বকর জাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন—মুফতির জন্য কর্তব্য হচ্ছে, তিনি ফতোয়া দেবেন ৭-৮ বছরের মেয়ে হারাম নয়; তবে যদি ফতোয়া জিজ্ঞাসাকারী বলে, সে খুব হৃষ্টপুষ্ট বা মোটা, তাহলে মুফতি সাহেব হারাম হওয়ার ফতোয়া দেবেন।[৫৩৯]

---

[৫৩৬] বিনায়াহ, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ১৩৪

[৫৩৭] আল-বাহরুর রায়িক, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা : ৩৭৬

[৫৩৮] তাবয়িনুল হাকায়িক, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১০৭

[৫৩৯] আল-মুহিতুল বুরহানি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৬৪

তো ফুকাহায়ে কিরামের কথা থেকে জানা গেল—নয় বছরের মেয়ে খাহেশাতপ্রাপ্ত, সে প্রাপ্তবয়স্কার হুকুমেই ধর্তব্য। আল্লাহই ভালো জানেন।

***

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অফিসে নারীদের চাকরি

একজন নারী কোনো মন্ত্রণালয়ে কোনো চাকরি করতে পারবেন কি না, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমরা কিছু বিষয় স্পষ্ট করে নেব। কারণ, প্রথম এখানে দুটো বিষয় রয়েছে—

- ০১. প্রথমত, মন্ত্রণালয় ও অফিসে দায়িত্ব পালন;
- ০২. দ্বিতীয়ত, সেখানে কাজ করার পদ্ধতি এবং সে-জন্য বাহিরে বের হওয়া;

০১. প্রথম বিষয় : মন্ত্রণালয় ও অফিসে দায়িত্ব পালন। মন্ত্রণালয় দুই প্রকার—

- এক. তাফবিজ (প্রস্তাব করার) মন্ত্রণালয়;
- দুই. তানফিজ করার (কার্যকর করা) মন্ত্রণালয়।

আল্লামা মাওয়ারদি রহ. তাফবিজের মন্ত্রণালয়ের পরিচয় এভাবে পেশ করেছেন— খলিফা এমন কাউকে উজির (মন্ত্রী) বানাবেন, যার কাছে যাবতীয় বিষয় নিজ সিদ্ধান্তে পরিচালনা করার, নিজে চিন্তানুযায়ী বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব সোপর্দ করবেন।[২৪০]

খিলাফাতের দায়িত্বের পর এই মন্ত্রণালয়ই সকল প্রশাসন-ব্যবস্থা ও অন্যান্য দায়িত্বের মূল। তাই কুরাইশ বংশ ছাড়া খলিফা হওয়ার সমস্ত শর্তাবলিই এই মন্ত্রালয়ের জন্য শর্ত। যেমনটা *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাতে* আছে। সুতরাং কোনো নারী যেমন খলিফা বা শাসক হতে পারে না, তদ্রুপ এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও গ্রহণ করতে পারবে না।

পক্ষান্তরে তানফিজ করার মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্ব বা শক্তি তাফবিজ করার মন্ত্রণালয়ের চেয়ে কম, এর শর্তাবলিও অল্প। কারণ, এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব খলিফার সিদ্ধান্ত ও পরিচালনার ওপর নির্ভরশীল। এ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী শাসকের মাঝে এবং জনগণ ও প্রশাসকদের মাঝে শুধু মাধ্যম মাত্র, খলিফা যা আদেশ করেন, তা পৌঁছে

---

[২৪০] আল আহকামুস সুলতানিয়্যা : ৫০

েন; যা করতে বলেন, সেটা বাস্তবায়ন করেন; যা ফায়সালা করেন, তা কার্যকর করেন; কাকে প্রশাসক নিযুক্ত করা হচ্ছে, কোন বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য পাঠানো হচ্ছে—এসব বিষয়ে মন্ত্রী খলিফাকে জানান। কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু হলে বা নতুন কিছু ঘটলে খলিফার সামনে পেশ করেন, যাতে খলিফা সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে পারেন, কিছু করণীয় থাকলে বলতে পারেন। মোটকথা, যাবতীয় বিষয় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই মন্ত্রী খলিফার সাহায্যকারী, সে বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে শাসকও নয়, দায়িত্বশীলও নয়।

আল্লামা মাওয়ারদি বলেন—এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও একজন নারী গ্রহণ করতে পারবে না, যদিও এক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য; কারণ, তার মধ্যে প্রশাসনের অর্থ ও দায়িত্ব পাওয়া যায়, আর প্রশাসন-ব্যবস্থা থেকে তো নারীদের নিষেধ করা হয়েছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

(لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة)

সে জাতি কিছুতেই সফল হতে পারবে না, যারা নারীর হাতে (নিজেদের) পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়।[২৫]

মুসনাদু আহমাদের বর্ণনায় আছে—

لا يفلح قوم اسندوا أمرهم الى امرأة

সে জাতি সফল হতে পারবে না, যারা নিজেদের যাবতীয় বিষয় একজন নারীর কাছে সোপর্দ করে।

০২. **দ্বিতীয় বিষয়:** অর্থাৎ কাজ করার পদ্ধতি এবং কাজের জন্য বের হওয়া।

তো, এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বা অফিসের কোনো দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য একজন নারী তখনই বের হতে পারবে, যদি তার কোনো শরয়ি প্রয়োজন থাকে; শরয়ি পর্দাবলম্বন অবস্থায় যদি কোনো পুরুষের সাথে আলাদাভাবে বসতে না হয়, মিশতে না হয়। কিন্তু যদি সে শরয়ি পর্দা ছাড়া বা কোনো পুরুষের সাথে আলাদা বসতে হয়, অথবা অন্যান্য পুরুষদের সাথে একসাথে মিলেমিশে কাজ করতে হয়, তাহলে বের হওয়া হারাম। কারণ, পর্দা ছাড়া বের হলে সতর ঢাকা হয় না। আর তা হারাম। আর যদি কারও সাথে আলাদাভাবে বসতে হয়, অথবা পুরুষদের সাথে মিশতে হয়, তাহলেও তা হারাম। কারণ, ইবনু আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন—

(لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم)

কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীকে নিয়ে একা না থাকে, আর কোনো নারী যেন মাহরাম ছাড়া সফর না করে।[৫৪২]

উকবা ইবনু আমির রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إياكم والدخول على النساء فقال رجل الأنصار يا رسول الله أفرايت الحمو قال الحمو الموت (رواه البخاري باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة)

নারীদের সামনে যাওয়া থেকে সাবধান!

তখন একলোক আনসার সাহাবি দাঁড়িয়ে বলল—ইয়া রাসুলাল্লাহ, দেবর সম্পর্কে আপনি কী বলেন?

নবীজি বললেন—আরে দেবর তো মৃত্যু (রীতিমতো ভয়ঙ্কর!)।[৫৪৩]

ইবনু উমার রা. বর্ণনা করেন, উমার রা. জাবিয়া নামক স্থানে খুতবা দেন, ...দীর্ঘ একটি হাদিস উল্লেখ করেন, যার একটি অংশ হলো—

ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان

সাবধান! কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে একান্তে মিলত না হয়, তাহলে সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে উপস্থিত হয় শয়তান।[৫৪৪]

জাবির রা. বর্ণনা করেন—

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل على المغيبات

দূরে অবস্থান করা স্বামীর স্ত্রীদের ঘরে প্রবেশ করতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিষেধ করেছেন।[৫৪৫]

এ বিষয়ে আরও অনেক হাদিস আছে, তবে যা বর্ণনা করা হয়েছে, এতুটুকুই যথেষ্ট বলে মনে করছি।

আল্লামা কাসানি রহ. বলেন—ঘরে যদি কোনো গাইরে মাহরাম নারী থাকে, তাহলে কোনো পুরুষ তার সাথে একা থাকতে পারবে না। কারণ, এখানে ফিতনার

[৫৪২] সহিহ বুখারি : ৩০০৬; পরিচ্ছেদ, কেউ যুদ্ধ বাহিনীতে নাম লেখালো, অতঃপর তার স্ত্রী হজ করতে বের হয়ে গেল, অথবা তার অন্য কোনো ওজর থাকে, তাহলে কি তাকে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে?

[৫৪৩] সহিহ বুখারি : ৫২৩২, পরিচ্ছেদের শিরোনাম : কোনো পুরষ কোনো নারীর সাথে মিলিত হতে পারবে না, যদি না মাহরাম হয় এবং প্রবাসীদের স্বামীদের স্ত্রীদের কাছে যাওয়া।

[৫৪৪] সুনানুত তিরমিজি : ২১৬৫ অনুচ্ছেদ : জামাআত আবশ্যক।

আশঙ্কা আছে, হারাম কাজে পতিত হওয়ার ভয় আছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—

لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان بدائع الصنائع

কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে একা মিলিত না হয়। কারণ, তখন তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে উপস্থিত হয় শয়তান।[৪৪৬]

সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইমাম নববি রহ. বলেন—যদি কোনো পুরুষ গাইরে মাহরাম নারীর সাথে একা থাকে, সেখানে অন্য কেউ না থাকে তাহলে সমস্ত উলামায়ে কিরামের মতে, এটা হারাম। তদ্রূপ যদি তাদের সাথে এমন কেউ থাকে—যার সামনে লজ্জা পায় না, যেমন : দুই তিন বছরের বাচ্চা, তাহলেও হারাম; কারণ, তার থাকা-না-থাকা সমান।'

এই ফিতনা-ফাসাদের যুগে একা থাকার ব্যাপারে আরও বেশি সতর্ক থাকা চাই। সুতরাং মুসলিম নারী-পুরুষ সবার কর্তব্য—খুব ভালো করে ফিতনা থেকে নিজেদের হিফাজত করা, কখনো যেন কোনো নারীর সাথে একা না থাকা হয়। তারা যেন এ সমস্ত লোকদের দিকে ফিরেও না তাকায় যারা বলে—

سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين

আরে তুমি বলো আর না বলো—সবই আমাদের জন্য সমান।

এরাই মূলত শরিয়তের বিধিবিধানের অবাধ্য হয়, মানুষকে খারাপ কাজ করতে বলে, ভালো কাজ থেকে নিষেধ করে। আয় আল্লাহ, ওদের মাঝে আর আমাদের স্ত্রী, কন্যা ও বোনদের মাঝে পূর্ব-পশ্চিমের মতো পরিমাণ দূরত্ব সৃষ্টি করে দেন।

হে মুসলিম উম্মাহ, আপনারা আল্লাহকে ভয় করেন, আপনাদের মেয়েদের নিজ দায়িত্বে রাখবেন। আল্লাহ তাআলা যে-সব জিনিস করতে তাদের জন্য হারাম করেছেন, যেমন মুখ খোলা রেখে বাহিরে বেপর্দা অবস্থায় বের হওয়া, সৌন্দর্য প্রকাশ করা, আল্লাহ তাআলার দুশমনদের অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিস্টানদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা—এসব থেকে তাদের বাধা দেবেন। মনে রাখবেন—এসব দেখে চুপ থাকলে তাদের সাথে আপনারাও গুনাহর ভাগিদার হবেন, আপনাদেরও আল্লাহর গজব ও অন্যান্য শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এসব অনিষ্ট থেকে যেন পবিত্র রাখেন, আমিন।

এখন সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব হচ্ছে—পুরুষদের সতর্ক করা, যাতে তারা নারীদের সাথে একা না থাকে, তাদের কাছে আসা-যাওয়া না করে, মাহরাম ছাড়া তাদের সাথে সফর না করে; কারণ, এসবই ফিতনা-ফাসাদের মূল মাধ্যম ও কারণ! নবীজি

---

৪৪৬ বাদাইয়ুস সানায়ে, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১১৫

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء

আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীদের চেয়ে ক্ষতিকর ও ভয়ঙ্কর কোনো ফিতনা রেখে যাই নি।[৫৪৭]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন—

إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء رواه مسلم

নিঃসন্দেহে এই দুনিয়া সুমিষ্ট, সবুজ শ্যামল। আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের এখানে স্থলবর্তী করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন আমল করো। অতএব, তোমরা দুনিয়া থেকে সতর্ক থাকো, নারীদের থেকে সাবধান হও; কারণ, বনি ইসরাইলের প্রথম (বিশেষ করে) ফিতনার সূচনা হয়েছিল নারীদের থেকে।[৫৪৮]

মুমিন ভাইয়েরা, এ বিষয়ে অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের ক্ষেত্রেও শিথিলতা করা যাবে না। কারণ, শুরুতেই যদি তাদের এভাবে বেড়ে ওঠানো হয়, তাহলে তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে, বড়ো হওয়ার পরও এ-সব স্বাচ্ছন্দ্যে করতে চাইবে। ফলে তাদের মাধ্যমেও ওই সব ভয়ঙ্কর ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি হবে, যা বড়োদের মাধ্যমে হচ্ছে।

সুতরাং প্রিয় ভাইয়েরা, আল্লাকে ভয় করেন, হারাম থেকে সতর্ক থাকেন, পরস্পর নেককাজ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন, একে অপরকে হক ও হকের ওপর সবর করতে বলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাদেরকেই এ-সব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, নিজেদের আমলের প্রতিদান দেবেন। আর মনে রাখবেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবরকারীদের সাথে রয়েছেন।

নারী-পুরুষ একত্রে এক জায়গায় থাকা হারাম। কারণ, এতে পরস্পরের মাঝে সংযোগ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, একে অপরের দিকে তাকানো যায়, বা ইশারা করা যায় কিংবা কথা বলা যায়। অথবা একবারে পাশাপাশি বসে কোনো প্রতিবন্ধক বা বাধা ছাড়াই যা উভয়ের মাঝে সৃষ্ট সন্দেহ বা ফিতনা তৈরি করতে পারে। এটাও হারাম। কারণ, এতে অনেক সমাস্যা ও নেতিবাচক প্রভাব আছে। যেমন—

---

[৫৪৭] সূত্র : সহিহ বুখারি।

[৫৪৮] সূত্র : সহিহ মুসলিম।

০১। (কুরআন আদেশ করা) দৃষ্টি অবনত রাখতে কষ্ট হয়; খুব সহজেই দৃষ্টির মাধ্যমে চোখের জিনা হয়ে যায়; অথচ আল্লাহ তাআলা মুমিন পুরুষ-নারীদের দৃষ্টি অবনত রাখার আদেশ করেছেন।

০২। এর মাধ্যমে কখনো কখনো নারীর শরীরে স্পর্শ লেগে যায়, যা হারাম। যেমন হাত দিয়ে মুসাফাহা করা যা হারাম, বৈধ নয়। কারণ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له
>
> কোনো পুরুষ না-জায়িজ নারীকে স্পর্শ করার চেয়ে তার মাথায় লোহার সুই দ্বারা আঘাত করা উত্তম।[৫৪৯]

০৩। যখন নারী-পুরুষ এক সাথে থাকে, অনেক ধরনের জিনা হতে থাকে। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বলেছেন—

> আদম-সন্তানের ভাগ্যে জিনার একটি অংশ লিখে দেওয়া হয়েছে, যা সে করবেই, কোনো সন্দেহ নেই। চোখের জিনা হলো (হারাম জিনিস) দেখা, কানের জিনা হলো (হারাম জিনিস) শোনা, জিহ্বার জিনা হলো (হারাম কিছু) বলা, হাতের জিনা হলো (হারাম জিনিস) ধরা, পায়ের জিনা হলো (হারাম জিনিসের দিকে) হাঁটা, (মানুষের অন্তর (কখনো কখনো খারাপ কিছুর) বাসনা করে আকাঙ্ক্ষা করে আর লজ্জাস্থান সে বাসনাকে পূর্ণরূপ দান করে অথবা অপূর্ণই রেখে দেয়।[৫৫০]

এ হাদিস প্রমাণ করে, নারীদের সাথে অবস্থান করা থেকে সতর্ক থাকতে হবে, তাদের আওয়াজ শোনা থেকে, তাদের দিকে তাকানো থেকে, তাদের স্পর্শ করা থেকে, তাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে, তাদের মনে মনে কামনা করা থেকে—এ-সবই জিনার অন্তর্ভুক্ত। (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেন।) অতএব, একজন বুদ্ধিমান পুতঃপবিত্র ব্যক্তিকে তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। যারাই নারীদের মেশে, তারা জিনার এ-সকল প্রকারের অন্তত কোনো একটা কিছু থেকে কখনোই মুক্ত থাকতে পারে না।

০৪। একসাথে কাজ করাটা প্রেম-ভালোবাসার কারণ হয়ে দাঁড়ায়; যার ফলে দ্বীন-দুনিয়া উভয়টাই বরবাদ হয়। কারণ, মন তখন মেয়েটির সাথে একাকার হয়ে যায়, অন্য কোনো কিছু মাথায় আসে না, শুধু তার চিন্তায়-ই ঘুর ঘুর করতে থাকে।

---

[৫৪৯] মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ৭৭১৮ অনুচ্ছেদ, গাইরে মাহরামের সাথে একান্ত মিলিত হওয়া হারাম, ইমাম হাইসামি বলেন—এই হাদিসের সমস্ত রাবি সহিহ।

[৫৫০] সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম। তবে এখানের শব্দ সহিহ মুসলিমের।

কখনো বা উল্টোও হয়। অর্থাৎ, মেয়ের মন ছেলের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এটা মূলত ওই একসাথে কাজ করার এবং দীর্ঘদিন একসাথে থাকার ফল।

০৫। এর ফলে যে ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়ে, তা হলো—আত্মমর্যাদা বিলীন হয়ে যায়; লজ্জা-শরম শেষ হয়ে যায়, চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। বিশ্বাস না হলে পর্দানশীন মেয়েদের অবস্থা লক্ষ্য করে দেখতে পারেন। সাধারণ মেয়েদের তুলনায় তাদের কী পরিমাণ লজ্জা থাকে, বাজার-ঘাটে তারা পুরুষদের থেকে কী পরিমাণ দূরে থাকে। তাদের চরিত্রের দিকে লক্ষ্য করে দেখেন, তাদের অভিভাবকদের অবস্থা লক্ষ্য করে দেখেন, নিজের মাহরামদের মাঝে এ-সমস্ত গুণ থাকার ফলে তারা কতটা মর্যাদা লাভ করে থাকে। অপরদিকে ওই সমস্ত মেয়েদের অবস্থাও দেখেন, যারা রাস্তাঘাটে সৌন্দর্য প্রকাশ করে বেড়ায়, মুখ খোলা রেখে চলে, পরপুরুষদের সামনে চেহারা প্রকাশ করে রাখে, উল্লিখিত কোনো গুণই তাদের মাঝে নেই, কখনো কখনো এসব পাপাচারী মেয়েকে দেখবেন, কোনো গাইরে মাহরাম পাপাচারি ছেলের সাথে এমনভাবে কথা বলে যে, দেখলে আপনার মনে হবে—তারা দুজন স্বামী-স্ত্রী, বিয়ের শরয়ি আকদ (চুক্তি) তাদের মাঝে হয়ে আছে।

মূলত এই ভয়ঙ্কর অধঃপতনগুলো আমাদের মুসলিম দেশে তখনই এসেছে যখন গণতান্ত্রিক আইন-কানুন মুসলিম দেশগুলোতে চলতে শুরু করেছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এর ছোবল থেকে রক্ষা করেন।

ব্যস, উপরের আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি—কর্মক্ষেত্রে গাইরে মাহরাম পুরুষের সাথে কোনো নারী একসাথে কাজ করতে পারবে না, এটা না-জায়িজ। আর এ যুগের জাহিদা ও সভ্যতার দাবি বলে—প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা তো আরও বড়ো খতরনাক বিষয়। এর ফলে বহু নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তিক্ত অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হবে। অশুভ পরিণতি আসবে। তাছাড়া এটা শরয়ি বহু 'নসে'র বিপরীত, যেখানে নারীকে আদেশ করা হচ্ছে ঘরে বসে থাকার, বাড়িতে তার উপযোগী বা ঘরের বা অন্য কোনো কাজ করার।

আল্লাহ তাআলা নারীকে ভিন্ন গঠন ও আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন—যা পুরুষদের গঠনের বিপরীত। সে গঠনের মাধ্যমে তাকে ওইসব কাজ করার উপযোগী করে দিয়েছেন, যা ঘরে বসে করা যায়, অথবা যা নারীরা পরস্পরেই করতে পারে। এ কথার অর্থ হলো, নারীদের যদি পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে আনা হয়, তাহলে তাদেরকে এর মাধ্যমে তার গঠন ও প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে বের করা হলো; যা তার ওপর বিরাট অবিচার, তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ওপর আঘাত, তার ব্যক্তিত্যকে ধ্বংসকরণ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই ধরনের অন্যায়-অবিচার থেকে রক্ষা করেন, আমিন।

নারীর সাথে মুসাফাহা বা হ্যান্ডশেক

পুরুষের সাথে নারীর মুসাফাহা বর্তমান যুগে গাইরে মাহরাম পুরুষের সাথেও নারীদের হ্যান্ডশেক ব্যাপক আকার ধারণ করেছে; যা খ্রিস্টান-ইউপরোপীয়দের থেকে ধার করে নেওয়া। অথচ আমাদেরকে ওদের বিরোধিতা করার আদেশ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত উলামায়ে কিরাম এক্ষেত্রে একমত পোষণ করেছেন—গাইরে মাহরাম নারীর শরীরের কোনো অংশই স্পর্শ করা যাবে না! এটা নাফারমানি। তবে প্রয়োজন হলে ভিন্ন কথা। কারণ, নারীর দিকে তাকানোই যায় না, স্পর্শ করা তো আরও দূরে। আল্লামা সারাখসি রহ. বলেন—প্রয়োজন ছাড়া খাহেশাত ও প্রবৃত্তির সাথে তাকানো কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। প্রয়োজন তখনই হবে যদি কোনো পুরুষকে নারীর বিপক্ষে সাক্ষী হিসাবে ডাকা হয়, অথবা বিচারক যখন তার ওপর বিচার করার জন্য দেখবেন, যদি সে স্বীকারোক্তি দেয় অথবা সাক্ষীরা তাকে চেনার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, এ-অবস্থায় তাকানো যাবে; কারণ, এখানে তাকানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই! আর শরিয়তের বড়ো একটি মলনীতি হলো—

الضرورات تبيح المحظورات

প্রয়োজনের কারণে নিষিদ্ধ বিষয়ও বৈধ হয়ে যায়।

তবে যখন তার দিকে তাকাবে, তখন নিয়ত থাকতে হবে—সাক্ষ্য দেওয়া বা বিচার করা, খাহেশাত পূরণের উদ্দেশ্যে দেখা যাবে না। কারণ, যদি দেখা পরিহার করে সাক্ষ্য বা বিচার করা সম্ভব হতো, তাহলে সেটাই করা হতো; কিন্তু দেখা পরিহার করা অসম্ভব হলেও নিয়তের মাধ্যমে পরিহার করা সম্ভব। তাই নিয়তের মাধ্যমে পরিহার করবে। যেমন—লড়াইয়ের সময় মুসলিমদের সামনে যদি মুশরিকরা শিশুদের রেখে ঢাল বানায়, তাহলে মুজাহিদদের কর্তব্য হচ্ছে লড়াই বন্ধ না করা; বরং তাদের দিকে অস্ত্র চালিয়ে যাবে, তবে উদ্দেশ্য থাকবে মুশরিকরা।

আর যদি কাউকে নারীর সাক্ষী হওয়ার জন্য ডাকা হয়, অথচ সে মনে করে যে, তার দিকে তাকালে প্রবৃত্তি চলে আসবে, তাহলে এ ক্ষেত্রে একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন—এটা জায়িজ; তবে শর্ত হলো—সাক্ষ্য গ্রহণের নিয়তে তাকাবে, খাহেশাত পূরণের জন্য নয়। যেমন জিনার সাক্ষীর জন্য সাক্ষ্যগ্রহণের উদ্দেশ্যে জিনাকারীর সতরের দিকে তাকানো বৈধ। তবে সহিহ মত হলো—এটা বৈধ নয়। কেননা, এখানে প্রয়োজন নেই। কারণ, সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য আরও অনেককে পাওয়া যাবে, যাদের খাহেশাত সৃষ্টি হবে না। পক্ষান্তরে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে জায়িজ; কারণ, সে সাক্ষ্য গ্রহণ করে দায়িত্বটা নিজের ওপর বাধ্য কর ফেলেছে। তাছাড়া সে ছাড়া সাক্ষ্য দেওয়ার আর কেউ নেই।[৫৫১]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

> يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ ..
>
> হে নবী, যখন মুমিন নারীরা আপনার কাছে আসবে এই মর্মে বাইআত করার জন্য, তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরিক করবে না চুরি করবে না, জিনা করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না...।[৫৫২]

এই আয়াতের তাফসিরে আল্লামা ইবনু কাসির রহ. বলেন—ইমাম বুখারি রহ. বর্ণনা করেন উরওয়া থেকে যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়িশা রা. তাকে বলেন, যে সকল নারীরা (মক্কা থেকে) হিজরত করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসত, তিনি তাদের এই আয়াতের মাধ্যমে (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ) —থেকে (غَفُورٌ رَّحِيمٌ) আয়াতের শেষ পর্যন্ত যাচাই-বাছাই করতেন। উরওয়া বলেন, উম্মুল মুমিনিন আয়িশা সিদ্দিকা রা. বলেছেন—

> তো, যে নারী এই শর্তগুলো মেনে নিত, তিনি তাদেরকে বলতেন—(قد بايعتك كلاما) তোমার কথার মাধ্যমে তোমার বাইআত গ্রহণ করে নিলাম। আল্লাহর কসম! তার হাত কখনোই কোনো নারীর হাত স্পর্শ করে নি; তিনি তাদের বাইআত গ্রহণ করতেন শুধু কথার দ্বারা যে—আমি এ-বিষয়ে তোমার বাইআত কবুল করলাম।[৫৫৩]

ইমাম আহমাদ রহ. রাকিকার মেয়ে উমাইমা রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন—

---

[৫৫১] সূত্র : আল-মাবসুত, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১৫৪

[৫৫২] সূরা মুমতাহিনা, আয়াত : ১২

[৫৫৩] সহিহ বুখারি : ২৭১৩

আমি কয়েকজন নারীর সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআতগ্রহণের উদ্দেশ্যে আসি। আমরা বললাম—আল্লাহর রাসুল, আমরা আপনার হাতে বাইআতগ্রহণ করছি এই মর্মে যে, আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করব না, চুরি করব না, জিনা করব না, নিজেদের রচিত অপবাদ রটাবো না, কোনো ভালো কাজে আপনার অবাধ্যতা করব না।

নবীজি বললেন—তোমরা যা করতে পারো এবং যা সাধ্যে রাখো সে বিষয়ে।

আমরা বললাম—আমাদের চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই আমাদের প্রতি অধিক দয়াবান, আসেন, আমরা আপনার হাতে বাইআত গ্রহণ করি, হে আল্লাহর রাসুল!

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—আমি নারীদের সাথে হাত মেলাই না!

একজন নারীকে আমার এই কথা বলা—'বাইআত কবুল করলাম'—এটা একশজন নারীকে বলার মতো।[৫৫৪]

ইবনু হাজার রহ. বলেন—এ হাদিসের দ্বারা গাইরে মাহরাম নারীর শরীর স্পর্শ করা হারাম বলা হয়েছে।[৫৫৫]

আমি বলি—জানা বিষয় যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুনাহ থেকে মাসুম ছিলেন। তাছাড়া বাইআত গ্রহণের—এক ধরনের চুক্তি ছিল—সময় পুরুষরা তাঁর সাথে হাত মিলাত, তা সত্ত্বেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের সাথে হাত মেলানো থেকে বিরত থেকেছেন। এমনকি স্পষ্টভাবে বলেও দিয়েছেন যে, নারীদের সাথে পুরুষের হাত মিলানো হারাম যাতে তার পরবর্তী খলিফারা তাকে এ ক্ষেত্রে অনুসরণ না করে। এই মাসআলার ক্ষেত্রে চারও মাজহাবের উলামায়ে কিরাম একমত পোষণ করেছেন যে—হাত মেলানো হারাম। হ্যাঁ, শুধু এ-যুগে একটা কথা পাওয়া যায় যে, গাইরে মাহরাম নারীর সাথে হাতমেলানো বৈধ, সামনে এ বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হবে। মুসাফাহার বিষয়ে ফকিহ আলিমদের অভিমত—

০১. হানাফি উলামায়ে কিরামের অভিমত : 'আদদুররুল মুখতারে' আছে (যার দিকে তাকানো বৈধ) পুরুষ হোক বা নারী (তাকে স্পর্শ করাও বৈধ) যদি নিজেরে বিষয়ে খাহেশাতের আশঙ্কা না করে, আর যদি আশঙ্কা করে কিংবা সে বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দে থাকে তাহলে দেখাও জায়িজ নেই, স্পর্শ কারাও জায়িজ নেই (তবে যদি

---

[৫৫৪] মুসনাদু আহমাদ : ২৭০০৮

[৫৫৫] ফাতহুল বারি, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ২০৪

গাইরে মাহরাম হয়) তাহলে তার চেহারা হাত কিছুই স্পর্শ করা বৈধ নয় যদিও খাহেশাতের ভয় না করে কারণ এটা আরও বেশি খতরনাক। এ'মাসআলা যুবতী নারীর ক্ষেত্রে। আর যদি বৃদ্ধা হয় যাকে দেখলে খাহেশাত সৃষ্টি হয় না তাহলে তার সাথে মুসাফাহা করতে পারবে, তার হাত স্পর্শ করতে পারবে যদি খাহেশাতের আশঙ্কা না করে'... আল্লামা ইবনু আবেদীন বলেন আরেকটা মত আছে (বৃদ্ধার সাথে মুসাফাহা করার ক্ষেত্রে) পুরুষকেও এমন হতে হবে যাকে দেখলে কাম প্রবৃত্তি সৃষ্টি হয় না (আল্লামা কাহাসতানি, কিরমানী রহ. থেকে বর্ণনা করে বলেন) 'যাখীরা' কিতাবে আছে যদি বৃদ্ধা এমন হয় যাকে দেখলে কামপ্রবৃত্তি সৃষ্টি হয় না, তাহলে তার সাথে মুসাফাহা করা যাবে, তার হাত স্পর্শও করা যাবে, আর যদি বৃদ্ধ হয় যে নিজের ব্যাপারে এবং নারীর ব্যাপারে খাহেশাতের আশঙ্কা না করে তাহলে নারীর সাথে মুসাফাহা করা যাবে। আর যদি নিজের ব্যাপারে অথবা নারীর ক্ষেত্রে আশঙ্কা করে তাহলে এটা থেকে বিরত থাকতে হবে।

তো, আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ.-এর কথা থেকে জানা যায়—বৃদ্ধা নারী স্পর্শ করার ক্ষেত্রে দুটো মত পাওয়া যায় :

০১. একমত অনুযায়ী মুসাফাহা জায়িজ, যদি তাদের একজন এমন হয়, যাকে দেখলে কামপ্রবৃত্তি সৃষ্টি হয় না।

০২. আরেক মতনুযায়ী প্রত্যেককেই এমন হতে হবে যাকে দেখলে, দুজনের কারওরই কামপ্রবৃত্তি সৃষ্টি হয় না। তবে দ্বিতীয় মতই অগ্রাধিকারযোগ্য। বিশেষ করে এই ফিতনা-ফাসাদের যুগে। কারণ, যে স্পর্শ করবে তার মনে যদিওবা কামপ্রবৃত্তি না থাকে, কিন্তু অপরজনের ক্ষেত্রে তো আশংকা আছে।

ইমাম সারাখসি রহ বলেন—যদি নারীর কামপ্রবৃত্তি সৃষ্টি হওয়ার আশা থাকে, তাহলে তার সাথে মুসাফাহা করা যাবে না। যেমন, যদি নিজের ক্ষেত্রে আশঙ্কা থাকে।[illegible]

আল্লামা মারগিনানি রহ. তার প্রখ্যাত কিতাব *হিদায়াতে* উল্লেখ করেন—পুরুষ গাইরে মাহরাম, নারীর হাত মুখ কিছুই স্পর্শ করতে পারবে না। যদিও খাহেশাতের আশঙ্কা না করে।

আল্লামা সামারকান্দি বলেন—নারী যদি যুবতি হয় তাহলে খাহেশাত থাকুক বা না থাকুক, উভয় অবস্থাতেই স্পর্শ করা হারাম, আর যদি বৃদ্ধা নারী হয় তাহলে খাহেশাতের ভয় না থাকলে তার সাথে মুসাফাহা করা যাবে আর যদি বৃদ্ধা নারীর খাহেশাত থাকে, তাহলে মুসাফাহা করা যাবে না। যদিও পুরুষের খাহেশাত না থাকে।[illegible]

[illegible] সূত্র : আল-মাবসুত, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১২৪

[illegible] তুহফাতুল ফুকাহা, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা ৩৩৪

হাফিজ জাইলায়ি রহ. বলেন—পুরুষ, নারীর হাত স্পর্শ করতে পারবেনা যদিও ফাহেশতের ভয় না থাকে কারণ এটা হারাম তদ্রূপ, এখানে কোনো প্রয়োজনও নেই. না করাতে অনেক কষ্ট মুছিবত চলে আসবে তাও নয়।[158]

০২. মালিকি মাজহাবের উলামায়ে কিরামের অভিমত : আল্লামা বাজি রহ. বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إني لا أصافح النساء

আমি নারীদের সাথে মুসাফাহা করি না।

অর্থাৎ, আমার হাতের সাথে তাদের হাত লাগাই না, নবীজি একথার মাধ্যমে—তবে আল্লাহই ভালো জানেন—(স্পর্শ করা থেকে) বিরত থাকতে চাচ্ছেন। মানে, পুরুষদের বাইআতগ্রহণ ছিল হাতে হাত রাখার মাধ্যমে, তো, নবীজি নারীদের বাইআতগ্রহণের ক্ষেত্রে হাতে হাত রাখা থেকে নিষেধ করেছেন। কারণ, তখন তাদের স্পর্শ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে (যা হারাম)।[159]

আসহালুল মাদারিক নামক কিতাবে আছে, কোনো নারীর সাথে পুরুষের মুসাফাহা করা বৈধ নয়, যদিও পরিচিতির জন্য করা হয়। কারণ, শুধু দেখাটাই বৈধ (এর বেশি কিছুতেই নয়)।[160]

০৩. শাফিয়ি মাজহাবের উলামায়ে কিরামের অভিমত : ইমাম নববি রহ. বলেন—সুন্দর লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী বালকের সাথেও মুসাফাহা করা থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ তার দিকে তাকানোই হারাম। আমাদের (মাজহাবের) উলামায়ে কিরাম বলেন—যার দিকে তাকানো হারাম, তাকে স্পর্শ করাও হারাম; বরং স্পর্শ করা তো আরও বেশি খতরনাক। কারণ, গাইরে মাহরাম নারীর দিকে তাকানো তখনই জায়িজ, যদি তাকে বিয়ে করতে চায় অথবা বেচাকেনা, লেনদেন বা এই জাতীয় কিছু করতে চায়; কিন্তু এ-সবের কোনো অবস্থাতেই স্পর্শ করা জায়িজ নয়।[161]

হাফিজ ইবনু হাজার রহ.-ও বলেন—হাদিসে বর্ণিত মুসাফাহা করা থেকে (দুজনের সাথে মুসাফাহা) বাদ দেওয়া হবে :

- ০১. গাইরে মাহরাম নারীর সাথে, এবং;
- ০২. সুশ্রী লাবণ্যময় সুন্দর বালকের সাথে মুসাফাহা করা।[162]

---

[158] তাবয়িনুল হাকায়িক, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৮

[159] আল-মুনতাকাযা, শারহুল মুআত্তা, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩০৮

[160] আসহালুল মাদারিক, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৭০

[161] আল-আজকার : ২২৮

হাফিজ ইরাকি রহ. বলেন—আয়িশা রা.-এর হাদিসে আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন স্ত্রী ও মালিকানাধীন দাসী ছাড়া কারও হাত স্পর্শ করেন নি, না-বাইআতগ্রহণের সময়ে, আর না অন্য সময়ে। তিনি মাসুম ও সন্দেহমুক্ত হওয়ার পরও যদি নারীদের সাথে মুসাফাহা না করেন, তাহলে অন্যান্যদের কর্তব্য তো আরও বেশি বিরত থাকা। বাহ্যিকভাবে এটাই প্রতীয়মাণ হয় যে, হারাম হওয়ার কারণেই তিনি স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতেন।[২৬৩]

০৪. হাম্বলি মাজহাবের উলামায়ে কিরামের অভিমত : *কাশফুল কিনা'* কিতাবে আছে—গাইরে মাহরাম যুবতী নারীর সাথে মুসাফাহা করা বৈধ নয়। কারণ, এটা তাকানো চেয়েও ক্ষতিকর ও বিপদজনক আর যদি বৃধ্ব হয় তাহলে মুসাফাহা করা বৈধ।[২৬৪]

আল-ইনসাফ ফি মারিফাতির রাজিহ মিনাল খিলাফ কিতাবে আছে—ইমাম আহমাদ রহ. নারীদের সাথে মুসাফাহা করাকে অপছন্দ করেছেন; বরং এক্ষেত্রে খুব কঠোরতা করে মুহরিম ব্যক্তির জন্যও মাকরুহ বলেছেন। তবে পিতার জন্য জায়িজবলেছেন।[২৬৫]

আর রাওজুন নাদিয়্য কিতাবে আছে—গাইরে মাহরাম যুবতি নারীর সাথে মুসাফাহা করাবৈধনয়।[২৬৬]

যারা এই মতের বিরোধিতা করেছেন, তাদের অভিমত : তাকিয়ুদ্দিন নাবাহানি তার কিতাব *আন-নিজামুল ইজতিমায়ি ফিল ইসলামি*তে বলেন—পুরুষ নারীর সাথে মুসাফাহা করতে পারে, নারী পুরুষের সাথে মুসাফাহা করতে পারে, এ ক্ষেত্রে কোনো বাধা বা প্রতিবন্ধকতা নেই।[২৬৭]

তিনি আরও বলেন—বাইআতগ্রহণ হাতের মাধ্যমেও হতে পারে, লেখার মাধ্যমেও হতে পারে, এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো প্রার্থক্য নেই, পুরুষ যেমন খলিফার হাতে বাইআত করতে পারে, নারীরাও হাতে হাত রেখে বাইআতগ্রহণ করতে পারবে।

তার মতের পক্ষে একাধিক দলিল আছে। আমরা সেই দলিলগুলো উল্লেখ করার পাশাপাশি তার খণ্ডনও উল্লেখ করব—

---

[২৬৩] তারহুত তাসরিব, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪৫-৪৫

[২৬৪] কাশফুল কিনা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৫৪

[২৬৫] আল-ইনসাফ ফি মারিফাতির রাজিহ মিনাল খিলাফ, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ৫৯

[২৬৬] আর রাওজুন নাদিয়্যু, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৪

...- ০১ : তিনি উম্মু আতিয়্যা রা.-এর হাদিস থেকে যা বুঝতে পেরেছেন, এই তার দলিল। উম্মু আতিয়্যা বলেন—

আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত করি, তখন নবীজি আমাদেরকে (أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا) এই আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন। তিনি আমাদের বিলাপ করতে নিষেধ করেন। তখন আমাদের সাথে থাকা এক নারী তার হাত গুটিয়ে বলল—অমুক নারী তো আমাকে একটা কাজে সাহায্য করেছিল, এখন আমি তাকে তার প্রতিদান দিতে চাই।

নবীজি কিছুই বললেন না তাকে। তারপর সে গিয়ে আবার ফিরে এলো। পরবর্তী সময়ে উম্মু সুলাইম, উম্মুল আলা, আবু সুবরার কন্যা—যিনি মুআজ রা.-এর স্ত্রী, অথবা আবু সুবরার কন্যা ও মুআজ রা.-এর স্ত্রী ছাড়া কোনো নারী—(বাইআতকৃত বিষয়গুলো) পূর্ণ করে নি।[৫৬৮]

তো নাবাহানি বলছেন—এই হাদিস প্রমাণ করে যে, নবীজি নারীদের হাতে হাত রেখে বাইআত গ্রহণ করেছেন। যার প্রমাণ, উম্মু আতিয়্যা রা. এই হাদিসে বলেছেন—'আমাদের এক নারী তার হাত গুটিয়ে ফেলে'। কারণ, এই কথার অর্থ হচ্ছে, সাথে থাকা অন্যান্য নারীরা নিজেদের হাত গুটিয়ে নেন নি। আর এখানেই বোঝা যায় যে—তারা নবীজির হাতে হাত রেখে বাইআত গ্রহণ করেছেন।

একাধিক দিক থেকে এই দাবির উত্তর দেওয়ার সুযোগ আছে। আমরা তিনটি দিক উল্লেখ করে এই দাবির উত্তর দিচ্ছি, ইন শা আল্লাহ—

প্রথম দিক : হাদিসে বর্ণিত, হাত গুটিয়ে নেওয়ার অর্থ, বিলম্ব করে বাইআত কবুল করা। যেমন, হাফিজ বদরুদ্দিন আইনি বলেন—হাত গুটিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্য : 'বিলম্ব করে বাইআত কবুল করা।'[৫৬৯] এর উদাহরণ হলো, মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন—(ويقبضون أيديهم - আর তারা নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখে।) এখানে উদ্দেশ্য : 'আল্লাহর রাস্তায় তাদের দান না করা।' আল্লামা শামসুদ্দিন বারমাবি বলেন—এখান থেকে এটা উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে না যে, তারা হাত রেখেই বাইআত করেছিল। কারণ, এটা দ্বারা উদ্দেশ্য তারা বাইআতের সময় হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেছে, স্পর্শ করে নি।[৫৭০]

দ্বিতীয় দিক : আমরা যদি ধরেও নিই যে, হাতে হাত রেখে ওই বাইআত হয়েছিল, তাহলে আমরা উত্তরে বলব—হাতে হাত রাখার মাঝে অন্য কোনো কিছু আড়াল

---

[৫৬৮] সহিহ বুখারি : ৭২১৫, অনুচ্ছেদ : নারীদের বাইআত গ্রহণ।

[৫৬৯] উমদাতুল কারি, খণ্ড : ১৯, পৃষ্ঠা : ২৩১

[৫৭০] আল-লামিউস সহিহ বি-শারহিল জামিয়িস সহিহ, খণ্ড : ১৭, পৃষ্ঠা : ১৫৮

ছিল; যেমনটা হাফিজ আইনি রহ. *উমদাতুল কারিতে* পরস্পর বিরোধপূর্ণ বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান দিতে গিয়ে বলেছেন।

তৃতীয় দিক : নারীদের বাইআতগ্রহণে যতগুলো সুস্পষ্ট ও সুসাব্যস্ত বর্ণনা পাওয়া যায়, সবগুলো বর্ণনা থেকে এই কথাই জানা যায় যে—নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের সাথে হাত লাগান নি। যেমন—

এক. আম্মাজান আয়িশা রা.-এর হাদিস গিয়েছে, যেখানে হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি বলেছেন—

لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام

> আল্লাহর কসম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত কখনো কোনো (গাইরে মাহরাম) নারীর হাত স্পর্শ করে নি; তবে, তিনি শুধু কথার মাধ্যমে তাদের বাইআত করেছেন।

দুই. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর থেকে বর্ণিত—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইআতের ক্ষেত্রে নারীদের সাথে মুসাফাহা করতেন না (হাতে হাত রাখনে না)।[৫৭১]

তিন. উমাইমা বিনতু রাকিকা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন—

> আমি কয়েকজন নারীর সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইআত গ্রহণ করার জন্য আসি। তখন নবীজি আমাদের বললেন—(তোমরা বাইআত গ্রহণ করো) যে বিষয় তোমরা করতে পার ও সাধ্য রাখ। আমি নারীদের সাথে মুসাফাহা করি না।[৫৭২]

তো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে যা বললেন তা উম্মু আতিয়্যা রা.-এর ব্যাখ্যার (যা নাবাহানি করেছেন) বিপরীত। আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও বাণী সর্বাবস্থায় অন্য যে কারও কথার ওপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

এই সমস্ত সহিহ ও সুস্পষ্ট দলিলগুলো প্রমাণ করে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইআতের ক্ষেত্রে কোনো নারীর সাথে মুসাফাহা করেন নি। সুতরাং মুসলিম হলে তার জন্যও উচিত নয়, এই দলিল ছেড়ে দিয়ে উম্মু আতিয়্যা রা.-এর হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা গ্রহণ করবে। তাছাড়া ওই হাদিসে তো মুসাফাহা বা হাত স্পর্শ করার কথা উল্লেখই নেই।

শাইখ আলবানি রহ. বলেন—মোটকথা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলঅইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো সহিহ সূত্রে একথা বর্ণিত হয় নি যে, তিনি কখনো কোনো নারীর সাথে মুসাফাহা করেছেন। এমনকি বাইআতের ক্ষেত্রেও না, সাক্ষাৎ গ্রহণের

---

[৫৭১] মুসনাদু আহমাদ : ৬৯৯৮

[৫৭২] সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৮৭৪, অনুচ্ছেদ : নারীদের বাইআতগ্রহণ।

সময় মুসাফাহা করা তো দূরের কথা; কিন্তু নারীর সাথে মুসাফাহা জায়িজ করার জন্য মুসাফাহার দলিল হিসাবে পেশ করা। যে-সকল সহিহ হাদিসে মুসাফাহার উল্লেখ নেই, সেগুলো এড়িয়ে যাওয়া, নিশ্চয়ই এখানে কোনো স্বার্থ আছে,যা কোনো মুমিন মুখলিস বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়।[৭৭৩]

দলিল - ০২ : নাবাহানি বলেন—নারীর হাত তার সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, তদুপরি শাহেশাত না থাকলে তাকানো হারাম নয়। সুতরাং তার সাথে মুসাফাহা করাও হারাম নয়।[৭৭৪]

এই দাবির উত্তর : আহলে ইলমের নিকট নারীর হাত সতর না হওয়া এটা প্রমাণ করে না যে, নারীকে স্পর্শ করা, তার সাথে মুসাফাহা করা জায়িজ; বরং এ-ব্যাপারে তো উলামায়ে কিরামের ইজমা আছে যে, প্রয়োজন ছাড়া নারীর, চেহারা, হাত স্পর্শ করা হারাম। যদিও এই দুটো অঙ্গ সতরভুক্ত নয়, যেমনটা ইতিপূর্বে উলামায়ে কিরামের অভিমতে আলোচিত হয়েছে। প্রার্থক্য শুধু এতুটুকু যে প্রয়োজনের কারণে হাত ও চেহারা খুলে রাখা যায়, না-হয় তাদের জন্য কষ্ট হয়ে যাবে; কিন্তু এই প্রয়োজনটা স্পর্শ করার ক্ষেত্রে নেই।

দলিল - ০৩ : ইবনু কাসির রহ. তার তাফসিরে ইবনু আব্বাস রা. থেকে একটা দীর্ঘ হাদিস উল্লেখ করেন। যারা নারীর সাথে মুসাফাহাকে জায়িজ বলেন, তারা এই হাদিস দিয়ে তাদের পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেন। হাদিসটির কিছু অংশ হলো—

> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নারীদের বাইআত গ্রহণ করছিলেন, তখন আবু সুফইয়ানের স্ত্রী হিন্দার মুখ আবৃত ছিল; কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে চিনে ফেলেন। নবীজি তাকে ডাক দিলে হিন্দা নবীজির হাত ধরে ফেলে।
>
> নবীজি তাকে বলেন—তুমি সেই হিন্দা!
>
> তখন হিন্দা বলে—আল্লাহ তো পূর্বের সব গুনাহ মাফ কর দিয়েছেন!
>
> ফলে রাসুলুল্লাহ সাললাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ছেড়ে দেন। তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকেন।[৭৭৫]

এই দাবির খণ্ডন : যারা এই হাদিস দিয়ে দলিল পেশ করেছেন, তারা মূলত ইবনু কাসির রহ.-এর মন্তব্য ছাড়াই দলিল পেশ করেছেন—যা আমানতদারিতার পরিপন্থি। আল্লামা ইবনু কাসির রহ. যখন এই হাদিসটি উল্লেখ করেন, তখন হাদিস

---

[৭৭৩] সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহা : ২৫৫

[৭৭৪] আন-নিজামুল ইজতিমায়ি ফিল ইসলাম : ৩৫

[৭৭৫] তাফসিরু ইবনি কাসির, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১২৬

সম্পর্কে চুপ থাকেন নি, বরং হাদিসের দুর্বলতা ও সাব্যস্তহীনতা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করে বলেন—এই হাদিসটি 'গরিব', তাছাড়া এর কিছু অংশ 'মুনকার'! আল্লাহই ভালো জানেন।

কারণ, আবু সুফইয়ান ও তার স্ত্রী যখন ইসলাম গ্রহণ করন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এড়িয়ে যান নি; বরং তাদের প্রতি আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা প্রকাশ করেছেন। এতটুকুই বিষয়ই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে উল্লেখ করার ছিল।

দলিল - ০৪ : তাদের আরেকটা দলিল, আনাস ইবনু মালিক রহ.-এর হাদিস। তিনি বলেন—

> إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينفع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها رواه ما جاء باب البراءة من الكبر والتواضع
>
> মদিনার লোকেদের দাসীরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ধরে রাখত। অতঃপর তার হাত ধরে মদিনার যেখানে ইচ্ছা প্রয়োজনে যেত, এর আগ-পর্যন্ত নবীজি তার হাত ছাড়তেন না।[৫৭৬]

এই দাবির উত্তর : এই দাবির উত্তরে আমরা তিনটি বিষয় উপস্থাপন করব—

এক. এই হাদিস 'জয়িফ'। কারণ, এই হাদিসের সনদে আলি ইবনু জায়িদ ইবনি জাদআন আছেন, যিনি দুর্বল রাবি। 'মাজমাউজ জাওয়ায়িদ' কিতাবে আল্লামা হাইসামি রহ. এমনটাই বলেছেন।

দুই. হাত ধরা দ্বারা এর 'আবশ্যকীয়' অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ অনুগত হওয়া, কোমলতা প্রদর্শন করা (কারণ কেউ যখন কারও হাত ধরে তখন সে তার অনুগত হয়ে যায়, সে যে দিকেই নিয়ে যায়, ওই দিকেই যায়)। ইবনু হাজার রহ. এমনই বলেছেন।[৫৭৭]

তিন. এই হাদিস দ্বারা উদ্দেশ্য কি, সেটা বোঝার জন্য আমরা ইমাম আহমাদ রহ.-এর বর্ণনা দেখতে পারি, তার বর্ণনায় আছে—

> إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة تجي تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينفع يده من يدها حتى تذهب به حيث شال ..
>
> মদিনাবাসী মেয়েরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁর হাত ধরে রাখত। নবীজি তাদের হাত ছাড়তেন না, যতক্ষণ

---

[৫৭৬] সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪১৭৭, অনুচ্ছেদ : অহংকার ও বিনয় থেকে মুক্ত হওয়া।

[৫৭৭] ফাতহুল বারি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৪৯০

না তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে নবীজিকে নিয়ে যায়।[২৭৮]

এখানে হাদিসে وليدة শব্দ আছে (পূর্বের হাদিসে أمة শব্দটি ছিল যার অর্থ : দাসী) যার অর্থ ছোটো মেয়ে শিশু ভাষাবিদ ফায়ুমি বলেন, الوليد। অর্থ নবজাতক বহুবচন ولدان শব্দটি দাসী অর্থেও ব্যবহৃত হয়, তখন এর বহুবচন হয় ولائد। সুতরাং পূর্বের হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না, যে গাইরে মাহরাম পুরুষের সাথে নারী মুসাফাহা করতে পারবে।

তাছাড়া মাকাল ইবনু ইয়াসার রা.-এর হাদিসে এসছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> لأي يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من اي بس امرأة لا تحل له
>
> তোমাদের কারও মাথায় লোহার সুই দিয়ে আঘাত করা উত্তম এমন নারীর স্পর্শ করা থেকে যে তার জন্য হালাল নয়।[২৭৯]

আল্লাহ তাআলাই সঠিক বিষয়ে অধিক অবগত।

নির্ভরযোগ্য বড়ো বড়ো কিতাবের আলোকে এই ইলমি আলোচনা জানার পর একজন গবেষক—যিনি ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখেন, নিজের মত ও প্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকেন—এই আলোচনায় উল্লিখিত শরয়ি দলিলগুলো মেনে নিতে বাধ্য। এরপর তিনি আর কোনো সন্দেহ বা সংশয়ের মাঝে থাকবেন না যে, গাইরে মাহরাম নারীর সাথে মুসাফাহা করা না-জায়িজ, তাছাড়া সমস্ত উলামায়ে কিরাম এক্ষেত্রে একমতও পোষণ করেছেন। কেউ এ থেকে পিছপা হন নি। এই রকম মেনে নেওয়াই মুমিনদের শান, যারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্ণ অনুসরণ করতে চায়।

মাহারাম বা স্বামী ছাড়া নারীর সফর করা

বর্তমান যুগের আরেকটা রোগ হলো—এ যুগের নারীরা মাহরাম বা স্বামী ছাড়া সফর করে। অথচ উলামায়ে কিরাম সবাই একমত যে, মাহরাম বা স্বামী ছাড়া নারী সফর করা নাজায়িজ। এর স্বপক্ষে বহু 'নস' আছে। কয়েকটি উল্লেখ করা হলো—

এক। আবু সায়িদ খুদরি রা.-এর হাদিস, যিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ১২টি গাজওয়ায় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে চারটি বাণী শুনেছি, যা আমার খুব মনঃপূত

---

[২৭৮] মুসনাদু আহমাদ : ১২৭৮০

[২৭৯] মুজামুত তাবারানি, তার সব রাবি সহিহ, মাজমাউজ জাওয়ায়িদ, আল্লামা হাইসামি, পরিচ্ছেদ [illegible] মিলিত হওয়ার নিষেধ করা।

হয়েছে। নবীজি বলেন—

- ০১. কোনো নারী স্বামী বা মাহরাম ছাড়া দুই দিনের দূরত্বে সফর করতে পারবে না।
- ০২. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এ দুই দিনে রোযা রাখা যাবে না,
- ০৩. সূর্য উদয়ের আগ পর্যন্ত ফজরের নামাযের পর কোনো নামাজ পড়া যাবে না।
- ০৪. আর সূর্যাস্তের সময় মাগরিবের নামাজ পড়া যাবে না। যতক্ষণ না তা ডুবে যায়।[৫৮০]

দুই। ইবনু আব্বাস রা.-এর হাদিস, তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন—

لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم ..

কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে একান্তে মিলিত না হয়। আর কোনো নারী যেন মাহরাম ছাড়া সফর না করে।[৫৮১]

তিন। ইবনু উমার রা. বর্ণনা করেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لا تسافر المرأة ثلاث أيام إلا مع ذي محرم

কোনো নারী যেন মাহরাম ছাড়া তিন দিনের দূরত্বে সফর না করে।[৫৮২]

চার। আবু হুরাইরা রা. বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

ما يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة

যে নারী আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন মাহরাম ছাড়া একদিন ও একরাতের দূরত্বে সফর না করে।[৫৮৩]

পাঁচ। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রা. বর্ণনা করেন—

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استند إلى بيت فوعظ الناس وذكرهم،
قال لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل ولا بعد الصبح حتى تطلع
الشمس ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مسيرة ثلاث...

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা ঘরের দিকে হেলান দিয়ে লোকদের উপদেশ দেন; নবীজি বলেন—কেউ যেন আসরের

---

[৫৮০] সহিহ বুখারি : ১৯৯৫

[৫৮১] সহিহ বুখারি : ৩০০৬

[৫৮২] সহিহ বুখারি : ১০৮৬

[৫৮৩] সহিহ বুখারি : [illegible]; অনুচ্ছেদ : কত রাকাত নামাজ কসর করবে।

পর রাত নামা পর্যন্ত নামাজ না পড়ে, ফজরের পর সূর্যদয়ের আগ পর্যন্ত (নামাজ না পড়ে) আর কোনো নারী যেন মাহরাম ছাড়া তিন (দিনের) দূরত্বে সফর না করে।[৫৮৪]

ছয়। আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لا تسافر امرأة بريدا إلا ومعها ذو محرم

কোনো নারী যেন মাহরাম ছাড়া কয়েক মাইলের দূরত্বে সফর না করে।[৫৮৫]

সাত। ইবনু আব্বাস রা. বলেন, রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو مع ذي محرم

স্বামী বা মাহরাম ছাড়া কোনো নারী যেন তিন মাইলের দূরত্বে সফর না করে।

তখন ইবনু আব্বাস রা.-কে বলা হলো—লোকেরা তো বলে, তিন দিন।

তিনি বলেন—এটা নিছক তাদের ধারণাবশত।[৫৮৬]

ইবনু বাতাল বলেন—দূরত্বের পরিমাণের ক্ষেত্রে হাদিসের বিভিন্নতা অর্থাৎ কোথাও একদিন, একরাত, কোথাও তিন দিন কোথাও বা দুই দিন উল্লেখ আছে। তো এই মতভিন্নতার কারণ হলো—প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিয়েছেন; যেমন—একজন প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করল, মাহরাম ছাড়া কি কোনো নারী এক দিন ও এক রাতের দূরত্বে সফর করতে পারে?

তখন নবীজি বললেন—না।

আবার আরেকজন দুই দিনের দূরত্বের সফর নিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

তখন নবীজি বললেন—না।

আবার আরেকজন তিন দিনের বিষয়ে বিজ্ঞাসা করলেও নবীজি বললেন—না।

এভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রত্যেকে যা শুনেছে তাই বর্ণনা করেছেন। এটা পরস্পর বিরোধপূর্ণ বর্ণনাও নয়, রহিত ও নয়। কারণ, এখানে মূল বিষয়টি হলো, মহরাম ছাড়া নারীর সফর কোনোভাবেই বৈধ নয়, তদ্রূপ মাহরাম ছাড়া অন্য কারও সাথে একান্তে থাকাও বৈধ নয়। কেননা, 'ইল্লত' ও 'কারণের' ক্ষেত্রে এক রাত ও তিন রাত উভয়টাই সমান। ইল্লত বা কারণ হলো, এক রাত ও

---

[৫৮৪] মুসনাদু আহমাদ : ৬৭১২

[৫৮৫] সুনানু আবি দাউদ : ১৭২৫

[৫৮৬] মুজামুত তাবারানি, কাবির : ১২৬৫২

তিন রাতের ক্ষেত্রেই মহরাম ছাড়া রাতের অন্ধকারে রাত্রিযাপন বা একান্তে মিলিত হওয়া, সফরসঙ্গীদের ঘুমিয়া যাওয়া, পাওয়া যাচ্ছে, যার ফলে তৃতীয় পক্ষ হয়ে শয়তান উপস্থিত হয়। তাই (খারাপ কাজের) মাধ্যম ও উপায় এবং উপকরণটা মজবুত হয়ে গেল। জ্ঞান ও দ্বীনের ক্ষেত্রে অপরিপক্ক নারীদের ব্যাপারে আশঙ্কাও বেড়ে গেল। (তাই তিন দিনের ক্ষেত্রেও জায়িজ নেই, একদিনের ক্ষেত্রেও জায়িজ নেই।) তাছাড়া নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো বলে দিয়েছেন—

لا يخلون رجل بامرأة ليست بذي محرم منهم ..

মাহরাম ছাড়া কোনো নারীর সাথে যেন কোনো পুরুষ একা না থাকে।[৫৮৭]

ইমাম নববি *মুসলিম শরিফের* ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন—এ সকল হাদিস সহিহ, তবে এ হাদিসগুলোতে সফরের সবচেয়ে কম সময়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় নি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও সবচেয়ে কম সময়ের সফরের পরিমাণের কথা বর্ণিত হয় নি। মোটকথা, সফরের যেটাকেই মানুষ সফর বলে মনে করে, সেটা থেকেই মাহরাম বা স্বামী ছাড়া নারীকে নিষেধ করা হবে। তিনদিন হোক, দুই দিন হোক, একদিন অথবা কয়েক মাইল হোক কিংবা অন্য কোনো সংখ্যা হোক। যার প্রমাণ, পূর্বে বর্ণিত ইবনু আববাস রা.-এর মুতলাক (শর্তহীন) হাদিস; যা সব ধরনের সফরকেই শামিল করে। আল্লাহই ভালো জানেন।[৫৮৮]

এ সকল হাদিসে সফর দ্বারা আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য (শরয়ি অর্থ নয়)। অর্থাৎ দূরবর্তী জায়গা অতিক্রম করা। মোল্লা আলি কারি 'মিরকাতে' এমনটাই বলেছেন। তিনি 'দারুল কুফর'[৫৮৯] থেকে মাহরাম ছাড়া নারীর হিজরত করাকে হাদিসে বর্ণিত নিষেধ থেকে বের করেন। অর্থাৎ এটাকে জায়িজ বলেছেন। যার দলিল, আদি ইবনু হাতিম রা.-এর হাদিস, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله

হিরা এলাকা থেকে উটে আরোহিত নারী কাবার উদ্দেশ্যে বের হবে, তার সাথে কোনো সঙ্গী থাকবে না। (অথচ) সে আল্লাহ ছাড়া কারও ভয় করবে না।[৫৯০]

---

[৫৮৭] শারহুল বুখারি, ইবনু বাতল : ৩

[৫৮৮] মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, ইমাম নববি, অনুচ্ছেদ : মাহরামসহ হজ বা অন্যকোথাও নারীর সফর করা..

[৫৮৯] সংক্ষিপ্তভাবে দারুল কুফরের পরিচয় হলো—এমন রাষ্ট্র, যার চারপাশে কোনো মুসলিম দেশ নেই, যেখানে ইসলামের বিধিবিধান অচল, সেটাকেই দারুল কুফর বলে।

[৫৯০] মিরকাত, মানাসিক অধ্যায়, হাদিস নম্বর : ২৫১৫

কাফিরদের হাতে বন্দিনীও মাহরাম ছাড়া পালিয়ে আসতে পারবে। কারণ, যে হিজরত করবে বা যে বন্দিনী পালিয়ে আসবে, তার এই 'আসা' সফর নয়; কারণ, তারা কোনো নির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশ্যে বের হয় না; বরং কোনোভাবে জুলুম-নির্যাতনের ভয় থেকে মুক্তি পাওয়াই মূল উদ্দেশ্য থাকে। এজন্যই তারা যদি কোনো নিরাপদ স্থান যেমন মুসলিম সেনাক্যাম্প দেখতে পায়, তাহলে তাদের ওপর ওয়াজিব সেখানে অবস্থান করা, স্বামী বা মাহরাম ছাড়া সেখান থেকে সফর না করা। এখন যদি তারা নির্দিষ্ট কোনো স্থানকে উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করে, তাহলে তাদের এ উদ্দেশ্য গ্রহণ বা নিয়ত ধর্তব্যও হবে না। সফর বলেও বিবেচিত হবে না। কারণ, তাদের এ বাহ্যিক অবস্থা অর্থাৎ মুক্তি পাওয়ার আশা ওই উদ্দেশ্যকে নাকচ করে। (আর মুক্তি পাওয়ার আশা সফরের পরিপন্থী)। আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, এটা সফর, তবুও বলতে হবে—এটা মাজবুরির সফর (অর্থাৎ এ সফর জায়িজ)। কারণ, সফর অবস্থায় যে ফিতনার (অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়া) (মাহরাম ছাড়া) আশঙ্কা আছে সেটা দারুল হারবের ফিতনার (জুলুম-নির্যাতন) চেয়ে অনেক লাঘব, তাই এ সফর জায়িজ বলে বিবেচিত হবে এই মূলনীতির আলোকে—

أخف المفسدتين يجب ارتكابها عند لزوم إحداهما

যখন দুটো ক্ষতিকর বিষয়ের যে কোনো একটা ক্ষতিকর বিষয় আশ্যকীয়, তখন কম ক্ষতিকর বিষয়টা করা ওয়াজিব।

মোটকথা, এখানে সফর জায়িজ হচ্ছে মজবুরি ও উপায়হীনতার কারণে; যাতে এমন ক্ষতি দূর করা সম্ভব হয়, যা মাহরাম ও স্বামী ছাড়া 'দারুল ইসলামে' (ইসলামি রাষ্ট্র) সফর করার ক্ষতির চেয়ে বেশি ক্ষতিকর। 'ফাতহুল কাদির' ও 'আল-বাহরুর রায়িকে' এমনই উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৯১]

কতটুকু দূরের সফরে স্বামী বা মাহরাম ছাড়া সফর করা যাবে না—এ-ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন মত :

এক. ইমাম নাখায়ি, শাবি, তাউস ইবনু কাইসান এবং জাহিরি মাজহাবের মত—নারী নিজে নিজে কোনো সফরই করতে পারবে না, কাছে হোক বা দূর। যদি-না তার সাথে স্বামী বা মাহরাম থাকে।

তাদের দলিল ওই সকল হাদিস, সেগুলো মুতলাক বা শর্তহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইবনু আব্বাস রা.-এর হাদিস।

দুই. আতা, সায়িদ ইবনু কাইসান এবং জাহিরি মাজহাবের কয়েকজনের নিকট—১২ মাইলের কম হলে সফর করা জায়িজ, আর যদি ১২ মাইল বা এর বেশি হয়,

[৫৯১] আল-বাহরুর রায়িক, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৩৮

তাহলে মাহরাম বা স্বামী ছাড়া সফর করা জায়িজ নয়। তাদের দলিল সুনানু আবি দাউদে বর্ণিত আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিস।

তিন. ইমাম আউজায়ি, লাইস, মালিক এবং শাফিয়ি রহ.-এর মাজহাব—একদিনের কম দূরত্বের হলে সফর করতে পারবে। এর বেশি হলে স্বামী বা মাহরাম ছাড়া সফর করতে পারবে না। তবে ইমাম মালিক ও শাফিয়ি রহ.-এর মাজহাবে ফরজ হজের জন্য স্বামী বা মাহরাম ছাড়াই নারী সফর করতে পারবে। যদিও তার এলাকা ও মক্কার মাঝে সফরের দূরত্বের পরিমাণ থাকে। অর্থাৎ তারা একা একা সফর করার নিষিদ্ধতার কথা শুধু ওই সফরের ক্ষেত্রেই বলেন, যা ওয়াজিব নয়।

তাদের দলিল *সহিহ বুখারি*তে বর্ণিত আবু হুরাইরা রা.-এর হাদিস।

চার. ইমাম জুহরি, হাসান আল-বাসরি ও কাতাদা রহ.-এর মত—দুই দিন ও রাতের কম দূরত্বে সফর করতে পারবে। আর যদি দুই দিন দুই রাত হয়, তাহলে মাহরাম বা স্বামী ছাড়া সফর করতে পারবে না।

তাদের দলিল, *সহিহ বুখারি*তে বর্ণিত আবু সায়িদ খুদরি রা.-এর হাদিস।

পাঁচ. ইমাম সাউরি, আ'মাশ, আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মাজহাব—কসরের সফরে অর্থাৎ তিন দিনের দূরত্বে মাহরাম বা স্বামী ছাড়া সফর করতে পারবে না।

তাদের দলিল, *সহিহ বুখারি*তে বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রা.-এর হাদিস। হানাফি মাজহাবে হজের সফর হোক বা অন্য যে কোনো সফর হোক কোনো পার্থক্য নেই। কোনো অবস্থাতেই মাহরাম বা স্বামী ছাড়া সফর করা জায়িজ নয়। এমনটাই উমদাতুল কারিতে রয়েছে।[৫১২]

এ সকল মাজহাব, মত ও দলিল-প্রমাণ বিশ্লেষণের জন্য দেখা যেতে পারে আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি হানাফি রচিত নুখাবুল আফকার ফী শারহি মাআনিল আসার, অধ্যায় : হজ (অনুচ্ছেদ, : নারী যদি মাহরাম না পায়, তাহলে কি তার ওপর ফরজ হজ আদায় ওয়াজিব হবে?)।

এই মতই (পঞ্চম মত) হানাফি মাজহাবের নিকট প্রসিদ্ধ। এ-জন্যই হিদায়া গ্রন্থপ্রণেতা হজ অধ্যায়ে বলেন—সফরের নির্দিষ্ট পরিমাণের কম দূরত্বে একজন নারীর জন্য 'মাহরাম ছাড়া' বের হওয়া বৈধ নয়।

কিন্তু আল্লামা ইবনু আবিদিন বলেন—আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত আছে, একদিনের দূরত্বে বের হওয়া মাকরুহ এবং এই ফিতনা ফাসাদের যুগে এই মতের ওপরই ফতোয়া দেওয়া উচিত।[৫১৩]

[৫১২] উমদাতুল কারি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১২৬

[৫১৩] সূত্র : শারহুল লুবাব।

এমতকে সমর্থন করে সহিহ বুখারি ও মুসলিমের হাদিস—

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم عليها وفي

যে নারী আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার জন্য বৈধ নয়, মাহরাম ছাড়া একদিন ও এক রাতের দূরত্বে সফর করা।

(এটা *সহিহ বুখারির* শব্দ।) *সহিহ মুসলিমে* আছে—(مسيرة ليلة) এক রাতের দূরত্ব, আরেক বর্ণনায় আছে (يوم) একদিন।[১১৪]

উপরের আলোচনা থেকে জানা গেল—বর্তমান যুগের ফাতওয়া অনুযায়ী মাহরাম বা স্বামী ছাড়া কোনো নারী একদিনের দূরত্বে সফর করতে পারবে না। আল্লামা ইবনু আবিদিন বলেন—মাহরাম বলা হয় এমন কাউকে, যার সাথে কখনোই বিবাহ করা বৈধ নয়। চাই সেটা আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে হোক বা দুধপানের সূত্রে, কিংবা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে।

তুহফাতুল ফুকাহাতে এমনই বলা হয়েছে। জহিরিয়্যা নামক কিতাবে উল্লেখ আছে, যার সাথে জিনা করেছে তার মেয়েও জিনাকারীর মাহরাম বলে গণ্য হবে; কিন্তু *শারহুল লুবাব* গ্রন্থে বলা হয়েছে—*হিদায়া* গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার আল্লামা কাওয়ামুদ্দিন বলেন, জিনার ভিত্তিতে মাহরাম হলেও কয়েকজন উলামায়ে কিরামের নিকট তার সাথে সফর করা যাবে না, এই মত পোষণ করেছেন। ইমাম কুদুরি রহ. এবং এটাই আমাদের মত। আর এর মাধ্যমেই দ্বীনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা যাবে, অপবাদ থেকে দূরে থাকা যাবে।

সাইয়িদ আবু সাউদ *নাফাকাতুল বাজ্জাজিয়া* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি পেশ করেন যে, বর্তমান যুগে নারী তার দুধভাইয়ের সাথেও সফর করতে পারবে না। অর্থাৎ ফিতনা ফাসাদের কারণে এটা করবে না। আমি—আল্লামা ইবনু আবিদিন—বলি, এ মত সমর্থন করে আরেকটা মাসআলা অর্থাৎ দুধভাইয়ের জন্য দুধবোনের সাথে একান্তে মিলিত হওয়া মাকরূহ। যেমন—ছেলের যুবতী স্ত্রীর সাথে শ্বশুরের একা থাকা মাকরুহ। অতএব, যুবতী স্ত্রীরও শ্বশুরের সাথে সফরে বের না হওয়ার কারণ, সফরও এক প্রকার 'একা' থাকার মতোই।[১১৫]

মুহরাম হওয়ার জন্য শর্ত হলো—

- ০১. আকেল বা বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া;
- ০২. বালেগ হওয়া;
- ০৩. মাজুসি (অগ্নিপূজারি) না হওয়া;

---

[১১৪] সূত্র : রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৫৮

[১১৫] সূত্র : রদ্দুল মুহতার

- ০৪. ফাসেক না হওয়া;
- ০৫. স্বামীর ক্ষেত্রেও এ শর্তগুলো পাওয়া যেতে হবে।[২১৬]

আল-মুহিতুল বুরহানি নামক কিতাবে, ইমাম কুদুরি রহ. বলেন—মাহরাম যদি মাজুসি হয়, যে তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করাকে বৈধ মনে করে, তাহলে তার সাথে সফর করা যাবে না। কারণ, তার লোলুপ দৃষ্টি নারীর ওপর পড়াটাই স্বাভাবিক। এ-জন্যই নারী তার মাহরাম মাজুসির সাথে একা থাকতে পারে না। সুতরাং সফরও করতে পারবে না। কুদুরি রহ. এটাও বলেন যে—কোনো মুসলিম-মাহরাম-এর ব্যাপারেও যদি খারাপের আশঙ্কা থাকে, তার সাথেও সফর করা যাবে না। কারণ, মাহরাম সঙ্গে থাকার যে উদ্দেশ্য সেটাই তার থেকে পাওয়া যায় না।

অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর থাকা না থাকা সমান। তদ্রূপ মস্তিষ্ক-বিকৃতির অধিকারী মাহরামের থাকাও বিবেচ্য নয়। কারণ, মাহরাম সঙ্গে থাকার উদ্দেশ্য হলো—নিরাপত্তা, যা তাদের দ্বারা পাওয়া যায় না।[২১৭]

এটাই মূলত বিধান যদিও বর্তমান যুগে সবাই এ বিধান পালনে শিথিলতা করে! আফসোসে বিষয় যে, অনেক উলামায়ে কিরামও এ বিষয়ে শিথিলতা করে থাকেন; অথচ তাদেরকেই অন্যদের আদর্শ মনে করা হয়। তাহলে শরিয়তপালনে অন্যদের কী দশা হবে! অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আজকে মুসলিম দেশগুলোতে খুব কমই এমন পাওয়া যায়, যারা শরিয়তের আদেশ নিষেধের সামনে অবিচল। তবে আল্লাহ তাআলার অনেক শুকরিয়া যে (হাদিসের ভাষ্যনুযায়ী) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একদল উম্মত সদা সর্বদা আল্লাহ তাআলার আদেশের সামনে অবিচল, যারা তাদের থেকে সরে যায় বা বিরোধিতা করে, তারা ওই দলের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। একসময় আল্লাহ তাআলার ফায়সালা আসবে, আর তারা সবার ওপর বিজয় লাভ করবে। আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ—তিনি যেন আমাদেরকেও এই মুবারাক কাফেলায় শামিল করেন। তিনিই ফরিয়াদ পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ তাআলাই সঠিক বিষয়ে অধিক অবগত।

ইসলামে নারীদের মর্যাদা

নারীদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও বৈবাহিক অধিকারের শ্লোগান নিয়ে আজকের সমাজ খুবই উত্তাল। তথাকথিত প্রগ্রতিশীল নারীবাদীরা মুখে বড়ো বড়ো কথা বলে, তারাই নারীকে স্বপ্ন দেখিয়েছে, গণতন্ত্র ব্যবস্থা তাদের মর্যাদা দিয়েছে। এদিক দিয়ে আরেকদল নারীর অধিকার রক্ষায় আল্লাহপ্রদত্ত ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে

[২১৬] রদ্দুল মুহতার, কিতাবুল হজ।

[২১৭] আল-মুহিতুল বুরহানি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪১৯

লেগেছে। তাদের দাবি—ইসলাম নারীকে তার সমস্ত প্রাপ্য হক থেকে বঞ্চিত করেছে। তাকে ঘরে বন্দি করে রেখেছে। পর্দার মাঝে আবদ্ধ করে রেখেছে। পুরুষের কাঁধে কাঁধ রেখে চলতে নিষেধ করেছে। পুরুষের ওপর তার যাবতীয় বিষয় সোপর্দ করেছে, যাতে যখন যেভাবে ইচ্ছা জুলুমের কাঠগড়ায় দাঁড় করতে পারে; তাকে স্বামীর ঘরে বন্দিত্বের শেকল পরিয়ে রেখেছে, যে কিনা যখন যাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারে, আবার চাইলে ফেলেও দিতে পারে।

এ জাতীয় আরও কিছু অপবাদ আছে, যেগুলোর ভেতরগত কাঠামো-দুর্বলতা ও অসারতা একজন জ্ঞানীর সামনে কখনোই তুলে ধারার প্রয়োজনও হয় না। তাদের থেকে তারপরও এই ধরনের অভিযোগ ওঠে আল্লাহপ্রদত্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার কারণে, অথবা অজ্ঞতার ভান করার কারণে; অথচ এই ইলাহি ব্যবস্থাই নারীর যাবতীয় হক, কীসে তার কল্যাণ—এসব কিছু সংরক্ষণ করে রেখেছে।

আসলে প্রগতিশীল বা নারীবাদীরা কল্যাণ-অকল্যাণ আর ভালো-খারাপের মাঝে পার্থক্য কী, তাই জানে না, বা পার্থক্যটা তৈরিই করতে পারে না। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা বলেন—

> وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ .. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ
>
> আর যখন তাদের বলা হয়—'তোমরা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়ো না'; তখন তারা বলে—'আমরা তো সংশোধনকারী'; কিন্তু তারা (তা) অনুধাবন করতে পারে না।[৫১৮]

তো, এখানে আমি স্পষ্ট করে সংক্ষিপ্ত পরিষরে তুলে ধরতে চাই, ইসলাম নারীকে কী মর্যাদা দিয়েছে, তার জন্য কী বৈধ করেছে আর কী অবৈধ রেখেছে।

ইতিহাস বলে জাহিলিয়াতর যুগে ইসলাম আসার পূর্বে নরীসমাজ এতটাই অমর্যাদার পাত্র ছিলা যে কাউকে যখন তার কন্যা সন্তান জন্মেছে বলে খবর দেওয়া হতো, তার কাছে নিজেকে এতটাই ব্যর্থ, কলংকিত মনে হতো যে শেষ পর্যন্ত তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলত, যাতে সমাজ থেকে কোনো রকম নিন্দা-সমালোচনার মুখোমুখি হতে না হয়, আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে বলেন—

> وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ .. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ..
>
> আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তার চেহারা কালো হয়ে যায়। আর সে ক্রোধে টগবগ করতে থাকে, তাকে

[৫১৮] সূরা বাকারা. আয়াত : ১১-১২

এমন সুসংবাদ দেওয়ার কারণে সে সমাজ থেকে পালিয়ে বেড়ায় (চিন্তা করতে থাকে) লাঞ্ছনা সয়ে তাকে (জীবিত) রাখবে না। মাটিতে পুঁতে ফেলবে। শোনো, এরা খুবই মন্দ বিচার করে।’[৫১১]

ইমাম রাজি বলেন—(ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا)। এটা দ্বারা উদ্দেশ্য—সে দুঃখে কষ্টে ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। কেউ যখন কোনো অপ্রিয়কর কিছুর সম্মুখীন হয় তখন বলা হয় (قد اسود وجهه غما وحزنا) তার চেহারা তো দুঃখে কষ্টে কালো হয়ে গেছে। (আয়াতে) মুখ কালো হয়ে যাওয়া দ্বারা চিন্তা পেরেশানি বোঝানো হয়েছে। কারণ, মানুষ যখন বেশি খুশি হয় তখন তার অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়, ভেতরে থাকা রূহ প্রশস্ত হয়ে যায়, বিভিন্ন অঙ্গা-প্রত্যঙ্গো এটা প্রকাশ পায়। বিশেষ করে চেহারায় যেহেতু এ দুয়ের মাঝে একটু বেশি সম্পর্ক আছে, এ হাসি যখন রূহের কাছে পৌঁছে, তখন চেহারা উজ্জ্বল আকার ধারণ করে। ঝলমল করতে থাকে। আর যখন খুব কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন ভেতরের রূহটা যেন নিস্তেজ ও অচল হয়ে যায়। ফলে চেহারা ছাই আকার ধারণ করে। কালো হয়ে যায়। তার চেহারা ঘোলাটে ও ভারী হয়ে যায়। তো এখান থেকে বুঝা গেল যে, খুশী হলে চেহারা উজ্জল ও জ্বলজ্বল করতে থাকে, আর কষ্ট পেলে চেহারা বিবর্ণ, ধূসর হয়ে যায়, কালো বর্ণ ধারন করে।এ-জন্যই মুখের শুভ্রতা ও উজ্বলতাকে খুশির অর্থে ব্যবহার করা হয়, মুখের বিবর্ণ ও কালো হওয়াকে দুঃখ-কষ্টের অর্থে ব্যবহার করা হয়। এই অর্থ বোঝানোর জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন—

ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا

তার চেহারা কালো হয়ে যায় আর সে ক্রোধে ফুঁসতে থাকে—

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ

মুফাসসিরিনে কিরাম বলেন—জাহিলি যুগে যখন কারও স্ত্রীর প্রসববেদনা হতো, তখন সে সমাজ থেকে আলাদা হয়ে সন্তান জন্মের খবর পাওয়ার আগপর্যন্ত পালিয়ে বেড়াত। তো, পুত্রসন্তানের কথা শুনলে খুশিতে আটখানা হয়ে যায়, আর কন্যাসন্তান হলে চিন্তা-পেরেশানিতে মাটির সাথে মিশে যায়। আরও কিছুদিন সে পালিয়ে থাকে। চিন্তা করতে থাকে—কী করবে সে? এ-সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ...

সেকি লাঞ্ছনা ভরে তাকে জীবিত রাখবে? এখানে জীবিত রাখা মনে বন্দি করে রাখা—(أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ) নাকি তাকে পুঁতে ফেলবে।

---

[৫১১] সূরা নাহল, আয়াত : ৫৮-৫৯

বলা হয়—আরবরা একটা গর্ত খুঁড়ে কন্যাকে পুঁতে ফেলত, এভাবে সে মারা যেত। কাইস ইবনু আসিম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, জাহিলি যুগে আমি আটটা মেয়েকে পুঁতে ফেলেছি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন—

أعتق عن كل واحدة منهن رقبة

প্রত্যেকের পক্ষ থেকে একজন করে দাস আজাদ করো!

তখন তিনি বললেন—হুজুর, আমার তো অনেক উট আছে।

নবীজি বলেন—

أهد عن كل واحدة منهن هديا

প্রত্যেত্যের পক্ষ থেকে একটা করে হাদি (পশু) দান করো।

বর্ণিত আছে, একলোক এসে বলল—হে আল্লাহর রাসুল, ইসলামগ্রহণের পর থেকে তো আমি আর ইসলামের মিষ্টতা অনুভব করতে পারছি না। কারণ, জাহিলি যুগে আমার একজন কন্যা জন্মেছিল, তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম—তাকে সাজিয়ে দেওয়ার জন্য। পরে সে আমার সাথে কন্যাকে বাহিরে নিতে দিলে, আমি তাকে নিয়ে একটা উপাত্যকায় যাই যা খুব গভীর ছিল, তখন আমি তাকে সেখানে ফেলে দিলাম! সে আমাকে বলছিল, বাবা তুমি আমাতে হত্যা করতে পারলে! এর পর থেকে যখনই আমার মনে তার এ কথা মনে পড়ে আমার মনে হয়, কোনো কিছুই বুঝি আমার উপকার করতে পারবে না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন—

ما كان في الجاهلية فقد هدمه الإسلام وما كان في الإسلام يهدمه الاستغفار

জাহিলি যুগে যত পাপ ছিল, তা আল্লাহ তাআলা ইসলামগ্রহণের মাধ্যমে মুছে দিয়েছেন। আর যদি কোনো গুনাহ ইসলামের যুগে হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা ইসতিগফার করার মাধ্যমে মাফ করে দেন।

জাহিলি যুগে তারা বিভিন্ন পদ্ধতিতে কন্যা সন্তানদের হত্যা করত, কেউ গর্ত খনন করে পুঁতে ফেলত। এভাবে সে মারা যেত। কেউ সুউচ্চ পাহাড় থেকে নিক্ষেপ করে ফেলে দিত, কেউ ডুবিয়ে মারত, এমনকি কেউ জবাইও করত। তারা এমনটা কখনো করত জাত্যাভিমান ও গাইরতের কারণে। কখনো বা দারিদ্র অনটন ও খরচের ভয়ে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

শোনো, তারা খুবই মন্দ বিচার করে।

কারণ, তারা কন্যা সন্তানকে হেয় জ্ঞান করতে করতে অনেক সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে। প্রথমত তারা মুখ কালো করে ফেলে। দ্বিতীয়ত, কন্যাকে প্রচণ্ড ঘৃণার কারণে সমাজ থেকে পালিয়ে বেড়ায়। তৃতীয়, স্বভাবগতভাবেই সন্তান সবার প্রিয় থাকে। এরপরও তারা ঘৃণাবশত তাকে হত্যা করতে উদ্যত হতো। এই সব কিছু এটাই প্রমাণ করে যে, কন্যা সন্তানের প্রতি ঘৃণা ও হেয়জ্ঞান করার ক্ষেত্রে এতটাই বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, যার ওপর আর কোনো বাড়াবাড়ি করা যায় না। বিষয়টা যদি এমনই হয়, অর্থাৎ যে জিনিসের প্রতি হেয়জ্ঞানটা এতটা সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তাহলে একজন সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী ব্যক্তি কীভাবে এ জিনিসটাকে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার দিকে সম্বন্ধ করাতে পারে—যিনি বিশ্ব জগতের অধিপতি, সমস্ত মালুকের সাদৃশ্য থেকে পুতঃপবিত্র?[৬০০]

জাহিলি যুগে নারীর অবস্থা

জাহিলি যুগে নারীদেরকে পশু ও পণ্যবস্তুর মতো মনে করা হতো; বরং সমাজে তার অধিকার বলতে কোনো কিছুই ছিল না। স্বামী মারা গেলে তাকে মিরাস হিসাবে বণ্টন করা হতো। মিরাসের ক্ষেত্রে তার কোনো প্রাপ্যই ছিল না। পশু বা অন্যান্য বস্তুর মতো তাকে বেচাকেনা করা হতো। তাকে বিবাহ ও অশ্লীল কাজে বাধ্য করা হতো। তাকে মিরাস বানানো হতো, অথচ সে মিরাস পেত না, তাকে হস্তগত করা হতো, অথচ সে কাউকে হস্তগত করতে পারত না!

যারা তাকে হস্তগত করত, তার মালিক হতো তাদের অধিকাংশই তাকে অনুমতি ছাড়া নিজের জিনিসও ব্যবহার করা নিষেধ করে দিত। তারা মনে করত স্বামী-স্ত্রীর সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে পারবে ঠিক, কিন্তু স্ত্রী পারবে না। কেউ কেউ নারী হত্যার ক্ষেত্রে পুরুষের ওপর কিসাস বা দিয়ত আবশ্যক করত না। এমনকি ইতিহাসে তো এমনও পাওয়া যায় যে, কোনো কোনো ইউরোপীয়রা ও অন্যান্য জাতিরা নারীসমাজকে পশু-শ্রেণি বা শয়তান-জাতি মনে করত। তাকে মানবশ্রেণির মধ্যে মনেই করত না! কেউ কেউ অবশ্য সন্দেহ করত।

ইসলামের যুগের নারীর অবস্থা

একসময় ইসলাম এলো, সমাজে নারীর অবস্থান সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরল, তাকে সম্মান ও মর্যাদার আসনে বসালো, তার উপযোগী অধিকারগুলো প্রদান করল। ইসলাম এসে বলল—নারী-পুরুষ সৃষ্টিগতভাবে সমান, তাদের উভয়কেই একজন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

[৬০০] আত-তাফসিরুল কাবির, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১১৫

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ..

হে লোকসকল, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যিনি তোমাদের একজন থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাদের উভয় থেকে বহু পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন। আর ভয় করো আল্লাহকে, যার দোহাই দিয়ে তোমরা চাও পরস্পর পরস্পরের কাছে। চাও আর (ভয় করো) আত্মীয়তা বন্ধনকে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের ওপর নজরদার।[৮০১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

إنما النساء شقائق الرجال

নারীরা হলো পুরুষদের সহদোরা।[৮০২]

অর্থাৎ সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত ক্ষেত্রে পুরুষদের মতো যেন নারীদের পুরুষদের থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে, তাছাড়া হাওয়া আ.-কে তো আদম আ. থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে, তার অংশবিশেষ থেকে গঠন করা হয়েছে।

ইসলাম বলে আমল ও প্রতিদানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সবাই সমান। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে বলেন—

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ..

যে কোনো মন্দ আমল করবে তাকে শুধু সে মন্দ আমলরই শাস্তি দেওয়া হবে আর যারা—পুরুষ বা নারী হোক—নেক আমল করবে এমন অবস্থায় যে তারা মুমিন, তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে এবং তাদেরকে বেলা হিসাব রিজিক দান করা হবে।[৮০৩]

আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন—সাওয়াব ও প্রতিদানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সবাই সমান, যদি উভয়ে সমানভাবে আনুগত্য করে। এই আয়াত প্রমাণ করে যে, ধার্মিকতার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় আমল ও কর্মের মাধ্যমে, আমলকারী বা কর্মীর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়। কারণ, কারও নারী বা পুরুষ হওয়া, ইতর বংশ বা সম্ভ্রান্ত বংশের হওয়া, ধার্মিকতা ও আমলের ক্ষেত্রে এসবের কোনোই প্রভাব নেই।

ইমাম রাজি বলেন—আখিরাতের নিয়ামত যেমন চিরস্থায়ী, তেমনি আখিরাতের আজাবও চিরস্থায়ী। আর সেই চিরস্থায়ী নিয়ামতের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা এবং ওই চিরস্থায়ী আজাব থেকে ভয় প্রদর্শন করা 'তারগিব-তারহিবের' শক্তিশালী একটি

[৮০১] সূরা নিসা, আয়াত : ১

[৮০২] সুনানু আবি দাউদ : ২৩৬, অনুচ্ছেদ, পুরুষ ঘুমের সময় আদ্রতা অনুভব করে।

[৮০৩] সূরা গাফির, আয়াত : ৪০

পন্থা। তারপর আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন—আখিরাতের প্রতিদান কেমন হবে, আল্লাহ তাআলা সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এদিকেও ইঙ্গিত প্রদান করলেন যে, আখিরাতে শাস্তির চেয়ে তার দয়ার পরিমাণই বেশি হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا

যে কোনো মন্দ আমল করবে তাকে শুধু সে অনুরূপ শাস্তি দেওয়া হবে।

এখানে অনুরূপ দ্বারা উদ্দেশ্য যা তার প্রাপ্য। এখন যদি আপত্তি করা হয় যে, এটা আবার কীভাবে সম্ভব? কারণ, সামান্য সময়ের কুফরিই তো চিরস্থায়ী শাস্তি আবশ্যক করে! আমরা উত্তর বলব—যদি কাফির এই প্রতিজ্ঞা করে যে, সে তার বিশ্বাসের উপরেই অটল থাকবে, তাহলে এটা ঠিক যে—তার শাস্তি চিরস্থায়ী হবে।

পক্ষান্তরে যে ফাসিক, সে কিন্তু বুঝতে পারছে যে—এটা তার খিয়ানত হচ্ছে, অবাধ্যতা হচ্ছে। সুতরাং বলা যায়, তার এই নিয়ত নেই যে, সে এই অবাধ্যতার ওপর অটল থাকবে। তাই, যদি বলা হয়—ফাসিকের শাস্তি ক্ষণস্থায়ী, তাহলে সমস্যা নেই।

আর মুতাজিলা সম্প্রদায় যা বলে, অর্থাৎ তাঁর শাস্তি চিরস্থায়ী, তাদের এই আকিদা বাতিল, প্রত্যাখ্যাত। কারণ, তার অবাধ্যতা তো ছিল ক্ষণস্থায়ী, অবাধ্যতার নিয়তটাও সার্বক্ষণিক ছিল না; বরং ক্ষণস্থায়ী ছিল। এখন যদি তাকে চিরস্থায়ী সাজা দেওয়া হয়, তাহলে সেটা কুরআনের বাণীর বিপরীত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا

যে কোনো মন্দ আমল করবে তাকে শুধু তার অনুরূপ শাস্তি দেওয়া হবে।[৬০৪]

ইসলাম বলে পুরুষের ওপর নারীদের কিছু অধিকার আছে, যেমন নারীদের ওপর পুরুষের কিছু অধিকার আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

তাদের (নারীদের) জন্য (পুরুষদের ওপর রয়েছে) রয়েছে কিছু হক যেমন নারীদের ওপর রয়েছে (পুরুষদের কিছু হক) আর পুরুষদের জন্য রয়েছে তাদের (নারীদের) ওপর বিশেষ মর্যাদা আর আল্লাহ প্রতাপশালী মহাপ্রজ্ঞাময়।[৬০৫]

[৬০৪] আত-তাফসিরুল কাবির, খণ্ড : ২৭, পৃষ্ঠা : ৫১৮

অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর অধিকার দুই পক্ষ থেকেই আসবে, স্বামীর জন্য যেমন স্ত্রীর ওপর কিছু হক রয়েছে তদ্রূপ স্ত্রীরও স্বামীর ওপর কিছু হক রয়েছে। তাদের হক ও অধিকার কী কী, সেগুলো সবিস্তারে উলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেছেন। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখ করার সুযোগ নেই। তবে খেয়াল রাখতে হবে—নারী পুরুষের মাঝে এ সাম্য সকল ক্ষেত্রে নয়, যেমনটা বলে গণতন্ত্রে বিশ্বাসীরা। কারণ, আল্লাহ তাআলা একটু পরই বলেন—

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

আর পুরুষদের জন্য নারীদের ওপর রয়েছে (বিশেষ) মর্যাদা।

ইমাম রাজি বলেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীদের চেয়ে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বেশি যেমন—

- ০১. জ্ঞানবুদ্ধি;
- ০২. দিয়াত;
- ০৩. মিরাস;
- ০৪. খলিফা, কাজি ও সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতার ক্ষেত্রে;
- ০৫. একজন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পুরুষ অন্যজনকে বিবাহ করতে পারবে, গ্রহণ করতে পারবে, কিন্তু একজন নারী তার স্বামী থাকাবস্থায় সেটা করতে পারে না;
- ০৬. স্ত্রী স্বামী থেকে যে পরিমাণ মিরাস পায়, তার চেয়ে বেশি স্বামী তার থেকে পায়।
- ০৭. স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে, তালাক দেওয়ার পর (ইদ্দত শেষ হওয়া পূর্বে) ফিরিয়ে নিতে পারবে, স্ত্রীর ইচ্ছা হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে না, তালাক দেওয়ার পর স্বামীকে ফিরিয়েও নিতে পারে না। আবার স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাধা দিতে পারে না।
- ০৮. গনিমতে নারীর চেয়ে পুরুষের অংশ বেশি।

তো যেহেতু এ সকল ক্ষেত্রে নারীর ওপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেল, সুতরাং বোঝা গেল—পুরুষের হাতে নারী অনেকটা একজন অক্ষম বন্দিনীর মতো। এজন্যই, তারা যেন অত্যাচারিত না হয়, তাদের ওপর যেন জুলুম না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক করতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان

তোমরা নারীদের ব্যাপারে উত্তম হিতাকাংখী হও; কারণ, তারা তো তোমার কাছে বন্দী।

আরেক হাদিসে আছে—

اتقوا الله في الضعيفين اليتيم والمرأة

দুই দুর্বল ও অসহায় এর ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো—

- ০১. ইয়াতিম, ও
- ০২. নারী।[৬০৬]

এ জন্যই শরয়ি পদ্ধতিতে স্ত্রীর ওপর স্বামীর জন্য খেদমত ও অনুগত্যের হক ও অধিকার রয়েছে। আম্মাজান আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> যদি আমি কাউকে কারও উদ্দেশ্যে সিজদা দেওয়ার আদেশ করতাম, তাহলে স্ত্রীকে আদেশ করতাম স্বামীকে সিজদা দেওয়ার জন্য। আর যদি কোনো স্বামী স্ত্রীকে লাল পাহাড় থেকে কালো পাহাড়ে, কালো পাহাড় থেকে লাল পাহাড়ে যাওয়ার আদেশ করে, তবুও তার কর্তব্য হবে সে আদেশ পালন করার।[৬০৭]

লাল পাহাড় থেকে কালো পাহাড়ে কালো পাহাড় থেকে লাল পাহাড়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। যদিও তা অসম্ভব। একথা বোঝানোর জন্য যে যত অসম্ভবই হোক না কেন, এবং যত কঠিনই হোক না কেন, স্বামীর আদেশ মানা স্ত্রী কর্তব্য, আর অসম্ভবতা বোঝানোর ক্ষেত্রে লাল পাহাড় এবং কালো পাহাড়ের সাথে সাদৃশ্য দেওয়া হয়েছে। কারণ, লাল পাহাড় এবং কালো পাহাড় সাধারণত একসাথে পাওয়া যায় না; বরং একটা আরেকটা থেকে অনেক দূরে থাকে। তো, এ হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর ওপর স্বামীর অনেক বড়ো হক রয়েছে।

নারীদের প্রতি ইসলামের ইহসান

ইসলাম নারীদের অধিকারবঞ্চিত করে নি। বরং তাদের অধিকার দিয়েছে। তাদের ওপর নানা রকম ইহসান করেছে। ইসলাম-পূর্ব আরব, বনি ইসরাইল ও অন্যান্য জাতির পুরুষরা যত ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত, এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা ছিল না, তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করাও শর্ত ছিল না! কিন্তু ইসলাম এসে সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলেছে—চার সংখ্যার বেশি এটা করা যাবে না। শুধু এতটুকুই না, যে নিজের ওপর দুজন স্ত্রীর মাঝে সমতা না রক্ষার আশঙ্কা করে, তার ওপর ওয়াজিব একজনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা। একের বেশি স্ত্রী-গ্রহণের অনুমতি শুধু

---

[৬০৬] আত-তাফসিরুল কাবির, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪৪১

[৬০৭] সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৫২, অনুচ্ছেদ : স্ত্রীর ওপর স্বামীর হক।

তারই জন্য, যার প্রয়োজন আছে, খরচ করতে পারে, তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করতে পারে।

এছাড়া, জাহিলি যুগে বিয়ে করাটা পুরুষদের কাছে নারীর জন্য একপ্রকার দাসত্ব ছিল। ইসলাম এসে বিয়ে-ব্যবস্থাকে একটা দ্বীনি আকদ (চুক্তি) বানিয়ে দিয়েছে। যাতে ফিতরতের তাকাজা (চাহিদা) রক্ষিত হয়, যেখানে স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার মাঝে মানবিক অস্থিরতা থেকে মন শান্ত হয়, যার ফলে দুই প্রেমাস্পদের মাঝে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি হতে থাকে, দয়া ও ভালোবাসা পূর্ণাঙ্গ হতে থাকে এবং সে দয়া ও ভালোবাসা মা-বাবা থেকে সন্তানদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
>
> আর তার নিদর্শনের মধ্য রয়েছে—তিনি তোমাদের থেকে তোমাদের জন্য স্ত্রীদের সৃষ্টি করেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ করো। আর তিনি তোমাদের পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তাতে রয়েছে কিছু নিদর্শন, এমন সম্প্রদায়ের জন্য—যারা চিন্তা করে।[৬০৮]

তাফসিরুল মানারে আছে—ইউরোপীয় ও অন্যান্য জাতি নারীদেরকে কোনো ধর্মের জন্য যোগ্যই মনে করত না, এমনকি তারা নারীদের জন্য আসমানি কিতাব পাঠ করাকেও হারাম মনে করত; কিন্তু ইসলাম এসে নারী-পুরুষ উভয়কে দ্বীনি বিষয়ে সম্বোধন করে তাদের 'মুমিন-মুমিনাত, মুসলিম-মুসলিমাত'- এর মহান উপাধি দিয়ে খেতাব ও সম্বোধনের মর্যাদা দান করেছেন।[৬০৯]

মোটকথা, নারী হক ও অধিকার প্রশ্নে ইসলাম জাহিলি ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মধ্যবর্তী এবং ইসলামই আদর্শ ও ইনসাফের ধর্ম। কেনই বা নয়, অথচ ইসলাম হলো সৃষ্টিকর্তা মহান রবের আইনব্যবস্থা, যিনি রহমান রহিম, নারী-পুরুষ প্রত্যেকের সংশোধন-পদ্ধতি, স্বভাব-প্রকৃতি, ভালো-মন্দ সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞানী, যিনি জানেন কীসে তাদের মুক্তি তাদের চিরচেনা দুশমন থেকে, যার শত্রুতা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাসী কোনো মুসলিম অস্বীকার করতে পারবে না, এ-জন্যই আল্লাহ তাআলা তাকে শত্রু হিসাবেই নেওয়ার এবং শত্রুতামূলক আচরণ করার আদেশ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

[৬০৮] সূরা রুম, আয়াত : ২১

[৬০৯] তাফসিরুল মানার, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ২৩৩

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

নিঃসন্দেহে শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ করো। সে তো তার দলকে প্ররোচনা দেয় যাতে তারা জাহান্নামের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।[৬১০]

আল্লাহ তাআলা শয়তানের শত্রুতা এত স্পষ্ট করে প্রকাশ করে দিয়েছেন; কারণ, শয়তান মানুষকে যে দিকে ডাকে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখতে মনে হয় মায়া-মমতা ও উপদেশ দিয়ে ভরা যেমন শয়তানের দোসররা করে থাকে; কারণ, সে মানুষকে তাদের প্রবৃত্তি উপভোগ, তাদের কী কী ভালো লাগে, এসবের দিকেই প্ররোচিত করে। কিন্তু আসলে সে যে তাদের ক্ষতি ও ধ্বংস করতে চাচ্ছে—এটা গোপন রাখে। উদাহরণস্বরূপ আদম আ. ও হাওয়া আ.-এর ঘটনা দেখা যেতে পারে। কী সুন্দর করে, শয়তার উপদেশ ও হিতাকাঙ্খা প্রকাশ করেছিল। সে তাদের বলেছিল—

مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

তোমাদের রব তো তোমাদের এ-গাছে (এর ফল খাওয়া) থেকে নিষেধ করেছেন, যাতে তোমরা ফেরেশতা না হয়ে যাও, অথবা চির অমর না হয়ে যাও...। আর আমি তোমাদের জন্য হিতাকাঙ্খীদের একজন।

তার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ....

অতঃপর শয়তান তাদের প্ররাচনা দিল..

হাঁ, এই নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার ওপর উদ্বুদ্ধ করাই মূল উদ্দেশ্যই ছিল এই প্ররোচনার, তখন থেকেই সে মানুষকে ওই সব কাজের দিকে প্ররোচনা দিয়ে আসছে। যা দেখতে মনে হয় তাদের চাহিদা ও প্রয়োজনই পূরণ করা হচ্ছে বৈ কিছু নয়, কিন্তু আসলে তার একমাত্র টার্গেট আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধ অমান্য করা, তাদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যেটা মনে হয়, সেটা নয়। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ

তোমাদের শত্রু (বন্ধু নয়)। অতএব, তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ করো।

অর্থাৎ, তার প্ররোচনার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকে, যেমন মানুষ তার শত্রুর কৌশলের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকে। অতএব, যে-সকল ধর্ম ও আইন-ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করা

---

[৬১০] সূরা ফাতির, আয়াত : ৬

হয়েছে মানবজাতিকে ধ্বংস করার ওপর, বুঝাতে হবে—সেটাই শয়তানের পথ ও পন্থা, যার মাধ্যমে সে তার দলবলকে প্ররোচিত করে, যাতে তারা জাহান্নামের অধিবাসী হতে পারে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি—জাহিলিয়াত ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা, দুটোই যেহেতু মানবজাতির ধ্বংসের কারণ, তাই এ দুটো ব্যবস্থাপনাই শয়তানেরই অনেকগুলো পথ-পন্থার দু-একটি। পক্ষান্তরে দ্বীনে ইসলাম ও তার আইন-কানুন, যা এই দুই ব্যবস্থাপনার মধ্যবর্তী; যাতে মানবজাতির মুক্তির সনদ লেখা আছে, এটা আল্লাহ তাআলার পথ, যার দিকে তিনি আপন বান্দাদের আহ্বান করেন, যাতে তারা জান্নাতের অধিবাসী হতে পারে।

তো নারীদের বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তার সারকথা হলো—ইসলাম নারীকে পর্দার আদেশ করে, ঘরে অবস্থান করতে বলে, সৌন্দর্য প্রকাশ করে এবং প্রয়োজন ছাড়া বের হতে নিষেধ করে। যেমন কুরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

আর তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করো; প্রথম জাহিলি যুগের মতো সৌন্দর্য প্রকাশ করে বেড়িয়ো না।

উসমা ইবনু জায়িদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

ما تركت بعدي فتنة أضر على أمتي من النساء على الرجال

আমি আমার পর পুরুষদের জন্য নারীদের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর কোনো ফিতনা রেখে যাই নি।[৬১১]

সুতরাং ওই সমস্ত প্রয়োজন ছাড়া নারীদের জন্য সভা-সমাবেশ ও অফিস-আদালতে বের হওয়া জায়িজ নয়, যেগুলো উলামায়ে কিরাম তাদের কিতাবে আলোচনা করেছেন, বিশেষ করে এই ফিতনা ফাসাদের যুগে। এই ফিতনা-ফাসাদের কারণেই উলামায়ে কিরাম ফাতওয়া দিয়েছেন যে—মাসজিদে নারীদের নামাজ পড়া নিষেধ। আম্মাজান আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل

(পরবর্তী সময়ে) নারীরা যা কিছু করেছে, এগুলো যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে পেতেন তাহলে তিনি তাদের নিষেধ করতেন যেমন বনি ইসরাইলের নারীদের নিষেধ করা হয়েছে।[৬১২]

---

[৬১১] মুসনাদু আহমাদ : ২১৭৪৬

[৬১২] সহিহ বুখারি : ৮৬৯

অতএব, মুসলিম উম্মাহর সাধারণদের কর্তব্য, নারীদের ক্ষেত্রে তাদের শরয়ি পন্থা অবলম্বন করা, নারীদের তাদের শরয়ি নির্দেশিত পাপ্য প্রদান করা, জাহিলিয়াত ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্জন করা; কারণ, এ-দুটোতে সমাজের ধ্বংসও বরবাদি ছাড়া কিছুই নেই।

আর মুসলিম উম্মাহর আলিমদের কর্তব্য, নারী-পুরুষ সবার অধিকার সবিস্তারে বর্ণনা করা, যা মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে ইসলাম তাদের প্রদান করেছে, বহুল দেশে প্রচলিত পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতি থেকে তাদেরকে সতর্ক করা, কারণ এই পশ্চাত্য অপসংস্কৃতির কারণেই আজকের নারী সমাজ অহংকার, তথাকথিত স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রতারণার স্বীকার; কারণ, মুসলিম উম্মাহর চিরতর দুশমনরা তাদের সামনে ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী শিক্ষা-ব্যবস্থা তুলে ধরেছে যার ফলে আজকের নারী-সমাজ সকল ক্ষেত্রেই পুরুষদের সাথে সমান অধিকারের শ্লোগান দিচ্ছে, যেন এগুলো তাদের, তাদেরই বিষয়! আসলে তারা আজকে স্বেচ্ছাচারিতা ও আত্মগরিমার শিকার, ঘরের ভেতর ও বাইরে পুরুষদের শাসিয়ে রাখতে চায়, ইসলামি শরিয়তব্যবস্থার সীমা অতিক্রম করতে চায়, এমনকি যেখানে কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট 'নস' আছে সেখানেও। বরং তারা নিজেরাই শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে চায়, যেগুলো তাদের বিষয় নয়। পুরুষদেরগুলোও দারা নিজেরা পরিচালনা করতে চায়, আল্লাহ তাঁর রাসুলের আদেশ থেকে বের হয়ে যেতে চায়। তারা তো অস্বীকার করে (আল্লাহ তাআলার বাণী যে) পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্ববান এবং (অস্বীকার করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী) ওই জাতি কখন সফল হতে পারবে না, যারা নিজেদের যাবতীয় বিষয় একজন নারীর হাতে সোপর্দ করেছে!

হে মুজাহিদ, আপনারা তাদের অনুসরণ করবেন না, যারা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে, যা পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা দ্বারা প্রভাবিত। কারণ, ওরা মহান স্রষ্টা ও তাঁর দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ। যদিও তারা নিজেদের জ্ঞানী বলে দাবি করে। অথচ তাদের বোধবুদ্ধি বলতে কিছুই নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

আর তোমরা সীমলঙ্ঘন কারীদের আদেশের আনুগত্য করো না যারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে, সংশোধন করে না[৬১৩]

আল্লাহ তাআলাই সঠিক বিষয়ে অবগত, আল্লাহ তাআলার কাছেই ফরিয়াদ তিনি যেন আমাকে সকল মুসলিম ভাইকে সঠিককে জানার তাউফিক দান করেন। তারপর সে বিষয়ে আমল করার তাউফিক দান করেন, এটাই আমার শেষ ইচ্ছা যা আমি চেয়েছি।

---

[৬১৩] সূরা শুআরা : ১৫১-১৫৩

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি আমি যা লিখেছি তা যেন সাদকায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করেন, আমার জন্য, আমার মা-বাবার, জন্য, আসাতিজায়ে কিরামের জন্য, মুসলিম উম্মাহ ও তাদের উলামায়ে কিরামের জন্য। আল্লাহ তাআলার জন্য অনেক অনেক প্রশংসা শুরুতে ও শেষে, জাহিরিভাবে ও বাতিনিভাবে।

দরুদ ও সালাত তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসুল মুহাম্মাদের প্রতি, তার পরিবার ও সাহাবায়ে কিরামের প্রতি। আল্লাহ সুবহানাহু ও তাআলা সন্তুষ্ট হন আমাদের প্রতি, আমলকারী আলিমদের প্রতি, দুনিয়া-বিমুখ মাশাইখগণের প্রতি, অল্পেতুষ্ট দরিদ্রদের প্রতি, একনিষ্ঠ মুজহিদের প্রতি। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের পূর্বসূরিদের ওপর রহম করেন। আমাদের উত্তরসূরিদের আপন অনুগ্রহে ঈমানের ওপর রাখেন। নিঃসন্দেহে তিনিই মমতাময়ী, অনুগ্রহকারী; যিনি আপন বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহবশত ইহসান করেন।

আল্লাহ তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের সম্মানার্থে, তার পরিবার ও সাহাবায়ে কিরামের বরকতে আমাদের সাথি-সঙ্গী ও প্রিয়জনদের প্রতি, সকল মুসলিমদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

এখন উত্তম হলো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লমের কিছু পরিপূর্ণ দুআ দ্বারা আমাদের আলোচনা সমাপ্ত করা। তাই আমরা দুআ করছি—

আয় আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে আপনার ভয় দান করেন, যার মাধ্যমে আপনি আমাদের মাঝে এবং গুনাহর মাঝে আড়াল হয়ে যাবেন, আপনার আনুগত্য দান করেন, যার মাধ্যমে আপনি আমাদের জান্নাতে পৌঁছে দেবেন; ইয়াকিন, বিশ্বাস ও দৃঢ়তা দান করেন, যার মাধ্যমে আমাদের সামনে দুনিয়ার মুসিবত তুচ্ছ করে দেবেন।

আমাদের কান, চোখ ও শক্তি দ্বারা উপকার দান করেন; যতদিন আমাদের জীবিত রাখবেন একে উত্তরাধিকার হিসাবে অমাদের পরবর্তীদের দান করেন। যারা আমাদের ওপর অন্যায় অবিচার করে, তাদের ওপর আমাদের প্রতিশোধ স্পৃহা দান করেন।

যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করেন। ধর্মপালন করার ক্ষেত্রে কোনো মুসিবত আমাদের দিয়েন না, দুনিয়াকে আমাদের চিন্তার বড়ো কেন্দ্র বানিয়ে দিয়েন না। (দুনিয়াকে) আমাদের ইলমের সর্বোচ্চ (মাপকাঠি বানিয়ে দিয়েন না)।

যারা আমাদের দয়া করে না, ওদেরকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েন না। আয় রব, আপনি আমার তাওবা কবুল করে নেন, আমার গুনাহ মোচন করে দেন, আমার হুজ্জত (প্রমাণ) শক্তিশালী করে দেন, আমার কথা সঠিক করে দেন, আমার অন্তরে হিদায়াত দান করেন, আমার মনের বিদ্বেষ বন্ধ করেন। আমিন।

লেখক-পরিচিতি

নাম ও বংশ : তিনি শাইখ আবদুল হাকিম ইবনু খোদায়াদ (হাজি মোল্লা সাহেব নামে প্রসিদ্ধ) ইবনি শের মুহাম্মাদ ইবনি মুহাম্মাদ জান ইবনি সাদুল্লাহ খান। পান জাওয়া এলাকার তালুকান গ্রামে এক দ্বীনি পরিবারে ১৩৭৬ সালে জন্ম।

ইবনু সাইয়িদ মুহাম্মাদ খান (আল্লাহ তাদের সকলকে ক্ষমা করে দেন) হাক্কানি, আফগানি, কান্দাহারি, বান্দতি মুরি ইসহাক জায়ি নামে প্রসিদ্ধ কবিলার দিকে সম্পৃক্ত। জন্ম আফগানিস্তানের কান্দাহারে। সেখানেই বেড়ে ওঠা ও লেখাপড়া।

তার পিতা ছিলেন সে যুগের বড়ো একজন আলিম ও ফকিহ। তাই তিনি নিজ পিতার কাছেই কুরআন কারিম পড়েন। ফার্সিভাষা, নাহু (আরবি ব্যকরণশাস্ত্র) সরফ (আরবি শব্দতত্ত্ব-শাস্ত্র) হাইআত, জোতির্বিদ্যা, হিকমত, রসায়ন-শাস্ত্র মানতিক-শাস্ত্র ফালসাফা (দর্শনশাস্ত্র) বালাগাত, (আরবি অলংকারশাস্ত্র) মিরাস (উত্তারাধিকার আইনশাস্ত্র) উসুলুল ফিকহ (ফিকহের মূলনীতি-শাস্ত্র) এবং তাফসিরের কিছু কিতাব—এই সব শিক্ষাই তিনি নিজ পিতার কাছেই লাভ করেন। তারপর ডাবেল শহরে (১৩৯৫) হিজরিতে গমন করেন। সেখানে শাইখ আবদুল্লাহ আখুনজাদা রহ.-এর কাছে আল্লামা তাফতাজানির রচিত *আল-মুতাওয়াল* নামে বালাগাতের গুরুত্বপূর্ণ কিতাব পড়েন। তারপর (১৩৯৭) হিজরিতে (১৯৭৭ ইংরেজি) হাদিসে নববি ও অন্যান্য শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করার জন্য জামেয়া দারুল উলুম হাক্কানিয়াতে দাখিল হন, যা পাকিস্তানের পেশওয়ারে অবস্থিত। এটি উকুরা খতক এলাকায় প্রতিষ্ঠিত। সেখানে তিনি হক্কানিয়ার বড়ো মাশাইখে কিরাম থেকে ইলম গ্রহণ করেন; তার উসতাজের মধ্যে রয়েছেন—শাইখ আল্লামা মুহাদ্দিস আবদুল হক, শাইখ আবদুল হালিম যারবাওয়াডী মুফতিয়ে আযম মুহাম্মাদ ফরিদ জারবাওয়াবি, শাইখ মুহাম্মাদ আলি সাবতি প্রমুখ রহিমাহুমুল্লাহ।

লেখক নিজের শিক্ষাজীবনের স্মৃতিচারণ করেন বলেন—আমি দারুল উলুম হাক্কানিয়াতে শাইখ আব্দুল হক রহ.-এর কাছে, যিনি ছিলেন এ মাদরাসার

প্রতিষ্ঠাতা, *জামি তিরমিজির* কিছু অংশ পড়ার সৌভাগ্য লাভ করি। মুফতিয়ে আজম মুহাম্মাদ ফরিদ সাহেবের কাছে *জালালাইনের* প্রথম খণ্ড, *সহিহ বুখারির* প্রথম খণ্ড, *জামে তিরমিজির* প্রথম খণ্ড ও *সুনানু আবি দাউদ* পড়ার সুযোগ পাই।

আর আল্লামা আব্দুল হালিম জারওয়াবি রহ.-এর কাছে—যিনি ছিলেন সদরুল মুদাররিসিন [প্রধান শিক্ষক] *তাফসিরে বাইজাবি, সহিহ বুখারির* দ্বিতীয় খণ্ড, *সহিহ মুসলিম* পড়েছি শাইখ মাওলানা সামিউল হক সাহেবের কাছে *জালালাইনের* দ্বিতীয় খণ্ড, *জামি তিরমিজি* দ্বিতীয় খণ্ড, *শামায়িলে তিরমিজি*, পড়ার সৌভাগ্য লাভ করি।

আর শাইখ মাওলানা মুহাম্মাদ আলি সাবাতি সাহেবের কাছে *তহাবি শরিফ, হিদায়ার* তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড পড়েছি। শাইখ ফজলুল মাওলা সাহেবের কাছে *মিশকাত* পড়েছি।

১৪০০ হিজরিতে লেখক (১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ) মুমতাজ (A+) লাভ করে দারুল উলুম থেকে ফারেগ হন। দারুল উলুম থেকে ফারেগ হয়ে সে বছরেই বালুচিস্তানের অবস্থিত জিয়ারত শহরে যান। সেখানে শাবান ও রামাদান, এই দুই মাসে শাইখ মুহাম্মাদ জান রহ.-এর কাছে কুরআন কারিমের তাফসিরের ইলম গ্রহণ করেন। কর্মজীবন ও কর্মজীবনের শুরুতে তিনি বিভিন্ন মাদরাসায় তাদরিসের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লেখক বলেন—বালুচিস্তানের বিভিন্ন মাদরাসার প্রসিদ্ধ কিতাব পড়ানোর সুযোগ হয়; যেমন, মাদরাসাতু তাদরিসিল কুরআন কারবালা, মাজহারুল উলুম শালদারা, নুরুল মাদারিস, যা আফগানিস্তানের ইসলামি ইনকিলাব সংগঠনের অধীনে পরিচালিত হতো।

পরবর্তী সময়ে যখন রুশবাহিনী আফগানিস্তান থেকে বিতাড়িত হয়, খিলকিদের ক্ষমতার সমাপ্তি ঘটে, তখন আমি আবার আফগানিস্তানে ফিরে আসি। আমার জন্মস্থান তালুকান গ্রামে তাদরিস শুরু করি। সেখানে দুই বছর তাদরিসের খেদমত করি। প্রথম বছর নির্দিষ্ট কিছু বিভাগে পড়াই, দ্বিতীয় বছর দাওরায়ে হাদিসে পড়াই, তারপর হেলমানদ গ্রামের সানজিন এলাকায় এসে দাওরায়ে হাদিসের দরস শুরু করি। তারপর আল্লাহর রাস্তার নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ আমিরুল মুমিমিন মোল্লা উমরি রহ.-এর নির্দেশে কানদাহারে গমন করি। সেখানে ইমারাতে ইসলামিয়্যার অধীনে পরিচালিত আল মাদরাসাতুল জিহাদিয়্যাতুল মারকাজিয়্যাতে তাদরিসের খেদমত করি। (এটা ২০০১ সালের কথা।)

যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার তাবেদার বাহিনী আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তালেবানদের হুকুমতের সমাপ্তি ঘটে, জায়গায় জায়গায় জুলুম-অন্যায়-অবিচারের আগুন ঝরে, সবাই হিজরত তখনকরতে বাধ্য হয়। লেখকও তাদের মতো পাকিস্তানে হিজরত করেন। সেখানে তিনি কুওয়াইতা শহরে বসবাস শুরু করেন।

সেখানে মুহাম্মাদ খায়ের সড়কে অবস্থিত জামেয়া হাক্কানিয়া, ও হাজি গাইবি সড়কে অবস্থিত জামেয়া ইসলামিয়্যাতে শিক্ষকতা করেন। এরপর ১৪২৪ হিজরিতে (২০০৩ সালে) তিনি নিজে কুওয়াইতা শহরে ইসহাকাবাদে জামেয়া দারুল উলুম আশ-শারইয়্যা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে ১৪ বছর হাদিসের দরস দেন। তারপর মার্কিন বাহিনির জুলুম অত্যাচারের কারণে দরস ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এমনকি জামাআতের সাথে নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদেও বের হতে পারতেন না।

কেন? কারণ, তিনি পূর্বে আফগানিস্তানের ইমারাতে ইসল্যামিয়্যার আদালতের প্রধান ছিলেন।, তাই তিনি রচনা ও সংকলনের কাজে মনোযোগ দেন। ফলে খুবই অল্প সময়ে অনেক কিতব রচনা করেন।

রচনাবলি : তিনি বেশ কিছু কিতাব রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

০১. *জাদুল মিনহাজ ফি তাহকিকিল মিনহাজ।* এটি তার শাইখ মুফতি মুহাম্মাদ ফরিদ জারওবারির রচিত, *মিনহাজুস সুনান শারহু জামিউস সুনান,* এবং প্রথম খণ্ডের বিশ্লেষণ। এ কিতাবে তিনি লেখকের কথা স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেন, সাথে সাথে আরও কিছু গুরুত্ব পূর্ণ আলোচনা ও ইলমি ফায়িদা যুক্ত করেন। এ কিতাবটি 5 খণ্ডের। এই কিতাবটির ভূমিকা লেখেন ইমারাতে ইসলামিয়্যার প্রধান আমিরুল মুমিমিন, শাইখুল হাদিস ওয়াত তাফসির আল্লামা হিবাতুল্লাহ আখুন্দ জাদাহ, হাফিজাহুল্লাহ এবং শাইখ শহিদ মাওলানা সামিউল হক রহ.।

০২. *আজ্বদ্দুশ শাবুইয়্যু ফি তাওজিহি জামিইত তিরমিজি।*এই কিতাবটিও *মিনহাজুস সুনান শারহু জামিইস সুনান* কিতাবটির দ্বিতীয় খণ্ডের বিশ্লেষণ; যা পাঁচ ভলিয়মের।

০৩. *জাদুল মাহফিল ফি শারহিশ শামায়িল।* এটি শামায়িলে তিরমিজির ব্যাখ্যাগ্রন্থ, এই কিতাবটি রচনার ক্ষেত্রে তিনি শামায়িলের অন্যান্য শরাহ ও হাশিয়ার সাহায্য নিয়েছেন। সাথে সাথে সিরাতের বিভিন্ন কিতাবেরও সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন।

০৪. *রাওজাতুল কাজা।* লেখক এই কিতাবে ইসলামি বিচারব্যবস্থার বিভিন্ন মূলনীতি ও নীতিমালা একত্র করেছেন। যার সংখ্যা ১৩৭৯টি।

০৫. *তাতিম্মাতুন নিজাম ফি তারিখিল কাজা ফিল ইসলাম।* এই কিতাবে তিনি ইসলামি বিচারব্যবস্থার সুদীর্ঘ ইতিহাস বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

০৬. *তাহকিকি মুয়িনিল কুজাতি ওয়াল মুফতিন।* এটি প্রসিদ্ধ কিতাব *মুয়িনিল কুজাতি ওয়াল মুফতিন* কিতাবের একটি শক্তিশালী ইলমি বিশ্লেষণ। ওই কিতাবটি রচনা করেছেন আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি, ও আশরাফ আলি থানবি রহ.-এর সুযোগ্য ছাত্র মুহাদ্দিস ফকিহ শামসুল হক্ব আফগানি (মৃত্যু : ১৪০৩ হিজরি।)।

০৭. *মানাকিবুল আইম্মাতিস সিত্তাতি রাহিমাহুমুল্লাহু।* এই কিতাবে তিনি ছয় ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফিয়ি, আহমাদ, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহিমাহুমুল্লাহর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য একত্র করেছেন।

০৮. *রিসালাতুন ফি আদাবিল মুআল্লিম ওয়াল মুতাআল্লিম।* রিসালাটি শুরু হয় প্রথমে 'আদব' শব্দের বিশ্লেষণ ও ফজিলত নিয়ে, তারপর শিক্ষকের আদব তারপর শেখানোর আদব, তারপর শিক্ষার্থীর আদব, তারপর শেখার আদব। রিসালাটি সমাপ্ত হয় কিছু আশ্চর্যকর ঘটনার বিবরণ উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে।

০৯. *রিসালাতুন ফি আদাবিল আকলি ওয়াশ শুরবি।* এখানে তিনি খাবারগ্রহণ, খাবারগ্রহণের অবস্থা, খাবার থেকে ফারেগ হওয়া, পান করা, মেহামানদারি ও মেহমানের আদাব নিয়ে আলোচনা করেছেন।

১০. *যাদুদ দুআ।* এটি একটি দুআর আদব এর বিষয়ে রিসালা রিসালাটি শুরু হয় দুআর অর্থ ও হাকিকত নিয়ে। তারপর দুআর ফজিলত, বিধান, আদাব, সময়, অবস্থা, স্থান নিয়ে আলোচনা করেন। নির্বাচিত দুআ উল্লেখ করেন। তারপর আল্লাহ তাআলার আসমায়ে হুসনা (সুন্দর নাম) উল্লেখ করেন। সাথে সাথে ব্যাখ্যাও করেন। রিসালাটি সমাপ্ত করা হয় জিহাদ সম্পৃক্ত কিছু দুআ উল্লেখ করে।

১১. *রিসালাতুন ফি আদাবিস সাফার।* এই কিতাবটিতে তিনি মুসাফিরের আদব নিয়ে আলোচনা করেছেন।

১২. *রিসালাতুন ফি আদাবিল মুফতি ওয়াল মুস্তাফতি।* রিসালাটি শুরু হয় ফতওয়ার শাব্দিক অর্থ ও পারিভাষিক অর্থ কাজার অর্থ ফাতওয়া এবং কাজার মাঝে পার্থক্য আলোচনার মাধ্যমে। তারপর তিনি ইফতা (ফাতওয়া প্রদানের বিধান) এর বিধান, মুফতির নিজের মাঝে থাকা আদাব ফাতওয়া লেখার ক্ষেত্রে মুফতির আদাব, ফাতওয়া প্রদানের আদাব, ফাতওয়া জিজ্ঞাসাকারীর আদাব ও গুণ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

১৩. *রিসালাতুন ফি আদাবি কাজাইল হাজাতি।* এখানে তিনি ইসতিনজার আদব নিয়ে আলোচনা করেছেন।

১৪. *আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা।* এই রিসালাটি শুরু হয় 'ওয়ালা এবং বারা'-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ নিয়ে আলোচনা করার মাধ্যমে। তারপর কুফ্ফার বিশ্ব থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার আবশ্যকীয়তা, কাফির ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করার হারাম হওয়া নিয়ে আলোচনা করেন। বন্ধুত্বগ্রহণের কিছু প্রকারও উল্লেখ করেন। তারপর রহমানের বন্ধু শয়তানের দোসরদের মাঝে শত্রুতা বিদআতি ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা ও ইসলামের ওয়ালা এবং বারার কিছু প্রয়োগক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করেন। খুবাইব ইবনু আদি সা'দ ইবনু আবি

ওয়াক্কাস, আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই—এদের ঘটনা উল্লেখ করেন। রিসালাটি সমাপ্ত হয় কাফির ও ফাসিকদের সাথে মুসলিমদের মুআমালার বিধানের আলোচনার মধ্য দিয়ে।

১৫. *রিসালাতুন ফিল হাবসি ওয়া আহকামিহি।* এই রিসালাটি শুরু হয় 'হাবস' ও 'সিয্‌জন' (আটক করা, বন্দি করা)-এর অর্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তারপর তিনি এর শরয়ি অনুমোদন, হিকমত, বন্দি করার কারণ ও সময়কাল, কারারক্ষকের গুণাবলি ও ভাতা, বন্দির পালিয়ে যাওয়া, কারাঘর পর্যবেক্ষণ করা ও সংস্কার করা, ইসলামে বন্দির হক ও অধিকার এসব নিয়ে আলোচনা করেন।

১৬. *রিসালাতুন ফি মাসআলাতি হালকির রা'সি।*

১৭. রিসালাতুন ফী মাসআলাতিল মোসাফাহা এই কিতাবে তিনি মোসাফাহার শারঈ অনু মোদন পদ্দতি, এ'সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করেন।—

১৮. *রিসালাতুন ফি মাসআলাতিত তাকলিদ।* এখানে তিনি তাকলিদের অর্থ, প্রকার,শরয়ি অনুমোদন, চার ইমামের তাকলিদের মাঝে তাকলিদের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

১৯. *রিসালাতুন ফি মাসআলাতিত তারাবিহ।* রিসালাটি শুরু করেন তারাবিহর নামাজের অনুমোদনের ইতিহাস, জামাআতের সাথে আদায় করা তারাবিহর রাকাআতের সংখ্যা চার মাজহারের মতামত, ও এবং তারাবিহর নামাজে কুরআন কারিম খতম করা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

২০. *ঝাদুদ দাওয়াহ।* এটি একটি রিসালাটিতে আল্লাহর রাস্তার দাওয়াত, এর ফজিলত, বিধান, স্বেচ্ছাসেবী, ও সাওয়াবের আশাকারীর মাঝে পার্থক্য, দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি ধরন, দাওয়াত প্রদানের পদ্ধতির এর উৎস ও সাধ্যম, দাঈদের আখলাক ও গুনাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়ে—

২১. *আত-তারিখুল ইসলামিয়া।* এটি ইসলামি ইতিহাসের বিষয়ে একটি রিসালা, রিসালাটি সূচনা করা হয়েছে ইতিহাস শব্দের বিশ্লেষণ, ইতিহাসের সূচনা, কারণ এবং মুহারম মাসের মাধ্যমে বর্ষ গণনা শুরু করার কারণ, এসব বিষয় নিয়ে বইটিতে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

২২. *খাতমু সহিহিল বুখারি শরিফ।* এই রিসালাতে কয়েকটি আলোচনা করা হয়েছে, প্রথম, *সহিহ বুখারির* অধ্যায় ও তরজমা, দ্বিতীয় অধ্যায়ের হাদিস বিশ্লেষণ, শেষ আলোচনা দাওরাতুল হাদিসের তালিবে ইলম ও মুতাখাররিজদের উদ্দেশ্যে কিছু অসিয়ত।

২৩. *জাদুল মাআদ ফি মাসাইলিল জিহাদ।* পশতু ভাষায় (জিহাদ বিষয়ক) লিখিত একটি কিতাব।

২৪. *তারিখুল ফাজলি ফি মাসাইলিল গনিমাতি ওয়াল ফাইহি ওয়ান নাফলি।* গনিমত, ফাই বণ্টন পদ্ধতি।

২৫. *তরিকুল জান্নাত।* (জান্নাত যাওয়ার পথ।)

২৬. *ঝাদুদ দারসিন ফি তাফসিরিল জালালাইন।* (জালালাইন কিতাবের তালিবে ইলমদের জন্য কিছু পাথেয়)

২৭. *আত-তাহকিকুল আজিব ফি হাল্লি শারহিল জামি।*

আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমার পিতার ফায়জ ও বারাকাত বিশ্বের প্রতিটি জনপদে ছড়িয়ে দেন, বংশধর, তালিবে ইলম ও মুহিব্বিন (প্রিয়জন) থেকে, ইলম ও ইরফানের ঝর্ণাধারা সেই দিন পর্যন্ত জারি রাখেন, যেদিন না কোনো সম্পদ কাজে আসবে, আর না সন্তানাদি; যদি-না বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর তাআলার সামনে উপস্থিত হয়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই তাউফিকদাতা।

—আবদুল গনি মাইওয়ানদি